চার দিক

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

বর্ণালী

৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রকাশক ঃ

কান্তি রঞ্জন ঘোষ

প্রচ্ছদ ঃ

পঞ্চানন মালাকর

প্রকাশকাল ঃ

সেপ্টেম্বর ১৯৬১

মুদ্রাকর ঃ

নিউ বৈশাখী প্রেস

শ্রীসুকুমার ঘোষ

৩৮ নং শিবনারায়ণ দাস লেন

কলিকাতা-৬

বন্ধুগণ, হাওয়া ঘুরছে।

বাতাস এখন ওলট পালট। সামলে। ভয় নেই, সংকট মানেই পরিত্রাণ। বাতাস ঘুরছে। ঘোরার মুখটাতেই যা একটু গোলমাল। ঘরের চাল উড়ে যায়, মাথার ওপর আকাশ বেরিয়ে পড়ে। মড় মড় করে ভেঙে পড়ে গাছের ডাল। মেঘ চমকায়, কড়াৎ করে বাজ পড়ে। তবু মনে রাখবেন, হাওয়া ঘুরছে। হাওয়া ঘুরে যাচ্ছে। হাত বদল হচ্ছে পৃথিবীর অধিকার। দেরী নেই।

প্রিয় বন্ধুগণ, হে চলাচলকারী জনসাধারণ, একদিন আমি বিপ্লবের অপেক্ষায় রাস্তার মোড়ে ফুলের মালা হাতে দাঁড়িয়ে থেকেছি। ওপরের ব্যালকনি থেকে উৎসাহ ভরে দেখেছি কত না মিছিল। মিছিলে আমি হেঁটেওছি কতবার, পতাকা বহন করেছি। চেঁচিয়ে বলেছি, আমাকে এটা দাও, সেটা দাও। কিংবা বলেছি—তুমি নিপাত যাও, অমুক নিপাত যাক। পুলিশের কালো গাড়ির ভিতরে বসে জালে আবদ্ধ কলকাতাকে দেখতে দেখতে গেছি জেলে। বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক—এই কথা চেঁচিয়ে বলেছি, বলেছি মনে মনে।

সন্ত্রাসবাদের আমলে আমার বয়স হয়নি, আমার বাবার হয়েছিল। কিন্তু তিনি সন্ত্রাসবাদী ছিলেন না, অসহযোগীও না। তিনি ছিলেন খুবই সফল এক রেল-কেরানী। বড় ইংরেজ-ভীরু লোক, আবার স্বদেশীদেরও সম্মান করেছেন বরাবর। কাজে ফাঁকি দেন নি, তাঁর ক্যাজুয়্যাল লীভ বছর বছর পচে যেত। জ্ঞান-বয়সে একমাত্র দাদুর শ্রাদ্ধের সময়ে, আর দিদির বিয়ের জন্য দু'টি দিন তিনি স্বেচ্ছায় ছুটি নিয়েছিলেন। একেবারে চাকরির শেষ দিকটায় তাঁর প্রমোশন হয়েছিল। শেষ একটা বছর তিনি স্বাধীন ভারতীয় রেলে কমার্শিয়াল ইন্‌সপেক্‌টর ছিলেন। তাঁর সেই উজ্জ্বল

সাফল্যের কথা তিনি এখনো লোককে ডেকে শোনান। এখনো তিনি ইংরেজদের গুণগান করেন। লক্ষ্য করে দেখেছি, ভারতের স্বাধীনতা কিংবা তজ্জনিত আন্দোলন, কিংবা গান্ধী বা ঐ রকম নেতারা, তাঁর মনে বিন্দুমাত্র রেখাপাত করতে পারে নি, যতটা পেরেছিল তৎকালীন ইংরেজ ডি. টি. এস. কিংবা ওপরওয়ালা অন্য কোন সাহেব।

অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আমার এই বাবাটির জন্যই আমি বরাবর মনে মনে বিপ্লবী। দিনশেষে বাবা বাসায় ফিরে রুটি খেতেন, তখন আমরা ছয় ভাইবোন তাঁকে ঘিরে ধরতাম। বাবা ভাগ দিতেন। মা আমাদের তাড়া দিলে তিনি দুই বাহু বাড়িয়ে বলতেন—আহা, থাক, থাক! রাতে পড়া করার সময়ে মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে গেলে হঠাৎ শুনতে পেতাম, রান্নাঘরের চৌকাঠে বসে বাবা মাকে বলতেন—এবারও হল না, বুঝলে! সান্যাল আমার কত জুনিয়ার, অথচ ও বেরিয়ে গেল প্রমোশন পেয়ে। শুনতাম, মা ঝেঁঝে উঠে বলছেন—তা তুমি করো কী? বাবা উত্তর দিতেন না। ভাবতেন। কখনো বা পড়ার ঘরে এসে বলতেন—ইংরিজিটা ভাল করে শেখো। চাকরিতে কাজে লাগবে। একবার রেলের এক ফুটবল ফাইন্যাল দেখতে গেছি। সুন্দর তাঁবুর নীচে ভাল ভাল চেয়ারে সাহেবরা বসে, পাশে মেম, সামনের টেবিলে কাচের গেলাস, অ্যাশ-ট্রে, বেয়ারারা ছোটাছুটি করছে। সেই তাঁবুর পাশে বাবা ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে খেলা ছেড়ে, চোর-চোখে, সেইসব সাহেবসুবো দেখছিলেন। আমি বাবাকে দেখছিলাম। সেই বোধহয় প্রথম আমি বাবার তুচ্ছতা বুঝতে পারি। সেই দৃশ্যটা, বাবার সেই মুখ, একটা বিষ-বিছের কামড়ের মতো লেগে আছে আমার বুকে। খেলার শেষে সাহেবসুবো, খেলোয়াড়দের জন্য লেমনেডের ক্রেট এসে পৌঁছলো। বাড়তি বোতলগুলোর জন্য শুরু হয়ে গেল হুড়োহুড়ি। সেই ভিড়ের মধ্যে আমি আমার অসহায় অক্ষম বাবাকে আর একবার লক্ষ্য করি। ঠেলা-ধাক্কায় তাঁর চশমা পিছলে যাচ্ছে নাক থেকে, কোঁচা খুলে পড়ছে, অতি কষ্টে তিনি, যে লোকটা লেমনেডের বোতল বিলি করছে তার দিকে দু'হাত বাড়িয়ে বললেন—তারকদা, আমাকে একটা। এই যে

আমি—আমাকে—। অবশেষে একটা বোতল তিনি অতিকষ্টে পেয়েছিলেন। অর্ধেক খেয়ে আমার দিকে বোতলটা বাড়িয়ে বললেন, খা। খুব মিষ্টি। তাঁর মুখখানায় তখন সেই মিষ্টি স্বাদ ছড়িয়ে আছে। কিন্তু লেমনেডের বোতলে মুখ দিয়ে সেই প্রথম আমি জীবনের তিক্ততার স্বাদ পাই।

তেতো স্বাদের সেই শুরু। তারপর মাঝে মাঝে আমি ক্রমান্বয়ে সেই তিক্ত স্বাদ পান করেছি। আমাদের ছেলেবেলা খুব সুখের হওয়ার কথা নয়। সুখের ছিলও না। কাটিহারে যে রেল কোয়ার্টারে আমার শৈশবের অনেকটা সময় কাটে, সেটা ছিল খুপড়ি, অন্ধকার। লালারাম ইনস্টিটিউটের উল্টোদিকে রেল ইয়ার্ডের গা ঘেঁষে সেই মোটা দেওয়াল, ছোট্ট ছোট্ট জানালার ঘর। সারাদিন শান্টিং ইঞ্জিনের ধোঁয়া আমাদের বাড়িটার ভিতরে জমে থাকত। সেই কাঁচা কয়লার ধোঁয়ার আবছায়ায় আমরা দীনভাবে প্রতিপালিত হতাম। ময়লা মশারি, ময়লা বিছানা, রঙচটা আয়না, তুচ্ছ আসবাব, অতি নিম্ম মধ্যবিত্তের ঘরে যেমনটা দেখা যায়। সারা বাড়িতে ঝুল ঝুল অন্ধকার বাদুড়ের মতো ঝুলে থাকে। একটা ভ্যাপসা গন্ধ। অবশ্য আমাদের বেশিরভাগ সময়ই কাটত বাজারের রাস্তায়, প্ল্যাটফর্মে, খালাসীটোলায়, ল্যাংড়াবাগানে। বাইরে থেকে কখনো বাসায় ফিরতে ইচ্ছে করত না। যতক্ষণ বাইরে থাকা যায় ততক্ষণ আমরা থাকতাম। পড়তে বসেছি, মা হয়তো মশলা আনতে পাঠাল। মশলা আনতে গিয়ে কতবার রাস্তায় বাজীকরের খেলা, কুষ্ঠরোগীর ভিক্ষে চাওয়া, বাঁদরনাচ, খালাসীর ছেলেদের মারামারি, নিদেন পক্ষে ইঞ্জিনের শান্টিং দেখে খামোখা খানিকটা সময় কাটিয়ে আসতাম। আমার দুই দিদি সারাদিন ঘুরেফিরে ছোট্ট জানালার মোটা মোটা গরাদ ধরে বাইরের দিকে চেয়ে থাকত। তাদের বাইরে বেরোনোর নিয়ম ছিল না। মনে পড়ে, সে সময়ে বিয়ে, অন্নপ্রাশন, শ্রাদ্ধের নেমন্তন্ন পেলে আমাদের আনন্দের সীমা থাকত না।

এ. টি. এস. সাহেবের ছেলেকে বাবা দশ টাকা মাইনেয় পড়াতেন। সেই বাড়িতে একবার আমি বাবার সঙ্গে জন্মদিনের নেমন্তন্ন খেতে যাই। সেটা ছিল গার্ডেন পার্টি। বিশাল লনে ফুলের

কেয়ারী ছিল, কুঞ্জবন ছিল, পাথরে বাঁধানো চাতাল ছিল। তখন শীতকাল, পপী ফুলের বাগানে প্রজাপতির মতো ক্ষীণজীবী ফুলেরা আলগোছে ফুটে আছে। ক্রিসেনথিমাম, সূর্যমুখী, মোরগ ফুল, আর গোলাপের ফাঁকে ফাঁকে রঙীন আলোর ডুম জ্বলছে। দুধের মতো শাদা ঢাকনায় ছোটো ছোটো টেবিল ঘিরে দুটো-চারটে করে চেয়ার। টেবিলের ওপর গেলাসে, পাকানো শাদা তোয়ালে, কী সুন্দর সব ছেলে-মেয়েরা ঘুরে বেড়াচ্ছে চারধারে। সে যেন পৃথিবীর দৃশ্য নয়। সেই সব সুন্দর সুগন্ধী শিশুরা যেন বড় হবে বলে পৃথিবীতে আসে নি, তাদের নেই জীবনযাপন। তারা স্বপ্নরাজ্য থেকে নিমন্ত্রণে এসেছে, আবার ফিরে যাবে। কালো প্যান্ট, বুট আর সাটিনের কোট পরা একটা ছেলে এগিয়ে এসে বাবাকে বলল, মাস্টারমশাই! বাবা তাকে রিবনে বাঁধা একখানা গল্পের বই উপহার দেবেন বলে সঙ্গে করে এনেছিলেন। বইটা আমার হাতে দিয়ে বললেন—এই হচ্ছে হিমাদ্রি, সাহেবের ছেলে। ওর জন্মদিন, বইটা ওকে দাও অতনু। আমি দেখেছিলাম জন্মদিনে ও এয়ারগান থেকে শুরু করে অনেক দামী উপহার পেয়েছে, এক সেট ক্রিকেটের সরঞ্জামও। তুচ্ছ বইটা সুন্দর ছেলেটির হাতে দেওয়ার সময়ে আর একবার আমার মনে হল, আধ-খাওয়া মিষ্টি একটা লেমনেডের বোতলে মুখ দিয়ে আমার সমস্ত শরীর তেতো স্বাদে ভরে গেল। সেই সুন্দর বাগানের চারপাশে চেয়ে মনে হয়েছিল—এখানে কোথাও আমাকে মানায় না। খবরের কাগজের জামা পরে বসে পশ্চিমা নাপিতের কাছে মাসে একবার খুব ছোটো করে চুল ছাঁটতে হয় আমাদের, পুজোর সময়ে কেনা বছরের বরাদ্দ একজোড়া জুতো কদাচিৎ কালি করা হয়। আমার সবচেয়ে ভাল জামাটি সস্তা রামধনু মার্কা জাপানী সিল্ক থেকে তৈরি, পরনে শাদা মোটা জিনু-এর হাফপ্যান্ট। গায়ে কালো মোটা কুটকুটে কোট—গতবার আমার পিসতুতো দাদার ছোটো হয়েছিল বলে আমি পেয়ে যাই। তার ওপর আমরা উপহার এনেছি মাত্র আট আনা কি বারো আনা দামের গল্পের বই। চারদিকের বিস্ময়ের মাঝখানে আমি দিশেহারা। লজ্জায় নিজের ভিতরে ডুবে যাচ্ছি। সেই সময়ে হিমাদ্রির মা এসে বাবাকে বললেন—ওমা, মাস্টারমশাই,

আপনি এখানে কেন ? আপনি তো বাইরের লোক নন। আমাদের ঘরের লোক। যান, ভিতরে গিয়ে বসুন গে। এইটি ছেলে বুঝি। বড্ড রোগা তো—

শ্রেণীবৈষম্যের সেটা হয়তো প্রাথমিক বোধ। একটা স্বপ্নের বাগানে পৃথিবীর ধুলোমাখা প্যায়ে দু'টি লোক ঢুকে পড়েছে—আমার শৈশবের শ্রেণীচেতনা ঐ দৃশ্যটি থেকে জন্মলাভ করেছিল হয়তো। সেই বাড়িতে আমাদের কোনো অনাদর হয় নি—কেবল সেই বাগানের দৃশ্যটি নিখুঁত রাখার জন্য আমাদের খুবই ভদ্র এবং বিনীতভাবে হিমাদ্রির পড়ার ঘরে সরিয়ে নিয়ে বসতে দেওয়া হয়েছিল। সে ঘরটিও সুন্দর। এবং সেখানে হিমাদ্রির দিদির গানের মাস্টারমশাই, হিমাদ্রির বাবার অফিসের বড়বাবু, এরকম দু' চারজন লোক ছিলেন। ছিল তাঁদের ছেলেমেয়েরা। সেখানে আমাদের আদর করে প্রচুর খাবার দেওয়া হয়েছিল। সেই খাবার থেকে আমি গোপনে কোটের পকেটে সন্দেশ আর চানাচুর প্লেট থেকে সবার চোখের আড়ালে সরিয়ে, মা আর ভাই-বোনের জন্য নিয়েছিলাম। কত কী যে খেয়েছিলাম তা আর খেয়াল নেই। তবু তারপর অনেকদিন ধরে আমার কেবলই মনে হত—অত খাবার, অত আপনকরা আদরের চেয়েও যেন ঐ স্বপ্নের বাগানটির একটি টেবিল ঘেরা চেয়ারে একবার বসতে পাওয়া অনেক বেশি সৌভাগ্যের ছিল। ঐ সুন্দর দৃশ্যটি থেকে কেন যে আমাদের বাদ দেওয়া হল! স্কুলের ফুটবল টিমের গ্রুপ ছবি উঠছে একবার, কালো কাপড়ে ঢাকা সেই রহস্যময় ক্যামেরার মুখোমুখী দাঁড়াতে খুব একটা ইচ্ছা ছিল ছেলেবেলায়। তাই অনাহূত আমি সেই ফুটবল টিম্-এর গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলাম। বড় ছেলেরা তখন আমাকে বার করে দেয়। সেই দুঃখ ও লজ্জার সঙ্গে কোথাও যেন এই ঘটনার মিল ছিল। যদিও আমাদের বের করে দেওয়া হয় নি, অপমানও করা হয় নি। কেবলমাত্র বাইরের সুন্দর বাগানটির দৃশ্যকে নিখুঁত রাখা হয়েছিল। এইসব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অপমান আমার বাবা হয়তো বুঝতে পারতেন না। আমি পারতাম। পারতাম বলেই আমার জীবন ঠিক আমার বাবার মত হয় নি।

আমার দশ-বারো বছর বয়সে এক বন্ধু জুটেছিল। খুবই

রোগা সে। তার কানে পুঁজ, দাঁতে পোকা, হাঁটু আর কনুইয়ে দীর্ঘস্থায়ী ঘা, পেছনের বেঞ্চে বসা ছেলে। সে পড়া পারত না, মিথ্যে কথা বলত। তার নাম ছিল প্রকাশ। টিফিনের পর প্রায় দিনই সে স্কুল পালাত। কিন্তু বাড়ি ফিরত না। তার বাবা ছিল খালাসী। ঘরে-বাইরে এবং ইস্কুলে সে বেদম মার খেত রোজ। কিন্তু তবু তার স্বভাব পাল্টাত না। স্কুল পালিয়ে সে প্রায়দিনই গিয়ে স্টেশনের ওভারব্রীজের ওপর দাঁড়িয়ে রেল-ওয়ার্ডে গাড়ির শান্টিং দেখত অনেকক্ষণ। রাস্তায় রাস্তায় মার্বেল খেলত, কিংবা ডাংগুলি। বাজারের মোড়ে যে চোখে-ছানিওলা বুড়ো ঢ্যাপের মোয়া বিক্রি করত, তাকে ফাঁকি দিয়ে ঢ্যাপের মোয়া চুরি করত সে। সে স্কুলের ছেলেদের পেন্সিল, রবার, পয়সা চুরি করত প্রায়ই। সবাই জানত প্রকাশ চোর। তার পাশে কেউ বসতে চাইত না। টিফিনের সময়ে বা ছুটির পর স্কুলের ছেলেদের খেলাই ছিল প্রকাশকে খ্যাপানো। তার নাম বলতে গিয়ে কেউই শুধু নামটা বলত না। বলত—চোট্টা প্রকাশ, ঘেয়ো প্রকাশ, গান্ধা প্রকাশ। সমস্ত স্কুলটা, নিজের বাড়িটা, বাইরের জগৎটা, সবই ছিল প্রকাশের বিরুদ্ধে। কিন্তু প্রকাশের একটা অদ্ভুত গুণ ছিল এই যে, সে কখনো কাউকে ভয় পেত না। যখন স্কুলের রাস্তায় দশ-বিশজন ছেলে তার পিছনে লাগত, তখন রেগে গিয়ে প্রকাশ বরাবর ঘুরে দাঁড়িয়েছে। একা রোগা প্রকাশ প্রায়দিনই দশ-বিশজনের সঙ্গে মারপিট করতে গিয়ে প্রচুর কিল-চড়-লাথি খেত। কাঁদত। কিন্তু পরদিনও আবার মারপিট করত। খালাসীটোলায়, ল্যাংড়া বাগানে, বাজারে এ রকম ঘটনা ঘটত হামেশাই। কেউ গাল দিলে, খ্যাপালে, মারলে প্রকাশ ঘুরে দাঁড়াত, মারপিট করত। মার খেত রোজ, তবু মারপিট করতে ছাড়ত না। খালাসীটোলার ছেলেরা তাকে রাস্তায় ধুলোয় পিষে দিয়েছিল প্রায়, তবু সে আবার লাগত তাদের সঙ্গে।

প্রকাশের ঐ একটিই গুণ ছিল। তার সাহস। বড় দুর্লভ গুণ। মারকুটে, গুন্ডা বদমাস অনেক ছেলে থাকে, কিন্তু প্রকৃত সাহসী ছেলে কম থাকে। প্রকাশের ঐ গুণ আমাকে তার দিকে টানত। আমি গান্ধা, ঘেয়ো, চোর প্রকাশের পাশাপাশি বসতাম।

একসঙ্গে স্কুল পালাতাম। ল্যাংড়া বাগানে, সাহেব পাড়ায়, খালাসীটোলায় রাস্তায় রাস্তায় খেলে বেড়াতাম। প্রকাশের সঙ্গে থাকার ফলে প্রায়ই আমাকে হাঙ্গামায় পড়তে হত। প্রথম প্রথম কিছুদিন মারপিট লাগলে প্রকাশকে একা ফেলে পালিয়ে যেতাম। প্রকাশ তার জন্য কখনো আমাকে দোষ দিত না। সে জানত, তার লড়াই তার একার। একাই সে দশ-বিশটা ছেলের মার হজম করত। তার অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু মারপিট দেখলেই আমার বুক কাঁপতে থাকত, হাত পা যেত অবশ হয়ে, দিশেহারা বোধ করতাম। প্রকাশ সেটা বুঝত। মারপিটের সম্ভাবনা দেখলেই সে চেঁচিয়ে বলত—অতনু, তুই পালা—

আর কোনো বন্ধু ছিল না বলেই প্রকাশ আমাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসত। ল্যাংড়া বাগানে গ্রীষ্মের প্রথম সময়ে, দুপুরবেলায়, ছুরিতে কাঁচা আম ছাড়াতে ছাড়াতে প্রকাশ বলত—তোর গায়ে যদি কখনো কেউ হাত দেয় তো তাকে আমি দেখে নেবো।

আমি ভেবে পেতাম না, কেউ কখনো কেন আমার গায়ে হাত দেবে। আমি মারকুটে নই, কেউ আমাকে খ্যাপায় না। তাই আমি বলতাম—আমাকে কেউ মারবেই না।

—তবু যদি মারে—

আমি তখনই বড়াই করে বলতাম—সাহসই হবে না কারো।

প্রকাশ আমার সেই বৃথা অহংকার দেখে একটুও হাসত না। গম্ভীরভাবে বলত—তা অবশ্য ঠিক।

এক একদিন সে গভীরভাবে চিন্তা-টিন্তা করে আমাকে বলত—অতনু, তোর সঙ্গে আমার কখনো আড়ি হবে না।

—কেন?

—হবে না—দেখিস। আমাদের জন্মের মতো ভাব।

বুঝতাম, তার মন চাইছে আমার সঙ্গে তার জন্মের মতো ভাব থাক। আমি তার একমাত্র বন্ধু, তার আর কেউ নেই। সে বলত—আমার দিদি রেণুদির সঙ্গে সই পাতিয়েছে। তাদের জন্মের মতো ভাব হয়ে গেল, আর কখনো আড়ি হবে না।

তারপর খুব লজ্জার সঙ্গে প্রকাশ বলত—অতনু, সই পাতাবি?

—দূর। পুরুষেরা কি সই পাতায়?

—তবে? অসহায়ভাবে প্রশ্ন করত প্রকাশ। তার বন্ধুকে বাঁধবার আর কোন কৌশল তার মাথায় আসত না।

আমি বরাবর তার বন্ধু থাকব কিনা এ বিষয়ে সে নিশ্চিন্ত হতে পারত না বলেই, ঘুরে ঘুরে আমার কাছে আসত। সকালবেলায় পড়তে বসেছি, হঠাৎ জানালায় প্রকাশের হাসি মুখখানি উঁকি মারত—পড়ছিস?

—হুঁ।

—পড়। এবার দেবীকে হারিয়ে ফার্স্ট হওয়া চাই।

আসলে দেবীকে হারিয়ে ফার্স্ট হওয়ার কোনো প্রশ্নই আসে না। আমি লেখাপড়ায় নিতান্তই সাধারণ, ফার্স্ট সেকেণ্ডদের ধারে কাছেও নই। তবু প্রকাশ ঐ কথা বলত, আমাকে খুশি করার জন্য। আমি হাসতাম।

প্রকাশ গম্ভীর হয়ে বলত—তুই খেটে পড়লে ওরা পারবে নাকি?

প্রকাশ আমার জানালার বাইরে থেকে রোজই কথা বলে যেত। কিন্তু বাড়ির ভিতরে আসত খুবই কম। সে এলে আমার দিদিরা, ভাই-বোনেরা তাকে নিয়ে হাসাহাসি করত। সে লজ্জা পেত খুব।

আবার বোকার মত সে আমার দিদিদের ফাই-ফরমাশও খেটে দিত।

সারাদিন শহরময় ঘুরে বেড়াত প্রকাশ। খালি পায়ে হাঁটত বলে পায়ের নিচে কড়া পড়েছিল, পায়ের পাতাটা পুরো ফেলতে পারত না প্রকাশ। একটু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়েই সারা শহরে ঘুরত সে। কোথায় কী চুরি করত, কাকে গাল দিত, কার সঙ্গে লাগত কে জানে। একবার তার সঙ্গে বাজারের ওধারে বেল পাড়তে গেছি, ভুঁইয়াদের দশ-বারোটা ছেলে এসে প্রকাশকে ধরল—তুই শালা আমাদের ক্ষেতি থেকে শালগম উপড়ে নিয়ে গেছিস।

প্রকাশ উদাস গলায় বলল—আমি না।

আমি পালাব বলে পা বাড়িয়েছি, একটা ছেলে এসে আমার কোমর পেঁচিয়ে ধরল—এ শ্যালা ভি চোট্টা, এই গান্ধাটার সঙ্গে এটাও ঘোরে।

—মার শালাকে—

ভুঁইয়াদের মারকুটে স্বভাব আমার জানা ছিল। ভয় পেয়ে

আমি হাত-পা ছুঁড়ে চেঁচিয়ে বলছি—আমি না। ঐ প্রকাশ চোর। ও চুরি করেছে।

কিন্তু ছেলেগুলো ছাড়বে না কিছুতেই। প্রকাশকে দু'জনে ধরে রেখেছে, একজন তার পিছন থেকে বগলের নীচে দিয়ে হাত ঘুরিয়ে ঘাড়ের ওপর ধরে কুঁজো করে রেখেছে, অন্যজন ধরেছে চুলের মুঠি, চারপাশ থেকে আর সবাই গাল দিচ্ছে আর কিল চড় মারছে। সেই মারের দৃশ্য দেখে আমি ভয়ে অবশ হয়ে গেলাম, সারা শরীরে ঘাম, তিন-চারজন আমাকে ঘিরে ধরেছে তখন। গাল দিচ্ছে। আমি বোবা হয়ে, বোকার মত চেয়ে আছি। মারবে! এরা আমাকে মারবে! আমি জীবনে কখনো বাড়ি কিংবা স্কুলের বাইরে এরকম হাটুরে মার খাই নি। কিন্তু তারা মারবার আগেই কী কৌশলে প্রকাশ পাঁচ সাতটা ছেলের হাত ছট্‌কে ছাড়িয়ে এল। খোঁড়াতে খোঁড়াতে ছুটে এসে রোগা কনুয়ের ধাক্কায় আমার চার-পাশের ছেলেগুলোকে দু'হাতে হটিয়ে দিয়ে বলল—খবর্দার, ওর গায়ে হাত দিবি না, আমি চুরি করেছি তো আমার সঙ্গে লড়। বলেই সে দুই হাত আর পা চালাতে লাগল কাঁকড়ার মতো। ধাক্কা খেয়ে আমি পড়ে গিয়েছিলাম। ঐ অবস্থাতেই দৃশ্যটা দেখলাম আমি। পায়ের তলায় কড়া বলে একটু খোঁড়া প্রকাশ, মাথায় আ-ছাঁটা চুলের জন্য তার প্রকাণ্ড মাথাটা রোগা শরীরের ওপর ঝুল-ঝাড়ুনির মতো দেখাচ্ছে, হাতে-পায়ে ঘা, চিট ময়লা নোংরা জামা-কাপড়। তাকে দেখলে এমনিতে হাসি পায়। তবু হাস্যকর চেহারার সেই ছেলেটির তীব্র রাগ আর লড়িয়ে তেজ আমার ভিতরটায় উপর্যুপরি কয়েকটা ছ্যাঁকা দিয়ে দিল। আমি লাফিয়ে উঠলাম। মারধরের কিছুই জানি না। তবু হাতে-পায়ে-দাঁতে নখে আমি সেই দশ-বারোটা ছেলেকে এলোপাথাড়ি মারতে লাগলাম। মুহূর্ত পরেই আমার মারগুলো ফিরে আসতে লাগল। ঠোঁটে, নাকে, মাথায়, পিঠে। ঠোঁট কেটে রক্তের নোনতা স্বাদ পাচ্ছি, চোখ ফুলে বন্ধ হয়ে আসছে, টানের চোটে পটাপট ছিঁড়ে যাচ্ছে মাথার চুল। তবু লড়ে যাচ্ছি। আমার দুর্বল হাত দিয়ে, পা দিয়ে যতদূর সম্ভব মারছি। ক্রমে শিথিল অবশ হয়ে আসছে সারা শরীর, ঘাম দিচ্ছে। পড়ে যাচ্ছি। সেই সময়ে বাজারের

দিক থেকে লোকজন ছুটে এসে আমাদের আলাদা করল।

আমার তখন দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই। অসম্ভব কাঁপছে হাত-পা। রী-রী করে শরীর কাঁপছে। ঘামে ভেজা শরীরে বাতাস লাগতেই শীতে কুঁকড়ে যাচ্ছি। একটা দোকানের বারান্দায় বসে মুখে চোখে জল চেপে অনেকক্ষণ বসে রইলাম। পাশে প্রকাশ। সে আমার তিনগুণ মার খেয়েছে। কপালে বিরাট কালশিটে, ঠোঁট কাটা, চুল খাড়া হয়ে আছে, কনুই হাঁটু ছড়ে গেছে। তবু হাসছে সে। অনাবিল আনন্দের হাসি। আমিও টের পাচ্ছি, আমার ভেতরে কোনো দুঃখ নেই! বড় ঝরঝরে লাগছে ভিতরটা। মার খাওয়ার ভয় এতকাল রোগ জীবাণুর মতো আমার ভিতরে ভিতরে ক্ষয় ধরাচ্ছিল। প্রকৃত মার খাওয়ার পর হঠাৎ সেরে গেছে। ফাটা, কাটা, ব্যথার শরীর জুড়ে কোথায় যেন একটা টলটলে জ্বর-সেরে যাওয়ার আনন্দ জমে উঠছে। আমি প্রকাশের দিকে তাকিয়ে হাসলাম। প্রকাশ ফিস্ ফিস্ করে বলল—মার খেতে খেতে আমার হাড্ডিগুড্ডি পেকে গেছে—এখন আর লাগে না। তোর বড্ড লেগেছে—না রে?

আমি মাথা নাড়লাম—ও কিছু না! আমারও আর লাগবে না—দেখিস।

এইভাবেই আমার আর একটা জীবনের শুরু। প্রায় সময়েই আমরা মারপিট করতাম। বেশিরভাগ সময়েই মার খেতাম। তবু একটা নেশার মতো ছিল সেটা, ছিল রোমহর্ষক, আনন্দ।

স্কুলে, পাড়ায় ক্রমশ মারকুটে ছেলে বলে সবাই চিনতে লাগল আমাকে। আমি আর প্রকাশ গোপনে মারপিটের নানা কৌশল আয়ত্ত করতাম! দেয়ালে ঘুষি মারা, দৌড়, নানা রকম প্যাঁচ, হঠাৎ লেঙ্গী মেরে ফেলে দেওয়া—এইসব নানা ছেলেমানুষী কায়দা-কানুন। পকেটে গুলতি থাকত, পাথর থাকত, থাকত পেন্সিল-কাটা ছুরি। কার্যকালে অবশ্য কেবল হাত-পাই চলত। তাতেই আনন্দ ছিল বেশি। আদিম মানুষের হিংস্রতার যেটুকু আমাদের ভিতরে আজও আছে, দাঁতে-নখে লড়াইতেই তার সর্বাধিক তৃপ্তি।

আমার দশ-বারো বছরের জীবনে সেই প্রথম আমি আমার

বাবার অসফল হীন জীবনের জন্য পৃথিবীর জন্য পৃথিবীর ওপর প্রতিশোধ নিতে শুরু করি। কথাটা হয়তো এভাবে বলা ঠিক হল না। কারণ আমার ঐ বয়সে প্রতিশোধের কথাটা অমন স্পষ্ট ভাবে আমিও বুঝতাম না। তবে নিজেদের সংসারে হীনতা, দারিদ্র্য, বছরের পর বছর কেরানী থেকে যাওয়া এবং তার জন্য আক্ষেপ, উপরন্তু সেই ফুটবল মাঠে লেমনেডের বোতলের স্বাদ, এ. টি. এস. সাহেবের ছেলের জন্মদিনে সেই স্বপ্নের বাগান থেকে নির্বাসিত—এ সব কিছুই আমার ভিতরে একটা রাগের ধোঁয়াকে পুঞ্জীভূত করে তুলত। মনে হত, আমাদের চারিদিকে যা কিছু আছে সবই আমাদের বিরুদ্ধ শক্তি।

এ কথা সত্য, আমার ভিতরে সেই বয়সেই মান-অপমানের বোধ বড় প্রবল ছিল, প্রবল ছিল জেদ। এই জেদের বসেই আমি কিছু কিছু অঘটন ঘটিয়েছি। প্রকাশের সঙ্গে মিশে মারপিট করে তখন আমার বদনাম হয়ে গেছে। হাফ-ইয়ার্লি পরীক্ষায় তিন বিষয়ে ফেল। রাগী মাস্টার ছোটনাগবাবু প্রায়দিনই কান মলে বেত মেরে বলে যেতেন—তোরা যদি পাশ করিস তো আমার হাতের তেলোয় চুল গজাবে। কথাটা আমার হীনমন্যতায় গুলির মত সেঁধিয়ে গিয়েছিল। জেদের বসে আমি পড়াশুনো শুরু করলাম। পড়া দেখিয়ে দেওয়ার কেউ ছিল না। তবু এ বাড়ি ও বাড়ি ঘুরে মাস্টারমশাইদের বাড়ি গিয়ে পড়া বুঝে আসতাম। অ্যানুয়েল পরীক্ষার তখনও মাস চারেক বাকী। প্রথম মারমিট করার উত্তেজনার মতোই এক উত্তেজনা আমাকে রাতে জাগিয়ে রাখত, ভোরে ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিত। খুব পড়তাম। জলের মত মুখস্থ হয়ে যেত পড়া। তবু ইচ্ছে করেই ক্লাসে পড়া বলতাম না। মাস্টার-মশাইরা গাল দিতেন; মারতেন! আমি মনে মনে হাসতাম। সকলের ওপর গোপনে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য আড়ালে তৈরি হতাম। দেবীপ্রসাদ চৌবে নামে যে ছেলেটি আমাদের ক্লাশে ফার্স্ট হত, সে যথার্থ ভাল ছেলে ছিল। অ্যানুয়েল পরীক্ষায় তাকে মারতে পারলাম না বটে, কিন্তু অনেকগুলো ছেলেকে ডিঙ্গিয়ে হয়ে গেলাম সেকেন্ড। সমস্ত স্কুলে, পাড়ায়, বাড়িতে হৈ-চৈ পড়ে গিয়েছিল। ছোটনাগবাবু ভ্রূ তুলে অনেকক্ষণ চেয়ে থেকে বলে-

ছিলেন—টুকিস নি তো। সবচেয়ে খুশি প্রকাশ। সে নিজে সেকেণ্ড হলেও এত খুশি হত না। সে তখন প্রায়ই আমাকে বলত—এবার থেকে তুই ফার্স্ট বেঞ্চে বসবি—না রে? কিন্তু বাইরে আমরা একসঙ্গে ঘুরব তো? ওদিকে আমি সেকেণ্ড হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পরিবারে একটা প্রত্যাশা জেগে উঠেছিল। বাবা প্রায়ই মাকে বলতেন—গরীবকে ভগবান দেখেন, বুঝলে? ছেলেটা দেখো, ঠিক মানুষ হবে।

আমাদের গরীবের সংসারে সেই প্রথম একটা গৌরবের ঘটনা ঘটেছিল। সেই গৌরবের স্বাদ পেয়ে আমি পরের বছরও সেকেণ্ড হই। হয়ে মাইনর স্কুল ছেড়ে যাই হাই স্কুলে। প্রকাশ সে বছর পাশ করতে পারল না। হাই স্কুলে আমি তখন হিমাদ্রির সঙ্গে এক ক্লাসে পড়ি। অনেক নতুন বন্ধু আমার। রাস্তায় ঘাটে প্রকাশের সঙ্গে দেখা হয়, সে মুখ গোঁজ করে থাকে। কথা বলতে চায় না। কিন্তু আবার বাসায় আসে, জানলা দিয়ে অনেকক্ষণ কথা বলে। সে সবই অভিমানের কথা। বলে—তুই আমাকে ভুলে গেছিস।

প্রকাশকে সেই বয়সে তখন মাঝে মাঝে আমার ভয় হত। আমার প্রতি তীব্র এক অধিকারবোধ ছিল তার। সেটা সে কখনো ভুলতে পারত না। আমি ভাল ছেলে হয়ে গেছি, চলে গেছি অন্য স্কুলে, আমার অনেক বন্ধু—এইসব দেখেই বোধহয় তার চোখে মুখে এক তীক্ষ্ণতা ফুটে উঠত। সে ডাকলে তখনো আমি তার সঙ্গে গেছি ল্যাংড়াবাগানে, খালাসীটোলায়, কুশী নদীর ধারে। কখনো সখনো এক-আধটা মারপিটেও অংশ নিয়েছি। কিন্তু কোথায় যেন দু'জনের মধ্যে একটা ব্যবধান তৈরি হচ্ছিল। ব্যবধানটা বোধহয় এইখানেই যে প্রকাশ তখনো বন্ধুহীন, সঙ্গীহীন, একা। আর, আমার অনেক বন্ধু। মাঝে মাঝে দেখি, প্রকাশ আমার স্কুলের রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে। কোনো কথা নেই, কেবল একটু সতৃষ্ণ চোখে দাঁড়িয়ে থাকা। আমি জিজ্ঞেস করলে লজ্জা পেয়ে, মাথা নেড়ে চলে যেত। কখনো বা এক-আধটা অদ্ভুত কথা বলত। তার কোনো মানে হয় না।

একদিন স্কুল থেকে ফেরার পথে দেখি, সে দাঁড়িয়ে আছে। উড়ো খুড়ো চুল, খুব বিষণ্ণ মুখ।

—কী রে প্রকাশ, কিছু বলবি ?

প্রকাশ একটু অপ্রস্তুত হাসল। বলল—অতনু, মা কাল মারা গেছে।

সেই বয়সে মা ছাড়া কিছু ভাবা যায় না। আমি দুঃখ পেয়ে ওকে কী যেন বলতে যাচ্ছিলাম, ও একটু রাগের স্বরে বলল—ভালই হয়েছে। মা আমাকে ভীষণ মারত, খুব মারত। মরে গিয়ে ভাল হয়েছে, খুব ভাল হয়েছে, মারত কেন ?

বলতে বলতে প্রকাশের চোখে জল এসে গেল। তবু শব্দ করে কাঁদল না সে। যেন বা মায়ের ওপর কোনো প্রতিশোধ নেওয়া যায় নি বলেই আক্রোশে সে দাঁতে দাঁতে চেপে বলল—রোজ মারত আমাকে, জলখাবার কম দিত। বাবার কাছে নালিশ করত রোজ। কেন মারবে ? আমার লাগে না ? মরে গিয়ে ভাল হয়েছে, খুব ভাল হয়েছে—কেন মারত আমাকে ?

অনেকক্ষণ ধরে আমরা রাস্তায় রাস্তায় হাঁটলাম, আর প্রকাশ অনর্গল তার মায়ের ওপর সেই সব আক্রোশের কথা অসংলগ্নভাবে বলে গেল। কিন্তু বার বার তার চোখে জল আসছিল। রাস্তায়-ঘাটে রোজ অবিরল মার খেয়ে যার হাড় পেকে গেছে সেই প্রকাশ তার কনুই তুলে আমাকে খুব অস্পষ্ট একটা দাগ দেখিয়ে বলল—এইখানে একবার পাখার ডাঁট দিয়ে মেরেছিল, জানিস ? কী ভীষণ লেগেছিল আমার ! আজও দাগ রয়ে গেছে, দ্যাখ। কখনো আদর করত না—কখখনো না।

এইসব কথা বলতে বলতে প্রায় প্রলাপ বকছিল প্রকাশ। ক্রমশঃ অসংলগ্ন হয়ে যাচ্ছিল তার কথা। সন্ধ্যা পেরিয়ে গেলে আমি তার হাত ধরে বাসার দরজায় যখন পৌঁছে দিলাম সে তখন বলল—জানিস, বাবা মাকে বড় মারত। খালসীর রাগ বড় ভীষণ। আমার মনে হয়, মারের চোটেই মা মরে গেছে। তিন-চারদিন আগে ভীষণ মেরেছিল বাবা—

বলতে বলতে একটু থমকে গেল সে। একটু ভাবল। তারপর বলল—কিন্তু বেশ হয়েছে, ভাল হয়েছে, খুব ভাল। কেন মারত —কেন মারত আমাকে ?

বলতে বলতে আবার কাঁদতে লাগল প্রকাশ।

তিন-চার মাস বাদে আবার একদিন স্কুলের রাস্তায় আমাকে ধরল প্রকাশ—অতনু।

—কী রে? সস্নেহে বলি।

প্রকাশ খুব লাজুক হাসি হেসে বলল—আমার নতুন মা এসেছে।

শুনে চুপ করে থাকি। সৎমায়েরা ভালবাসে না, এইরকমই জানা ছিল।

প্রকাশ পায়ের আঙুলে মাটি খুঁটতে খুঁটতে মুখ নীচু করে বলল—নতুন মা খুব সুন্দর। আমাকে ভীষণ ভালবাসে।

আমার বিশ্বাস হল না। মনে হল, প্রকাশ মিথ্যে কথা বলছে।

তবু প্রকাশ বলল—বাবা বলেছিল, তোর তো লেখাপড়া হবে না, সাহবকে বলে তোকে পোর্টারের চাকরিতে ঢুকিয়ে দিই। নতুন মা তাতে রাজি হয় নি। বলেছে, আমি যদি পরীক্ষায় সেকেণ্ড হতে পারি তো একটা হাওয়া বন্দুক কিনে দেবে। নতুন মা আমাকে খুব ভালবাসে।

প্রকাশ আবার লজ্জা-টজ্জা পেয়ে বলল—আমি নতুন মাকে বলেছি, এবার আমি সেকেণ্ড হবোই।

আমি অবাক হয়ে বলি—সেকেণ্ড কেন প্রকাশ! হলে তুই ফার্স্ট হবি। লোকে তো ফার্স্ট হতেই চেষ্টা করে, সেকেণ্ড হয়ে যায়।

প্রকাশ মাথা নেড়ে বলে—না। ফার্স্ট না। ফার্স্ট হয়ে কী হবে! আমি সেকেন্ড হবো। তোর মতো।

খুব অবাক হয়েছিলাম। সেই অবাক হওয়ার ঘোর কাটতে না কাটতেই আমাদের বদলীর অর্ডার এসে গেল। প্রকাশ সেকেণ্ড হতে পেরেছিল কিনা, তা আর আমার জানা হয়নি। আমাদের চলে যাওয়ার আগে পুরোনো বন্ধুরা সবাই দেখা করল। প্রকাশ এল না। দু'দিন তার বাড়িতে গিয়ে খোঁজ করলাম, সে নেই। প্রকাশের সঙ্গে দেখা হল না বলে খুব মন খারাপ লাগছিল।

বিকেলের গাড়িতে আমরা কাটিহার ছেড়ে যাচ্ছি। তখন ম্লান আলোয় চরাচর জুড়ে এক অপরূপ ছবি ফুটে উঠেছে। জানালার ধারে বসে এক পুরানো জগতের হারিয়ে-যাওয়া দেখছি। সরে

াচ্ছে চেনা প্লাটফর্ম, সাহেবপাড়ার রাস্তায় দেবদারুর সারি, ল্যাংড়া ্যামের বাগান। ক্রমে অচেনা এক জগতের দিকে রেলগাড়ি ঘুরে াচ্ছে। ইটখোলার মাঠ পেরিয়ে যাচ্ছি, সেইসময় হঠাৎ আমার ানালার ধারে ঠং করে জোর একটা ঢিল এসে লাগল। পলকে াথা সরিয়ে চোখ বুজে ফেলেছিলাম। তাকিয়ে দেখি, খোলা াঠের ভিতর দিয়ে প্রাণপণে ছুটছে প্রকাশ। ছুটে রেলগাড়ি থেকে, মামার কাছ থেকে দূরে—আরো দূরে পালিয়ে যাচ্ছে।

প্রকাশ ঐভাবেই আমাকে বিদায় জানিয়েছিল।

লচু গাছে ছাওয়া দোমোহানী একটা ঘুমন্ত গঞ্জ। সারাদিন রাস্তায় াতাস ধুলো ওড়ায়, লোক চলাচল দেখাই যায় না। একটা স্টশন, একটু বাজার, রেলের অফিস, আর কোয়ার্টার—এইটুকুতেই দোমোহানী ফুরিয়ে যায়। ডিস্ট্যান্ট সিগন্যালের ওধার থেকে ঘন ান শুরু হয়ে গেছে। সেইখানে, কাছে গৃহস্থের গোয়ালে মাঝে াঝে হানা দেয় চিতাবাঘ। একটা নিঃঝুম ভাব ঘিরে থাকে চার- ারে। পলহোয়েল সাহেবের স্কুলে তখনো ম্যাট্রিকের সীট পড়ে না।

ছুটির দিনে ডি. টি. এস. হুদা সাহেব বন্দুক নিয়ে শিকারে বেরোন। সঙ্গে থাকে আরো দু' চারজন বন্দুক হাতে মানুষ, কুকুর, আর্দালি। আমরা পিছু নিই। বেশি দূর যেতে হয় না। দোমোহানীর উপকণ্ঠে গাছগাছালি জুড়ে পাখিদের মেলা। হুদা াহেব ঘুঘু মারেন, বেলেহাঁস নামিয়ে আনেন, মারেন বন-মুর্গী। ন্দুক হাতে মানুষদের পৃথিবীতে সবচেয়ে শক্তিমান বলে মনে হয় তখন।

নিজেকে লাগে তেমনি অসহায়। নিরস্ত্র। নির্জীব। একটা খেলনা-বন্দুকের জন্য কত বায়না করেছি। বাবার কিনে দেওয়ার

সাধ্য ছিল না। ভারতবর্ষ জুড়ে তখন যে অর্ধনগ্ন ফকির এক অস্ত্রহীন আন্দোলন গড়ে তুলছেন, বাবা আমাকে সেই গল্প বলতেন। বলতেন - বৃটিশদের কত কামান-বন্দুক-সৈন্য, গান্ধীর তো কিছু নেই। যাদের চরিত্র আছে, তাদের অস্ত্র লাগে না।

বাবা মুখে গল্প বলতেন বটে, কিন্তু কার্যতঃ তিনি ছিলেন রাজভক্ত। বৃটিশের গুণমুগ্ধ, তাঁর কাজেকর্মে তাই বিন্দুমাত্র অসহযোগ থাকত না। রেলের ইউনিয়নকে তিনি সন্দেহের চোখে দেখতেন। সবচেয়ে বেশি ভয় পেতেন বাঙালীদের সহিংস আন্দোলনকে। সন্ত্রাস তাঁর দু'চোখের বিষ ছিল। বৃটিশরা চলে যাবে -এ ছিল তাঁর কল্পনার অতীত।

আমি গুলতি তৈরি করে নিতাম, বানাতাম টিনের তলোয়ার। বাখারির ধনুক আর তীর। পশু-পক্ষীর ওপর আমার শত্রুতা ছিল না। ছেলেবেলাতেই আমি বুঝে গিয়েছিলাম আমাদের শত্রু এক ধরনের মানুষ। তারা দেখতে শুনতে অনেকটা আমাদের মতোই, আবার পুরোপুরি আমাদের মতো নয়। আমার অদৃশ্য লড়াই ছিল তাদের সঙ্গে। কল্পনায়। তাই আমার তীর ছুটত না। গুলতির পাথর পকেটেই থেকে যেত।

আমার বাবা তখন স্টোরের বাবু। স্টোরের বাবুদের কিছু আয় থাকে। আমার বাবারও হয়তো ছিল। কিন্তু সেটা খুবই সামান্য। ঐ আয়টুকুর জন্য বাবা বড় ভয়ে ভয়ে থাকতেন। রেলের গুদামে একধরনের লোহার রিং পাওয়া যেত। সেই রিংয়ে চাকা চালানো ছিল মজার খেলা। চাকা চালানো আমাদের ছেলেবেলায় যত প্রিয় ছিল, এখন আর তত নেই। সেই রিঙ কতদিন বাবার কাছে চেয়েছি। বাবা ভয়ে দেননি, পাছে লোকে সন্দেহ করে। আবার হয়তো দিয়েছেন, খুব চুপেচাপে। সাবধান করে দিয়েছেন —খুব সাবধান বাবা, চালাতে হয় তো নির্জন নিরিবিলি জায়গায় গিয়ে চালাবে।

বলতে গেলে এই ভীরুতাই তার উন্নতির প্রধান অন্তরায় ছিল। সৎ বা অসৎ—মানুষ যা-ই হোক না কেন, জোরের সঙ্গে না হলে তার কোনো মূল্য নেই। আমার বাবাকে দেখে তা আমি বুঝেছি।

অপরদিকে, ছেলেবেলায় প্রকাশের সঙ্গে মিশে আর তার সঙ্গে নানা জায়গায় মারপিট করে আমার ভীরুতা ঝরে গিয়েছিল। সাহসী ছেলে বলে আমার খ্যাতি ছিল। সেই ছেলেবেলাতেও আমার অনুকারী সঙ্গীর অভাব ছিল না। আমি ছিলাম স্কুলের মনিটর।

ফার্স্ট ডিভিশনে ম্যাট্রিক পাশ করার পর আমার পড়াশুনোর অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। কাছাকাছি কলেজ নেই! হোস্টেলে থাকবার সামর্থ্য নেই। বাবা দরখাস্ত করলেন, এমন জায়গায় তাঁকে বদলী করা হোক যেখানে কলেজ আছে। অনেক দরবার করলেন বাবা, সাহেবদের টাকা খাওয়াবার চেষ্টা করলেন। অবশেষে তাঁকে শিলিগুড়িতে বদলী করা হল। জলপাইগুড়ির কলেজে আমি ভর্তি হলাম।

জলপাইগুড়িতে আমি আমার পরবর্তী রাজনৈতিক জীবনের স্বাদ পাই। তখন সদ্য দেশ ভাগ হয়েছে। পশ্চিমবাংলা, আসাম জুড়ে পিঁপড়ের মতো ছড়িয়ে পড়ছে মানুষ। আমরা ভলান্টিয়ার হয়ে খাটি, আশ্রয়শিবিরে গিয়ে শরণার্থীদের তদারক করি। প্রায়-দিনই বাসায় থাকি না। লেখাপড়া চুলোয় যাচ্ছে। নিজের বাসা, স্কুল বা কলেজের সীমাবদ্ধতা থেকে হঠাৎ এক বৃহৎ মানব পরিবারের ভিতরে গিয়ে পড়েছি তখন। মানুষকে দেখার একটা নেশা আছে, সহজে তা ছাড়া যায় না। আমার ভিতরে তখন সব-সময়ে এক উত্তেজনা, একটা আক্ষেপ ফেটে বেরোতে চায়। রেল-স্টেশনে একটা বৌকে দেখেছিলাম যে কথা বলতে ভুলে গিয়েছিল। অনেক সাধ্যসাধনা করে তাকে খাওয়াতে হত। তার সঙ্গীরা বলত, বৌটা বাঁচবে না। গ্রামে যখন লুঠেরারা আগুন দেয় বৌটার ছেলে তখন বিছানায় ঘুমোচ্ছে। ঘরে আগুন লাগতেই বৌটা ঘরে ঢুকে ছেলে কোলে নিয়ে দৌড়াতে থাকে। প্রায় মাইলখানেক দূরের রেলস্টেশনে এসে দেখে খুব অবাক হয়ে যায়—কোলে ছেলে তো নেই। ছেলের কোলবালিশটা বুকে করে নিয়ে এসেছে সে। দিশেহারা হয়ে ছেলের বদলে······। বৌটী কথা বলত না, খেতে চাইত না, বিরক্ত হয়ে তার স্বামী তাকে মারত। আমরা গিয়ে লোকটাকে ধমক-টমক করলে লোকটা হাউ মাউ করে বলত—

বাবু, ছেলে গেছে, এখন বৌটাও যদি যায় তবে আমার থাকে কী? আপনারা ওরে একটু কাঁদান। নইলে ও বাঁচবে না।

মনে পড়ে, বীথি নামে একটি মেয়েকে দেখতাম, যে ছিল ধর্ষিতা। অল্পবয়সেই সে তাই বড় উদাসীন আর গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল। জল-কাদার মধ্যে অতি নড়বড়ে বাঁশের ঘরে যেসব অসুবিধার মধ্যে উদ্বাস্তুরা থাকত, তার মধ্যেই সে ছিল। যখন রিলিফের জিনিস আমরা ভাগ-বাঁটোয়ারা করতে যেতাম সে কখনো এসে হাত পাতে নি। যেন বা এ জন্মের মতো তার খাওয়া-পরার সাধ ঘুচে গেছে। একদিন সে লজ্জায় আমাকে ডেকে গোপনে জিজ্ঞেস করেছিল—এখানে খারাপ মেয়েছেলেরা কোথায় থাকে। আমার বয়স তখন কম, একটি যুবতী মেয়ের এই প্রশ্নের উত্তরে ভীষণ ঘাবড়ে গিয়ে বলেছিলাম—তা দিয়ে কী হবে? মেয়েটা হেসে বলল—এদের সঙ্গে থাকা ভাল দেখায় না। আমি তো নষ্ট হয়ে গেছি, খারাপ মেয়েদের সঙ্গেই থাকা ভাল।

উদ্বাস্তুশিবিরগুলি ছিল সরাইখানার মতো। সেখানে কেউ দু'চার-ছ'মাসের বেশি থাকত না। পাকাপাকি আস্তানার সন্ধান পেলেই চলে যেত কাছাড়ে, উত্তর-বাংলা, ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকার কোথাও, কিংবা উত্তর বা পূর্ব আসামে। কিন্তু শিবিরগুলো খালি থাকত না বড় একটা। কাতার দিয়ে মানুষ আসত। সেই অল্প বয়সেই তাই আমি আকণ্ঠ মানুষের বহমান এক ধারাতে নিমজ্জিত ছিলাম। প্রাণপণ খাটতাম আমরা। কিন্তু মানুষের তুলনায় রিলিফ নেহাত অল্প পাওয়া যেত। এমনও হয়েছে, নিজেদের বাড়ি থেকে পুরোনো কাপড়, চাল ডাল পয়সা এনে দিয়েছি। কিন্তু তাতে কিছুই হত না। মানুষের বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধার সামনে অসহায় লাগত নিজেকে। দেখতাম, আড়কাঠিরা মেয়ে ধরার জন্য ঘুরছে, উত্তর আসামের চা-বাগানের জন্য নিয়ে যাচ্ছে মজুর, ডোলের চাল বেশি দাম দিয়ে কিনে নিচ্ছে মহাজন। সোনাদানার সন্ধানে আসে লোক, ঘটিবাটির জন্য আসে চোর। আর সবার অলক্ষ্যে মাঝে মাঝে লাফ দিয়ে আসে কলেরা। এ সবের মধ্যেও একধরনের লোক এসে উদ্বাস্তুদের জড়ো করে বক্তৃতা দিয়ে বলত—সরকার অনেক টাকা দিচ্ছে, চাল ডাল কাপড় দিচ্ছে

তোমাদের। কিন্তু ভাইসব, দালাল আর আমলাদের জন্য তোমরা তা পাচ্ছো না। নিজেদের অধিকার সম্বন্ধে তোমরা সজাগ হও, কেড়ে নাও—ইত্যাদি। এ সবের ফলে মাঝে মাঝে রিলিফ বিলি করতে গিয়ে আমরা মুস্কিলে পড়ে যেতাম। উদ্বাস্তুরা দল বেঁধে আসত—জোচ্চোর, তোমরাই সব মেরে দিচ্ছো। আমরা পাচ্ছি না।

মাঝে মাঝে মনে হত এইবার রিলিফের কাজ ছেড়ে আবার কলেজের ক্লাশঘরে পালিয়ে যাই। মানুষের অকৃতজ্ঞতায় জীবনের তিক্তস্বাদ পেতাম। কিন্তু নেশা। মানুষের নেশা বড় মারাত্মক। রিলিফের কাজে আমার তখন বেশ নাম-ডাক। কংগ্রেস নেতারা পরিদর্শনে এসে আমার খোঁজ করেন। সভা হলে আমাকেও মঞ্চে ডাকা হয়। রিলিফের রিপোর্ট তৈরি করি, টাকাপয়সার হিসেব রাখি। কেউ কেউ চোর বলে মনে করে, কেউ কেউ শ্রদ্ধা কৃতজ্ঞতা জানিয়ে যায়, খাতির রাখে। এমন কিছু খারাপ লাগে না। রিলিফের অফিস ঘরেই মাঝে মাঝে রাতে শুয়ে থাকি। বাসায় মা ঘুমের মধ্যে মাঝে মাঝে জেগে উঠে হয়তো অস্ফুটে জিজ্ঞাসা করেন—অনু, এলি নাকি! বাবা বিরক্ত হন। ভাইবোনেরা হতাশ। বাসার ভালো ছেলেটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ঠিক নষ্ট বলা যায় না, তবে কি রকম যেন!

বাবা একদিন আমাকে ডেকে বললেন—অনু, মানুষের জন্য তুমি করো, এ ভালই। কিন্তু মানুষের ঐ দুঃখ-দুর্দশা যেন তোমার বা তোমার পরিবারের ভাগ্যে না ঘটে, তোমাকে বা তোমার পরিবারকে যেন পরের দয়ায় বা সাহায্যে বেঁচে থাকতে না হয়—এ তুমি নিশ্চয়ই চাও। আমি গরীব, তোমাদের ভালভাবে মানুষ করতে পারছি না, কিন্তু যেটুকু সুযোগ আছে তা কাজে না লাগালে একদিন তোমাদেরও পরের দয়ার জন্য বসে থাকতে হবে। সে বড় ভয়ানক। আজ তুমি পরিত্রাতা হয়েছো—ভালই, কিন্তু একদিন যখন তুমি নিজেই আর্ত হবে তখন?

আমি বাবার মুখের দিকে চেয়ে সেই পুরোনো ভয় এবং ভবিষ্যৎ চিন্তা দেখলাম। কী জানি কেন নিজেকে নিয়ে আমার কোনো ভয় বা ভবিষ্যৎ চিন্তা ছিল না। বাসার সঙ্গে পরিবারের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ভিতরে ভিতরে ক্ষীণ হয়ে গিয়েছিল। খাওয়া-

শোওয়ার কোনো ঠিক ছিল না। দীন-দরিদ্র ভিখিরিদের সঙ্গেই তখন আমার সারাদিন ওঠাবসা। তাদের দেখে নিজের ভবিষ্যতের ভয় আমার কখন কেটে গিয়েছিল। প্রবহমান এক মনুষ্যধারা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখতে পারতাম না। স্কুলবাড়ির একটা ঘরে বেঞ্চ জোড়া দিয়ে আমরা কয়েকজন ভলান্টিয়ার শুয়ে থাকতাম। ছারপোকা কামড়াত, মশার জ্বালায় ঘুম হত না। বাইরে এসে নিঃঝুম চরাচরের দিকে চেয়ে বসে থাকতাম। স্নিগ্ধ রাত্রিটি ঘিরে ধরত আমাকে। নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে অনুভব করার সেই ছিল সবচেয়ে সুন্দর সময়। বহু লক্ষ কোটি আলোকবর্ষ দূর থেকে প্রাচীন নক্ষত্রের আলো এসে স্পর্শ করত আমাকে, শীতল চাঁদের আলোয় ছিল স্বপ্নময় অবগাহন। আকাশের হিম অন্ধকারের দিকে চেয়ে এক শব্দহীন মহাসমুদ্রের অন্তহীনতাকে অনুভব করতাম। কখন আমার আমি হারিয়ে যেত। মনে হত কে আমাকে ডেকে বলছে—শোন মতি, শোন সন্ন্যাসী, পৃথিবীতে তোমার শয়ন হবে এই ভূমিশয্যা, তোমার গৃহের ছাদ হবে ঐ আকাশ, তোমার আহার ভিক্ষালব্ধ অন্ন। তোমাকে আমি দেবো না কিছুই, তুমি চলো দেখি। এক-একদিন সেই নিঃঝুম মহাশূন্যের মাঝখানটিতে বসে রাত গভীর হয়ে যেত। আমার মনে হত, আমার জীবন, মাটি ও আকাশের মাঝখানে যে সহজ প্রসার সেইখানে গড়ে উঠবে। সহজ মানুষের মধ্যে। আমি আর কিছুই চাই না।

আমার বাবা তাঁর গৃহকে ভালবেসেছিলেন, গৃহস্থালী ছিল তাঁর প্রিয়, তিনি ঘরের বাইরে মানুষের প্রবাহমানতায় কখনো গা ভাসান নি। তাই তাঁর সুখ-দুঃখের পরিমাপও ছিল ছোটো, সীমাবদ্ধ। আমার প্রতিজ্ঞা, আমি কিছুতেই তাঁর মতো হবো না। কী জানি কেন, ঘরের চেয়ে বাইরেটাই ক্রমে আমার প্রিয় হয়ে উঠেছিল। সারাদিন কাজের অবধি ছিল না। কাজ চাইলেই কাজ এসে ঘাড়ে পড়ে। জমি দখল করে উদ্বাস্তু বসতি গড়ে তুলতে চলে যাই ডুয়ার্সের কোন গর্ভে, কোথায় কোথায় যে। ডাবগ্রাম, মাটিগাড়া, বীরপাড়া, আমবাড়ি। যেখানেই যাই, চেনা মানুষেরা ছেঁকে ধরে। জঙ্গল কেটে বসত হচ্ছে মাত্র, কিন্তু চাষের জমি নেই, খাবার নেই, রুজি নেই, ব্যবসার মূলধন নেই, সমস্যা বিশাল এবং

ব্যাপক। লোকেরা আমাকে উদ্বাস্তু শিবিরে কাজ করতে দেখেছে, তারা দেখেছে আমাকে নেতাদের সঙ্গে কথা বলতে, বক্তৃতা দিতে। তাদের ধারণা আমি সরকারের লোক। কাজেই তারা রাজ্যের অভাব-অভিযোগ নিয়ে আসে। সমাধান চায়। আমার ক্ষমতা ছিল না, কিন্তু চেষ্টা ছিল। অবিরল সেই চেষ্টা। লড়াই। কিন্তু মানুষের অসহায়তা বরাবর তার কাছে ফিরে আসে। এইসব কাজে ডুবে থাকতে থাকতেই খবর আসে, বড়দির বিয়ে হয়ে গেল। অনুষ্ঠানে আমার যাওয়া হলো না। জামাইবাবুকে দেখলামই না।

আলিপুরদুয়ারে তখন সদ্য এক রেলওয়ে জংশন গড়ে উঠছে। আসাম লিঙ্কের নতুন রেল-লাইনের কাজ প্রায় শেষ। কোর্টে একটা মামলার সাক্ষী দিয়ে ফিরছিলাম। তখন হঠাৎ ইচ্ছে হল, রেল কলোনীটা দেখে যাই। একটা জনপদ তৈরি হচ্ছে, কত লোকের বসত হবে। দেখে যাই।

সন্ধ্যে হয় হয়। নির্জন রেল কলোনীর অনেক বাড়ি খালি পড়ে আছে, রাস্তায় চাঙর চাঙর পাথর সাজানো হয়েছে মাত্র। সে রাস্তায় চলা যায় না, পাশের মেঠো পথ দিয়ে চলতে হয়। চারিদিকে জল-কাদা। বাজারের দিকে কিছু লোক চোখে পড়ে মাত্র, আর সব নিরালা, নিঝুম। বাজারের পাশে ছোট্ট একটা মাঠ। তখন ঝুঁঝকো আঁধার নেমে আসছে। দেখি, সেই মাঠের মাঝখানে ছোট্ট একটা সভা বসেছে। কুড়ি-পঁচিশজন কুলি-কামারি গোছের লোক, দু' চারজন বিড়ি-বাঁধিয়ে। কিছু পিওন-আর্দালি খালাসী বসে আছে। মঞ্চ নেই, একটা ন্যাংটো টেবিলের পাশে দু'টি লোহার চেয়ার। বাঁশের উপর একটা লাল ঝাণ্ডা উড়ছে। একটা চেয়ারে একজন চশমা পরা লোক বসে আছে। একজন রোগা, লম্বা, কালো লোক খুব চেঁচিয়ে মেঠো গলায় বক্তৃতা দিচ্ছে। হ্যাজাক নেই, কোনো আলো নেই, দিনের আলো মরে আসছে, সেই মরা আলোয় বক্তার মুখখানা আস্তে আস্তে মুছে যাচ্ছে। কয়েক পলক সেই হাস্যকর সভাটির দিকে তাকিয়ে রইলাম। রাস্তা ছেড়ে নেমে গেলাম সভাস্থলীতে। শুনি, লম্বা রোগা কালো মানুষটা তার শ্রোতৃবৃন্দকে একটা সংগ্রামে নামতে আহ্বান জানাচ্ছে। তখন তার বক্তৃতার শেষ পর্যায়, খুব তাড়াতাড়ি কথা বলছিল সে। বুঝতে

পারছিলাম, হ্যাজাক জ্বালার সংস্থান তাদের নেই। দিনের আলো ফুরোবার আগেই তাই সভা শেষ করতে হবে। সভা ঘেঁষে আমি ঘাসে বসে পড়লাম। বক্তার মুখখানা শেষবেলার আলোতে তখনো সামান্য দেখা যাচ্ছে। কুয়াশায় আবছা হয়ে গেছে স্মৃতি, তবু অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়ার আগে হঠাৎ মনে হল, মুখখানা প্রকাশের। লোকটা ঘাসের ওপর থেকে একটা চোঙা তুলে নিয়ে সভাশেষে শ্লোগান দিচ্ছে তখন, বলছে—কহিয়ে আপলোক, ইনকিলাব—

সবাই বলল—জিন্দাবাদ।

সভা শেষ হল! লোকদুটো তাড়াতাড়ি টেবিল, চেয়ার চোঙা, ঝাণ্ডা গোছাতে লাগল। ধরাধরি করে তুলল পাশের দর্জির দোকানে। শ্রোতৃবৃন্দ নির্বিকার বসে রইল, কেউ কেউ বিষয়কর্মে উঠে গেল, কেউ গিয়ে বসল মাঠের ধারে পেচ্ছাপ করতে।

আমি গিয়ে লোকটাকে ধরলাম—প্রকাশ না তুই?

বড় চমকে গেল লোকটা।

রেলের চাকরির এই এক সুবিধে। কোনো মানুষই হারিয়ে যায় না। ঘুরে-ফিরে দেখা হয়ে যায়। পুরোনো মানুষ ফিরে আসে, পুরোনো জায়গায় ফিরে যাওয়া যায়।

দেখি ঝগড়াটে, ঘেয়ো, গান্ধা প্রকাশ আর নেই। ছিপছিপে, টান চেহারার ছেলেটির মুখে-চোখে বাড়ন্ত বয়সের কাঁচা লাবণ্য। যদিও সে রোগা তবু একটা সতেজ দীপ্তি গোটা মানুষটা থেকে বিকীর্ণ হচ্ছে। প্রকাশ দু'হাত বাড়িয়ে আমাকে ধরল—অতনু, তোকে আমি একটুও ভুলি নি। একটুও না।

একসঙ্গে হুড়মুড় করে সব মনে পড়ে যাচ্ছিল। কাটিহারের পাড়ায় পাড়ায় আমাদের দু'জনের কীর্তি, কত মারপিট, প্রকাশের সেকেণ্ড হওয়ার ইচ্ছে, এ. টি. এস. সাহেবের বাগানে সেই জন্মদিনের বিকেল, প্রকাশের অদ্ভুত বিদায় জানানো—সব একসঙ্গে ঠেলে উঠছিল বুকের ভিতরে। যন্ত্রণাময় একটা আবেগ টের পেয়ে আমি প্রকাশের দুই হাত জোরে চেপে ধরলাম। আমার হারানো পৃথিবী, আমার শৈশব ঝড়ের মতো ফিরে আসছিল। বললাম—প্রকাশ মনে পড়ে? সব মনে পড়ে?

প্রকাশ মাথা নাড়ে—সব। আমি কিছুই ভুলি নি।

—তুই এখানে কী করছিস?

—চল, বলছি।

প্রকাশ তার লোকজনদের কাছে বিদায় নিয়ে এল।

আলিপুরদুয়ার জংশনের নিঃঝুম রেল-কলোনীতে অন্ধকার নেমে আসছে। ফাঁকা জায়গা পড়ে আছে অনেক। বালি, ইট, সুরকি আর লোহালক্কড় স্তূপ হয়ে পড়ে আছে। গোধূলির কুয়াশা ঝুলে আছে মাঠে ঘাটে। রাস্তার পাথরে, গর্তে হোঁচট খেতে খেতে দু'জনে হাঁটছি। প্রকাশ বলছে—বাবা মারা গেল। তাড়াতাড়িই মরার কথা ছিল তার। অত মদ খেলে লোকে বেশিদিন বাঁচে না। তার ওপর ঐ খাটনি, খেতেও পেত না তেমন। আমার মা মরে যাওয়াতে বাবা খুব খিটখিটে হয়ে গিয়েছিল। নতুন মাকেও ভীষণ মারত, আমাকেও। সৎমা সম্পর্কে কত কথা শোনা যায়! কিন্তু আমার সৎমা খারাপ হওয়ার সুযোগই পায় নি। তার ছেলেপুলে হয় নি বলে আমাকে ভালবাসত খুব। তার ওপর বাবার ঐ অত্যাচার আমাদের দু'জনকে আরো এক করে তুলেছিল। বাবা আমাকে মারলে নতুন মা এসে বুক দিয়ে পড়ত, নতুন মাকে মারলে আমি গিয়ে ঠেকাতাম! অতনু, অত্যাচার এবং দুঃখকষ্ট চিরকাল মানুষকে একতাবদ্ধ করেছে—আমার ঘরে সেটা আমি নিত্য দেখতাম। তারপর যথারীতি বাবা মারা গেলে আমরা হাঁফ ছাড়লাম। তখন দেখি আমার নিষ্পর, রক্তের সম্পর্ক-হীন নতুন মা কবে আমার আসল মা হয়ে গেছে। আমাদের দু'জনের আমরা দুজন ছাড়া কেউ নেই। তখন আমাদের অবস্থা বড় খারাপ। বাবার প্রভিডেণ্ড ফাণ্ডের সামান্য টাকা পেতে কী যে কষ্ট গেছে। তার ওপর রেল থেকে তখন বার বার তাগাদা দিচ্ছে কোয়ার্টার ছেড়ে দিতে। আমরা মাহাতোদের বস্তিতে উঠে গেলাম, মার দু'একটা গয়না বেচে কিছুদিন চলল। তারপর মাকে নিয়ে অফিসে অফিসে ঘুরে সাহায্য চাইলাম। এমন কি স্কুলের মাস্টারমশাইদের কাছেও গিয়ে কতবার চেয়েছি। স্কুলের ছেলেরা চাঁদা তুলে সাহায্য করত। ক্রমে ক্রমে আমরা একেবারে সমাজের নীচু তলার নেমে যাচ্ছিলাম। বুঝতে পারছিলাম, আমরা

এইভাবে ভিখারী হয়ে যাবো। এক-একদিন মাকে লুকিয়ে পূর্ণিয়ার শার্টল ট্রেনে উঠে, অচেনা লোকজনের কাছে ভিক্ষে করেও এসেছি। মা ঘোমটায় মুখ ঢেকে আমাকে নিয়ে সাহেবদের বাড়ি বাড়ি যেত, বলত—আমার এই ছেলেকে চাকরি দিন, নইলে আমরা মরে যাবো। অতি কষ্টে একটা ক্লীনারের চাকরি পেলাম। কয়েক বছর পর এখন ফায়ারম্যান হয়ে এসেছি। মা আর আমি—আমরা বেঁচে গেলাম।

বলে হাসল প্রকাশ। বলল—অনু, এখনো বেঁচে আছি রে। মাঝে মাঝে বিশ্বাস হয় না। আমার ছেলেবেলাটা বড় অন্ধকার। ছেলেবেলার কথা ভাবলে এখনো শিউরে উঠি। মাতাল বাবা সন্ধ্যেবেলা ফিরে কত কাণ্ড করত। ভাতের হাঁড়িতে পেচ্ছাপ করত, বিছানায় বমি, মাকে ভীষণ মারত! আমার মা ঐ মার সইতে না পেরেই মরে যায়। বেঁচে থাকতে কত কষ্ট পেত। তার ওপর আমি ছিলাম ঐরকম—সারাদিন বাইরে বাইরে ঝগড়া করে বেড়াতাম, মারধর খেতাম, চুরি করতাম। ঘরে ফিরলে মা মারত, মারত মাতাল বাবা, খেতে পেতাম না। এখনো কী করে বেঁচে আছি—ভাবলে অবাক লাগে। নতুন মাকে নিয়ে আমার সংসার, চাকুরি করে পয়সা হাতে পাই, খাই পরি নিজের মনের মতো থাকি—এ যেন আমার জীবনই নয়। এই জীবনযাপন করতে করতে মাঝে মাঝে যখন সেইসব দিনের কথা ভাবি তখন বড় অস্থির লাগে। আমার শিশুকালটা কেন অমন অন্ধকার, ভয়ঙ্কর ছিল? কেন শৈশবের কোনো সুখস্মৃতি আমার নেই—যা সকলের থাকে! কেন কেড়ে নেওয়া হয়েছে আমার জীবন থেকে আমার সবচেয়ে ভাল সময়টা! ভাবতে ভাবতে বুঝতে পারি, এ জগতে অভাবের দুঃখ নেই। জটিল কার্যকারণসূত্রে সে-ই নিয়ন্ত্রণ করছে মানুষের আচার-ব্যবহার, চরিত্র, মনুষ্যত্ব। এখন আমি এইসব নিয়ে খুব ভাবি। আমার ছেলেবেলা, দেশের অর্থনীতি, মানুষের ভবিষ্যৎ—এই সবকিছুর সম্পর্ক আবছাভাবে বুঝতে পারি। ভিতরে ভিতরে অস্থির হই, কখনো রাগে ফেটে পড়ি, কখনো শান্তভাবে সমাধানের উপায় ভাবি। একদিন রেলেন ইউনিয়নের সুপ্রিয় গুপ্তের সঙ্গে আলাপ হল। তিনি আমাকে ট্রেড-ইউনিয়ন বোঝালেন, বোঝালেন

মানুষের মৌলিক অধিকার, শ্রেণীচেতনা এবং শ্রেণীদ্বন্দ্ব, দাবী আদায়, স্বার্থ-সচেতনতা। আমার এলোমেলো চিন্তাগুলি সাজিয়ে দিলেন তিনি। এখন বুঝতে পারি—কেন নীচুতলার পরিবারে মানুষে মানুষে ভালবাসার গিঁট আলগা হয়ে যায়, ভাগ্যনির্ভর মানুষ সুদিনের অপেক্ষা করতে করতে কী করে আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলে, কী করে অদেখা শ্রেণীর লড়াইয়ে উঁচুতলার মানুষ গরীবের সংগ্রাম করার ক্ষমতা কেড়ে নেয়। অতনু, আমি ইউনিয়নে নেমেছি। চোঙ ফুঁকে মিটিং করি। মিটিঙে লোক হয় না! কিন্তু দেখিস, আমি এটুকু করেই ছাড়বো না, আমি মানুষের জন্য বিরাট লড়াই করব। মার খাবো, মরে যাবো, তবু লড়বোই।

রেল-লাইন পেরিয়ে প্রকাশের বাসা। সেইখানে ছোট্ট হ্যারিকেনের আলো জেলে প্রকাশের নতুন মা প্রকাণ্ড এক অন্ধকারের মধ্যে বসে আছেন। প্রকাশ বাইরে থেকেই চেঁচিয়ে বলল—মা, দ্যাখো, কাকে এনেছি।

শান্তচোখে তিনি আমাকে দেখলেন। চিনতে পারলেন না। কিন্তু ছেলের মতোই আদরে নিলেন ঘরে। একখানাই ঘর, ভিতরে বারান্দা আছে, সেই বারান্দাটা বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘিরে প্রকাশ তার স্টাডি বানিয়েছে। সেখানে ছোট্ট তক্তাপোশে সে শোয়। কেরোসিন কাঠের একটা টেবিলের ওপর রাজ্যের রাজনীতির বই, ইশতেহার, ইউনিয়নের সার্কুলারের খসড়া, প্রকাশের লেখা কিছু পাণ্ডুলিপি, ডায়েরী।

দু'দিন আমি প্রকাশের কাছে রইলাম। দুটো দিন আমার কাটল প্রকাশের রাজনৈতিক বই আর ইশতেহার পড়ে। প্রকাশের সঙ্গে পুরানো কথা যত না হল তার চেয়ে ঢের বেশী হল ট্রেড-ইউনিয়ান এবং রাজনীতির কথা। এতকাল মানুষ নিয়ে আমি যত ভেবেছি, মানুষের জন্য আমার আবেগ বা ভালবাসা, মানুষের প্রতি আমার রাগ বা ঘৃণা, অভিমান বা উপেক্ষা—সবকিছুই ঐ দু'দিনে অন্যরকম চেহারা নিয়েছিল। বুঝতে পারছিলাম, রাজনীতি নামে এক বিশাল রহস্যময় জগৎ আছে। প্রকাশের জীবনে একটা বিশাল পরিবর্তন এসেছে। সে আর তার নিজের পরিবারে

আটকে নেই। সে ক্রমে মানুষের পরিবারের একজন হয়ে উঠেছে। আমার বড় লোভ হল।

দু'দিন পর যখন চলে আসবো তখন খেতে বসিয়ে প্রকাশের নতুন মা বললেন—বাবা, পৃথিবীতে রক্তের সম্পর্কের কেউ নেই আমার, যা আছে আমার সব নিজের হাতে গড়ে নেওয়া সম্পর্ক। ঐ যে প্রকাশ—ও আমার ছেলে—ভালবাসাই ওকে আমার ছেলে করেছে, নইলে কেউ না। তুমি আমার প্রকাশের চেয়ে পর নও—তাই আপন বলে আমার কাছে এসো।

দেখলাম, প্রকাশ যা করে তার সব তাতেই তার মায়ের সায় আছে। বুঝলাম, প্রকাশের হবে। ওর নতুন মা ওর কমরেড। ওর বাসা, ওর সংগ্রামের ক্ষেত্র তৈরি করে দেয়।

সে-বয়সটা আশা-ভরসা করার পক্ষে সুন্দর বয়স। আলিপুর-দুয়ার থেকে শিলিগুড়ি ফেরার পথটা আমি গভীর চিন্তায় ডুবে রইলাম। মানুষের বৃহৎ পরিবারের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। আমার ছিল না কেবল দুটি সুবিন্যস্ত, অস্তিবাচক চিন্তাশক্তি। প্রকাশ আমাকে এইটে ধরিয়ে দিয়েছে। বড় নেশার মতো লাগছিল।

ফিরে এসে শুনি, আমার বাবা প্রমোশন পেয়েছেন। শীগগিরই তিনি পাণ্ডুতে বদলী হয়ে যাবেন। বাড়িতে একটা আনন্দের স্রোত বয়ে যাচ্ছে।

কেন জানি না, এই পারিবারিক আনন্দে আমি নির্বিকার রইলাম। আমার মন বলছিল, ছোটো 'পাওয়া' মানুষকে তার বৃহৎ 'পাওয়া'র সংগ্রাম থেকে দূরে নিয়ে যায়।

বিপ্লব, লড়াই, অধিকারের জন্য সংগ্রাম, মৌলিক অধিকার, রাজনৈতিক মুক্তি, সাম্য—এইসব শব্দ সেই বয়সে কী ভীষণ মাদকতাময় ছিল! আমাদের বুকের ভিতরের বাতাস এইসব শব্দে বাঙময় হয়ে উঠত। শরীর মনকে মুচড়ে বেজে উঠত বৃহৎ পৃথিবীর ডাক। মনে হত, আমিই লেনিন।

সুপ্রিয় গুপ্ত আমাদের রাজনৈতিক জীবনের প্রথম গুরু। কিন্তু তিনি নিজে ট্রেড-ইউনিয়নের বাইরে আসতে চাইতেন না। বাইরের রাজনীতি তোমরা কর—এই কথা বলতেন প্রায়ই। প্রকাশও ট্রেড-ইউনিয়নে আটকে ছিল। আমার সেরকম কোনো বাধা ছিল না। আমার দু'টি চমৎকার গুণ ছিল। আমি যা নিজে বুঝতাম তা সহজেই অন্য সবাইকে বোঝাতে পারতাম, আর আমি সহজেই অন্যের মাথায় আশা আকাঙ্ক্ষা এবং স্বপ্ন ঢুকিয়ে দিতে পারতাম। রাজনৈতিক নেতারা আমার কার্যকলাপে মনোযোগী হতে শুরু করলেন। উত্তরবাংলা এবং আসামে আমি দ্রুত সংগঠন শুরু করি। সুপ্রিয় গুপ্তর দল আমাকে তাদের রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।

পাণ্ডুর পাঁচ নম্বর ফেরীঘাটে বাবা যে বাসা পেয়েছিলেন আমি সেখানে মাঝে মাঝে যেতাম। দুই-একদিন থেকে আবার বেরিয়ে পড়তাম। তখন আমার অল্প-স্বল্প নাম-ডাক হয়েছে, এম-পি, এম-এল-এ, মন্ত্রীদের সঙ্গে আমার মেলামেশা অবাধ, বড় অফিসরারও আমাকে একটু আধটু খাতির করে। এইসব দেখেই বোধহয় বাবা বুক বেঁধেছিলেন। আমার ভবিষ্যৎ নিয়ে আর আমাকে ভর্ৎসনা করতেন না। কেবল মা আমাকে বাসায় গেলেই চেপে ধরতেন—অনু, তুই যে পার্টি করিস, এসব কিন্তু ভাল না। লোকে নানা কথা বলে।

—কী বলে?

—বলে ওসব বিয়ে করার পার্টি। যেসব ছেলেদের চাকরি হয় না, আর যেসব মেয়েদের বিয়ে হয় না তারাই নাকি পার্টি করে। একসঙ্গে ওঠে বসে, তারপর হুট হাট নিজেদের মধ্যে বিয়ে করে ফেলে। আজকাল নাকি যেসব কুচ্ছিৎ মেয়ের বিয়ে হয় না তাদের বাবারা তাদের পার্টিতে ভিড়েয়ে দেয়। পার্টি করতে করতে তাদের বিয়ে হয়ে যায়।

শুনে আমি মায়ের ওপর ভীষণ রাগ করি।

কিন্তু মা তাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় না। সন্তানের স্বার্থ-রক্ষায় কোন্ মা কবে পিছ-পা হয়েছে। আমি রাগ করলে মাও শাসিয়ে বলে—যদি কোনোদিন তুমি পার্টির মেয়ে বিয়ে করে আনো, তবে আমি গলায় দড়ি দেবো—মনে রেখো।

আমি তখন মাকে খ্যাপানোর জন্য বলি—পার্টির মেয়ে খারাপ হবে কেন! আমাদের সঙ্গে অনেক মেয়ে কাজ করে, তারা বেশ সুন্দর লেখাপড়া জানা মেয়ে, কেমন বুদ্ধিশুদ্ধি রাখে!

শুনে মার চোখমুখ ফ্যাকাশে হয়ে যায়। বলে—ও, এইসব হচ্ছে! তাই বলি, অনু আমার এত বাউন্ডুলে হয়ে গেল কেন! দাঁড়াও, তোমার বাবাকে বলছি।

মাকে ঐরকম দুশ্চিন্তাগ্রস্ত রেখে আমি আবার বেরিয়ে পড়তাম।

লামডিং-এর কালী মিত্র ছিলেন আমাদের দলের একজন বড় ট্রেড-ইউনিয়নিস্ট। তিনি চাকরি করতেন না, ছিলেন পার্টির হোল-টাইমার। তাঁর কাজ ছিল, প্রায়দিনই থানার মাঠে ঝাণ্ডা পুঁতে একটা টেবিল, একজোড়া চেয়ার পেতে চোঙা ফুঁকে বক্তৃতা করা। রেল-কর্মচারীদের স্বার্থ-সচেতন করে তুলতেন, অফিসারদের দুর্নীতির বিবিধ উদাহরণ দিতেন তথ্য সহযোগে। অত্যন্ত দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করতেন। পার্টিতে তাঁর সুনাম ছিল না। শোনা যেত, ক্লাশ থ্রী এবং ক্লাশ ফোর কর্মচারীদের বদলী রদ করা, সাস্পেনসন্ অর্ডারের প্রত্যাহার, বিশেষ জায়গায় বদলী করা ইত্যাদি কাজের জন্য তিনি টাকা খেতেন। উপরন্তু বুকিং ক্লার্ক স্টেশন মাস্টারদের ঘুষ এবং হ্যাণ্ডলিং থেকে তাঁর নিয়মিত রোজগার ছিল। কিন্তু তাঁর একটা অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। তিনি নিপুণ গোয়েন্দার মতো রেলের দপ্তর থেকে সব গোপন তথ্য জোগাড়

করতে পারতেন। এইটাই ছিল তাঁর সবচেয়ে মারাত্মক অস্ত্র। প্রতিটি কর্মচারী থেকে অফিসাররাও তাঁকে ভয় পেতেন। কালী মিত্রের কোপ কখন কার ওপর পড়ে তার ঠিক ছিল না। কিন্তু যার ওপর পড়ত তার দুর্গতি হতই। কারণ, কালী মিত্র সঠিক তথ্য ও প্রমাণ সহযোগে প্রকাশ্য সভায় সব ফাঁস করতেন। হৈ-চৈ পড়ে যেত। অন্ততঃ তিনজন জেলা অফিসারকে তিনি লামডিং থেকে তাড়িয়েছিলেন। ফলে অফিসাবরাও তাঁকে খাতির করতেন। পার্টিও তাঁকে ঘাঁটাতে সাহস করত না।

হঠাৎ খবর পাওয়া গেল কালী মিত্র আমাদের ইউনিয়ন ছেড়ে সরকারী ইউনিয়নে যোগ দিয়েছেন। আমি রেলের ইউনিয়নের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলাম না। আমার কাজ ছিল চা-বাগানের শ্রমিক, চাষী, স্কুল শিক্ষক, উদ্বাস্তুদের নিয়ে সংগঠন তৈরি করা। তবু সুপ্রিয় গুপ্ত আমাকে ডেকে বললেন, অতনু, কালীদার মতো ওয়ার্কার চলে গেলে ক্ষতি হবে। আমরা অনেক চেষ্টা করেছি, তিনি থাকতে চাইছেন না। তোমার আইডিয়াগুলো খুব ফ্রেশ, বলতে কইতেও জানো, তোমার ব্যক্তিত্বের আকর্ষণও আছে। দ্যাখো তো কালীদাকে ফেরাতে পারো কিনা! কিন্তু মনে রেখো, লোকটা ঝুনো ট্রেড-ইউনিয়নিস্ট, পলিটিক্যাল থিয়োরীর ধার ধারেন না। যতদূর সম্ভব নিজের ব্যক্তিত্ব দিয়ে লোকটাকে পটাতে চেষ্টা করবে, আদর্শের কথা বেশি বলো না।

লামডিং সুন্দর টিলার শহর। রেল লাইনের পশ্চিম ধারে প্রকাণ্ড খেলার মাঠ। সেই মাঠে ক্রিকেট খেলা হয়, ফুটবল, বেসবল নামে, সাহেব সুবোরা একসময়ে এটাকে গল্‌ফ্‌ লিঙ্ক বানিয়েছিলেন। লেভেলক্রসিং পার হলেই দেখা যায়, একটা চওড়া সুরকির রাস্তা মাঠকে ডাইনে ফেলে ঘুরে ঘুরে উঠে গেছে। টিলার পর টিলা, ঝাউ আর শালগাছের ফাঁকে ফাঁকে স্বপ্নের মতো বাংলোবাড়ি সব। সেখানে নীলাভ আলো জ্বলে, অগ্যাণ্ডির পর্দা ওড়ে হাওয়ায়, অফিসার্স ক্লাব থেকে ইংরিজি বাজনা ভেসে আসে, হুল্লোড়ের শব্দ শোনা যায়। সেই রাস্তায় হাঁটলে মনে হবে এ যেন বিদেশ। এখানে যেসব সুখী মানুষ বাস করে তারা কেউ

ভারতের অর্থনীতির শরিক নন, তাঁরা বিদেশী, তাঁরা অন্য পৃথিবীর মানুষ।

অন্যদিকে রেল-লাইনের পূবধারে কয়েকটা টিলার ওপর বাবুদের বাস। আরো এগোলে ক্রমে শহরটা ছোটো ঘিঞ্জি আর নোংরা হয়ে এসেছে। কাঁচা ড্রেনের গন্ধ, ইট-ওঠা সরু রাস্তা, বস্তির মতো বাড়ি, মাতালের এলোমেলো পদক্ষেপ, রাস্তায় ন্যাংটা ছেলেমেয়ে। এদিকে এলে কিছুতেই বিশ্বাস হয় না, এই শহরের অন্য দিকটাই এক অবিশ্বাস্য সুন্দর বিদেশ, যেখানে বিদেশী সুখী মানুষেরা বাস করে। প্রতিটি শহরেরই আলাদা চরিত্র থাকে।

এই ঘিঞ্জি এলাকায় একটা ছোট্ট কাঠের বাড়িতে পা দিয়ে দেখি, সামনের বারান্দায় একটা ময়লা তেলচিটে ইজিচেয়ারে একজন একা মানুষ আধশোয়া হয়ে আছে। হাড়-বের করা রুক্ষ চেহারা, গালে গর্ত, চোখে চশমা। অনেক লড়াইয়ের চিহ্ন তার শরীরে ফুটে আছে। কঠিন বাস্তব তাঁর রক্তরস নিংড়ে একটা ছিবড়ে মানুষকে ফেলে রেখে গেছে। সন্ধ্যার আধো-অন্ধকারে দেখি লোকটা বড় অন্যমনস্ক, হাতে সিগারেট জ্বলে যাচ্ছে, লম্বা হয়ে ঝুলে আছে সিগারেটের পতনোন্মুখ ছাই। দেখি লোকটা পশ্চিমদিকের সেই স্বপ্নের সুন্দর শহরটার দিকে চেয়ে আছে যেন। হঠাৎ বিদ্যুৎ-চমকের মতো আমার মনে হল, লোকটা স্বপ্ন দেখছে। ঐ যে পশ্চিমের সুন্দর শহর, ঐখানে কোনোদিন তার যাওয়া হয় নি, সুখী মানুষদের একজন সে হয়নি কখনো, তার ঘরে ওড়েনি অগ্যাণ্ডির পর্দা। অভিশপ্ত কিছু মানুষের একজন সে হয়ে রইল চিরকাল, লড়াই করেছে অনেক—কিন্তু স্বপ্নের শহর রয়ে গেল দূরে। যাওয়া হল না! ক্রমে বয়স বেড়ে গেল, পিছনে ফিরে তাকালে দেখা যায় বিশাল হাহাকারের গহ্বরে ভরা একটা জীবন তার, মুঠো খুললে দেখা যায় প্রাপ্তি—শূন্য। তাই এই ভর সন্ধ্যায় একা নির্জন মানুষটি স্বপ্ন দেখছে। স্বপ্ন দেখছে, সে পশ্চিমের ঐ শহরটিতে চলে যাবে।

কালী মিত্র মুখ তুলে আমাকে দেখলেন। সিগারেটের ছাই খসে পড়ল। আমাকে চিনতে পেরে হাসলেন—এসো অতনু।

নির্দেশ ছিল, যেন রাজনৈতিক আদর্শের কথা না তুলি। যেন

ব্যক্তিগত প্রভাব দিয়ে তাঁকে আকর্ষণ করার চেষ্টা করি। কিন্তু তার কিছুই দরকার হল না। দলত্যাগী কালী মিত্র যেন তাঁর সব কথা কাউকে বলার জন্য তৈরিই ছিলেন। আমাকে পেয়ে বেঁচে গেলেন।

পরিপাটি কথায় যিনি ওস্তাদ সেই কালী মিত্র সেই সন্ধ্যায় খুব গুছিয়ে কথা বলতে পারছিলেন না। তাঁর কথা এলোমেলো হয়ে যাচ্ছিল। যেমন, প্রথমেই তিনি আমাকে প্রশ্ন করলেন—অতনু, বিয়ে করেছো?

আমি মাথা নাড়লাম।

তিনি অন্যমনস্কভাবে বললেন—তোমার আর বয়স কী! বিয়ে করার অনেক সময় পাবে। কিন্তু আমার বয়স পঁয়তাল্লিশ। আমি এখনো বিয়ে করি নি। অতনু, তুমি কাউকে ভালবাসো?

আমি আবার মাথা নাড়লাম।

তিনি বললেন—আমি একজনকে ভালবাসি। বিশ বছর ধরে বাসি। তার বয়স এখন ঊনচল্লিশ। বিশ বছর আগে সে যেমন সুন্দর দেখতে ছিল, এখন আর তেমন নেই। মোটা হয়ে গেছে, মুখে মেচাতা পড়েছে, চামড়া ঝুলে গেছে। খুব এক ঢাল চুল ছিল তার, এখন সেসব কিছুই নেই। গত বিশ বছরে আমরা আমাদের সুন্দর বয়সটা হারিয়েছি। কিন্তু আর না। অতনু, তোমার বাবা এখনো চাকরি করেন, বোধহয় কমার্শিয়াল ইন্‌সপেক্‌টর। না?

আমি মাথা নাড়লাম।

উনি বললেন—তাহলে তোমাকে কখনো তোমার পরিবারের ভরণপোষণের জন্য তেমন চিন্তা করতে হয় নি। কিন্তু সেই ষোলো সতেরো বছর বয়স থেকে আমাকে সংসার টানতে হয়েছে। কী করে টেনেছি তা ভগবান জানেন। বিড়ি বেঁধেছি, বোকাজানে গুড়ের কারবার করেছি, কাপড়ের গাঁট ফিরি করেছি। আমার পড়াশুনো বেশি না। মার্ক্স-লেনিন-গান্ধী—আমি কিছুই বুঝি না। যারা বোঝে তারা আমার চেয়ে বেশি কাজ করে নি। আমি হার্ডেন্‌ড্‌ পলিটিশিয়ান। বিশ বছর আগে ছিলাম ফার্স্ট ফায়ারম্যান। আর ক'দিন পরেই ড্রাইভার হওয়ার কথা। সেই সময়ে রেল ইঞ্জিনের বড়ো টানাটানি, মালগাড়ির বগির খুব চাহিদা।

আসামের এই অঞ্চলে তখন রাস্তাঘাট হয় নি, একমাত্র রেলওয়েই ভরসা। এই চাহিদার সুযোগে মার্চেন্টদের কাছ থেকে সাহেবরা দু'হাতে পয়সা লুটত। একটা পুরো মালগাড়ির জন্য কয়েক হাজার টাকার লেনদেন হত। সেইসময়ে আমাদের ইঞ্জিনের স্টীম ব্রেকটা গড়বড় করছিল। ইঞ্জিন 'শেড'-এ দেওয়া হয়েছে, মেরামতি তখনো হয় নি—সেই সময়ে ইয়ার্ডে একটা গাড়ির অর্ডার হয়েছে। গাড়ি তৈরি, ইঞ্জিন নেই। খবর পেয়ে সাহেবদের মাথায় হাত। তক্ষুণি সাহেবরা লোকোশেডে ফোন করে সেই ডিফেক্টিভ ইঞ্জিন বের করতে বললেন। আমরা আপত্তি করলাম, সাহেব ধমক দিলেন —ঐটুকু ডিফেক্ট কিছুই না। আমি ইঞ্জিনীয়ার, আমার চেয়ে তোমরা বেশি জানো? আমাদের উপায় ছিল না, ইঞ্জিন বের করলাম। তিনসুকিয়ার কাছে সিগন্যাল না পেয়ে গাড়ি থামাতে গিয়ে টের পেলাম স্টীম ব্রেক কাজ করছে না, ওদিকে গাড়িটাতে ভ্যাকুয়ামও দেওয়া হয় নি। গাড়ি সিগন্যাল পেরিয়ে দুটো পয়েন্ট ফাটিয়ে ডিরেল হল, পাঁচ-ছ'খানা বগি উল্টে গিয়ে মালপত্র সব নষ্ট। ইন্সপেকশন হল, ইঞ্জিনের গলদ ধরা পড়ল, রিপোর্ট গেল। আমরা সাসপেনশন অর্ডার পেলাম। সাহেব যে ঐ ইঞ্জিন নিয়ে যেতে আমাদের বাধ্য করেছিলেন তা আমরা লিখিতভাবে জানালাম। কাজ হল না। সাহেব স্বীকার করলেন না। আমরা আন্দোলন শুরু করলাম, অ্যাক্সিডেন্টের জন্য চিরকাল ড্রাইভার-ফায়ারম্যান কিংবা পয়েন্টসম্যানদের চাকরি যায়, এবার থেকে অ্যাক্সিডেন্টের জন্য সাহেবদেরও কৈফিয়ৎ তলব করা হোক। সেই আন্দোলনে কেউ গুরুত্ব দিল না। জীবনের শুরুতেই ঐ রকম ঘা খেয়ে কেমন হয়ে গেলাম। একদিন রাতে সোজা চলে গেলাম সাহেবের বাংলোয়। বললাম, দেখা করতে চাই। সাহেব বারান্দায় বেরিয়ে এলেন। আমার হাতে একটা পাঁচ ব্যাটারীর টর্চ ছিল, সেইটে দিয়ে মাথায় মারলাম। অফিসার মানুষ—ভাল খায় দায়, জীবনীশক্তি বেশি, কিছু হল না। আমার জেল হল. চাকরি গেল। জেল থেকে বেরিয়ে আমি ইউনিয়ন করা শুরু করি। অতনু, আসামের এই অঞ্চলে আমি প্রায় একা রেলের ইউনিয়নকে জোরদার করে তুলি। তুমি জানো?

'আমি মাথা নাড়লাম।

তিনি অন্যমনস্কভাবে বললেন—ইউনিয়ন করতাম, বিড়ি বাঁধতাম, গুড় বেচতাম, কাপড়ের গাঁট ফিরি করতাম। আমার পরিবার প্রতিপালন এবং আন্দোলন—দুই-ই এই দুই হাতে করেছি। বিশ বছর প্রতিশোধের নেশা ছিল, আন্দোলনের নেশা ছিল। বিশ বছর আমি বিয়ে করি নি, বিশ বছর একটি সুন্দর মেয়ে অপেক্ষা করে আছে। অপেক্ষা করতে করতে তার যৌবন কেটে গেল, ঝরে গেল রূপ, এক ঢাল চুল পাতলা হয়ে গেল। বিশ বছর ধরে আমি কী আন্দোলন করেছি—হিসেব করতে গিয়ে দেখি—বিশ বছরে আমি কিছু স্বার্থপর লোভী লোকের বদলী আটকেছি, সাসপেনশন রদ করেছি, ঘুষ ধরেছি কিংবা আরো অনেক কিছু করেছি—কিন্তু তাতে কী হয়েছে? কিছু না, অভাবে অভাবে আমার চরিত্র নষ্ট হয়েছে, টাকা খেয়েছি, বদনাম কিনেছি। এর বেশি আর কিছু হওয়ার নেই আমার। বলেছি তো, আমি মার্ক্স-লেনিন-গান্ধী বুঝি না। আমি সহজ হিসেব-নিকেশ করে দেখেছি—আমার যা পাওয়া উচিত ছিল আমি তা পাই নি। কিন্তু অন্যেরা আমাকে ভাঙিয়ে কাজ গুছিয়ে নিচ্ছে। অতনু, পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে এখন হঠাৎ আমার নিজেকে বড় বোকা-বোকা লাগছে। অতনু, সুপ্রিয়দাকে বোলো, আমার লড়াই আমি করেছি। আর আমার কিছু করার নেই। এখন জীবন থেকে আমি কিছু পেতে চাই। মরবার আগে যেন অন্তত একবার মনে হয়—জীবনটা সুন্দর ছিল।

নিমেষে আমি ছোবল তুললাম। দেখলাম ব্যক্তিগত স্বার্থের দুর্বলতম স্বপ্নে নুয়ে পড়েছে একটি শক্ত-সমর্থ লোক। কাঠ-জোয়ান. লড়াকু একটা মানুষ—মানুষের বৃহৎ লড়াই, সামগ্রিক সংগ্রাম, যৌথ স্বার্থ ভুলে পশ্চিম লামডিঙের টিলার সুন্দর শহরের স্বপ্ন দেখছে। এমন একটা মানুষ যদি এইভাবে সকলের চোখের সামনে ভেঙে পড়ে তবে বহু ছেলেই আত্মবিশ্বাস হারাবে। আমি কালী মিত্রকে বললাম—দাদা, আমিও এই কাজে নেমেছি। আমারও সুখের সংসার নয়······ইত্যাদি।

কালী মিত্র কেবল মিটমিট হাসলেন, বললেন—আমি

জানি অতনু, তোমার মত সৎ কর্মী পার্টিতে বেশি নেই। তুমি অনেক দূরে উঠবে। কিন্তু সকলেই এরকম ক্ষমতা নিয়ে জন্মায় না। আমি যা করেছি তা একটা প্রতিশোধের জন্য। তা পূর্ণ হয়েছে। এখন আমাকে ছেড়ে দাও। বিপ্লবের অর্থ প্রতি বছর পাল্টে যাচ্ছে, পার্টি কেবলই তার সংগ্রামের দিক পাল্টাচ্ছে! বড় দামাল সময় এখন। এত ওলট-পালটের মধ্যে আমি বড় বেমানান। আমি তো কবে থেমে গেছি। আমার সাধ্য নেই তোমাদের সঙ্গে চলি। কাজেই আমাকে ছুটি দাও। চাকরিতে রিটায়ারমেণ্ট আছে, রিটায়ার করার পর মানুষ তার নিজস্ব জীবন যাপন করে। তেমনি আমাকে রিটায়ার করতে দাও। আমাকে ভুলে যাও।

আমি যতবার ছোবল তুলি, তিনি ততবার মিষ্টি হেসে ধুলো-পড়া মন্ত্র দিয়ে দেন। তারপর একসময় হঠাৎ উঠে বললেন—চলো, আমার সঙ্গে এক জায়গায়।

বেশি দূর না। ঘিঞ্জি পাড়ার আর একটু ভিতরে একটা দরিদ্র বাড়িতে তিনি নিয়ে গেলেন আমাকে। বাইরে থেকে ডাক দিলেন—বিভা বিভা—

বিভা এসে সামনে দাঁড়ালেন। ময়লা শাড়ি, দেহে গার্হস্থ্যের নির্ভুল ছাপ। এককালে সুন্দরী ছিলেন—বোঝা যায়। আমাদের ঘরে নিয়ে বসালেন। হ্যারিকেনের আলোটা উস্কে দিয়েই বিভা আমার দিকে তীব্র চোখে তাকালেন। সেই চোখে অনেক প্রশ্ন ছিল এবং সংশয় আর ভয়। কিন্তু কোনো প্রশ্ন করলেন না। কালী মিত্র বললেন—পার্টির ছেলে। খুব চোখা। ওর নাম শুনেছো বোধহয়, অতনু সেন। চারটে চা-বাগানে একনাগাড়ে পনেরো দিন ধর্মঘট করিয়েছিল একা। খুব হৈ-চৈ হয়েছিল।

বিভা বললেন--শুনেছি।

কালী মিত্র বললেন—ও আমাকে ফেরাতে এসেছে।

বলে হাসলেন। বিভা কথা বললেন না, কিন্তু অনেকক্ষণ সংশয়ের চোখে দেখলেন আমাকে। বুঝলাম, তিনি খুব ভয় পেয়েছেন।

কালী মিত্র বললেন—তুমি চা করে আনো, আমরা বসছি।

বিভা চলে গেলে কালী মিত্র বললেন—এটা ওর দাদার সংসার।

বিশ বছর ও এই সংসারে পড়ে আছে। দাদারা সামান্য দোকানদার। সংসারে অনটন, বৌদিরা ভাল ব্যবহার করে না। অনেক ভাল বিয়ের সম্বন্ধ এসেছিল, কিন্তু সব ও ভেঙ্গে দিয়েছে বলে কেউ ওকে ভাল চোখে দেখে না। আমার সঙ্গে মেশে বলে পাড়াতেও যথেষ্ট নিন্দে আছে ওর নামে। এই সংসারে ও কাপড় কাচে, বাসন মাজে, ছেলে মানুষ করে, খেতে-পরতে পায় না, আদর-ভালবাসা নেই। বিশ বছর ধরে ও এই জীবন যাপন করছে। অতনু, এটা কতবড় স্বার্থত্যাগ তা বাইরে থেকে বোঝা মুস্কিল।

আমি বললাম—আপনি পার্টিতে থেকেও তো বিয়ে করতে পারেন—

কালী মিত্র হাসলেন—শুধু বিয়ের জন্য পার্টি ছাড়ছি—কে বলেছে! ওকে এতকাল ইচ্ছে করেই কষ্ট দিয়েছি। বিয়ে করবার কথা মনেই হত না। কথা উঠলে বলতাম—অপেক্ষা করো, এখন অনেক কাজ। কাজে কাজে বেলা বয়ে গেল। কত কাজ করেছি এতকাল! তারপর হঠাৎ মনে হল, পুরোটাই নিজেকে ফাঁকি দেওয়া। এই ফাঁকির হাত থেকে বাঁচতে হলে দুটো কাজই একসঙ্গে করব। পার্টি ছাড়বো, বিয়েও করব। রেল থেকে অনেকদিন ধরে আমাকে অফার দিয়েছে। সরকারী ইউনিয়নে গেলে আমাকে ওরা বড় চাকরি দেবে। আমি হবো ওয়েলফেয়ার অফিসার, ইচ্ছেমতো জায়গায় পোস্টিং পাবো, আমার বাংলো হবে। আমি ওদের বড় জ্বালাচ্ছি, তাই আমাকে নিষ্ক্রিয় করে রাখা ওদের খুব দরকার।

আমি কিছু বলার জন্য মাথা তুলেছিলাম। তুলে দেখি, কালী মিত্র ছোটো চোখে আমাকে তীক্ষ্নভাবে দেখছেন। আমি মুখ তুলতেই প্রসন্ন, শান্ত হাসি হাসলেন, বললেন—রাগ কোরো না। আমি বিস্তর মানুষ দেখেছি। একটু প্রমোশন, একটা বদলী, একটু অপরাধের মার্জনা—এ সবের জন্য মানুষ কী প্রচণ্ড ছোটাছুটি রাধরি করে। তোমার বাবাকে জিজ্ঞেস কোরো, বুড়ো বয়সে কমার্শিয়াল ইন্‌স্‌পেক্‌টর হতে তাঁর কী রকম ধকল গেছে। সব মানুষই সুখে থাকার জন্য এসব করছে—আমার অপরাধ কোথায়? তাছাড়া ভেবে দেখ, একসিডেণ্ট করে অন্যায়ভাবে চাকরি না গেলে

আজ আমার ফোরম্যান কিংবা অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ইঞ্জিনীয়ার হওয়ার কথা। চাকরি না গেলে আমি পার্টিতে কিংবা ট্রেড-ইউনিয়নে আসতাম না, ফোরম্যান বা অফিসার হতাম। হলে কি কেউ আমার দোষ দেখত? তা হলে এখন ওয়েলফেয়ার অফিসার হলেই বা তোমরা আমার দোষ দেখবে কেন?

বিভা চা নিয়ে এলেন। তারপর চুপচাপ ঘরের এক কোণে দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণ চোখে আমাদের দিকে তাকিয়ে রইলেন। কালী মিত্র বললেন—বিভা, তুমি অতনুকে কিছু বলো।

বিভা একটুক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ আমাকে জিজ্ঞেস করলেন —আপনি কেন এসেছেন?

বললাম—এমনিই। দেখা করতে।

বিভা মাথা নাড়লেন—না। পার্টি থেকে আপনাকে পাঠিয়েছে।

আমি ইতস্তত করে বললাম—না, ঠিক তা নয়।

বিভা হঠাৎ উত্তপ্ত হয়ে বললেন—আমি জানি। আপনি—আপনি এসেছেন ওকে—

কালী মিত্র হেসে উঠলেন। বিভা ওঁর দিকে চেয়ে ধমক দিলেন —তুমি হেসো না। তারপর আমার দিকে ফিরে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বললেন—আপনি ওকে খুন করতে এসেছেন।

ভীষণ চমকে উঠে বললাম—সে কী?

কালী মিত্র হাসছিলেন। বললেন—ওর ঐ এক ভয়। ও কেবলই ভাবে, দলকে বিট্রে করছি বলে আমাকে খুন করা হবে। এর আগে পার্টি থেকে যারা এসেছে তাদেরও ও এই কথা বলেছে।

কালী মিত্র একটু শ্বাস ছেড়ে বললেন—না বিভা, আমাকে কেউ খুন করবে না। এখন কেউ আর আদর্শের জন্য খুন করার রিস্ক্ নেয় না, স্বদেশী আমলে যেমন নিত। এখনকার রাজনীতি আলাদা। তোমার ভয় নেই, অতনু খুন করতে আসেনি।

বিভা নতমুখ হলেন। মুখ তুলে সজল চোখে বললেন—আমার এক দাদা স্বদেশী করতে করতে সব ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়ে গিয়েছিলেন। স্বদেশীরা তাঁকে সন্দেহ করে খুন করেছিল। সেই থেকে আমার ভয়।

আমার ভিতরটা রাগে, ঘেন্নায় ফেটে যাচ্ছিল। চায়ের কাপ

রেখে আমি উঠে দাঁড়ালাম। বললাম—আমি খুন করতে আসি নি। খুন করার দরকারই বা কী? মানুষটাকে তো মরতেই দেখে গেলাম।

কালী মিত্র হাসছিলেন। অবিরল হাসছিলেন।

বেরিয়ে এসে আমার কাঁধে হাত রাখলেন তিনি। বললেন—অতনু, তোমাকে দু'একটা ইনফর্মেশন দিয়ে রাখি। আমরা সবাই ক্যারিয়ারিস্ট্। একটা বয়সের পর আমরা কেউ খামোখা রাজনীতি করি না। সুপ্রিয় গুপ্ত বড় ট্রেড-ইউনিয়নিস্ট। তাঁর ত্যাগও অনেক। আমি খবর রাখি, তিনি অফিস করেন না বলে মাসের শেষে মাত্র বাইশ তেইশ টাকা মাইনে পান। সার্ভিস রুল অনুযায়ী খুব শীগগিরই তাঁর চাকরি যাবে। তখন কী হবে জানো? একদিকে রেলের কর্মচারীরা চাঁদা তুলে তাঁর হয়ে মামলা লড়বে, অন্যদিকে পার্টি তাঁকে খুব ভাল কনস্টিটুয়েন্সী থেকে পার্লামেন্টারী সীটের জন্য দেবে নমিনেশন। তিনি রিটার্নড্ হবেন। সব ঠিক হয়ে আছে। এম-পি হওয়াটা একটা মস্ত ক্যারিয়ার অতনু, সারা ভারতবর্ষে মাত্র শ'পাঁচেক লোক হতে পারে। সেই তুলনায় একটা সামান্য ওয়েলফেয়ার অফিসারের চাকরি কিছুই না।

বলে তিনি হাসতে লাগলেন।

আমি জ্বলতে লাগলাম।

*

ছ'মাসের মধ্যেই কালী মিত্র ওয়েলফেয়ার অফিসার হয়ে গোরক্ষপুরে চলে গেলেন। বিয়ে করেছেন, তাও শুনলাম। লামডিঙের রেলের ইউনিয়ন বেশ একটা ঘা খেল।

বছরখানেক পর। একদিন মাল জংশনে একটা চা বাগানে

মিটিং করে ফিরছি! স্টেশনে প্রকাশের সঙ্গে দেখা। বিমর্ষ মুখে সে বলল—অতনু, সুপ্রিয়দার চাকরি গেছে।

অবাক হলাম না। কালী মিত্র ঝানু লোক। ঠিক খবর রাখত।

স্টেশনের স্টলে দাঁড়িয়ে দু'জনে চা খাচ্ছিলাম! প্রকাশ বলল—আমরা চাঁদা তুলছি, মামলা করব।

আমি হাসলাম, বললাম—চাকরি গেলেই বা কী! পার্টি তাকে পার্লামেন্টারী সীটে নমিনেশন দেবে।

প্রকাশ অবাক হয়ে বলল—কী করে জানলি?

—এক বছর আগে থেকেই জানি।

প্রকাশ অবিশ্বাসে বলল—যাঃ। মোটে দু'দিন আগে পার্টির মিটিঙে এরকম একটা কথা উঠেছিল। এখনো কথাটা পাকা নয়। এক বছর আগে কেউ জানতই না যে এমন হঠাৎ সুপ্রিয়দার চাকরি যাবে।

আমি বললাম—প্রকাশ, আমরা অনেক কিছুই জানি না। আমাদের জানানো হয় না। কিন্তু পুরো ব্যাপারটাই ছক-বাঁধা হয়ে আছে এক দেড় বছর আগে। কালী মিত্র ঠিক এইটাই আমাকে বলেছিল।

প্রকাশ ঠোঁট উল্টে বলল—কালী মিত্র। ও নিজেই তো আসামের অ্যাসেম্বলীর সীটে নমিনেশন চেয়েছিল। জোচ্চোর লোক, ওকে নমিনেশন দিলে পার্টির বদনাম হবে বলে দেয় নি। সেই জ্বালায় আজে-বাজে বলত।

আমি হেসে বললাম—তোর কথাই হয়তো ঠিক। তবু, সুপ্রিয়দার যে চাকরি যাবে, আর পার্টি তাঁকে পার্লামেণ্টে পাঠানোর চেষ্টা করবে—এটা কালী মিত্র খুব আন্দাজে বলেনি। একটা কিছু আঁচ করেছিল। আমরা যারা ফিল্ড ওয়ার্কার বা সাধারণ ট্রেড-ইউনিয়নিস্ট তারা অনেক কিছুই জানি না, প্রকাশ।

প্রকাশ কথাটা মানতে চাইছিল না। কিন্তু তাকে বিমর্ষ দেখাচ্ছিল।

আমি বললাম—তোরা খামোখা মামলা করছিস কেন! যদি সুপ্রিয়দা পার্লামেণ্টে যায়, তাহলে আর মামলা করে কী

হবে? তোরা জিতলে সুপ্রিয়দা আবার চাকরিতে ফিরে আসবেন?

প্রকাশ মাথা নাড়ে—তা কেন? তাঁর সংগ্রামের ক্ষেত্র অনেক দূর বিস্তৃত হল। আমাদের দাবী-দাওয়া তিনি সরাসরি পার্লামেণ্টে তুলতে পারবেন। তিনি ফিরবেন না, কিন্তু তাঁকে যে অন্যায়-ভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে সেটা আমরা সবাইকে বুঝিয়ে দেবো।

আমি বললাম—খামোখা। সার্ভিস রুল অনুযায়ী তাঁর চাকরি গেছে। লড়ে জিতলেও তিনি ফিরবেন না। তবে কেন গরীব কর্মচারীদের টাকার অপব্যবহার করব!

শুনে প্রকাশ রেগে গেল, বলল—তুই এসব কী বলছিস? *সুপ্রিয়দার জন্য আমরা লড়ব না! তিনি সারাজীবন আমাদের* জন্য লড়েছেন!

আমি কোন উত্তর দিলাম না। কিন্তু বার বার দুশ্চরিত্র, দল-ত্যাগী কালী মিত্রর কথাটা আমার মনে পড়ছিল—একটা বয়সের পর আমরা কেউ আর খামোখা রাজনীতি করি না। আমরা সবাই ক্যারিয়ারিস্ট্। সুপ্রিয়দার ব্যাপারটা এমনিতে দেখতে গেলে খুবই সাধারণ। কোন অন্যায় নেই এর মধ্যে, চুরি নেই, চরিত্রহীনতা নেই। কিন্তু আমার মন কেবলই বলছিল, ব্যাপারটা যেন গোপনে ছক বাঁধা হয়েছিল! তবে কি পার্টি কাউকে কাউকে গোপনে লোভ দেখিয়ে জীইয়ে রাখে! প্রতিশ্রুতি দেয় যে, তোমার চাকরি গেলে তোমাকে এম-পি বা এম-এল-এ বানাবো? যদি তাই হয় তবে আমরা সুপ্রিয়দা বা কালী মিত্রর মত লোককে চিরকাল হারাবো। প্রকাশের চোখে হয়তো কালী মিত্রর অফিসার হওয়া আর সুপ্রিয় গুপ্তর এম-পি হওয়া সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার। কিন্তু আমার কাছে আবছাভাবে দু'টিই এক কার্যকারণসূত্রে বাঁধা বলে মনে হচ্ছিল।

প্রকাশের সঙ্গে আর খুব বেশী কথা হল না। আসাম লিঙ্ক এসে পড়ল। সে চলে গেল আলিপুরদুয়ারের দিকে। আমি রাতের গাড়িতে শিলিগুড়ি রওনা হলাম। আমার ভিতরে ভিতরে কোথায় যেন ছোট্ট পোকার কামড়ের মতো যন্ত্রণা হচ্ছিল। আমার

কেবলই মনে হচ্ছিল, মানুষের জন্য আমরা যেসব সংগ্রাম এতকাল ধরে করেছি—সব বৃথা যাবে। গৃহসুখ, অর্থসুখ, ভবিষ্যৎ—এই সব ভেবে যোদ্ধারা যুদ্ধ শেষ না করেই রণক্ষেত্র ছেড়ে যাচ্ছেন, মানুষের সংগ্রাম পড়ে থাকছে। বিপ্লবের পথ বেঁকে যাচ্ছে গার্হস্থ্যের দিকে। বনের সন্ন্যাসী ফিরে যাচ্ছে বনে।

সেবার সুপ্রিয় গুপ্ত বিহারের একটা বাই-ইলেকশনে জিতে পার্লামেণ্টে গেলেন। প্রকাশের সঙ্গে দেখা হয়। দু'জনে রাত জেগে গল্প করি। কত গল্প হয়। সে তার ট্রেড ইউনিয়নের কথা বলে, আমি বলি ফিল্ডওয়ার্কের কথা। বলতে বলতে কখন অলক্ষ্যে আমাদের কথাবার্তায় একটা বিষণ্নতা আর হতাশার সুর চলে আসে। তার রাজনীতির গুরু সুপ্রিয়দা চলে যাওয়াতে একটু ভেঙ্গে পড়েছিল প্রকাশ। আবার সামলে গেছে। এখন তার দায়িত্ব অনেক। তার পিছনে গোয়েন্দা ঘোরে, গুণ্ডা পিছু নেয়, কর্তৃপক্ষ শত্রুতা দেখায় প্রকাশ্যে! তবু তার গুরুত্ব বেড়েছে অনেক। কিন্তু সেই সঙ্গে বেড়েছে বয়স আর অভিজ্ঞতা। ফলে, আশা করার, স্বপ্ন দেখার ক্ষমতা গেছে কমে।

ক্রমে আমার ভিতরেও আসছে হতাশা। মনে হচ্ছে পৃথিবী জোড়া মানুষের বিপুল সমস্যার ভার আমরা কী করে ঠেলবো! প্রতি বছর বিপ্লবের অর্থ পাল্টে যাচ্ছে, পাল্টাচ্ছে সংগ্রামের স্ট্র্যাটেজি। তবু বছরের ছয়মাস অবসাদে কাটে, বাকী ছয়মাস, বুনো মোষ তাড়িয়ে ফিরি। তখনই মনে হচ্ছিল, যে বিশেষ দলটিতে আমি আছি তাতে থেকে খুব একটা লাভ নেই। এই দল সত্যিকারের বিপ্লব চায় না, চায় সমঝোতা, কিংবা মীমাংসা, কিংবা দাবী-আদায়।

প্রকাশকে বলি—প্রকাশ, ট্রেড ইউনিয়ন করে কিছু হবে না।

—কেন?

ট্রেড ইউনিয়ন কেবল লোকের অসৎ প্রবৃত্তির প্রশ্রয় দিচ্ছে। মানুষের দাবী আদায় করে দেওয়াই কেন আমাদের ট্রেড ইউনিয়নগুলির কাজ হবে? দাবী আদায় বরং মানুষগুলোকে আরো নষ্ট করে দিচ্ছে, ওরা লড়াইয়ের শরিক হচ্ছে না, ইউনিয়ন বলতে ওরা বোঝে ব্যক্তিগত স্বার্থরক্ষার উপায় মাত্র। ওরা খারাপ জায়গায় বদলী হতে চায় না, বা ভাল জায়গায় পোস্টিং চায়, অন্যায় করে

শাস্তি এড়াতে চায়, ব্যক্তিগত প্রতিশোধ চায়—এইসব বিচিত্র চাওয়াকে পূরণ করে গেলে কিন্তু মানুষগুলো কেবলই পিছলে যাবে। ওদের মূল স্বভাব পাল্টাবে না। ওরা কাজ কম করবে, ফাঁকি দেবে, চুরি করবে, নিজেরটা গুছিয়ে নেবে, কখনই বৃহত্তর স্বার্থের লড়াইতে নামবে না। এইসব লোভী, নীচ, স্বার্থপর মানুষদের শুদ্ধ করবে কে?

প্রকাশ গম্ভীরভাবে বলে—অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হলে ওরাও পাল্টাবে।

আমি বলি—দূর। তাহলে অফিসারেরা চুরি করত না, মন্ত্রীরা সৎ হত, ক্যাপিট্যালিস্টরা আয়কর ফাঁকি দিত না। অভাব নষ্ট করলে স্বভাব যায় না। তুইও জানিস।

প্রকাশ ভাবে। কথা বলে না। হয়তো দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতায় সেও বুঝতে পারছিল বাইরে থেকে মানুষের অবস্থা পাল্টে দিয়ে কোন লাভ নেই। মানুষের ভিতরে পচন। সেই পচন নালী ঘায়ের মত সমাজের শরীরে ফুটে উঠছে। আমার মন বলত, দল নয় মানুষ, মানুষই মূল কথা। মানুষের জন্য হাজারবার দল পাল্টানো যায়, হাজারবার দল গড়া যায়। কিন্তু কথাটা যেন মনে থাকে—মানুষের জন্য, মানুষের জন্য, মানুষের জন্য।

এইসব কথা আমি কিছু কিছু প্রকাশ্যেও বলতাম। দলের কাজের প্রকাশ্য প্রতিবাদও করি কয়েকবার। কর্মী হিসেবে আমার নাম ডাক ছিল। ডুয়ার্সকে আমি চিনতাম আমার হাতের নখের মত। আমার অনুগত ছিল দলের সবচেয়ে ভাল কর্মীরা। কাজেই আমার সমালোচনা পার্টি মুখ বুজে সয়ে গেল। আর সাধারণ নির্বাচনে আমাকে বিধানসভায় দিল নমিনেশন।

পুরোনো কায়দা। অবাধ্য কর্মীকে বশে রাখার চেষ্টা। যে কনস্টিটুয়েন্সি আমাকে দেওয়া হল তা ছিল নিশ্চিত হারের জায়গা। আমার প্রতিপক্ষ একজন উপমন্ত্রী। সেই কনস্টিটুয়েন্সিতে কেউ আমাকে তেমন চেনেই না।

তবু লড়াইটা আমি লড়েছিলাম খুব। পার্টি আমাকে যে চ্যালেঞ্জটা ছুঁড়ে দিয়েছিল, সেটা লুফে নিয়ে আমি নির্বাচনে প্রচণ্ড

খাটি। আলিপুরদুয়ার থেকে প্রকাশ এসে আমার পাশে দাঁড়াল। বহু জায়গায় আমাদের সভায় ইটপাটকেল পড়েছিল, ভাড়াটে গুন্ডা করেছিল তাড়া। প্রকাশ আমাকে বলল—পার্টি তোকে এ কী কনস্টিটুয়েন্সি দিয়েছে! এখানে জেতার কোন আশা নেই। তোর মত কর্মীকে অনেক ভাল জায়গা দেওয়া যেত। তুই কেন রিফিউজ করিস নি!

আমি ম্লান হেসে বললাম—প্রকাশ, ছেলেবেলায় তুই আর আমি যখন মারপিট করতাম তখনকার কথা মনে আছে? তখন আমরা লোক বেছে মারপিট করি নি। যার সঙ্গে লাগত লড়ে যেতাম। কত মার খেয়েছি, পিছিয়ে যাই নি। আমি সে লড়াই আজও ভুলিনি।

শুনে প্রকাশ গুম হয়ে রইল অনেকক্ষণ। তারপর দাঁতে দাঁত চেপে বলল—ঠিক আছে। আমিও ভুলি নি। অতনু, আমি চিরকাল তোর রইলাম! আমি আছি, মনে রাখিস।

নির্বাচনে আমি হাজার দু'য়েক ভোটে হেরে গেলাম। কিন্তু খাটুনীর এত ধকল গেল যে নির্বাচনের পরদিনই আমার একশ চার ডিগ্রী জ্বর উঠে গেল। জ্বর আর নামে না। খবর পেয়ে বাবা আর মা এসে আমাকে পাণ্ডুতে নিয়ে যান।

মাসখানেক টাইফয়েডে ভুগে উঠলাম। তখনো ভাল চলতে পারি না। চিন্তাশক্তি যেন কমে গেছে। বারান্দায় মা ইজিচেয়ার পেতে দেন। একটা বই হাতে সারাদিন সেখানে বসে থাকি। সামনে পাঁচ নম্বর ফেরীঘাটে গাদাবোট নোঙর ফেলে দাঁড়ায়, মালগাড়ি লোড হয়। আর তার পিছনে বিপুল গৈরিক জলরাশি নিয়ে ব্রহ্মপুত্র নিরন্তর বয়ে যায়। ওপারে আমিনগাঁওয়ের টিলাগুলো দেখা যায়, দূরে নীলাভ ধূসর পাহাড়। ডাইনে নীল পর্বতে কামাখ্যার মন্দির, নদীর ওপর ওঁ বাবার আশ্রম। নির্জন চারদিকে

সবকিছু সারাদিন স্থির থাকে। শুধু অবিরল নদী চলে। তার নিরন্তর চলা সারাদিন দেখি, তবু দেখা ফুরোয় না। একটা জীবন আমি এরকম অবসর ভোগ করি নি। বসে থেকে থেকে চিন্তারাশি মাথায় মেঘ করে আসে। মনে হয়, রাজনীতি না করলেও পারতাম। মানুষের প্রতি আমার স্বাভাবিক ভালবাসা ছিল—সেটাই ছিল ভাল। মানুষের মুক্তির সংগ্রাম করতে গিয়ে আমি এক সংকীর্ণ অন্ধ রাস্তায় চলে এসেছি। ঐ নদীর মতোই আমি একদিন বহমান ছিলাম, আজ আর নেই। নিজেকে স্থবিরের মত লাগে। নদীর বয়ে যাওয়ার দিকে তাই মুগ্ধ চোখে চেয়ে থাকি। ফেরী স্টীমারের ভোঁ বাজে, ইঞ্জিন শিস্ দেয়, চমকে উঠি—মনে পড়ে—বয়স হল। ঢের বয়স হয়ে গেল। কত মুখ ভীড় করে আসে মনে। অসহায় দুঃখী মুখ সব। একটি মেয়ের কথা মনে পড়ে—বেশ্যা হতে চেয়েছিল। একটি বৌয়ের মুখ মনে পড়ে—লুঠেরাদের তাড়া খেয়ে যে আগুনের ঘর থেকে ছেলে কোলে নিয়ে এক মাইল দৌড়ে গিয়ে দেখেছিল—তার কোলে ছেলের বদলে ছেলের পাশবালিশ। একটা দুঃখী মেয়ে কবে যেন একটা ভাঙা পুতুলের একটি হাত মাত্র কুড়িয়ে পেয়েছিল, তার অন্য খেলনা ছিল না বলে সারাদিন সেই হাতখানা রাখত বুকে করে। এরকম মুখ আসে যায়। মনে হয়, মানুষের বৃহৎ সমাজের বিচিত্র ধারাকে রাজনীতি খুব সামান্যই দিতে পারে। নদীর দিকে চেয়ে থাকি, মনে মনে পথ হাতড়াই। মানুষ দেখে আমার এই বিশ্বাস স্থির হয়েছে যে, মানুষের ভিতরে অনন্ত শক্তির আকর রয়েছে। তাকে গতি দিলে, তাকে শক্তি দিলে সে অনায়াসে নিজের দুই কুলের সীমা উপচে প্লাবিত হতে পারে। মানুষ দুঃসহতম ক্লেশ অক্লেশে করতে পারে বহন। রাজনীতি সেই শক্তিকে উপেক্ষা করে কেবলই তার জন্য দাবী-আদায় করার চেষ্টা করছে, খুশি রাখার চেষ্টা করছে তাকে। মরে যাচ্ছে তার ভিতরকার শক্তি। সে আর্ত হয়ে পড়ে থাকছে চিরকাল, অথচ তার ভিতরে ছিল মানুষকে ত্রাণ করার অমোঘ ক্ষমতা।

ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ি। ঘুম ভাঙলে আবার চেয়ে থাকি। আবার ঘুমোই। সারাটা দিন কেটে যায়। ধর্ম-বিষয়ে লেনিনের গ্রন্থখানা অপঠিত থেকে যায়, কিংবা কোনদিন আমার কোলের

ওপর খোলা মানবেন্দ্রনাথ রায়ের বইখানার পাতাগুলি হাওয়ায় উল্টে যায় কেবল। বই ভাল লাগে না। বরং ইচ্ছে করে তীর্থযাত্রীর মত বেরিয়ে পড়ি মানুষের মেলায়। সে মেলায় বড় ধুম। সে মেলায় একশো মজা।

সামনের রাস্তাটা দিয়ে একটা মেয়ে মাঝে মাঝে হেঁটে যায়। বড় কমনীয় তার মুখশ্রী। গায়ের রং শ্যামলা। ছিপছিপে শরীর। সদ্য কৈশোর পার হয়ে সে শাড়ি ধরেছে। যেতে যেতে কখনো বা একপলক আমাকে দেখে যায়। রোগা এক পুরুষ সারাদিন শুয়ে শুয়ে কী করে—তাই দেখে বোধহয়। তার চোখে সরল কৌতূহল লক্ষ্য করি। মাঝে মাঝে সে তার ভাইয়ের সঙ্গে যায়, মাঝে মাঝে একা একা। তাকে রোজ লক্ষ্য করি। ক্রমে লক্ষ্য করতে ভাল লাগে। আমার দীর্ঘ অবসর সহজে কাটতে চায় না। মাথা অলস লাগে। সেই আলস্যের ফাঁকে ফাঁকে মেয়েটি ক্রমে আমার শূন্য মাথায় বাসা নেয়। বড় সুন্দর তো মেয়েটা!

অল্প অল্প করে হাঁটাহাঁটি শুরু করি। প্রথমে বাগানের গেট পর্যন্ত। কিছুদিন সামনের রাস্তায়। এ অঞ্চলটা খুব নির্জন। কয়েকটা বাংলো বাড়ীর পরই নদীর ঢাল, শান্টিং লাইন। হাঁটিতে হাঁটিতে পাড়ার শেষ সীমা পর্যন্ত চলে যাই। দেখি, শেষ বাড়ীটার লনে বিকেলবেলা নেট টাঙিয়ে ব্যাড্‌মিণ্টন খেলছে কারা। খেলা দেখতে এগিয়ে গিয়ে বাগানের বেড়া ঘেঁষে দাঁড়াই। দেখি, সেই মেয়েটা, তার ভাই, আরো দু'টি ঐ বয়সের মেয়ে নিতান্ত অপটু হাতে খেলছে। আমাকে দেখে তারা লজ্জা পায়। র‍্যাকেট হাতে দাঁড়িয়ে থাকে। আমি সরে আসি! অন্যমনে হাঁটতে হাঁটতে নদীর ধার পর্যন্ত চলে যাই। জলে পা দিয়ে দাঁড়াই। বড় অন্যমনস্ক লাগে, চিন্তাগুলি এলোমেলো হয়ে যায়। হৃৎপিণ্ডের শব্দ হঠাৎ পাল্টে যাচ্ছে—শুনতে পাই।

মায়ের কেবল এক কথা। বিয়ে কর। আগে কথাটা শুনলে বড় রেগে যেতাম। আজকাল রাগি না। কিন্তু বড় অসহায় লাগে। তাই মাকে ঝেঁঝে উঠে বলি—যাও তো মা, আমাকে একা থাকতে দাও।

মা কাকুতি মিনতি করে। বলে—এখন বয়সের জোরে ঐসব

বালিস। কিন্তু যখন বয়স হবে তখন তোকে দেখবে কে? যে নিজেকে নিয়ে ভাবে না, তার জন্য ভাবনা করার একজন লোক চাই।

আমি চুপ করে থাকি। মা অনর্গল বকে যায়।

এক একদিন মা চুপি চুপি এসে বলে—যদি পার্টির কোনো মেয়েকে তোর পছন্দ তো বল স্বজাত স্বঘর হলে আমার আপত্তি নেই।

বিরক্ত হয়ে বলি—বিয়ে করে আমি খাওয়াবো কী?

অমনি শুনি বাবা ভেতরের ঘর থেকে গম্ভীর গলায় বলেন—যে দেশশুদ্ধ লোকের খাওয়া পরার ভার নিয়েছে তার নিজের বৌকে খাওয়াবার প্রব্লেম থাকা উচিত নয়।

শরীরটা সারলে কিছুদিনের জন্য আবার বেরিয়ে পড়ি। আসাম আর উত্তর বাংলার মাঠ-ঘাট জঙ্গল ভেঙ্গে কিছুদিন পর আবার ফিরে আসি।

এসে দেখি সেই মেয়েটা আমার বোনের বন্ধু হয়ে গেছে। দু'জনে দুপুরবেলা একসাথে উল বোনে, সন্ধ্যেবেলা হারমোনিয়াম বাজিয়ে একে অন্যের কাছ থেকে গান তুলে নেয়। দেখা হলে মেয়েটি হরিণীর মতো ভীতু চোখে আমার দিকে তাকায়। মেয়েটা সম্ভবত শুনেছে, আমি বিধানসভায় দাঁড়িয়ে অল্প ভোটে হেরে গেছি, আমি পার্টির একজন স্তম্ভ, আমি নেতা। আর কিছু না থাক এইসব গ্ল্যামার তো আমার আছেই। মেয়েটি তাই ভয়ে ভয়ে আমার দিকে তাকায়।

আমার চিন্তার রাজ্য খুবই ব্যাপক। সেখানে একটি মেয়ের স্থান কতটুকুই বা! হাজার মুখের ছবির মধ্যে, হাজার সমস্যার চিন্তার মধ্যে তার হারিয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু তবু হারায় না।

পাঁচ নম্বর ফেরীঘাট জায়গাটা বোধহয় ভাল না। এই জায়গা মানুষের মনকে নরম করে ফেলে। চারদিকে আকাশ আর নীলাভ পাহাড়ের মায়া, রেলের মন্থর শান্টিঙের শব্দ, স্টীমারের বিষণ্ণ ভোঁ আর সব কিছুর ভিতর দিয়ে অবিরল জলের শব্দ তুলে ব্রহ্মপুত্রের বয়ে যাওয়া—এইসবের ভিতরে কী যেন রয়েছে। মন এলিয়ে

পড়ে। দু'দণ্ড বিশ্রাম নিতে ইচ্ছে করে। অবসর ভোগ করতে বাসনা জাগে। ভাবতে ভাল লাগে একটি কমনীয় মুখশ্রীকে।

সেবার বাড়িতে আসতে একদিন মা মেয়েটিকে দেখিয়ে বললেন—ঐ মেয়েটা, ওর নাম দুলু। ওকে আমার বড় পছন্দ। স্কুল ফাইন্যাল পাশ করে এবার কলেজে পড়ছে—

না শোনার ভান করেই উঠে যাই। তবু বুকের মধ্যে একটা চমক খিচ্ ব্যথার মতো চেপে ধরে থাকে। আবার পালাই। চা বাগানের শ্রমিক, উত্তর বাংলার চাষীদের নিয়ে মেতে থাকি, মিটিং করি, রাত জেগে বই পড়ি, ডুয়ার্সের মাঠ-জঙ্গল ভেঙ্গে অবিরল ঘুরতে থাকি। রোদে জলে পোড় খেয়ে শরীরটা রুক্ষ কঠিন হয়ে আসে। কিন্তু যখনই একটু অবসর পাই, যখনই কর্মহীন একটু সময় যাপন করি, তখনই পাঁচ নম্বর ফেরীঘাটের মায়াবী প্রকৃতি মনে পড়ে, মনে পড়ে—শান্টিঙের শব্দ, স্টীমারের ভোঁ, নদীর বয়ে চলা। শুনতে পাই, আমার হৃৎপিণ্ডের শব্দ আস্তে আস্তে পাল্টে যাচ্ছে।

এই সময়ে একদিন প্রকাশ এসে আমাকে ধরল—অতনু, মা কিছুতেই ছাড়ছে না। তুই মাকে একটু বুঝিয়ে বল, আমি কিছুতেই এখন বিয়ে করতে পারব না।

আমি বললাম—কেন?

প্রকাশ গম্ভীর হয়ে বলে—বিয়ে করা আমার ঠিক হবে না অতনু। নতুন মা যে আমার সৎমা তা আমি ভুলেই গেছি। অনেক দুঃখ কষ্টের ভিতর দিয়ে, অনেক মারধর খেয়ে আমরা দু'জন—মা আর ছেলে হয়েছি। আমার আর বেশি কিছু চাওয়ার নেই। অন্যের মেয়ে এসেই আমাদের সম্পর্কের ভিতর ফাটলটা খুঁজে বের করবে। সে আমাকে দখল করতে চাইবে মা'র কাছ থেকে। এইভাবে আমার মা আস্তে আস্তে সৎমা হয়ে যাবে। না অতনু, যতদিন মা আছে ততদিন বিয়েতে আমার কাজ নেই।

শুনে ভারী অবাক হলাম। আমি ভেবেছিলাম, প্রকাশ বিয়েতে আপত্তি করবে অন্য কারণে। সে বলবে রাজনীতিই তার প্রতিক্ষণের শ্বাসপ্রশ্বাস, ট্রেড-ইউনিয়ন করে বলে তার উন্নতি বন্ধ, তাছাড়া

হয়তো পার্টির হোলটাইমার হয়ে একদিন বৃহত্তর রাজনীতিতে
ওয়ার চেষ্টা করবে, তাই বাঁধা পড়তে চায় না। তার বদলে
াশ এ কী বলছে! আমার নিজের মাকে, কই এত ভালবাসতে
রিনি তো!

কিন্তু প্রকাশের বিয়ে ঠেকানো গেল না। মাসীমা জেদী বাচ্চা-
য়ের মতো মুখের ভাব করে বললেন—আমি মরে গেলে প্রকাশের
ার কেউ থাকবে না। পরের মেয়ে ওর বৌ হয়ে আসবে বলে ও
য় পায়। কিন্তু একজন পরের মেয়ে যে ওর মা হয়ে এসেছে
ার বেলা?

খুব সাধারণ একটি মেয়ের সঙ্গে প্রকাশের বিয়ে হয়ে গেল।
স বিয়েতে প্রকাশ দানসামগ্রী প্রায় কিছুই নিল না। না ঘড়ি-
াংটি-বোতাম না খাটপালঙ্ক। নিজের খরচে দীনভাবে বৌ-ভাত
ারল। বরকর্তা হয়ে আমি খুব ছোটাছুটি করলাম। নেমন্তন্ন
টতে খুবই রাত হয়ে গেল। তারপর একা আমি সিগারেট
রিয়ে চুপ করে সামনের মাঠটায় গিয়ে বসলাম। অমনি মহাশূন্যের
কটি নিস্তব্ধতার ঘেরাটোপ আমার চারধারে নেমে এল। তখন
ামার ভরা যৌবন। টলটল ছলছল এক নদীর মতো আমার
ন ছাপিয়ে যাচ্ছে বানের জল। বড় একা লাগল। ভূতে-পাওয়া
নুষের মতো বসে বসে শুনতে লাগলাম আমার অবাধ্য হৃৎপিণ্ডের
দ পাল্টে যাচ্ছে।

পাণ্ডুর পাঁচ নম্বর ফেরীঘাটে আমাদের বাসায় যাওয়া হয়নি
ুকাল। মা চিঠি লিখছে বারবার, লোক পাঠাচ্ছে, মাঝে মাঝে
িফন ক্যারিয়ারে চেনা গার্ড সাহেবের সঙ্গে পিঠেপায়েস তৈরী
র পাঠিয়ে দেয়! আমার যাওয়া হয় না। ইচ্ছে করেই যাই না।
কে একটা খিচ্ ধরে মাঝে মাঝে। সব চেপেচুপে দাঁত টিপে
িজেকে সামলাই। কয়েক বছর আগে জলপাইগুড়ি কলেজ থেকে
. এ. পাশ করেছিলাম। তারপর থেকেই ইচ্ছে ছিল, আইন
ড়ব। উত্তর বাংলার কৃষি-আইন নিয়ে বিস্তর মাথা ঘামাতে হয়,
ানতে হয় লেবার রেগুলেশনস্। ইচ্ছে ছিল, কলকাতায় গিয়ে
ব। সেটা হয়ে ওঠেনি। কয়েকটা ভূমি-সংক্রান্ত আইনের
যোগাড় ছিল। সেগুলো দিনরাত পড়তাম, যেন কালই আমার

পরীক্ষা। বস্তুত কিছুই পড়া হত না। একা লাগত। একা একা দম বন্ধ হয়ে আসত মাঝে মাঝে। বার বার ঘর ছেড়ে মাঠে-ঘাটে বেরিয়ে পড়তাম। চিরকাল বাইরের টান আমার। মাঠ-ঘাট-জঙ্গলেই ভাল থাকতাম বেশি।

সেবার শীতকালে একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটে। বীরপাড়ার কাছে এক ধানকলের মাঠে কৃষকদের সভা ছিল। যখন বীরপাড়ায় বাস থেকে নামলাম তখন শীতের বেলা দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে। মাঠ-ঘাট থেকে দ্রুত রোদের চাদর গুটিয়ে নিচ্ছে আকাশ। বীরপাড়া থেকে মাইলখানেক দূরে সেই ধানকল। বাসস্ট্যাণ্ডের দোকানে এক কাপ চা খেয়ে, মেঠো পথে নেমে পড়লাম। চারদিকে ক্ষেত। ক্ষেতে ধানের গোড়া পড়ে আছে, শুকনো খড়ের গন্ধ। রবিশস্যের চাষ দিয়েছে কেউ কেউ। গাঢ় সবুজ হয়ে আছে ক্ষেত। মাঠ থেকে ভাপ উঠে আসছে, কুয়াশা জমছে। নীচু মেঘের মতো ধোঁয়া জমে আছে এখানে সেখানে। চারদিকে অপার্থিব নির্জনতা। একা একা হেঁটে যেতে বড় ভাল লাগছিল। রাঙামাটির রাস্তা। গোরুর খুরের ধুলো তখনো উড়ছে। কিন্তু কী এক কার্যকারণসূত্রে কোথাও কোনো লোক নেই, গোরুবাছুর নেই, রাস্তায় নেই শিশুরা। শুধু মাথার ওপর দিয়ে সাঁই সাঁই পাখিরা উড়ে যাচ্ছে। রাস্তার পাশে গাছে গাছে তীব্র হুলুধ্বনির মতো তাদের শব্দ শোনা যাচ্ছে। চরাচরে কুয়াশার মেঘ, গাছগাছালিতে ঘনায়মান অন্ধকার, আর মাটির গন্ধ, শুকনো খড়ের গন্ধ। দূরে কোথাও পাতা জেবলে আগুন করেছে কেউ—সেই ঝাঁঝালো গন্ধ। অন্যমনে আমি হাঁটছিলাম।

সামনেই একটা ঘন ঝোপ, ঝোপের পাশ দিয়ে রাস্তাটা মোড় নিয়েছে। পড়ন্ত বেলায় সেই ঝোপটা তার দীর্ঘ ও গাঢ় ছায়া ফেলেছে রাস্তার ওপর। কোথাও কিছু ছিল না, হঠাৎ সেই গাঢ় ছায়াময় জায়গাটিতে পা দিতেই ধুলো থেকে ধুলোটে রঙের একটা সাপ পলকে ফণা তুলে দাঁড়াল। এত কাছে যে হয়তো বা তার ছায়া আমার গায়ে পড়েছিল, তার শ্বাস স্পর্শ করেছিল আমার শরীর। দু'টি পুঁতির দানার মতো চোখ আমার ওপর স্থির, তার শরীরে একটা মৃদুমন্দ দোল। আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো দাঁড়িয়ে

রইলাম। আমার শরীরে বর্ম নেই, হাতে নেই অস্ত্র। উদোম আকাশের নীচে, খোলা জায়গায় তার আর আমার মধ্যে একটুমাত্র শূন্যতার ব্যবধান।

ডুয়ার্সের মাঠে-জঙ্গলে সাপ আমি অনেক দেখেছি। কিন্তু এমন মুখোমুখি উদ্যতফণা প্রতিদ্বন্দ্বীর মতো কখনো দেখা হয় নি। তখন আমার চারপাশে ঘনায়মান পড়ন্ত বেলার কুয়াশা, ফসল-কেটে-নেওয়া মাঠ, কুয়াশার মেঘ ঝুলে আছে এখানে ওখানে। এক নির্জনতার ছায়াচ্ছন্ন কোণে সকলের অগোচরে সে আর আমি মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছি। পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে লাভ নেই, পিছু ফেরার উপায় নেই, চোখ সরাতে পারছি না। অপলক চোখে তার দুই চোখে চেয়ে আছি। কেবল চারপাশে পাখিরা চিৎকার করছে, ঝোপে-ঝাড়ে মাঠে তাদের ঝগড়ার শব্দ, আমাদের চারপাশে কেবল পাখির ডানার আওয়াজ। একটু আগেই এই রাস্তা দিয়ে মানুষ হেঁটে গেছে, ফিরেছে গোরুর পাল, রাখাল ফিরেছে, হাঁটুরেরা গেছে দল বেঁধে। তখন সাপটা কোথায় ছিল কে জানে! কে জানে, কী করে আমাদের এরকম দেখা হয়ে গেল। নইলে আমি আর সে—আমরা দু'জন দুই আলাদা পৃথিবীর বাসিন্দা। কোথায় ছিলাম আমি! কত দূরে। ডুয়ার্সের চাষীদের সাথে, আমাদের জঙ্গলে, চা বাগানে। কত মিছিল মিটিং, আন্দোলন, ধর্মঘট শোষণহীন সমাজের স্বপ্ন দেখতে দেখতে জেগে পথ হাঁটা। বহুদূরে বিস্তৃত এক কর্মক্ষেত্র জুড়ে ছিল আমার ছড়িয়ে থাকা। আর সে তখন ঘাস ও তৃণভূমি ছেড়ে জলায়, কখনো ফসলশূন্য ক্ষেত পার হয়ে নাবালে তার সুন্দর পিছল শরীর গুটিয়ে ঘুমিয়েছে গাছের ছায়ায়, ইঁদুরের সন্ধানে সতর্ক চোখে ফসলের ক্ষেতের ভিতরে গর্ত খুঁজে ফিরেছে, লাফ দেওয়া ব্যাঙকে শূন্য থেকে মুখে লুফে নিয়েছে। তার একরকমের জীবন, আমার অন্যরকমের। কোথাও আমাদের দেখা হওয়ার কথা ছিল না। এই তো একটু আগে বাস থেকে নেমে কত নিশ্চিন্তে চা'য়র দোকানে বসে এই শীতে আরামে এক কাপ গরম চা খেয়েছি। তার স্বাদ এখনো জিভ আর ঠোঁটে জড়িয়ে আছে। তখন এই পথে হাটুরেরা হেঁটে গেছে, গেছে রাখাল, চাষী, গ্রামের শিশুরা ফিরেছে দূরের ইস্কুল

থেকে। তখন কোথায় ছিল সে। এই গভীর শীতের শেষ বেলায় সে হয়তো তার গর্তের উষ্ণ আরামে শুয়ে ছিল। তবে কে আনল তাকে এই পথের ওপর। এই ঝোপের ছায়ায়, ধুলোয় সে কেন অপেক্ষা করে ছিল? আমারই জন্য কি?

আমার সমস্ত শরীর কাঁটা দিয়েছে। কপালে ঘাম ফুটছে চিন্‌ চিন্‌। হাত-পা খিল ধরে শক্ত হয়ে আছে। বুঝতে পারি, একটা জীবন মানুষের জন্য আমার সব সংগ্রাম বৃথা গেছে। বৃথা হয়ে গেছে যৌবনের কূলে কূলে পরিপূর্ণ ঢল। বৃথা জন্ম, বৃথা ভালবাসা। হঠাৎ নেমে এল শূন্য মুহূর্ত। মূল্যবান—মহামূল্যবান কয়েকটি ক্ষণ মাত্র আছে আর—তাও বয়ে যাচ্ছে। এত সহজে মানুষ মরে যায়? এমন অগোচরে, অলক্ষ্যে, নিঃশব্দে? প্রতিবাদহীন এ আমার কেমন মৃত্যু হচ্ছে? এই গভীর শীতে কোথা থেকে এল সাপটা! কেনই বা?

মাথা থেকে সমস্ত স্মৃতি মুছে যায়, মুছে যায় স্বপ্ন। ভাষা ভুলে যাই, প্রিয়জনের মুখ মনে পড়ে না। শুধু সবিস্ময়ে দেখি জীবন ও মৃত্যুর মাঝখানে একটুমাত্র শূন্যতার ব্যবধান। আলো আঁধারময় সেই শূন্যতাটুকুই মাত্র আমার জীবন। অতি তুচ্ছ তা, মূল্যহীন। সতেজ সাপটি তার বুকের শাদাটুকু তুলে দাঁড়িয়ে আছে, পথ বন্ধ, সমস্ত সঞ্চিত বিষ সে তুলে আনছে মুখে, শিকড়ের মত তার জিভ লোভী আগ্রহে চেটে নিচ্ছে, শুষে নিচ্ছে তার ও আমার মাঝখানের শূন্যতাটুকুকে। সে দুলছে, সে আসছে।

আমার শরীর হাহাকার করে ওঠে। কত রহস্য অজানা রয়ে গেল পৃথিবীতে, জীবন ও মৃত্যুর অর্থ বোঝা গেল না, পথের মাঝখানেই ফুরিয়ে গেল পথ। কেন জন্মেছিলাম, কেনই বা মরে যাচ্ছি?

সাপটা দুলছে। শূন্যতাটুকু পার হয়ে আসছে সে।

হঠাৎ টের পাই, আমার জিভ নড়ছে, আমার ঠোঁট নড়ছে। চারদিকে শীতার্ত নির্জনতা। তার ভিতরে হঠাৎ শুনতে পাই অন্য মানুষের অচেনা কণ্ঠস্বর। কে যেন বলছে—দয়া করো। দয়া করো। দয়া করো···

আস্তে আস্তে বুঝতে পারি, এ আমারই গলা। আমার দুই

হাত বুকের ওপর জড়ো হয়েছে কখন। জলে ভেসে যাচ্ছে আমার চোখ, গাল বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা খসে যাচ্ছে পথের ধুলোয়। জলে আবছা চোখে অদ্ভুত দেখাচ্ছে চরাচর। আস্তে আস্তে আমি ধুলোয় পথের ওপর হাঁটু ভেঙে বসি। আমার কপালের সমান্তরাল সেই সাপটার সাদা বুক, তার ফণা, তার মিটমিটে চোখ। আস্তে আস্তে সেই ফণার সামনে নত হয়ে যাই আমি। অচেনা মানুষের গলায় বিকারগ্রস্তের মতো বলে যাই—দয়া করো। দয়া করো। দয়া করো——

সাপটা স্থির হয়ে দাঁড়ায় কিছুক্ষণ। তার তীব্র শ্বাসের শব্দ ধীরে ধীরে কমে আসে। শ্লথ হয়ে যায় শরীর। ধীরে ধীরে সে মাথা নীচু করে আনে। আবার ধুলোয় মিশিয়ে দেয় মাথা। শেষ বেলার আলো মরে গেছে। ঝোপের ছায়াটা আরো গাঢ় হয়েছে। সে অবহেলায় আমার দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে তার রহস্যময় আলাদা জীবনের অন্ধকারে চলে যায়।

চারদিকে এক বিপুল মহাপৃথিবীর শূন্যতার মাঝখানে আমি বসে থাকি। পথের ধুলোয়। অনেকক্ষণ আমার কোনো চেতনা থাকে না। তখনো আমি বিড় বিড় করে কেবলই বলছি—দয়া করো। দয়া করো। দয়া করো……

কিছুক্ষণ পরে চাষীদের সেই মিটিঙের কয়েকজন সভা ভেঙে ফেরার পথে আমাকে এই অবস্থায় দেখতে পায়। সাপের কথা শুনে আমার শরীরে তারা দাঁতের দাগ খুঁজল। এক চাষীর বাড়িতে নিয়ে গিয়ে গরম লোহা দিয়ে নুন পুড়িয়ে খাওয়াল। টর্চ জেবলে পেঁৗছে দিল বাসের রাস্তায়। বলল—শীতকালে সাপ বড় একটা দেখি না আমরা। ঐ শালা যে কোথা থেকে এল!

কোথা থেকে এল তা আমিও জানি না। কিন্তু এই ঘটনার পর থেকে আমি ধীরে ধীরে অন্যমনস্ক হয়ে যাই। মাঝে মাঝে অকারণে গা শিরশির করে, খেয়ে উঠে বমি পায়, ঘুমে দুঃস্বপ্ন দেখি। কেবলই মনে হয়, সাপটার কাছ থেকে পাওয়া ভিক্ষালব্ধ আমার এই জীবনটা যেন বা ঠিক আমার নয়। অতনু সেন নামে একজন বীরপাড়ার রাস্তায় সেই সন্ধ্যাবেলায় পথের

ধুলোয় সর্পদষ্ট হয়ে পড়ে আছে। তার পরের এই যে আমি— এই আমি অন্য একটা লোক—ভিক্ষালব্ধ আয়ু পেয়ে বেঁচে আছি। আমি ঠিক অতনু নই।

চিন্তার স্রোত মাঝে মাঝে এলোমেলো হয়ে যায়। একা থাকতে ভয় পাই। রাতে যথার্থ ঘুম হয় না। কেবলই মৃত্যুর কথা ভাবি। এইভাবে আমার মেলাঙ্কলিয়ার সৃষ্টি হয়। মাঝে মাঝে মনে হয়, মানুষের যে স্বার্থের সংগ্রাম চলেছে পৃথিবী জুড়ে, তার বাইরে পড়ে আছে এক রহস্যময় অচেনা জগৎ। তার খোঁজ আমি কখনো করি নি। মৃত্যুর অর্থ আমার অজানা রয়ে গেছে, কেন মানুষের জন্ম—তাও জানি না। ভিক্ষালব্ধ এই যে আমার দ্বিতীয় জীবন—এই জীবনটায় আমি সেইসব রহস্য মোচন করে যাবো।

বহুকাল বাদে পাণ্ডুর পাঁচ নম্বর ফেরীঘাটের বাসায় ফিরে আসি। সেই ব্রহ্মপুত্র বয়ে যাচ্ছে, ডাইনে নীলপর্বত, ওপারে আমিনগাঁওয়ের টিলার সৌন্দর্য, মালগাড়ি শান্টিঙের শব্দ, স্টিমারের ভোঁ। কিন্তু তবু ঠিক আগের মতো লাগে না। মনে হয়, সব অন্যরকম। ব্রহ্মপুত্রের দিকে চেয়ে নিরালা তীরে বসে থাকি। বীরপাড়ার সেই সন্ধ্যার দৃশ্যটি কত অসংখ্যবার ভেবেছি, তবু আবার ভাবি। কোন কার্যকারণসূত্রে সাপটা আমার পথের ওপর অপেক্ষা করে ছিল! কী করে আমার দয়াভিক্ষার ভাষা সে বুঝতে পেরেছিল! সে সময়ে কে আমার মুখে ঐ কথা সঞ্চার করেছিল— দয়া করো!

সমাধান পাওয়া যায় না। অন্যমনে হাঁটতে হাঁটতে ফিরে আসতে থাকি। শেষ বাংলো বাড়িটার লনে আগের মতোই 'নেট' টাঙ্গিয়ে ব্যাডমিন্টন খেলা হচ্ছে। খেলছে কয়েকটা বাচ্চা ছেলেমেয়ে। সেই মেয়েটি নেই। তারা দু'মাস আগে বদলী হয়ে গেছে বদরপুরে। দু'এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে খেলা দেখি। একটা শূন্যতা ভর করে মনের ভিতর। আর হয়তো দেখা হবে না। বাবা এক্সটেনশনে আছেন, সামনের বছর তাঁর রিটায়ারমেণ্ট। কলকাতার বেহালায় জমি কিনে রেখেছেন। রিটায়ার করার পর বাড়ি তুলে চলে যাবেন।

দুপুরে মা ঘুমোতে পারে না। আমার পাশটিতে এসে বসে। বলে—অনু, তুই কী করবি? আমাদের সঙ্গে কলকাতায় যাবি না?

অন্যমনে বলি—দেখি।

মা শ্বাস ছেড়ে বলে—একটা জীবন তোকে কাছেই পেলাম না। আমার কোলছাড়া হয়ে কত দূরে চলে গেছিস! আমার যে একটা বড়সড় ছেলে আছে তা বুঝলামই না।

আমার ছোটো এক বোন, আর দুই ভাই। তাদের সঙ্গে বস্তুত আমার তেমন পরিচয়ই নেই। দাদা বাড়ি এলে তারা কৌতূহলী হয়ে দেখে। কিন্তু বড় একটা কাছে ঘেঁষে না। ভয় পায়, সমীহ করে। আমার দুই দিদির বিয়ে হয়ে গেছে। একজন দিল্লীতে, অন্যজন কলকাতায়। বহুকাল দেখা হয় নি। ছোটো বোনটার বিয়ের চেষ্টা চলছে।

বাবা ডেকে বললেন—অনু, পাত্রটি কেমন বুঝছো! অ্যাসিস্ট্যাণ্ট আই-ও-ডব্লিউ, বেশ স্মার্ট। বাড়ির অবস্থা······

শুনে যাই মাত্র। বাবা বিরক্ত হয়ে বলেন—কোনো বিষয়েই তোমার গা নেই। আমি এখন বুড়ো হয়েছি, বিয়ের খাটাখাটনি কি আমার পোষাবে! তুমি বড় ছেলে, সংসারের দায়িত্ব একটুও নিলে না। তোমার দুই দিদির বিয়েতে একবার উপস্থিতও থাকলে না। এসব কেমন দেখায় পাঁচজনের চোখে!

অপরাধী মুখ করে বসে থাকি।

বাবা বলেন—এই বিয়েটা আর ফাঁকি দিও না। অনুষ্ঠানে অনেক কাজ। এবারটা থেকো।

বললাম—থাকবো।

বিয়ের তিন দিন আগে আমার কলকাতার দিদি এল। সঙ্গে তার প্রফেসর বর। লাজুক, অন্যমনস্ক মানুষটি। মেজদি তার বরের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার সময়ে বলল—এই আমার ভাই, একজন হতে পারত এম-এল-এ। দেশোদ্ধারে ব্যস্ত ছিল বলে আমার বিয়েতে আসে নি।

জামাইবাবু মিষ্টি হাসলেন। বিয়ের সময়ে তিনি ছিলেন স্কুল মাস্টার, বিয়ের পর দিদির তাড়নায় এম-পাশ করে প্রফেসর হয়েছেন।

দিদির সেইজন্য খুব অহঙ্কার, জামাইবাবুরও দেখি দিদির ওপর খুব টান।

আমার দিল্লীর দিদি আসতে পারল না। তবু বেশ কিছু আত্মীয়স্বজন এল। বাড়ি গম্ গম্ করে সবসময়ে। সারাদিন হাসি-ঠাট্টা চলে। আমাকে নিয়ে সবচেয়ে বেশি। মেজদি, মা সবাই ঠাট্টা করে বলে—অঞ্জুর বড় ভাগ্য। একমাত্র ওর বিয়েতেই অনু বাড়িতে আছে।

পারিবারিক আবহাওয়া আমার ঠিক সহ্য হয় না। তবু কী কারণে যেন এই পারিবারিক সম্মেলনটি আমার বড় ভাল লাগছিল। মনে হচ্ছিল, অঞ্জুর বিয়ের পর এবার আমার বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বোধহয় একটু কষ্ট হবে।

বিয়ের আগের দিন। সোনার দোকানে তাগাদা দিয়ে, গৌহাটি পার্টি অফিসে আড্ডা দিয়ে, মালিগাঁওয়ে রেল হেড কোয়ার্টার্সে দু'চার জন দলের লোকের সঙ্গে দেখা করে ফিরতে দুপুর হয়ে গেল। ফিরে অবাক হয়ে দেখলাম, সামনের বারান্দায় পাশাপাশি চেয়ারে অঞ্জু আর দুলু বসে আছে। সামনেই একটা সুটকেস আর বেডিং, তখনো তোলা হয় নি ঘরে। আমাকে দেখে দুলু উঠে দাঁড়াল তটস্থ হয়ে।

এক একটা সময় আসে যখন নিজেকে ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা বৃথা। নির্ভুলভাবে টের পেলাম, আমার হৃৎপিণ্ডের শব্দ পাল্টে যাচ্ছে, বুকে একটা খিচ্ ধরছে হঠাৎ, কান মুখ ঝাঁ ঝাঁ করছে।

সম্ভবত দুলুর এইসব দুর্বলতা নেই। তার বন্ধুর দাদা, আর রাজনীতিতে নামডাকওলা লোকটির প্রতি হয়তো তার সহজাত শ্রদ্ধা ছিল। আমি বারান্দায় উঠতেই সে আমাকে প্রণাম করল। পায়ে সামান্য স্পর্শ। সেই স্পর্শটুকু যেন আমাকে হাজার মাইল আনন্দে দৌড় করাতে পারে।

বন্ধুর বিয়েতে এসে সে চারদিন রইল আমার বাসায়। সেই চারদিন আমি তার কাছে ঘেঁষবার অনেক সুযোগ পেয়েছিলাম। নিই নি। কিন্তু আমার মন কাঁটার মতো ঘুরে ঘুরে একটা সিদ্ধান্তে স্থির হয়েছিল।

প্রায়দিনই মা আর মেজদি আমাকে বিয়ের কথা বলত। বিয়ের

পরের পরদিন বাসা যখন অনেক ফাঁকা, এক দুপুরে আবার সেই কথা উঠল। মেজদিকে আড়ালে ডেকে বললাম—বিয়ে করব। দুলুকে বলু, ও যদি রাজি থাকে—

মেজদি একটা লাফ দিল আনন্দে। চেঁচিয়ে ডাকল—মা!

দৃশ্যটা আমি দেখেছিলাম। পরদিন বৌভাত, বৌভাতের নেমন্তন্ন খেয়ে তার পরের দিন দুলু চলে যাবে। বৌভাতের আগের দিন সন্ধ্যাবেলা একটা লুডো খেলার আসর বসেছিল। মা, দুলু, মেজদি ও আমার এক পিসিমা। আমি বারান্দায় অন্ধকারে বসে আছি। বাইরে ফুটফুটে জ্যোৎস্না। বাগানে ফুলের গাছগুলি ইকড়ি মিকড়ি ছায়া ফেলেছে। লুডোর আসর ভেঙে উঠবার সময়ে মেজদি দুলুর হাত ধরে টেনে বলল—চলো দুলু, বাইরে চাঁদ উঠেছে, একটু বাগান ঘুরে আসি।

ওরা আমাকে দেখতে পায় নি। বারান্দা পার হয়ে ওরা দু'জন বাগানে নেমে গেল। গেট্-এর কাছে দাঁড়াল। হাসি আর কথার শব্দ শোনা যাচ্ছে। তারপর একসময়ে মেজদি বলে—তোমার সঙ্গে কিন্তু একটা সিরিয়াস কথা আছে।

এই কথা বলে মেজদি ঝুঁকে কী একটু গোপনে বলল দুলুর কানে। হঠাৎ দেখি, দুলুর মাথা নুয়ে পড়েছে বুকের ওপর। একটু পরে আবার মুখখানা ধীরে ধীরে তুলল সে। জ্যোৎস্নায় ভাল দেখা যায় না, কিন্তু মনে হল বোধহয় একটু হাসল।

বৌভাতের পর দুলু চলে গেল।

দিন সাতেক বাদে বাবা আমাকে ডেকে বললেন—বাসুবাবু আমাকে একটা চিঠি দিয়েছেন। তাঁর খুব ইচ্ছে তাঁর মেয়ে দুলুর সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ করেন। আমি মত দিয়েছি।

আমি চুপ করে রইলাম।

বাবা বললেন—বাসুবাবুর ধারণা, তোমার ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল, একদিন তুমি দেশের গণ্যমান্য মানুষ হবে। চিঠিতেও সেই কথা লিখেছেন। আর আমাদের সকলেরই দুলুকে পছন্দ।

আমি চুপ।

বাবা আমার মুখের দিকে একটু তাকিয়ে কিছু বুঝবার চেষ্টা করলেন। তারপর বললেন—বিয়ের পর কী করবে ভেবেছো?

আমি মাথা নেড়ে জানালাম—না।

বাবা বললেন—ভাববার অবশ্য কিছু নেই। বিয়ে করতে আজকালকার ছেলেরা যত ভয় পায়, আসলে তত ভয়ংকর নয়। তোমার কথা অবশ্য আলাদা। বিয়ে করা তোমার কাছে কোন সমস্যাই হওয়া উচিত নয়। তুমি রাজি থাকলে যখন যে কোন ফার্মে চাকরি পেতে পারো। এমন কি আমাদের রেলেই তোমার ভাল চাকরি হতে পারে। তুমি একটু রাজি হলেই হয়।

বাবার ধ্যানধারণা খুব সাধারণ মানুষের মতই। সুযোগ মত গুছিয়ে নাও। আর দেরি কেন! পলিটিক্স অনেক করেছো, এই-বার কিছু ঘরে আনো।

বাবা অবশ্য অন্য কথা বললেন। একটু ভেবেচিন্তে বললেন—সামনের বছর আমি রিটায়ার করছি। তুমিও আমাদের সঙ্গেই কলকাতায় চল। তোমার ল' পড়ার ইচ্ছে ছিল, সেটা পড়ে নাও। তোমার পার্টির কাজকর্ম ওখানেও হতে পারবে। তারপর ওখানেই গুছিয়ে বোসো। তুমি কাছে থাকলে আমার একটু বল-ভরসা হয়। তোমার ছোটো ভাই দু'টি এখনো বলতে গেলে নাবালক। একটা জীবন তোমার জন্য দুশ্চিন্তা করে আমরা কাটিয়েছি। এই শেষ বয়সটা তুমি না হয় কাছেই থাকলে।

বললাম—ভেবে দেখি।

মনে মনে কেন যেন বুঝতে পারছিলাম, আমার জীবনে একটা পরিবর্তন আসছে। সেটা ভাল কি মন্দ কে জানে। ডুয়ার্স আমার এত চেনা, এত বেশি জানা, এত প্রিয়—তবু কেন যেন আর এখানে ভাল লাগছিল না। সমস্ত আসাম, উত্তরবাংলা, বিহারের কিছু অংশ, সিকিম, ভুটান, নেপাল জুড়ে আমি ঘুরেছি কম নয়, কাজও করেছি। তবু মনে হচ্ছিল, এখানে থাকলে ক্রমে আমি ঝিমিয়ে পড়ব। নতুন জায়গায় নতুন মানুষদের মধ্যে গেলে বোধহয় আবার নতুন করে প্রাণ পাওয়া যাবে।

ছয় মাস পরে দুলুর সঙ্গে আমার বিয়ে হয়ে গেল।

আমার নিজের বিশ্বাস, রাজনীতিতে আমি ইচ্ছে করে আসি নি। আমার ছিল বাউণ্ডুলের মতো বাইরের টান, আর মানুষ দেখার নেশা। ঐ দুই থেকে আমি রাজনীতিতে চলে এসেছি। প্রত্যক্ষ-ভাবে দলের কাজে আমাকে টেনে নামিয়েছিল প্রকাশ। ফলে আমার স্বাধীন ইচ্ছেয় বাইরের জগতে ঘুরবার সমস্ত ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল, নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল মানুষ দেখার নেশা। ভিতরে ভিতরে তৈরি হয়েছিল ক্ষমতার লোভ।

বিয়ের কিছুদিন পরেই উত্তরবাংলায় দুটো বাই-ইলেকশন হল। তার একটাতে পার্টি আবার নমিনেশন দিল আমাকে। আমি নাওয়া-খাওয়া ভুলে গেলাম। প্রকাশ আগের মত সব কাজ ছেড়ে চলে আসতে পারল না, কিন্তু তবু এল। মিটিং করল, ঘরোয়া সভায় বসল। কলকাতা থেকে দলের প্রাদেশিক সেক্রেটারি এসে ঘুরে গেলেন। যাওয়ার আগে আমাকে ডেকে বললেন—যদি আপার-হাউসে যেতে আপত্তি না থাকে তো বলুম। নেক্সট টাইমে—

আমি মাথা নাড়লাম। না। জেতার স্বাদ আলাদা। আমি জিততে চাই। এ নেশাটা ক্রমে ক্রমে আমার ভিতরে তৈরি হয়েছিল।

আমার প্রতিপক্ষ এবারেও শক্ত। লোকটার বিস্তর দান-ধ্যান আছে। একটা এলাকার উদ্বাস্তুদের জন্য সে করেছেও খুব। প্রতিপক্ষ আরও দুজন ছিল। তারা ভোট ভাঙাতে দাঁড়িয়েছিল। দেখেশুনে এবারও প্রকাশ বলল—অতনু, তুই জিতবি না। পার্টি তোকে হারাতেই দাঁড় করিয়েছে।

—কেন?

—এমনি, মনে হল।

বুকটা দমে গেল খুব। পার্টির ওপরমহলের সঙ্গে আমার মাখামাখি নেই। আমি চিরকাল তাদের মাঠ-ঘাটের কর্মী। কিছুটা অবাধ্য। কিন্তু একটা অংশের ওপর আমার প্রভাব বেশি। তারা আমাকে ঘাঁটাতে সাহস করে না। নমিনেশনও দেয়।

প্রকাশ বলল—অতনু, সময় থাকতে তুই নাম উইথড্র করে নে।

—কেন?

- পার্টিতে তোকে বেইজ্জত করার জন্যই নমিনেশন দিয়েছে।

আমি চুপ করে রইলাম।

প্রকাশ বলল—পর পর দু'বার হেরে গেলে পাবলিক ইমেজ নষ্ট হয়ে যবে। এর পরের বার তোকে নমিনেশন না দিলে কারো কিছু বলার থাকবে না। তোর রাইভ্যাল রাঙাবাবু কত টাকা ঢালছে দ্যাখ। কুলী বস্তিতে হাঁড়িয়ার বান বয়ে যাচ্ছে, রিফিউজী কলোনীতে ইলেকট্রিফিকেশনের জন্য দেড়শো খুঁটির দাম দিচ্ছে রাঙাবাবু। রাস্তা মেরামত হচ্ছে, রাঙাবাবুর তিনটে লরী ফেলছে মাটি আর কাঁকর। আর তুই কেবলই ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা নিয়ে আছিস, মিটিং করে বলছিস আদর্শের কথা। পার্টি টাকা ঢালছে না কিছুই, তোরও টাকা নেই। উত্তর বাংলার মানুষ এখনো বড় গরীব, তারা টাকাটা চেনে।

আমি যে জানি না তা নয়। তবু কেন জানি না, কবে থেকে যেন বুকের ভিতরে আমার অলক্ষ্যে জমে উঠেছে লোভ।

সেই রাত্রে একা একা অনেকক্ষণ বিছানায় জেগে শুয়ে রইলাম। দলছুট যখন ছিলাম তখন আমার অকারণ আনন্দ ছিল, ছিল মানুষের প্রতি পক্ষপাতহীন ভালবাসা। আমি মাঠে-ঘাটে মুক্তির আনন্দে ঘুরে বেড়িয়েছি। তখন আমার প্রতিপক্ষ ছিল না কোন মানুষ, কোন দল, কোন মতবাদ। আমি তখন কত ভাল ছিলাম। ক্রমে রাজনৈতিক শিক্ষা, মতাদর্শ আমার বাহুল্য আবেগগুলো ছেঁটে কেটে ফেলে দিল, হরণ করল আমার নিরপেক্ষ ভালবাসা। তৈরি করল প্রতিপক্ষ, প্রতিদ্বন্দ্বী। মানুষের প্রবহমান ধারাটি আমার চোখে কবে যেন খণ্ডিত হয়ে গেছে।

গভীর রাতে বিছানা ছেড়ে উঠে দরজা খুললাম। বাইরে অন্ধকার। অদূরে চা-বাগানের ভেজা তীব্র মাদকতাময় গন্ধ নাকে

এল। আমার অনেককালের চেনা গন্ধ। গাছগাছালিতে বাতাসের শব্দ। মনে হল, চলে যাই। আর একবার পুরনো অতনু সেন হয়ে চলে যাই মানুষের কাছাকাছি।

আবার ফিরে এসে শুই। বহুদূরে, পাঁচ নম্বর ফেরীঘাটের বাসায় দুলু অপেক্ষা করে আছে। বড় আশা তার স্বামী এম-এল-এ হবে। একদিন হয়তো বা হবে মন্ত্রী, দেশের অন্যতম প্রধান। সেই আশায় সে আজ বিছানার শূন্য অংশটিতে তার হাতখানা বাড়িয়ে রেখেছে। ঐ হাতে সে আমাকে জড়িয়ে রাখে নি। রাখলে ভাল করত।

নির্বাচনের শেষ ক'টা দিন আমি আর তেমন ঘুরলাম না। যেটুকু না হলে নয় সেটুকুমাত্র কাজ করলাম। সেই কবে ছেলেবেলায় ফুটবল মাঠে বাবার আধখাওয়া লেমনেডের বোতল মুখে দিয়ে জীবনের তিক্ত স্বাদ পেয়েছিলাম, টের পেলাম—আবার সেই তিক্তস্বাদে আমার শরীর ভরে গেছে।

ভোট হয়ে গেল। আমি অনেক ভোটে হেরে গেলাম।

আমার বাবা আর শ্বশুরমশাই হতাশ হন। আমার বৌ দুলু একটু গম্ভীর হয়ে যায়।

আমি পার্টির মেম্বারশিপ ছেড়ে দিলাম।

বেহালায় আমাদের বাড়িটা শেষ হয়ে গিয়েছিল। আমরা সেই বাড়িতে চলে গেলাম।

বন্ধুগণ, বিপ্লবের অর্থ প্রতি বছর একবার করে পাল্টায়। তবু নেশা যায় না। কারো কারো রক্তে রাজনীতির নেশা থেকে যায়। পোকার মত কেটে কেটে ক্ষয় করে মানুষটাকে।

উত্তরবাংলার এক চা বাগানের মালিক বিপদ বুঝে আমাকে

খুশি করার চেষ্টায় ছিলেন। কলকাতায় তাঁর অন্য কারবার ছিল। আমি পার্টি ছেড়ে কলকাতায় চলে আসছি শুনে তিনি আমাকে ডেকে তাঁর কলকাতার কারবারে আমাকে লেবার অফিসারের চাকরি দিতে চাইলেন। আমি স্বভাবতঃই সে চাকরি প্রত্যাখান করি।

শুনে বাবা খুব রেগে গেলেন। বললেন—তুমি পার্টি ছেড়েছো, এখন কে তোমাকে মূল্য দেবে? যেটুকু সুযোগ ছিল তা কাজে লাগালে না, তোমার মত এমন বোকা কেউ আছে? পার্টি না ছাড়লে কোনদিন হয়তো বা অ্যাসেম্বলিতে যেতেও পারতে—

আমার বৌ দুলু বাইরে কখনো রাগ দেখায় না। এখনো তার মুখ তেমনই লাবণ্যে ঢল ঢল করে। কৈশোর ছেড়ে সে ক্রমে যৌবনের ভর-ভরাট চেহারা নিয়েছে। তবে তার মুখের হাসি কমে এসেছে। সারাদিন সে ঘরের কাজ করে, কথা বলে কম। ক'দিন আগেও শ্রমিক, চাষী, শিক্ষকদের নিয়ে মিটিং করে, রাত জেগে বই পড়ে, বহু দূরে দূরে সংগঠন করে ফিরেও তার মুখে হাসি আর অভিমান দুই-ই দেখেছি। এখন সে হাসে কম, অভিমান করেই না। নীরবে শরীর দেয়। কলকতায় এসেই সে কলেজে ভর্তি হল। সকাল-বিকেল দুটো অল্প টাকার টিউশনি শুরু করল। সে বুঝতে পেরেছিল অকর্মণ্য লোকের স্ত্রী হয়ে থাকতে গেলে সংসারে তার আদর হবে না। সকলের ইচ্ছের বিরুদ্ধেই সে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করতে লাগল।

আমিও দুটো টিউশনি করি। সকালের ল' কলেজ করি। সারাদিন ইউনিভার্সিটি ক্যান্টিনে ছাত্র ইউনিয়নের ছেলেদের সঙ্গে বসে থাকি। দু'চার দিনের মধ্যেই আমার নাম ছাত্রমহলে ছড়িয়ে পড়ে। ল'কলেজে তখন ছাত্রদের দুটো দল। একটা দলের খুব রবরবা, অন্যটা টিমু টিমু করে চলছে। দুটো দলকে যাচাই করে আমি দ্বিতীয় দলে যোগ দিই। তারপর ভূতের মত খাটতে থাকি ইউনিয়ন ইলেকশনে। রাত জেগে পোস্টারের বয়ান লিখি, বক্তৃতার খসড়া তৈরি করি, দিনে বক্তৃতা দিই, ঘরোয়া সভা করি, অন্য দলের ছাত্র ভাঙাই। এসব কাজ আমার কাছে ছেলেখেলার মত লাগে। তবু সেই ছেলেখেলার মধ্যেও মৌতাত জমতে থাকে। তার ওপর আমার গ্ল্যামার তো ছিলই। আমি

রাজনীতি করা লোক, বিধানসভার নির্বাচনে দু'বার নমিনেশন-পাওয়া। ছাত্র-ছাত্রীরা আমার পিছনে ঘোরে।

ইলেকশনে সেবার দ্বিতীয় দলটা রৈ-রৈ করে জিতল। আমি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জেনারেল সেক্রেটারি হলাম। ফলে ছাত্রদের এই দলের পিছনে যে রাজনৈতিক দলটি ছিল তার সঙ্গে আমার অনায়াসে যোগাযোগ হয়ে গেল। আমি বছর দু'য়েকের মধ্যে মেম্বারশিপ পেয়ে গেলাম।

তারপর আবার নেশা। আইন পাশ করে আমি সম্পূর্ণভাবে পার্টির কাজে নেমে গেলাম। এ দল আমার আগের দলের চাইতে অনেক বড়। প্রায় একটি সর্বভারতীয় দল। আন্তর্জাতিক দলের শরিক। ফলে কর্মীর সংখ্যা অনেক বেশি, ভাল কর্মীর অভাব নেই। এই দলে প্রাধান্য পাওয়া শক্ত। তবু কলকাতা এবং চব্বিশ-পরগণায় ধীরে ধীরে আমার আন্তরিক কাজ স্বীকৃতি পেতে লাগল, প্রায় সারাদিন পার্টি-অফিসে পড়ে থাকি। কল-কারখানায় ট্রেড-ইউনিয়নের সঙ্গে কাজ করি। ছোটো-বড়ো সভায় বক্তৃতা করার সুযোগ জুটে যায়। মাঝে মাঝে খবরের কাগজে নাম বেরোয়। পুলিশের খাতায় নাম ওঠে। রাজভবনের সামনে কর্ডন ভেঙ্গে একবার গ্রেপ্তার হই। আর একবার খাদ্য আন্দোলনে।

বাবার প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের টাকা দ্রুত ফুরিয়ে আসছে। ভাই দু'জনের একজন বি-এ. অন্যজন বি-কম পাশ করে বসে আছে। কিংবা ঠিক বসেও নেই। একজন একটা ক্ষীয়মান পাবলিসিটি ফার্মে কপি লিখে আশি টাকা রোজগার করে, অন্যজন একটা সিনেমা কাগজে বিজ্ঞাপন যোগাড় করে সামান্য কমিশন পায়। দুলু বি-এ পাশ করে বি-টি দিল নিজের চেষ্টায় পাশ করে স্কুলের একটা চাকরির জন্য ছোটাছুটি করতে লাগল। আমাদের তখন দুটো বাচচা হয়েছে। বড়টা মেয়ে, ছোটোটা ছেলে। তাদের ভবিষ্যৎ ভেবে দুলুর চোখে ঘুম নেই। একটা চাকরি তাকে পেতেই হবে। আমার টাকা ছিল না, কিন্তু প্রভাব ছিল বেশ। সেই জোরে বেহালার একটা স্কুলে দুলু চাকরি পেল। রাত জেগে, খেটে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসে এম. এ. দিল। পাশও

করল। সকাল-বিকেল ছাত্রী পড়াতে লাগল। জেদের বশবর্তী হয়ে সে আর একবার এম. এ. দিল অর্থনীতিতে এবং ভাল সেকেণ্ড ক্লাশ পেয়ে গেল। তিন-চার বছরের মধ্যেই সে হল অ্যাসিস্ট্যাণ্ট হেডমিস্ট্রেস। শিখল অঙ্ক, মৌখিক ইংরিজি, সাধারণ বিজ্ঞান এবং অভিজ্ঞতার জোরে বাড়ীর বারান্দায় একটা টিউটোরিয়ালও খুলল। পরের বছর সেই টিউটোরিয়ালের ছাত্রী-সংখ্যা পঞ্চাশ ছাড়িয়ে গেল। প্রতিজন মাথা পিছু কুড়ি টাকা— এই হিসেবে দু'বেলার টিউটোরিয়াল থেকে দুলুর মাসিক আয় দাঁড়াল হাজার টাকা। অবশ্য এর জন্য তাকে খাটতে হত প্রচুর। আমার অবসর থাকলে আমি, বাবা এবং আমার ছোট ভাই দুলুকে সাহায্য করতাম। সেই টিউটোরিয়াল এবং দুলু-ই তখন আমাদের পরিবারে একমাত্র ভরসাস্থল। আমরা সবাই এই দু'টিকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করতাম। আমার দল আর একবার আমাকে নমিনেশন দেওয়ার কথা ভাবছে তখন। দুলু যখন ধীরে ধীরে দুই পায়ে দাঁড়াচ্ছে, দাঁড় করিয়ে রাখছে সংসার, তখন অন্যদিকে আমি ডুবছি। দল বদল করার ফলস্বরূপ শেষ পর্যন্ত আমাকে নমিনেশন দেওয়া হল না। আমি ঝিমিয়ে পড়লাম।

দুলু আর আমি তখন এক ঘরে দুই খাটে শুই। অনেক রাত জেগে দুলু পরীক্ষার খাতা দেখে, শক্ত অঙ্ক কষে, প্রশ্নের উত্তর লিখে রাখে, প্রকাশকদের নির্বন্ধে নোটবই লিখে দেয়। শুয়ে থেকে দেখি টেবিলল্যাম্পের আলো ওর ভারী চশমায় ঝিকিয়ে উঠছে। বড় ভয় করত দুলুকে। কতকাল ওর শরীর ছোঁয়া হয়নি! ও যে আমার বৌ তা প্রায় ভুলে গেছি। দেখতাম, দুলু তখনো শ্রীময়ী আছে, বরং বয়সের সাথে সাথে ওর চরিত্রের দৃঢ়তা, গাম্ভীর্য আর জেদ ওকে আরো সুন্দর করেছে। আত্মপ্রত্যয় মানুষকে সুন্দর করে। অন্যদিকে নিজের মুখখানা কল্পনা করি, মাথায় অল্প টাক, ভাঙা মুখ, অগভীর, চিন্তাকুটিল চোখ। হীনমন্যতার দরুন দুলুর কাছাকাছি যাওয়ার সময় হত না। দুলু কত রাত কেঁদে বালিশ ভিজিয়েছে। আর এখন রাজনৈতিক হতাশায় ক্লান্ত আমি দুলুর দিকে চেয়ে থাকি। আমার ভিতরে এক পুরুষ জেগে ওঠে। কিন্তু বড় ভয় করে দুলুকে। অনেক

রাত পর্যন্ত লেখাপড়া করে ও ওর ছেলে-মেয়ের পাশে শুয়ে পড়ে। একবারও আমার বিছানার দিকে চেয়ে দেখে না। দিনের পর দিন কথা বলে না দুলু, সময় হয় না। আমি চেয়ে দেখি, সেই মধ্যযৌবনে আমার ব্যর্থতায় হতাশ হয়ে সেই যে গাম্ভীর্যের ছাই মেখেছিল দুলু আজও সেই ছাই তাকে সন্ন্যাসিনী করে রেখেছে। বাড়ির সবাই তাকে ভয় পায়। বাচ্চারা তার সামনে কাঠ হয়ে থাকে। ছাত্রীরা টুঁ শব্দ করতে সাহস পায় না। বুঝতে পারি, ব্যক্তিত্বময়ী মধ্যযৌবনা দুলুকে আমিও ভয় পাই।

অভ্যাসবশত আমি তখনো সকালে বেরিয়ে যাই। বিভিন্ন আড্ডায় ঘুরি, পার্টি অফিসে সময় কাটাই, এক বন্ধুর দোকানে বসে থাকি। দুপুরে এসে খেয়ে আবার বেরোই। কখনো-সখনো ঘরোয়া মিটিং কি জনসভা হয়, সেই পুরনো বিপ্লবের কথা বলি— যার অর্থ তখনো আবছা। কাগজে ছোট্ট করে কখনো-সখনো নাম বেরোয়। কিছু ছেলে-ছোকরা তখনো আশে-পাশে ঘুর ঘুর করে। তাদের তালিম দিই, পথসভা করাই, কিন্তু বুঝতে পারি একটা জীবন শেষ হয়ে এল, বিপ্লবের অর্থ বোঝা গেল না। না যাক, ক্ষতি নেই। এবার অন্ততঃ একবার নিজের কাছে ফিরি। বাবার দুঃখ দেখে পৃথিবীর দুঃখমোচন করতে গিয়েছিলাম। সেই দুঃখের পাহাড় আমাকে ঠেলে দিয়েছে এবার। একটা জীবন আমি কম খাটি নি। কিন্তু বয়স এবং হতাশার ভার আছে, আছে গৃহপালিতের মত ব্যক্তিগত দুঃখগুলি। একবার খোলা-মেলা মন নিয়ে নিজের কাছে বসা ভাল। নিজের ক্ষতস্থানের পরিচর্যা আর আমি কবে করব! দুলু আর আমার দিকে ফিরেও চায় না। বাবা-মা এক-আধবার চেয়ে দেখে। ছোট ভাই সমীহ করে বরাবর দূরত্ব রেখে চলে। আমি রাতের ঢেকে-রাখা খাবার একা বসে খাই। সারাদিন চা আর সিগারেটের ফলে শরীরে টক্ টক্ করে অম্বল। খেতে পারি না, অর্ধেকের বেশি ভাত পাতে পড়ে থাকে। কেউ লক্ষ্য করে না। রাতে শুয়ে থেকে দূর থেকে দুলুকে দেখি, শরীরে পুরুষ জেগে ওঠে। নিপুণ সাপুড়ের মত সেই উদ্যত পুরুষকে ঝাঁপিতে ভরে রাখি। তারপর ঘর অন্ধকার হয়ে গেলে মশার শব্দের মত আমার নানা ব্যর্থতার চিন্তা

ঝিন্ ঝিন্ করে সারা মাথায় ঘোরে। এক একদিন পেটে একটা উৎকট ব্যথা হয়, মাঝে মাঝে বমি পায়। মাথা ঘোরে, শরীর দুর্বল লাগে। অভ্যাসবশত কাউকে কিছু বলি না। কিন্তু রাত্রে মাঝে মাঝে উৎকট ব্যথায় ককিয়ে ককিয়ে উঠতাম, তারপর বালিশে মুখ গুঁজে চাপা দিতাম শব্দটা। দুলু টের পেত কিনা জানি না। টের পেলেও উঠে আসত না। আমার সঙ্গে বিবাহিত জীবন যাপন করে স্বভাবতই সে একটু নিষ্ঠুর হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সেজন্যে আমার অভিমান ছিল না। কারণ রাজনৈতিক জীবনের ব্যর্থতার তীব্রতর অভিমান এইসব ছোট-খাটো ভাবপ্রবণতাকে ঠেকিয়ে রাখত। দুলু উঠে আসত না, আমি ব্যথা চেপে শুয়ে থাকতাম। হয়তো দুলুরও ঘুম হত নিঃসাড়ে। সারাদিনে তারও তো খাটা-খাটনি কম ছিল না।

রবিবার রান্নাঘরের ভার নিত দুলু। ঐ তার একটা শখ। ছুটির দিন সে তার পছন্দমত খাবার রান্না করত। কখনো শুঁটকী মাছ, কখনো তেল-কৈ, কি পোস্ত-চচ্চড়ি। জলখাবারও করত সে-ই। সেদিন রান্নাঘরে কেউ বড় একটা যেতে সাহস পেত না। আমি বরাবর দেরিতে উঠি, আমি উঠলে আমাকে আমার চা দেওয়া হয়। কিন্তু রবিবার দুলু তার নিয়মে সংসার চালায়। সকালে চায়ের পাট চুকে যায়। রবিবারে আর চা হয় না। তাই আমাকে লুঙ্গির ওপর শার্ট চাপিয়ে ঝন্টুর দোকানে যেতে হয়।

সবদিন সমান যায় না। একটা রবিবার সকালে উঠে আমার শরীর খুব দুর্বল লাগছিল। সারারাত জেগে থেকে সকালের দিকে ঘুমিয়েছিলাম। সেই শরীরে বাইরে যেতে ইচ্ছে করছিল না আমার। ঘরে বসে এককাপ চা খেতে ইচ্ছে করছিল। দুলুর সঙ্গে বহুদিন হল কথা নেই। সেই সকালে ইচ্ছে হচ্ছিল একটু কথা বলি। রান্নাঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়িয়ে বললাম—এক কাপ চা দেবে?

দুলু তার গম্ভীর মুখ ফিরিয়ে আমাকে একবার দেখল। আমি মুষড়ে পড়লাম। দুলু আস্তে করে বলল—চায়ের দোকানের অভাব নেই। আমি ভাত চাপিয়েছি, নামালে নষ্ট হয়ে যাবে।

চলে এলাম। মাথা ধরেছিল খুব। সকালে চা না পেলে এরকম হয়। জামাটা গায়ে চড়িয়ে বেরোতে যাচ্ছি, দেখি আমার দুটি ছেলেমেয়ে সিঁড়ির কাছে মুড়ির বাটি হাতে বসে আছে। আমার মেয়ে ঝিমলির বয়স বছর সাতেক, ছেলে তিতুর বয়স সাড়ে চার। সংসারে তখনো এ দুটি প্রাণীর কাছে আমার কিছু মূল্য ছিল। খুব সাবধানে, মায়ের চোখের আড়ালে, তারা আমার কাছে আসত। তাদের প্রিয় ছিল তাদের ব্যর্থ বাবা। আমি তাদের কতবার উত্তর বাংলার জঙ্গলে বাঘ দেখার গল্প বলেছি, বলেছি সিকিমের পাহাড়ের গল্প, চা-বাগানের কুলি-কামিনদের গল্প। সেইসব গল্প আর কেউ কখনো শুনতে চায়নি, আমিও কাউকে বলি নি। নইলে উত্তর বাংলার পাহাড়ে-জঙ্গলে যে-সব দিন আমি কাটিয়েছি, তার কিছু বলার মত গল্প ছিল। একবার জীপ উল্টে আমি প্রায় ত্রিশ ফুট নীচে গড়িয়ে যাই, আর একবার ঝড়ে গাছ পড়েছিল আমার মাথার ওপর। আমার এই দুই প্রায়-নিশ্চিত অপঘাতের কথা কখনো কাউকে বলা হয় নি। জিজ্ঞেসও করেনি কেউ। সে-সব গল্প জানে কেবল ঝিমলি আর তিতু। তাদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক প্রায় বন্ধুর। বাচ্চা তিতু আমাকে দেখলেই উঠে দাঁড়িয়ে বাঁ হাতখানা পিছনে নিয়ে গম্ভীরভাবে আমার বক্তৃতা নকল করতে থাকে, বন্ধুগণ, আজ এই সভায়'···ইত্যাদি। ঝিমলি তাকে ধমকায়—'অ্যাই, বাবা গুরুজন না!' আমি তাদের সামলাই। আমাকে নিয়ে কেউ একটু-আধটু ঠাট্টা করলে তখন আমার খারাপ লাগে না। বস্তুত কেউ আমার দিকে করুণ চোখে চেয়ে থাকে, এটা আমি চাই না। তার চেয়ে ঠাট্টা বরং ভাল। কিন্তু মায়ের সামনে তারা আমার দিকে তাকায়ও না। মায়ের বারণ আছে বোধহয়।

সেই রবিবার সকালে হতাশ মন আর ক্লান্ত শরীরে চায়ের দোকানে বেরোবার মুখে দুই শিশুমুখ দেখে থমকে দাঁড়ালাম। সকালের রোদে তারা মুখ তুলে ঝকমকে দাঁত দেখিয়ে নীরবে হাসল। বাবাকে তারা ভালবাসে। তারপর সতর্ক চোখে চার-দিকে দেখে নিল। আমিও হাসলাম। তারপর অবসন্ন শরীরে বসলাম তাদের কাছে। সিঁড়ির শেষ ধাপটায়। তিতু উঠে

দাঁড়াল। হুবহু আমায় নকল করে বলতে লাগল—বন্ধুগণ, আজকের এই সভায়—

চিড়িক করে মাথায় একটা বদ মতলব খেলে গেল।

তিতুকে দু'হাতে জড়িয়ে বুকে টেনে নিয়ে বললাম—বাবা আজ একটা নতুন খেলা খেলবে?

—কী খেলা?

—চল, একটা মিছিল বের করি।

তারা দু'জন দু'জনের দিকে চেয়ে হাসল।

ঝিমলি তার চুলের ঝাপটা সরিয়ে বলল—কিসের মিছিল বাবা?

আমি হাসলাম—ভুখ্খা মিছিল। তোমার মা আমাকে আজও চা দেয়নি।

কয়েকটা পুরনো জুতোর বাক্সের পিচবোর্ড কাটা হল, তাতে লেখা হল স্লোগান—বাবাকে চা দিতে হবে। আমাদের দাবী মানতে হবে। নইলে গদী ছাড়ো। ইত্যাদি। কাঠিতে সেই প্ল্যাকার্ড উচু করে ধরে আমাদের তিনজনের ছোট্ট মিছিল ধ্বনি দিতে দিতে রান্নাঘরেয় দিকে এগোচ্ছিল। মা বেরিয়ে এসে বললেন—এ কী?

তারপর সবাই হেসে খুন।

রান্নাঘরে দুলু তখন গন্‌গনে আঁচের মত লাল হয়ে ভাতের ফেন গালছে। উনুনে চেপেছে মাংসের হাঁড়ি, আওয়াজ শুনে মুখ তুলে অনেকক্ষণ হাঁ করে রইল। আমরা নীরবে তিনজন দরজা জুড়ে দাঁড়ালাম। হাতে প্ল্যাকার্ড। বহুকাল দুলুর সঙ্গে এরকম ঠাট্টা করা হয়নি। তাই ঠাট্টাটা ধরতে দুলুর সময় লাগল।

বুঝে খুব ক্ষীণ একটু হাসল সে। ছেলেমেয়েদের দিকে চেয়ে গম্ভীরভাবে বলল—এসব শিখতে হবে না। বরং কাজ করতে শেখো। নিষ্কর্মারাই মিছিল মিটিং করে।

তারপর একটু ভেবে বলল—আচ্ছা যাও, তোমাদের দাবি আমি মেনে নিলাম।

নিজের ঘরে এসে একা বসলাম। একটু পরেই দুলু নিজেই

চা নিয়ে এল। চা দিয়েই চলে গেল না। একটু দাঁড়িয়ে থাকল। বলল—লিকার পাতলা করেছি।

বললাম—ঠিক আছে।

আবার একটু চুপ করে থেকে বলল—নিজেকে নিয়ে ঠাট্টা করতে তোমার লজ্জা করে না?

—ঠাট্টা কিসের?

—ঠাট্টা নয়! মিছিল তো তোমার প্রাণ। তুমি তো কেবল বোঝ মানুষের মুক্তি-যুদ্ধ মানেই মিছিল করা, বিপ্লবের পথও ঐ মিছিল। তবে সেই মিছিলকে নিয়ে ঠাট্টা কেন?

চুপ করে রইলাম।

চলে যাওয়ার আগে দুলু বলল—ছেলেমেয়েদের ওসব শিখিও না। ওরা যখন বড় হবে, তখনকার সময়ে তোমাদের এই মিছিলের ধাপ্পা আর চলবে না।

বলে, চলে গেল দুলু।

আমি একটুও রাগ করলাম না। মিছিলের ভাবপ্রবণ দিকটা নিয়ে তখন আমিও ভাবি। সারাজীবন মিছিল মিটিং ছাড়া লোক-শিক্ষার জন্য আমরা তো আর তেমন কিছু করি নি। সত্যিকারের কর্মঠ লোকের ন্যায্য দাবি উপেক্ষিত হয় না। দুলু নিজেই তার প্রমাণ আর আমার ব্যর্থতাই প্রমাণ করে যে, আমি ভুল পথে চলেছি এতকাল।

দুলুর ওপর তাই রাগ করার কিছু নেই। বরং দীর্ঘকাল পর দুলুর নিজের হাতে করা চা-টুকু আমি বেশ উপভোগ করছিলাম।

সেদিন যথারীতি দুপুরের খাবার হয় নি। অনেক রাত পর্যন্ত মাংসের ঢেকুর উঠল। পেটের উৎকট ব্যথাটা উঠল চাগিয়ে। বালিশে মুখ চেপে ধরে অস্ফুট আর্তনাদ করছি, হঠাৎ টের পেলাম ওপাশের বিছানা থেকে মশারি তুলে দুলু বেরিয়ে এল। পর-মুহূর্তে চুড়ি আর শাড়ির শব্দ করে, একঝলক মারকোলাইজড ওয়াক্স-এর সুগন্ধ ছড়িয়ে দুলু আমার বিছানায় ঢুকে এল। হাত বাড়িয়ে আমার মাথা ছুঁয়ে বলল—কী হয়েছে?

—কিছু না।

—কিছু না? বলে দুলু আমার চুলের মুঠি আলতো চেপে

ধরে মাথাটা ঘুরিয়ে মুখোমুখি তাকাল। কেউ কারো মুখ দেখতে পাচ্ছি না আবছায়ায়। কিন্তু দুলুর মুখখানা আমার মুখস্থ, যেন দেখতে পাচ্ছিলাম, অভিমানে তার নাকের পাটা ফুলে ফুলে উঠছে, কাঁপছে ঠোঁট, চোখ নিষ্পলক হয়ে আছে। এরকম দেখতে দেখতে আমি ব্যথা ভুলে দু'হাত বাড়িয়ে দিলাম। আমার ভিতরকার পুরুষটি জেগে উঠল। দুলুও বাধা দিল না। কিংবা দিয়েছিল হয়তো, আমি বুঝতে পারি নি।

দীর্ঘকাল পরে আমি দুলুর স্বাদ নিলাম। আমাদের মাঝখানের বাঁধ ভেঙে গেল। পর পর কয়েকদিন দুলু আদর করতে করতেও আমাকে গাল দিত—অপদার্থ বাউণ্ডুলে, ছোটলোক—

কিন্তু সেই গালাগালের মধ্যেও তীব্র আশ্লেষ ছিল। তখন যৌবনের শেষ ঢল ভাঁটিতে নেমে যাচ্ছে। পিছল মাটিতে দাঁড়িয়ে আমরা পরস্পর টাল সামলে নিচ্ছিলাম। দুলু বলত—এটা কীরকম দাবি আদায়?

কয়েকদিন পর দুলু তার স্বাভাবিক গাম্ভীর্য ফিরে পেল আবার। তবে সম্পর্ক তেমন শুকনো রইল না। মাঝে মাঝে আমার দিকে চেয়ে দেখত। কখনো বলত—চুলগুলো বড় হয়েছে, ছেঁটে এসো। কখনো ঝিমলিকে বলত—সন্না দিয়ে তোর বাবার সামনের পাকা চুলগুলো তুলে দে তো। সপ্তাহে এক-দুই দিন অন্ধকার আবছায়ায় আমার বিছানায় আমরা পরস্পর কাছে থেকে দেখতাম!

মাস দুই পর এরকম এক আবছায়ায় আমাদের দেখা হলে দুলু খুব গম্ভীর তেতো গলায় বলল—আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে।

চমকে উঠে বলি—কীরকম?

সে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলল—বোঝ না? সর্বনাশ তো তুমিই করেছ?

আমি বুঝলাম। বললাম—তুমি তো ছেলেমানুষ নও। জেনে-শুনেই যা করার করেছ। এতে সর্বনাশের কী? আর একটা বাচ্চা কি হতে নেই?

দুলু ঝেঁঝে উঠল—না, হতে নেই।

—কেন?

—এই বুড়ো বয়সে লোকে কী বলবে!

—তোমার কি খুব বয়স হয়ে গেছে?

—হয়েছেই তো! আমার সারাদিনে দম ফেলার সময় নেই, দেখছ না? এতসব সামলে এসব ঝামেলা কে পোয়ায়! আমি পারব না।

আমি চুপ করে ওর মেরুদণ্ডের ওপর হাত বুলিয়ে দিলাম।

ও একটু চুপ করে থেকে বলল—তাছাড়া, ছাত্রীদের সামনে বেঢপ পেট নিয়ে ঘোরা—মাগো, সে আমি পারব না। লজ্জায় মরে যাব।

—কেন, মিস্ট্রেসদের বাচ্চা হয় না?

—হোক গে। আমি পারব না। তোমার কী, হওয়ার যে কী কষ্ট তা তুমি কী বুঝবে! আমাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে চল কাল সকালেই। আমি এটা নষ্ট করে ফেলব।

অবাক হলাম না। এরকমটা আশা করেছিলাম। বললাম—ঠিক আছে।

ডাক্তার দেখানো হল। অনেক ওষুধ খেল দুলু। কিন্তু বাচ্চাটার প্রাণশক্তি ছিল বটে। সে-সব ওষুধ হজম করল সে। পাঁচ মাসের মাথায় মাতৃগর্ভে সে প্রথম নড়াচড়াও শুরু করল। আতঙ্কে দুলু এক রাত্রে ছুটে এল আমার বিছানায়—ওগো, ওটা এখনো বেঁচে আছে মরে নি।

—তা হলে, বেঁচে থাকতে দাও।

দুলু রাগ করল—তুমি তো বলবেই! তোমার আর কী?

যথাসময়ে আমার দ্বিতীয় পুত্র জন্মলাভ করে। তার নাম ছোটন। ওষুধপত্রের জন্যেই কিনা জানি না, ছেলেটা খুব রোগা হল, তার মাথায় ছিল জন্মাবধি দীর্ঘস্থায়ী ঘা। বালিশে মাথা রাখলে ব্যথায় কেঁদে কেঁদে উঠত। তাকে নিয়ে দুলুর কষ্টের শেষ ছিল না। সারাদিন সে অবশ্য পিসি আর ঠাকুরমার কাছে থাকত, কেবল রাত্রে থাকত মায়ের কাছে। কিন্তু ঘায়ের ব্যথায় তার ঘুম হত না বলে মাঝে মাঝে জেগে উঠে কাঁদত, সারাদিন খাটুনির পর দুলু ঘুমোতে পারত না। গাল দিত আমাকে। ডেকে তুলে

বলত—তোমার ছেলে তুমি গিয়ে দেখ। আমার না ঘুমোলে চলবে না।

আমার পেটের ব্যথাটা তখন ক্রনিকে দাঁড়িয়ে গেছে। গোপনে ডাক্তার দেখিয়ে ওষুধ খাই। ব্যথাটা কমে যায়। আবার বাড়ে রাত্রে কষ্ট হয় সবচেয়ে বেশি। তবু আমি কষ্ট চেপে দুলুর বিছানায় গিয়ে তার জায়গা নিতাম। দুলু শুতো একা, আমার বিছানায়।

শিশুরা মায়ের গন্ধ চেনে। ছোটন আমার কাছে থাকতে চাইত না। ঝিমলি একটু বড় হয়েছে তখন। মাঝরাতে উঠে সে-ও আমার সঙ্গে ছোটনকে সামলাত।

ছোটন আর একটু বড় হল। যখন তার আড়াই বছর বয়স, তখন দেখা গেল, সবাইকে ছেড়ে সে তার মায়েরই ভক্ত হয়ে উঠেছে। সে পেটে থাকতে মা ছিল তার বড় শত্রু। ছোটন তা জানত। সে তার গম্ভীর এবং কাজের মানুষ মাকেই সবচেয়ে বেশি ভালবাসত। মায়ের মতই সে ছিল গম্ভীর।

ছোটন হওয়ার পর থেকেই দুলু নানারকম অসুখে ভুগছিল। তবু খাটত খুব।

রাজনৈতিক জীবনে আর আমার কিছুই করার ছিল না। চেষ্টা করছিলাম কী করে সব গন্ধ ঝেড়ে ফেলা যায়। একটা ব্যবসার কথা প্রায়ই ভাবতাম। লরীর পারমিটের জন্য ঘোরাঘুরিও করলাম কিছুদিন।

চশমার পাওয়ার পাল্টাতে হল। কষের দুটো দাঁত উপড়ে ফেললাম। বয়স হচ্ছে। কিংবা সঠিক বয়স হওয়া এ নয়। এ হচ্ছে বুড়িয়ে যাওয়া।

কিছুকাল আগে আমার দলটি একটি জাতীয় সংকট উপলক্ষ্য করে দু'ভাগে ভাগ হয়ে যায়। আমার মেম্বারশিপের চাঁদা বাকি

পড়েছিল অনেক। সে চাঁদা আর দিতে ইচ্ছে করছিল না। পুঁথিপত্র ঘেঁটে তখনো বিপ্লবের অর্থ বুঝতে চেষ্টা করি। বোঝা যায় না। মাথা ধরে যায়। চোখে জল চলে আসে।

আমার বন্ধু দীপ্তিনাথ দল ছেড়ে একটা ছোট্ট দলে চলে গিয়েছিল। তার বুদ্ধি ছিল না, কিন্তু খাটত খুব। সে এসে একদিন আমাকে বলে—অতনু, তোমার দল কি তোমাকে নমিনেশন দিচ্ছে এবার ?

আমি মাথা নাড়ি—আমার চাঁদা বাকি পড়েছে। মেম্বারশিপ রিনিউ করা হয়নি।

দীপ্তিনাথ বলে—ঐ দল তোমাকে নমিনেশন দেবে না কোনো দিন। দল ছাড়ো। তোমার মতো এফিসিয়েন্ট ওয়ার্কার পড়ে থাকবে কেন ? ইলেকশনে আমার দল তোমাকে নমিনেশান দেবে। আমরা প্রাণ দিয়ে খাটবো। তোমাকে আমি চিনি—বিধানসভায় তোমাকে পাঠাবোই।

বুকটা কেঁপে ওঠে হঠাৎ। প্রত্যাশা জাগে। তবু ইতস্তত করতে থাকি।

দীপ্তিনাথ হেসে বলে—বয়স হল না অতনু ? আর কবে আমরা অ্যাসেম্বলীতে যাবো ?

আমার বাবা-মা ভাইরা বহুকাল আমার দিকে চেয়ে আছে। কবে আমি এম. এল.-এ বা এম. পি. হই, কবে হয়ে উঠি নেতা, অপেক্ষা করতে করতে তারা ঝিমিয়ে পড়েছে, তারা আমার কাছ থেকে কিছু আশা করতে ভরসা পায় না। তাদের জন্য একবার অন্তত আমার কিছু হয়ে ওঠা দরকার।

কয়েকটা দিন ভেবেচিন্তে আমি দল বদল করলাম। দলটা নতুন, একটা বড় দল ভেঙে কয়েকজন নেতা বেরিয়ে এসে এটা তৈরী করেছেন। উৎসাহী কর্মী আছে। আমাকে তারা সাদরে নিল। খবরের কাগজে আমার দল বদলের খবর বেরোলো। বাবা খবরের কাগজ হাতে সকালেই আমার ঘরে এসে বললেন—আবার দল পাল্টালে ? বরং এবার জীবনটা পাল্টাও, বৌমা মুখে রক্ত তুলে রোজগার করছেন, আমরা খাচ্ছি—ছিঃ ছিঃ—।

নতুন দলটা আমাকে বাই-ইলেকশনে নামিয়ে দিল। কিন্তু

দক্ষিণ-পরগণার প্রত্যন্ত প্রদেশে কেউ আমাকে তেমন চিনত না। উপরন্তু দলত্যাগীর ওপর মানুষের বিশ্বাস নেই। হারলাম।

বাড়িতে একটু হাসাহাসি হল। দুলুর মুখ থম্ থম্ করতে লাগল। পুরোনো দলের কর্মীরা এসে আমাকে ধরল—দাদা, এখন দল ভাঙ্গার সময় না। আমরা বিরাট পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে যাচ্ছি। আপনার মতো কর্মী চলে গেলে আমরা কোথায় দাঁড়াবো? আপনি চলে আসুন। আমরা আপনার মেম্বারশিপ রিনিউ করে দিচ্ছি।

বার বার তিন বার হেরে গেছি আমি। তবু বুঝতে পারি, আমার পাবলিক ইমেজ না থাক, দলে আমার কাজের সুখ্যাতি আছে এখনো। আমায় তারা বলল—দাদা, পোলারাইজেশন হবেই, তখন ঐ সব ছোটো দল হয় ভেসে যাবে, নয়তো বড় দলের সঙ্গে জোট বাঁধবে, ওদের আলাদা এন্‌টিটি থাকবেই না। আপনি কেন পরগাছা দলে পড়ে থাকবেন? আমাদের নেতারা জানেন, আপনি ভুল করেছেন। তাঁরা এখনো আপনাকে চান।

ভাবি। ভাবতে থাকি। বিপ্লবের অর্থ বোঝা গেল না এখনো। অথচ বুঝতেই হবে। দিশেহারা বোধ করি। নির্বাচনে হারলেই দলের মধ্যে প্রভাব একটু কমে যায়ই। নতুন দলেও আমার আদর কমেছিল। তারা জানত, আমি কাজ করার জন্য তাদের দলে আসিনি, এসেছি নমিনেশনের জন্য। তারা আমাকে সঠিক বিশ্বাস করতে পারছিল না।

কিছুদিন পর আবার আমি পুরোনো দলে ফিরলাম। আবার খবরের কাগজে খবর বেরোল। বাবা কেবল বললেন—হুঁ!

সাধারণ নির্বাচন এসে গেল। খুব খাটছিলাম। এবার নমিনেশন পাই নি ঠিকই, তবু নিভে যাওয়ার আগে শেষ জ্বলে ওঠার মতো আমি মন-প্রাণ দিয়ে কাজ করছিলাম। দল ভেঙে দু'ভাগ হয়েছে। পুরোনো সহকর্মীরা এখন প্রতিপক্ষ। কাজেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা সাংঘাতিক। কোন্ দল থাকবে কোন্ দল প্রাধান্য পাবে—এই নিয়ে অস্তিত্বের হাড্ডাহাড্ডি লড়াই। সেই চূড়ান্ত ব্যস্ততার মধ্যেই একদিন কাগজে উত্তর বাংলার প্রার্থীদের নাম বেরিয়েছে দেখলাম। দেখি, উত্তর বাংলায় আমার পুরোনো দল

প্রকাশকে নমিনেশন দিয়েছে। যে জায়গায় আমি দ্বিতীয়বার হেরে যাই সেই জায়গায়। এবারও প্রকাশের প্রতিপক্ষ রাঙাবাবু।

হঠাৎ আবেগে আমার চোখে জল আসছিল। প্রকাশ! সেই প্রকাশ ছেলেবেলায় যে প্রথম আমার সব ভয় হরণ করে লড়াই করতে শিখিয়েছিল। সেই প্রকাশ, যে আমার নির্বাচনে খেটেছিল বুক দিয়ে। বলেছিল, অতনু, আমি তোর আছি। চিরকাল তোর পক্ষে রইলাম।

চোখে জল নিয়েও হাসি আসে। প্রকাশ আমার সারা জীবনের বন্ধু হতে চেয়েছিল একদিন। বলেছিল, আয়, আমরা একটা কিছু পাতাই। ভালবাসার আক্রোশে আর অভিমানে সে ঢিল ছুঁড়ে মেরেছিল আমাদের রেলগাড়ি লক্ষ্য করে। পৃথিবী তার অতনুকে কেড়ে নিচ্ছে কেন? সেই আক্রোশেই সে একদিন সেকেণ্ড হওয়াকেই জীবনের লক্ষ্য বলে ধরে নিয়েছিল।

যাবো! গিয়ে প্রকাশের নির্বাচনী এলাকায় প্রাণ ঢেলে কাজ করে আসবো? প্রকাশ তো আমার জন্য করেছিল! খুশি হবে প্রকাশ। বড় অবাক হবে। যাবো?

কিন্তু বাস্তবিক তা হয় না। প্রকাশ এক দলের, আমি অন্য দলের। আমরা প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিপক্ষ। বহুকাল দেখা হয় না প্রকাশের সঙ্গে, প্রথম প্রথম কিছুদিন চিঠিপত্র চালাচালি হয়েছিল, তারপর কবে বন্ধ হয়ে গেছে। এখন প্রকাশের সঙ্গে দেখা হলে কী করবে?

নির্বাচনের ফল বেরিয়ে গেল। প্রবল উত্তেজনায় দেখি, কাগজে উত্তর বাংলার ফলে রাঙাবাবুকে চার হাজার ভোটে হারিয়ে প্রকাশ জিতেছে।

বিধানসভার অধিবেশন বসল। আমি গেলাম। গ্যালারি থেকে দেখলাম প্রকাশকে। পিছন হেলে বসে আছে। চোখে চশমা, একটু রোগা হয়ে গেছে বুঝি! তবু সেই অকপট মুখ, আন্তরিকতা মাখানো চেয়ে থাকা, রাজ্যপালের ভাষণের ওপর বিতর্ক হচ্ছিল। প্রকাশও বলল। থেমে থেমে ভেবেচিন্তে বলার ভঙ্গি। আগের

মতো আবেগতপ্ত ঝোড়ো বক্তৃতা নয়। যেন দ্বিধা এসে গেছে, সংশয় এসেছে। একটু বলেই বসে পড়ল।

বেরিয়ে এসে লবীতে অপেক্ষা করতে লাগলাম। নতুন এম-এল-এ-রা ঘোরাফেরা করছে, চা-সিঙাড়া কিনে খাচ্ছে। তাদের মধ্যে অনেকেই আমার চেনা। একটু দাঁড়াতেই আমার চারধারে জনাকয় জড়ো হয়ে গেল। তাদের সঙ্গে কথা বলি কিছুক্ষণ। আবার লবীতে ঘুরি, প্রকাশকে খুঁজি।

অনেকক্ষণ বাদে প্রকাশ বেরিয়ে এল। সেই প্রকাশ—গান্ধা, চোর, মারকুটে। এখন দেখা যায়—চিন্তায় ভারাক্রান্ত মুখ, অন্য-মনস্ক চোখ, চোয়ালে ধারাল ভাব। মুখোমুখি হতেই দু'হাত বাড়িয়ে চেঁচিয়ে বলল—এই শালা।

দু' পক্ষের দু'জন। চারদিকে কৌতূহলীদের ভিড় জমে গেল! কী ব্যাপার সবাই জানতে চায়। সেই ভিড় থেকে প্রকাশকে টেনে আনলাম—এখানে না। বাসায় চল।

কাটিহারের সেই ছোট্ট ছেলেটি এত উন্নতি করেছে দেখে বাবা বড় খুশি হলেন। উন্নতিশীল মানুষ দেখলেই তিনি খুশি হন। প্রকাশকে সামনে বসিয়ে সব জেনে নিলেন। বললেন—তোমারও আগে অনু তিনবার নমিনেশন পেয়ে জিততে পারল না। কপাল। এখন তোমরা দেখ, ওর জন্য কিছু করে দিতে পারো কিনা! বুড়ো হতে চলল—কিছুই হল না। আমরা কত আশা করেছিলাম—ও কিছু একটা হবে! এখন দেখ, দুলু রোজগার করে বলে খেয়ে-পরে আছি। তোমরা ওকে একটু দেখ—

আমি মনে মনে হাসি। বাবা বোঝেন না, আমরা বন্ধু হলেও দু'জনে দু'দলের। এখন আমাদের জীবন যার যার নিজস্ব ব্যক্তিগত জীবন। রাজনীতি ক্ষেত্রে আমরা আর একে অন্যের জন্য কিছু করতে পারি না।

কথায় কথায় প্রকাশ বলল—চাকরিটা ছাড়তে হয়েছে। রেলের কোয়ার্টার এখনো ছাড়ি নি কিন্তু শীগগিরই ছাড়তে হবে। মাকে নিয়ে যে কোথায় উঠবো ভেবে পাই না। মাঝে মাঝে মনে হয়, নমিনেশন না নিলেই ভাল হত। বাঁধা চাকরিটাই ভাল ছিল। এখন এই এম-এল-এ হয়ে থাকাটা বড় অনিশ্চয়ের কাজ। বড়

য় করে রে। এই বয়সে নতুন কিছু করতে ভরসা পাই
া।

জিজ্ঞেস করি—প্রকাশ, তুই কী করে জিতলি ? রাঙাবাবু এবার
কা ঢালে নি ?

প্রকাশ হাসল, বলল—ঢেলেছিল। কিন্তু সব মানুষেরই ওঠা-
ড়া আছে। রাঙাবাবু পড়তির দিকে এখন। তা ছাড়া,
নুষের রাজনৈতিক চেতনার চোখ খুলছে। অতনু, এই কাজ
ই-ই করে এসেছিস। তুই কী করেছিস তা তোর জানা নেই।
মি চষার শক্ত কাজটা তোরই করা। লোকে তোকে ভোট দেয় নি
কই, কিন্তু তোর তারিফ করেছে বারবার। এখনো পার্টিতে
োর কথা হয়। আমরা তোর কথা বলি। লোকেও বলে।
াগজে তোর দল ছাড়ার খবর পেয়ে সবাই দুঃখ করে।

চোখ ঝাপ্সা হয়ে আসে। উত্তর বাংলার মাঠ-ঘাট-জঙ্গলের
ব ফুটে ওঠে। অজস্র মানুষের মুখ ভেসে যায় চোখের ওপর দিয়ে।

প্রকাশ একটু ভেবে বলে—কেউ কেউ আছে বাউল-বৈরাগীর
ত, দলে তারা বেমানান। তোকে দেখে আমার মনে হয় তোর
ব কাজ বৃথা যায় নি—তুই যতটা ভাবিস ততটা নয়, দলীয়
জনীতি আলাদা ব্যাপার—সেটা তোর হয় নি বলে আমার দুঃখ
াই। তুই মানুষের জন্য অনেক করেছিস।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ করে থাকি। প্রকাশের সব কথা বিশ্বাস
য় না। তবু বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয়।

প্রকাশ বলে—অতনু, মানুষ তোকে ভোলে নি। বিশ্বাস কর,
ভোলেনি। তুই দেখিস।

বিধানসভার প্রথম সেসন শেষ হলে প্রকাশ উত্তর বাংলায় ফিরে
েল। পরের সেসন এল আবার। দেখা হল। কত কথা হয়
'জনে। কথায় কথায় রাজনীতির কথা এসে পড়ে। তর্ক হয়।
লীয় আদর্শের তফাৎ নিয়ে ঝগড়া করি দু'জনে। এক এক সময়ে
কাশ আমার দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে থেকে মিটিমিটি হাসে, বলে—
তনু, আমার বিশ্বাসই হয় না যে তোর ব্রেনওয়াশ হয়েছে।
োর তা হতে পারে না। আমার মনে হয় তুই কোনোদিনই কোনো
লকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসিস নি।

আমি চুপ করে থাকি। ভাবি। হয়তো প্রকাশ ঠিকই বলছে। কিন্তু আমি কিছু ভেবে পাই না।

প্রকাশ আবার বলে—কোন কোন মানুষ আছে, মানুষের ভাল করতে গিয়ে পলিটিক্স করে, কেউ কেউ বা সাধু-সন্ন্যাসী-সন্ত হয়। তুই দ্বিতীয় দলের। আমরা জোর করে তোকে পলিটিশিয়ান বানিয়েছি।

হেসে উঠি।

আবার প্রকাশ চলে যায়। আবার আসে। বিধানসভায় কতগুলো বিল-প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তার বক্তৃতা বেশ সুখ্যাতি পেল। একটু নাম করল প্রকাশ।

পরিষ্কার টের পাচ্ছিলাম, দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়া পাল্টে যাচ্ছে। দীর্ঘকাল ধরে ক্ষমতাসীন দল চাল মাৎ হয়ে বসে আছে। নতুন কিছু করার নেই। পুরোনো আদ্যিকালের কাঠামো রয়ে গেছে সমাজের চেহারায়। সেই ঘুণধরা কাঠামোর ওপরে মাটি চাপিয়ে প্রতিমা গড়ার চেস্টা। বার বার ভেঙে যাচ্ছে মূর্তি। কারিগর বুঝতে পারছে না কী করতে হবে।

মিহির নামে একটা ছেলেকে চিনতাম। বাঁকুড়ার গ্রামে তার বাড়ি, কলকাতায় থেকে চাকরি করত। মিহিরের বড় ইচ্ছে ছিল, তার গাঁয়ে একটা পোস্ট-অফিস হয়। সে সেইজন্যই অনেক ঘোরা-ঘুরি করেছে। বহু দরখাস্ত পাঠিয়েছে পি-এম-জি-র কাছে। সেই-সব দরখাস্ত যাতে গুরুত্ব পায় সেইজন্য সে যথাবিহিত নামের পাশে এম-এ কথাটা উল্লেখ করে দিত। কখনো বা গ্রাম থেকে গণ-দরখাস্ত পাঠাত। পত্রিকায় অন্তত তার 'পোস্ট-অফিস চাই' শিরোনামায় চারটে চিঠি বেরিয়েছিল। কিছুই হয় নি। তখন সে এক অদ্ভুত পন্থা নেয়। গাদা গাদা খাম পোস্টকার্ড কিনে সে তার গ্রামের বিভিন্ন লোকের নামে চিঠি দিতে শুরু করে। তার বিশ্বাস ছিল, যদি তার গ্রামে বহুসংখ্যক চিঠি যেতে শুরু করে তবে সরকার বাধ্য হয়ে পোস্ট-অফিস খুলবে সেখানে। এত চিঠি একা লেখা সম্ভব ছিল না বলে সে চেনা জানা যাকে পেত তাকেই একখানা ঠিকানা লেখা পোস্ট কার্ড দিয়ে বলত—কয়েক লাইন লিখে দাও। যা খুশি।

—সে কী! অচেনা লোককে কী লেখা যায়?

—অন্তত একটু শুভেচ্ছা জানিয়ে দাও। চিঠি যার কাছে যাবে সেও জানে—এ চিঠি নয়, এ আসলে হচ্ছে লড়াই। যেমন করেই হোক পোস্ট-অফিস আমাদের চাই।

মিহিরের গ্রামে ওরকম চিঠি আমিও পাঠিয়েছি।

বেশ কয়েকমাস গাঁটের কড়ি খরচ করে চিঠি লিখেও যখন পোস্ট-অফিস হল না তখন সে ভারী মুষড়ে পড়ে। তার গ্রাম থেকে একজন বুড়ো-সুড়ো মোড়ল গোছের লোক প্রায়ই মিহিরের কাছে আসতেন। তাঁর সঙ্গে গভীর পরামর্শ করত সে। কলকাতায় মিহির আমাদের দলের হয়ে খাটত। কিন্তু গাঁয়ে গিয়ে সে ক্যাম্পেন করত সরকারের পক্ষে। আমার কাছে স্বীকার করত সব, বলত—দাদা, এখনো গাঁয়ের মেইন রাস্তাটা পাকা হয়নি। তিনটে টিউবয়েল বসানোর কথা চলছে, ইলেক্‌ট্রিক আসার কথা, আর ঐ পোস্ট-অফিসটা···বিরাট একটা ফিরিস্তি দিয়ে যেত সে। তারপর বলত—এগুলো আগে আগে আমরা গুছিয়ে নিই, তারপর দেখবেন রাজনীতি পাল্টে যাবে।

আমি তার কাণ্ড দেখে খুব হাসতাম।

অবশেষে একদিন মিহির সেই বুড়ো মানুষ ভদ্রলোককে নিয়ে আমার কাছে এসে বলে—দাদা, হল না। অনেক করে দেখলাম। এবার আমরা উল্টো পার্টির লোক দাঁড় করাবো। আপনি চলুন আমাদের গাঁয়ে, মিটিং করবেন।

এই কথা শুনে হঠাৎ আমার চোখের সামনে একটা পর্দা সরে যায়। রাজনীতির চেহারাটা প্রকট হয়ে ওঠে। সাধারণ মানুষেরা ডিপ্লোম্যাট হয়ে যাচ্ছে! চালছে উল্টো কূটনৈতিক চাল! ভারতের রাজনৈতিক কাঠামোতে মানুষের স্বার্থই কি একটা পরিবর্তন আনবে!

মিহিরের গ্রামে গিয়ে আমি মিটিং করলাম। পরে নির্বাচনের সময়টা ধীরে ধীরে এসে গেল।

সেই নির্বাচনে সরকার পাল্টাল। স্টেট্‌স্‌ম্যান লিখল—এ ভোট অব অ্যাংগার। ঠিক কথা। এ হচ্ছে রাগের ভোট। মিহিরের গাঁয়ের লোকেরা বড় আশায় ছিল। পাকা রাস্তা, টিউবয়েল, বিজলী

বাতি, একটা পোস্ট-অফিস—কিছুই হয় নি। মিহির কলকাতায় একটা দল করত আন্তরিকভাবে, গাঁয়ের স্বার্থে সেখানে গিয়ে করত অন্য দল। এই ছোট্ট বাঁকুড়ার গ্রামখানিই বাংলাদেশের ছবি, ভারতবর্ষের চেহারা। রাগের ভোট! ঠিকই তো! আমিও জানি, বাংলাদেশে বামপন্থীরা কিছু গঠনমূলক কাজ করে নি

ব্যক্তিগতভাবে কেউ কেউ করেছে মাত্র। তাতে কিছু যায় আসে না। পার্টি পার্টির কাজ করে গেছে। তাতে জনগণের আস্থা বাড়ে নি। বিশ্বাস আসে নি। তবু তারা যে দান উলে দিল তার কারণ তাদের সরকারের উপর রাগ। সেই নেতিবাচক ভোট পেয়ে বাম দলগুলি লাফাতে থাকে। কলকাতায় সেই সন্ধ্যা বেলা বাসে ট্রামে টিকিট কাটে নি কেউ, কন্ডাক্টর পয়সা চায় নি। অনেক রাত পর্যন্ত ঘুরে ঘুরে আমি শহর দেখলাম কিন্তু কেমন যেন নিস্পৃহতা এসে গেছে আমার। আমি আর সেরকম আনন্দ পাই না।

প্রকাশ আবার জিতে এল। জড়িয়ে ধরল। তার দল আর আমার দল এবার মিলেমিশে সরকার তৈরি করছে। খুশি হয়ে বলল—অতনু, যদি সত্যিই আমরা এরকম মিলতে পারি, যদি মিশে যাই, তা হলে কী ভীষণ কাণ্ড হবে!

তেমন উৎসাহ বোধ করি না। কেমন যেন লাগে! প্রকাশ যে বলেছিল—তুই দলের জন্য নয়—সেই কথাটা মনে পড়ে। কেবলই মনে হয়, গণ্ডী ভেঙে বেরোনো দরকার। খুঁজে দেখা দরকার সব দলকে গ্রাস করে নেওয়ার মতো কোনো আদর্শ কোথাও জন্ম নিয়েছে কিনা। মানুষ পাল্টাল না, কেবল রাজনীতি পাল্টে গেল —এ কেমন কথা?

প্রকাশ বড় আশাবাদী। তর্ক করে। ঝগড়া হয়। বলে— মানুষ পাল্টাচ্ছে অতনু।

আমি উত্তর দিই—কে তাদের পাল্টাল? কবে? হাজারটা দল হাজার রকমের কথা বলছে, করছে নীতির লড়াই, আমাদের বক্তৃতার অধিকাংশ জুড়ে থাকে এর ওর তার নিন্দে, গালাগাল, অভিশাপ। আমাদের মিছিলের স্লোগানে থাকে আক্রোশ। মানুষকে আমরা ঐসব শেখাচ্ছি। তার মুখে বসিয়ে দিচ্ছি দলের

কথা, চিন্তায় ঢুকিয়ে দিচ্ছি দলের স্বার্থ। আমরা মানুষকে শেখাচ্ছি দাবি আদায় করতে—এর বেশি কিছু না। প্রকাশ, এ ভাবে মানুষ পাল্টায় না। মানুষের ভিতরে কবে আমরা সততা, দয়া, কর্মনিষ্ঠা জাগাবার চেষ্টা করেছি? ক'জন মানুষকে শিখিয়েছি আলস্য ত্যাগ করতে? ক'জনকে মদ ছাড়িয়েছি, সচ্চরিত্র করেছি ক'জনকে? যখন রিফিউজি কলোনীতে ভলান্টিয়ার হয়ে প্রাণপণে খাটতাম, ঘরের চালডাল পয়সা কাপড় এনে দিতাম, তখন থেকেই রাজনীতির লোকেরা এসে রিফিউজিদের স্বার্থচেতন করত, বলত সরকারী সাহায্য দালালরা মেরে দিচ্ছে, তোমরা পাচ্ছো না···ইত্যাদি। রিফিউজিরা ক্ষেপে গিয়ে আমাদের মারতে আসত। অথচ ঐ রিফিউজি ক্যাম্প থেকে কয়েকটা মেয়ে বেশ্যা হয়ে যায়—তাদের কেউ ঠেকাতে পারে নি। কত ছেলে চোর, পকেটমার হয়ে গেল, কত মানুষ দুঃখ ভুলতে ঘটিবাটি বেচে মদ্যপ হল—কেউ তখন তাদের সচেতন করে নি। মানুষের চরিত্র যখন অন্ধকারের দিকে বেঁকে যায় তখন কে আমাদের মধ্যে গিয়ে তার পথ আটকে দাঁড়িয়েছি। প্রকাশ, মানুষের ভাত-কাপড়ের অভাব আমি মানি—তার জন্য লড়াই আমিও করি। কিন্তু আমার মনে হয়, আমাদের সবচেয়ে বড় লড়াইটা ছিল মানুষের ধর্মের চেয়ে বেশি কিছু দেওয়ার নেই। ধর্ম আর চরিত্র পেলে মানুষ আপনি দাঁড়ায়। এত হাঁকডাকের দরকার হয় না। মানুষ আমাদের আদর্শকে বিশ্বাস করে এবার ভোট দেয় নি, দিয়েছে রাগের ভোট—ক্ষমতাসীন দলকে তারা অবিশ্বাস করে। আমরা সেই অবিশ্বাসের ভোট পেয়েছি।

প্রকাশ হাসে। গুরুত্ব দেয় না।

আমি তবু বলি—দ্যাখ, সে-বার দেশ স্বাধীন হওয়ার বছরে মানুষের কী ভীষণ উৎসাহ দেখা গিয়েছিল। একদিন রেলের কম্পার্টমেন্টে উঠে এক চেকার প্রথমেই হাতজোড় করে বলল—ভাইরা, দিন পাল্টে গেছে। আমি টিকিট চাইবার আগে বলে নিই—যারা টিকিট কাটেন নি, তাঁরা জরিমানা দেবেন, এবং প্রতিজ্ঞা করবেন যে, আর বিনা টিকিটে কখনো যাবেন না। আমিও প্রতিজ্ঞা করছি, আর ঘুষ নেবো না। শুনে আমরা ভীষণ অভিভূত হয়ে পড়লাম। কোন চেকারের মুখে এমন কথা কেউ কখনো শোনে নি।

কামরার অনেকের টিকিট ছিল না, তারা কেউ কেউ জরিমানা দিল
প্রতিজ্ঞাও করল অনেকে। দু' একজন আবেগে চোখের জল ফেলল
সেই চেকার ভদ্রলোক কাঁদছিলেন। জনে জনে হাতজোড় ক
বলছিলেন—ভাইসব, আমি অনেক ঘুষ নিয়েছি। মহাপাপ করেছি
কিন্তু আর না। আপনারা আমাকে আশীর্বাদ করবেন। শু
সকলে মূক হয়ে গেল। কেউ কেউ বিড় বিড় করে আশীর্বা
করল। এক বুড়ো তাঁকে বুকে চেপে ধরে আর ছাড়তেই চান ন
কেবল বলছেন—তুই আমার পোলা। তুই আমার সোনা
গোপাল—। সেই কামরাটায় কয়েক মুহূর্তের জন্য সে এক স্বর্গী
আবহাওয়া। আমার বুক ঠেলে উদ্বেল আবেগ উঠে আসছিল
সেই চেকার ভদ্রলোককে কী যে মহান মনে হয়েছিল! ভেবেছিলা
এই হচ্ছে ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষের জনগণের প্রতীক। সেই কামরা
যেন ভারতবর্ষেরই একটা ছোট্ট ছবি।

প্রকাশ চুপ করে ভাবে।

আমি বলি সেইদিনও আমার মনে হয়েছিল, জনগণ পা
যাচ্ছে। সুদিন এল বুঝি। কিন্তু মানুষের আবেগ—তাকে বিশ্বা
নেই। আবেগ দু দণ্ড থাকে অতিথির মতো। তারপর চলে যায়
আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়ি। একবছরের মধ্যেই সেই চেকারকে আ
নিজের চোখে ঘুষ নিতে দেখেছি। মানুষ সহজে পাল্টায়
প্রকাশ, তাকে পাল্টানোর জন্য দীর্ঘ সংগ্রাম পড়ে আছে। কে
সেই লড়াই লড়ছে না। কেবল দাবি আদায় করে দিয়ে সন্তু
রাখছে তাকে, তপ্ত করে তুলছে স্বার্থের লড়াইতে, জোরদার কর
দলের শক্তি। মানুষ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে যাচ্ছে কেবল
তাদের ঘরের দরজায়-জানালায় কেবল চোর-গুণ্ডার উঁকিঝুঁকি
আড়কাঠিদের ছায়া, তার বিপদের রাস্তায় পুলিশের বাড়ানো হা
চারিদিকে লুট অরাজকতা, তার বেঁচে থাকা মানেই আত্মরক্ষা
ট্রেনের কামরায় দেখা সেই দৃশ্যটা স্বপ্নের মত মনে হয়।

ত্তর বাংলায় একটা বড় রকমের গণ্ডগোল হয়ে গেল। কৃষক বদ্রোহ। চারিদিকে হৈ-চৈ পড়ে গেল খুব। চাষীদের সশস্ত্র সংগ্রামের বৃত্তান্ত কাগজের হেডিং।

প্রথমটায় চমকে উঠলাম। উত্তর বাংলার মাটিতে আমি মিশে আছি। সেই স্নিগ্ধ মাটি থেকে এই অগ্নুৎপাত!

দৌড়ে গেলাম প্রকাশের কাছে। প্রকাশ খুশি নয়, বিমর্ষও নয়। চিন্তিত। আমাকে বলল—অতনু, ব্যাপারটা আমার ভাল াগছে না।

আমি বললাম—আমারও না। এটা গণতন্ত্রের পথ নয় ঠিক। কিন্তু আমি জানতে চাই, এটা বিপ্লবের পথ কিনা! এদেশে মানুষ দীর্ঘকাল বিপ্লবের জন্য অপেক্ষা করছে। এটা কি তারই পূর্বাভাস?

প্রকাশ ম্লান হেসে বলে—সেটা তোরই ভাল জানার কথা। তার দল বিপ্লবের কথা সবচেয়ে বেশি বলে।

একটু চুপ করে থেকে প্রকাশ আবার বলে—মানুষ এত সহজে াল্টায় না—এ তো তোরই কথা!

দীর্ঘকাল রাজনৈতিক ব্যর্থতার রোগে ভুগে আমি খিট্‌খিটে য়ে গেছি। মনে হয়, সমস্ত শরীরে আমার জ্বালা, দাঁতে-মুখে বষ। হাত-পা নিশ্‌পিশ্‌ করে। আমি প্রকাশকে বললাম—ভাল হাক মন্দ হোক, তবু একটা কিছু হয়ে যাক। একটা চূড়ান্ত কছু হওয়া বড় দরকার। একটা বড় ঝাঁকুনি, ওলটপালট বড় রকার।

কথাটা স্বস্তির মুখে পড়ল। বাংলাদেশে রাজনৈতিক ঝড় এসে গল হঠাৎ। বার বার বিধানসভা ভেঙে যায়। সেই ঝড়ের মধ্যে ক্ষেপতনের মত লাশ পড়তে শুরু করল। প্রথমটায় খুব চমকে লাম। কিন্তু খুনের সেই শুরু। খুনের পর দেয়ালে লেখা

হয় অমুক খতম তমুক খতম। নতুন রাজনৈতিক মতবাদ লেখা হতে লাগল চারদিকে। এর আগে বেলেঘাটায় একজন পলাতক নেতা রাস্তার ওপর পুলিশের তাড়া খেয়ে গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে পালাবার সময়ে জনতার হাতে মারা পড়েছিলেন। আমার আর প্রকাশের খুব চেনা লোক। আমরা দু'জনেই খবর পেয়ে মুষড়ে পড়লাম। এমনটা না হলেও পারত এতটা যেন এদেশের মাটিতে মানায় না।

বিপ্লবের ডাক কারা লিখে যায় দেয়ালে। স্কুল-কলেজ ছেড়ে চলে আসার আহ্বান করে ছাত্রদের। লেখে—শ্রেণীশত্রুর রক্তে যার হাত রঞ্জিত হয় নি সে কমিউনিস্টই নয়। আরো কত কথা! পড়তে অবাক লাগে। বিপ্লব! এই কি তবে বিপ্লব!

আবার পুঁথিপত্র খুলে বসি। মিলিয়ে দেখতে চেষ্টা করি। কিছু মেলে, কিছু মেলে না। বরাবর এই এক ব্যাপার দেখে আসছি। পুঁথিপত্রে যা লেখা আছে তার কিছু মেলে, কিছু মেলে না।

তবু সশব্দে চারদিকে লাশ পড়তে থাকে।

খুব অবাক হয়ে ভাবি, উত্তর বাংলার গ্রামে যে বিপ্লবের শুরু তা গ্রাম থেকে গ্রামে ছড়িয়ে না পড়ে কেন শহরে এসে বাসা নিয়েছে গ্রাম দিয়ে তবে এরা কী করে শহর ঘিরবে! বড় অবাক লাগে।

রাত-বিরেতে একা একা ফিরতে গা ছম্-ছম্ করে। বার বার পিছু ফিরে দেখে নিই। বাতাসকে বিশ্বাস হয় না, গাছটাকেও সন্দেহ করি। যদিও রাজনীতিতে আমি মরা ঘোড়া হয়ে গেছি তবুও গায়ের গন্ধ বহুদূর যায়। আমাদের রাস্তার চৌমাথায় পাড়ার ছেলেরা আড্ডা মারে। চেনা ছেলে, তবু তাদের সেই দঙ্গল দূর থেকে দেখে হঠাৎ ভয় লাগে। চেনা ছেলে বটে, কিন্তু যদি ভিতরে ভিতরে রং বদলে থাকে! নীচের তলার ঘরে শুই, শিয়রে জানালা খোলা থাকে। রাতে ভাল ঘুম হয় না। দুঃস্বপ্ন দেখে উঠে বসি। তারপর মাঝরাতে সিগারেট জেবলে জানালায় দাঁড়িয়ে নির্জন চরাচর দেখি। দূরে গাঢ় নীল হিম আকাশের দিকে অপলক চেয়ে থাকি। মৃত্যুর কথা ভাবি। পরকালে আমার কি বিশ্বাস আছে? কে জানে! তবে চিরকাল আমি বস্তুবাদী। নিজের

মৃত্যুর কথা ভাবতে গেলেই বীরপাড়ার রাস্তায় ঝোপের গাঢ় ছায়া থেকে আজও ধূসর রঙের একটা সতেজ সাপ উঠে তার বুকের সাদা রঙ আমাকে দেখায়। শরীর শিউরে উঠে, ভয় করে।

কিন্তু বস্তুত মৃত্যুকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই আমার, আমার পারিবারিক সম্পর্ক আলগা, বাইরের জগৎ থেকেও কিছু পাওয়ার নেই। বেঁচে থাকার আর কী অর্থ? মরলেই বা ক্ষতি কী? নিছক বেঁচে থাকার জন্যই বেঁচে থাকাটা কোনো কাজের নয়। কেঁচো, কীট পশুরাই ওরকম বাঁচে। এসব কথা নিজেকে বলেছিও কতবার। যখন রাজনীতিতে প্রথম নেমেছিলাম, তখন অন্তত মৃত্যুভয় আমার ছিল না, সেইসব দিনে কতবার ভাড়াটে গুন্ডা, গোয়েন্দা পুলিশ, অন্য দলের মারমুখো সমর্থকদের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছি অনায়াসে। তবে কি বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ভয় বাড়ে? আয়ুর প্রতি ভালবাসা? যদি আমি রোজগেরে মানুষ হতাম, যদি আমার ওপর নির্ভর করত আমার ছেলে-মেয়ে-বৌয়ের ভবিষ্যৎ, তবে হয়তো বেঁচে থাকার প্রতি ভালবাসা স্বাভাবিক হত। কিন্তু তাও তো নয়।

সেই আন্দোলনের প্রকাশ্য নিন্দে করল প্রকাশ। কাগজে ওর লেখা বেরোলো। গিয়ে প্রকাশকে সাবধান করে দিলাম—দিনকাল ভাল না প্রকাশ। সাবধান।

প্রকাশ মুখ গম্ভীর করে আমাদের সেই চেনা নিহত পলাতক রাজনৈতিক নেতার কথা উল্লেখ করে বলে—ও মারা যাওয়ার পর থেকে আমার মন চারদিকটার ওপর বিষিয়ে গেছে! ওর আর আমার দল আলাদা ছিল, তবু আমাদের কাজ আসলে তো আলাদা নয়। এখন এইসব যা হচ্ছে এই-ই বা কী অতনু? বাচ্চা ছেলে সব—এরা কী বোঝে? কেন এসব—! প্রটেস্ট করে রাখলাম অতনু, ভবিষ্যতের মানুষ যখন এই অন্যায়ের নিন্দা করবে তখন তারা খুঁজে দেখবে, কেউ সাহস করে এর প্রতিবাদ করেছিল কিনা, আমি সেটা করে রাখছি—

সুখের বিষয়, আমার অভিজ্ঞতা প্রকাশের চেয়ে বেশি। আমি এখন ভবিষ্যতের ভাবনা কম ভাবি। আমার চিন্তা বর্তমানকে নিয়ে। এইসব ঝোড়ো দিনগুলো মাথা নুইয়ে কাটিয়ে দেওয়াই

বুদ্ধিমানের কাজ। সুযোগ যদি আসে আসবেই—তখন দে
যাবে। প্রকাশ তা বোঝে না। তর্ক করে। ঝগড়া হয়।

রাশি রাশি ছেলে ধরা পড়েছে। তবু খুন কমছে না। অবা
হয়ে দেখি বাংলাদেশের নরম মাটি থেকে এ কারা জন্মাল! তিনি
চারটে ছেলে গিয়ে স্কুল জ্বালায়, পুলিশ ব্যারাকে আক্রমণ কে
সশস্ত্র এস-আইকে খুন করে। দিনের বেলায় হাজার লোবে
চোখের সামনে ট্র্যাফিক পুলিশ মারে। এক-আধজন এম. এল.-এ
খুন হয়।

থানার ও-সি চেনা লোক। একটু খাতির করেন। কে
মারাত্মক না হলেও আমার ক্যাডারদের অযথা আটকে রাখেন না
আমি গেলে ছেড়ে দেন। হেসে বলেন—আমাদেরও জায়গা নেই
দেশ শুদ্ধ ছোকরারা ক্রিমিন্যাল হয়ে গেলে আমরা রাখি কোথায়।
মাঝে মাঝে থানায় যাই। আড্ডা মারার জন্য নয়। পরিস্থি
বুঝবার জন্য। থানার খবর সবচেয়ে পাকা। ও-সি বসান,
খাওয়ান, অল্পস্বল্প ইনফর্মেশন দেন। আর বার বার বলে দে
—সাবধানে চলাফেরা করবেন। আমাদের দেশে একরকম কাঁঠা
হত। মাটির নীচে ফলত। পেকে গন্ধ ছড়ালে আমরা টে
পেতাম। আপনারা হচ্ছেন সে কাঁঠালের মতো। লুকিয়ে থাকলে
গন্ধে লোকে টের পাবে ঠিক।

আগেই বলেছি, জীবনের প্রতি আমার তেমন গাঢ় অনুরা
থাকার কথা নয়। তবু দেখি এত হেলাফেলা করে যে জীবন
কাটিয়ে দিলাম, যে আমি সংসারে কারো কাজে লাগলাম না,
আমাকে এই সংসারও বড় বেশি হেলাফেলা করেছে, তারও রয়ে
মৃত্যু-চিন্তায় প্রগাঢ় কাপুরুষতা।

নাকি এ স্বাভাবিক বাঁচার আকুতি!

সিদ্ধান্তে আসতে পারি না। বীরপাড়ার রাস্তায় ধুলোয় হাঁ
গেড়ে বসে একদা আমি প্রাণভিক্ষা চেয়েছিলাম একটি সাপের কাছে
সে অবহেলা ভরে ছুঁড়ে দিয়ে গিয়েছিল আমার আয়ু। সেই কথ
মনে পড়ে।

আমাদের বাড়ির পিছনের দিকে একটু উঠোন, একটু বাগান

য়াল ঘেরা। সারা দুপুর সেইখানে খেলা করে তিতু আর
মলি। আমি আজকাল একটু বেশি ঘরে থাকি। দুলু
লে চলে যায়, ভাইরা বেরোয়, বাবা আর মা ঘরে শুয়ে বসে
কে। আমি একা বারান্দায় বসে থাকি। একা আমি চিরকালই।
রর প্রবাস আমার। দুলু কয়েকটা দিন শুধু আমার কাছে
সেছিল। খানিকটা ভালোবাসায়, খানিকটা আক্রোশে। ঘৃণা
ার ভালবাসার দূরত্ব বুঝি বেশি নয়। মানুষের মনে তারা পাশা-
শি দু'টি পাখির মত বাস করে। একজন ডাক দিলে অন্যজনও
কে ওঠে। দুলুর সঙ্গে বাস করে আমার এখন এই অভিজ্ঞতা
য়েছে। দুলুর উদাসীনতায় আমি বাস করি। এক এক সময়
লু সচেতন হয়ে আমাকে ভালবাসে কিছু, কিছু ঘৃণা করে।

ঐ যে তিতু আর ঝিমুলি—ওরা কি ঘৃণার ফসল, নাকি ভাল-
সার তা আমি বুঝি না। চেয়ে থাকি। বুঝতে চেষ্টা করি।
ারাটা দুপুর ওরা উঠান আর বাগানময় খেলাঘর তৈরি করে,
ার ভাঙে। এক এক সময়ে আমাকেও ডাকে। আমি তাদের
তুলের কাপড় পরিয়ে দিই, পাহাড় বানাই, মিছিমিছির নেমন্তন্ন
াই। ছোটন সাধারণত এইসব খেলায় থাকে না, ছয় বছর তার,
বু বাড় নেই। তিন কি চার বছরের শরীর তার, কথা আধো-
াধো, মুখ দিয়ে লালা পড়ে, মাথার ঘা, সারাটা দিন দাদু
ার ঠাকুমার মাঝখানে শুয়ে থাকে। কোনো কোনোদিন সেও
ঠে এসে খেলা করে। খেলা শেষ হয় একসময়ে। তখন গল্প
লার পালা। বারান্দায় তারা আমাকে ঘিরে বসে। আমি জঙ্গল
ার পাহাড়ের গল্প বলি। বলতে বলতে একসময়ে তাদের কথা
ার খেয়াল থাকে না। আমি গল্প বলে চলি নিজেকেই। সাপ,
াঘ, পাহাড়, জঙ্গল, আর মানুষ—উত্তর বাংলার সেই জীবনের
চিত্র আলো-আঁধারিতে কখন হারিয়ে যাই। তিতু, ঝিমুলি আর
ছাটন হাঁ করে শোনে। শিউরে উঠে আমার গা ঘেঁষে আসে।

বিকেলে দুলু ফিরে এসেই তাদের সরিয়ে নেয়। আমাকে
পা ধমকের সুরে বলে—ছেলেমেয়েদের নষ্ট কোরো না, ওদের
তরে তোমার মাঠ-ঘাট-পাহাড় আর রাজনীতির বাউণ্ডুলেপনা
কিও না।

বুকের ভেতরটা এখনো খিচ ধরে। হৃৎপিণ্ডের শব্দ পাল্টে যায়। রাগে, হতাশায়। বড় নিষ্ঠুর তুমি দুলু। তোমার মায়া নেই।

চারিদিকে প্রতিদিন লাশ পড়ছে। তবু কেউ আমাকে সাবধান করে না। কারো উদ্বেগ নেই আমার জন্য। মনে হয়, তারা সবাই আমাকে চোখের সামনে দেখেও প্রতিদিন ভুলে যাচ্ছে। এর চেয়ে মৃত্যু খুব বেশি মর্মান্তিক নয়। দুলু নিষ্ঠুর হাসি হেসে বলে —তুমি কেন বেরোও না? তুমি বেরোলেই আমি নিশ্চিন্ত থাকি।

মর্মান্তিক! তবু ঘটনাটা ঘটে যায়।

মধ্য কলকাতার পার্টি অফিসের ঘরে থাকত প্রকাশ। বিধান-সভার অধিবেশন শেষ হলে উত্তর বাংলায় ফিরে যেত। এবারও যাওয়ার কথা। যাওয়ার আগের দিন ঘুরে ঘুরে কিছু বাজার করছিল। বাচ্চাদের জন্য খেলনা, বড়বাজার থেকে ডালের বড়ি, হাওড়া হাট থেকে ছিটকাপড়। ফিরতে বিকেল হয়েছিল। পার্টি অফিসের সামনের গলিতে চারজন তাকে ঘিরে ধরে।

প্রকাশের হার্ট ভাল ছিল না, সম্ভবতঃ ডায়াবেটিসও ছিল। খুব মিষ্টি খেত প্রকাশ। উত্তেজিত হলে ইদানীং থর থর করে কাঁপত। বলতাম—ডাক্তার দেখা, একটা জীবন শরীরের দিকে তাকাস নি; এখনও সময় থাকতে—

প্রকাশ বলত—বাদ দে। শরীরটা পুষে রাখার জন্য নয়, কাজে লাগাবার জন্য। যতদিন কাজে লাগবে লাগুক, তারপর ফেলে দেবো।

কখনো বা বলত—ডাক্তারের কাছে যেতে মাইরি ভয় করে। ফায়ারম্যান ছিলাম, কত ধকল গেছে। পার্টি করতে গিয়ে শরীরের ওপর কত অত্যাচার করেছি। কোথায় কী হয়ে আছে শরীরের ভিতর কে জানে! হয়তো ক্যান্সার, যক্ষ্মা, প্রেসার, ডায়বেটিস কি হার্টের ব্যামো। ডাক্তার দেখালেই সব ধরা পড়ে যাবে। তার চেয়ে না জেনে এই বেশ আছি—

প্রকাশের বৌ দুলুর মতো সুন্দর ছিল না। ছিল না দুলুর মতো নিষ্ঠুরও। সে প্রকাশকে ভালবাসত খুব। বৌয়ের কথ

লতে প্রকাশ বলত—যা ভয় করেছিলাম, বৌটা সেরকম হয়নি! আমার নতুন মাকে কেড়ে নেয়নি। বরং আমি বারমুখো বলে তারা শাশুড়ী বৌ জোট বেঁধে থাকে। মা বাচ্চাগুলোকে সামলায়, বৌ ঘরদোর দেখে। ভারী লক্ষ্মীশ্রী ফুটিয়ে রেখেছে ঘরে—গরীবের ঘরে যতটা ফোটানো যায়। কিন্তু আমি কেমন লক্ষ্মীছাড়া দ্যাখ, সেই ঘরে আমার থাকাই হয় না। এত দূর পার্টি অফিসে পড়ে থাছি, টেবিল পেতে শতরঞ্জি বিছিয়ে শুয়ে থাকি, পাউরুটি আর জল খেয়ে কত দিন কেটে যায়।

আমাদের বাড়িতে কতবার প্রকাশকে থাকতে বলেছি, থাকে নি। বলেছে—দূর! লোকে কী বলবে! আমাদের দল আলাদা—সেটা ভুলিস না।

বড় একটা চমক লাগত। প্রকাশের দল আলাদা! হায় ঈশ্বর কাটিহারের রাস্তায় রাস্তায় আমরা যে একসঙ্গে কতবার মার খেয়েছি!

যতদূর জানি, প্রকাশ শব্দটিও করতে পারে নি। চারজন তাকে ঘিরে ধরেছিল। খোলা রাস্তায় তার পার্টি অফিসের সামনেই। খবর পেয়ে গিয়ে দেখি, খুব ভীড়। পুলিশ সদ্য এসেছে। মেডিক্যাল কলেজের এমার্জেন্সিতে প্রকাশের দেহটা শোয়ানো।

কিন্তু, এ কে? একে তো কখনো চিনতাম না আমি। এই কি প্রকাশের চেহারা! তার মাথাটা প্রায় নেই-ই। আকারহীন, ফাটা ভাঙ্গা একটা মাথা, চোয়াল ভেঙ্গেছে। সমস্ত শরীর ছোরায় ছোরায় লণ্ডভণ্ড। একটা বয়স্ক, দুর্বল দেহের ওপর এ কেমন আক্রোশ ওদের! এতটার দরকার ছিল না। প্রকাশের হৃৎপিণ্ড দেখা যাচ্ছে, পেটের ভিতর থেকে একটা নাড়ি বেরিয়ে এসে ঝুলছে। আমি চোখ ফেরাতে পারি না, তাকাতেও চোখ ফেটে যাচ্ছে।

পুলিশ আমার কাছে একটা বিবৃতি চেয়েছিল। কিছুই বলতে পারি না। কথা এলোমেলো হয়ে যায়। আবোল-তাবোল কী সব বলি। মাঝে মাঝে শরীরে কাঁপুনি উঠে যায়। হিক্কা ওঠে। অনেকক্ষণ শূন্য লাগে মাথা, পুলিশের সাব ইন্সপেক্টরটি আমাকে বললেন—আপনার শরীর বোধহয় ভাল নেই। যাক গে, পরে হলেও চলবে।

পত্রিকার লোক দু' একজন আমাকে ধরে। আমি ভীষণ অবাক হয়ে চেয়ে থাকি, তারা সরে যায় অবশেষে। হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে রাস্তায় উবু হয়ে বসে এক কোষ জল বমি করি।

দেওয়ালে দেওয়ালে লেখা হল—প্রকাশ খতম।

মাসখানেক ভাল করে খেতে পারি না। বরাবর মন অস্থির হলে আমি বাইরে বেরিয়ে পড়ি। ঘুরে ঘুরে মন ঠিক হয়ে যায়। এখন আর তেমন বাইরেও যাওয়া হয়ে ওঠে না। ঘরেই বেশির ভাগ থাকি। অবিরাম পায়চারি করি। মাথার ভিতরে চিন্তার ঘূর্ণীঝড় ওঠে। মাঝে মাঝে বসে থাকি, বসেই থাকি।

পৃথিবীতে সুখকর বিস্মৃতি আছে। মানুষের দুঃসময়ে যা সবচেয়ে বড় বন্ধু। একটু দেরীতে আসে ঠিকই। আস্তে আস্তে ক্রমশ বিস্মৃতির প্রলেপ পড়তে থাকে।

*

একদিন রাত দুটো নাগাদ দরজার কড়া নড়ল। ঘুমের মধ্যে সেই শব্দ তীরের মতো বিঁধে কাঁপতে লাগল। জেগে উঠেও বুকের দুরদুর আর থামে না। দুলুও তার বিছানায় উঠে বসেছে, টের পেলাম। কিন্তু কিছু বলল না, জানালা দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম কে ?

কয়েকটা ছেলে জানালার সামনে এগিয়ে বসে বলল—অতনুদা, আমরা।

চিনলাম। পাড়ারই ছেলে, যারা চৌরাস্তার মোড়ে আড্ডা মারে দেখে ভয়ও পেলাম একটু।

তাদের মধ্যে একজন জানালার কাছে এসে বলল—আমাদের মণিকে আজ পুলিশে তুলে নিয়ে গেছে। ওর কোনো দোষ নেই ও-সি আপনার চেনা, যদি একটু বলে দেন।

একাজে আমি অভ্যস্ত। অতীতে বহুবার বহুজনকে ছাড়িয়ে

নেছি। কিন্তু এবার একটু ইতস্ততঃ করতে থাকি। বলি—এত াতে?

বলেই মনে মনে হাসলাম। কোনোকালেই আমার কাছে দিন-াতের কোনো ভেদ ছিল না। এখন এইসব গৃহস্থের সংস্কার ামার আসছে। ভয় খামচে ধরেছে বুক। এইসব ছেলেরা চেনা য়েও আমার অচেনা। কোন অছিলায় বার করে নিয়ে গিয়ে যদি ারে। মেরে ফেলে?

সামনের ছেলেটা বলল—এত রাতে আসতাম না। কিন্তু ওকে দি মারধোর করে। একটা নির্দোষ ছেলে সারারাত মার খাবে!

হঠাৎ সাহস এল। ভাবলাম, এদের নিয়েই বাস। যদি এরা ামাকে পেতে চায়, তবে পাবেই কোনো না কোনো দিন। তাই র্ক করলাম না। বুঝলাম, যদি পিছিয়ে যাই তবে এরা হয়তো বা া চিরকালের মতো আমার শত্রু হয়ে দাঁড়াবে। এগোলে যদি বিপদ াকে তো পিছোলেও বিপদ আছে। তাই বললাম—চলো, দেখা াক।

গায়ে জামা চড়াতে চড়াতে অন্ধকারেই দুলুকে লক্ষ্য করে ললাম—সদরটা দিয়ে দিও। আমি ঘুরে আসছি।

অতীতে দুলু বহুবার রাতবিরেতে উঠে ঘুম-চোখে সদর দয়েছে কিংবা খুলেছে, একটিও কথা বলে নি, এবার বলল—ওরা কারা?

—পাড়ার ছেলে।

—চেনো তো?

—চিনি।

একটু চুপ করে থেকে বলল—কীরকম চেনো? ভাল করে?

চাপা গলায় বললাম—ওরা জানালার কাছেই আছে। শুনতে বে।

দুলু উদাস গলায় বলল—দেখতে পাচ্ছি।

তারপর উঠে এসে আমার পিছু পিছু সদর পর্যন্ত হাঁটতে টতে বলল—ওদের জন্য আমার ছাত্রীরা আসতে ভয় পায়। স্তার মোড়েই ওরা থাকে। ওদের কাউকে যদি পুলিশ ধরে থাকে া বেশ করেছে, তুমি ছাড়িয়ে এনো না।

উত্তর না দিয়ে দরজার হুড়কো খুললাম। ছেলেগুলো গম্ভীর নিস্তব্ধ মুখে দাঁড়িয়েছিল। বললাম—চল।

—আপনাকে কষ্ট দিলাম অতনুদা, বৌদি হয়তো রাগ করছেন।

একটু কেঁপে উঠে বললাম—না না, রাগের কী। মানুষের বিপদে-আপদে দেখতে হয় না।

ওরা আর কিছু বলল না। কয়েকজন আমার আগে, কয়েক জন পিছনে হাঁটতে লাগল। বড় অদ্ভুত অবস্থা হল আমার। আগের দলকেও বিশ্বাস হচ্ছে না, পিছনের দলকেও না। রাস্তার মোড়ে একটা তেঁতুলগাছ, তার ঝুপসী ছায়া। ছায়াটা পেরোবার সময়ে চোখ বুজে বিড় বিড় করে বললাম—বোধহয় এইবার—এইখানে—।

কিন্তু ছেলেগুলো আমার দিকে তাকালও না। পিছনে কয়েকজন একটু দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরাল, দেশলাইয়ের শব্দ পেলাম। নিঃশব্দে হাঁটতে লাগল। সারাটা রাস্তায় আমি হাঁটতে হাঁটতে ভয়ে ঘেমে গেলাম। অদূরে থানার আলো যখন দেখা যাচ্ছিল তখনো আমার ভয় কাটে নি।

থানার দেউড়ির একটু দূরে ছেলেগুলো দাঁড়িয়ে বলল—আপনি যান। আমরা এখানে রইলাম।

বললাম—তোমরাও এসো না।

একজন একটু হেসে বলল—আমাদের অনেকের নামেই ওয়ারেণ্ট আছে। ঝামেলায় কাজ কী? এসব ব্যাপারে আপনি একাই একশো।

খুবই বিপন্ন বোধ করলাম এই ভেবে যে, এদের সঙ্গেই হয়তো এতটা পথ আবার আমাকে একা ফিরতে হবে। আজকাল পথ আর আমার ফুরোয় না।

চেনা ও-সি মুখ তুলে ভ্রূ তুললেন—আপনি!

আমি হাসলাম—ঐ যে মণি নামে ছেলেটা—

ও-সি অবাক হয়ে বললেন—সে তো আপনার দলের ছেলে নয়। বরং বোধহয় উল্টো পার্টির।

আমি উদাস গলায় বললাম—না। আমার পাড়ার ছেলে, আমি চিনি।

ও-সি মাথা নাড়লেন—এ ব্যাপারে আপনার চেয়ে আমার খবর াশি পাকা। বরং আপনি ছেলেটিকে একবার দেখুন ভাল করে, াপনার ভুল হতে পারে—।

আমি ইতস্তত করছি দেখে ও-সি হাসলেন—দেখলেই বুঝতে ারবেন, এ আপনার দলের নয়। আসুন—

ও-সির সঙ্গে সঙ্গে উঠে লক-আপে গেলাম। ভিতরে একটি হলে মেঝের ওপর বসে আছে। ঘাড় পর্যন্ত তার লম্বা রুক্ষ চুল, ালে না-কামানো দাড়ি, বেশ লম্বা ছেলেটা, কাঁধের হাড় চওড়া। ায়ে মাংস নেই, কিন্তু হাড়গুলো মজবুত। দুটো চোখ লালচে। ামাকে দেখে সেই লাল চোখ জলব জলব করে উঠল। তাকে আমি াগে কখনো দেখেছি বলে মনে হয় না।

শান্ত গলায় সে বললে কী চাই?

আমি ও-সির দিকে তাকালাম, তাঁর মুখে সন্দেহের ায়া।

মুখ ফিরিয়ে ছেলেটার সঙ্গে নকল পরিচিতের সুরে বললাম— ী হয়েছিল মণি? কী করেছিলে?

ছেলেটি একটু চেয়ে থেকে শান্ত গলায় বলল—আপনি কেন লাল মশাই?

একটু থেমে গেলাম। বুঝলাম, ছেলেটা আমাকে চেনে। 'লাল' কথাটা প্রমাণ করে যে, ছেলেটি আমার দলের নয়। বরং -সির কথাই ঠিক। ছেলেটা উল্টো পার্টির।

তবু মুখ বাঁচানোর জন্য চাপা স্বরে বললাম— মণি, কী হচ্ছে। ামি তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছি।

ভারি অবাক হল ছেলেটা। তারপর ধীরে ধীরে তার চোয়াল ক্ত হয়ে ওঠে, মুখে দেখা দেয় রাগের রক্তিমাভা। দাঁতে দাঁত চেপে লে—কে চায় ছাড়া পেতে? আপনি কোন পার্টির দালালী রেন আমি কি তা জানি না।

তার গলা হঠাৎ ক্ষ্যাপা কুকুরের চিৎকারের মত তুঙ্গে উঠে যায়। া চেঁচিয়ে বলতে থাকে—যাদের দালালী করে এসেছেন এতদিন, াদের জন্য দারোগার কাছে নাকে কাঁদুন গে। সাচ্চা বিপ্লবী াখ দেখেছেন একটাও? আমি যখন বেরোব, এই থানার দেয়াল

ভেঙ্গে বেরোব, আপনার মত দালাল কুত্তার হাত ধরে নয়। এই দারোগা এটাকে বের করে দিন, আমার ঘেন্না করছে।

রাজনীতি করার একটা শিক্ষা হচ্ছে এই যে, নিজে রাগ অনুভূতি, ইত্যাদির ওপর নিয়ন্ত্রণ আসে, অপমান সহ্য করার মত সহনশীলতা জন্মায়। আমি রাগলাম না। ও-সি কে একটু তফাত হতে বললাম। তিনি একটু হেসে সরে গেলেন।

আমি সেল্-এর কাছে গিয়ে ছেলেটিকে বললাম—তোমার বন্ধুরা বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। তোমাকে তারা নিয়ে যেতে চায়।

ছেলেটার চোখ আবার ঝিকিয়ে উঠল। ব্যঙ্গের হাসি হেসে বলল—কারা আমার বন্ধু? তাদের নাম কী?

সকলের নাম আমার জানা ছিল না। দু' একজনের ডাক নাম জানতাম! বললাম—ভুলু মণ্ডল, শচী, এরা সব।

ছেলেটা হাঁ করে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর আস্তে আস্তে সন্দেহে কুটিল হয়ে গেল তার মুখ, গরাদের শিখ ধরে উঠে দাঁড়িয়ে ঝুঁকে হঠাৎ আমার গায়ে এক ঝলক থুথু ছুঁড়ে দিল সে। দাঁতে দাঁত ঘষে বলল—ওরা আমার বন্ধু? কুকুরের বাচ্চা, আমি তোমার মতলব বুঝি না?

থুথুর ভয়ে আমি পিছিয়ে এসেছিলাম। তাছাড়া ছেলেটার রাগের তাপও আমি সহ্য করতে পারছিলাম না। আমার ভয় করছিল। আমি অবাক হয়ে বললাম—ওরা তোমার বন্ধু নয়?

ছেলেটা ব্যঙ্গের হাসি হেসে বলল—ওরা আমার কীরকম বন্ধু আপনি জানেন না? না জেনেই এত কষ্ট করে মাঝরাতে বৌয়ের কোল ছেড়ে উঠে এসেছেন?

হঠাৎ আমারও কেমন সন্দেহ হচ্ছিল কোথাও একটা ভুল হয়ে গিয়ে থাকতে পারে। তবু আমি ঐকান্তিকভাবে বলার চেষ্টা করলাম—ওরা তোমার বন্ধু কিনা জানি না। তবে ওরা ভয় পাচ্ছে পাছে তোমাকে পুলিশে মারধোর করে, তাই আমাকে ডেকে এনেছে।

ছেলেটা দুই শক্ত হাতে এত জোরে গরাদ চেপে ধরল যে তার আঙুলের মাথাগুলো সাদা হয়ে গেল। তেমনি ঠাণ্ডা রাগের

গলায় বলল—আমাকে মারধোর করার সাহস এদের নেই। যদি করে, তবে নির্বংশ করে দেব। কিন্তু ঐ যারা বাইরে দাঁড়িয়ে আছে, তারা কেন দাঁড়িয়ে আছে, আমি জানি। আপনি ওদের হয়ে কন এসেছেন তাও জানি। দালাল আর কুত্তার দল কেউ থাকবে না। আপনার দিন শেষ হয়ে এসেছে—ওদেরও।

এই বলে হঠাৎ সেল্-এর দরজাটা ঝনাৎ করে খুব জোরে নাড়া দিয়ে ছেলেটা ডাকল—এই দারোগা—

ও-সি ধীরে সুস্থে এলেন! আমার দিকে চেয়ে একটু হেসে চোখে ইঙ্গিত করলেন। আস্তে বললেন—বলেছিলাম কিনা!

ছেলেটা চেঁচিয়ে বলল—এ লোকটা এখানে কেন এসেছে জানেন?

ও-সি বললেন—অতনুবাবুকে আমি চিনি।

ছেলেটা শিকের ওপর জোর একটা ঘুঁষি মেরে বলল—ছাই চেনেন! বাইরে কতগুলো কুত্তা দাঁড়িয়ে আছে, আর এটা হচ্ছে সেই কুত্তাদের এজেন্ট। আমাকে ছাড়িয়ে নিতে এসেছে, বাইরে নিয়ে গিয়ে —হিস্‌হিস্‌—বলে ছেলেটা হাত তুলে নিজের গলায় নলীটার ওপর চালিয়ে দেখাল। তারপর হাসল। বলল—গলাটা কেটে ফেলবে।

ও-সি তাকিয়েছিলেন।

ছেলেটা গনগনে মুখে বলল—একে আপনি কিছুই চেনেন না।

ও-সি আমার দিকে ফিরে বললেন—বাইরে কারা দাঁড়িয়ে আছে?

আমার ভয়ঙ্কর বুক কাঁপল। আমার বিরুদ্ধে বহু ষড়যন্ত্রই আমি ধরতে পারি নি। মনে হচ্ছিল বেশিরভাগ মানুষই আমার চেয়ে চালাক। আমি বড় বোকা রয়ে গেছি।

নামগুলো ও-সি কে বললাম।

তিনি রুদ্ধশ্বাসে বললেন—এতক্ষণ বলেন নি কেন? ওদের আমরা খুঁজছি—

বলতে বলতে তিনি হাতে স্বয়ংক্রিয় রিভলবার টেনে বের করে ব্যস্তভাবে চলে যেতে যেতে ঘাড় ফিরিয়ে আমাকে বলে গেলেন—পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আসছি। ওরা কোথায় আছে?

—বাদামতলায়।

মুহূর্তের মধ্যে বুটের শব্দ ঝড়ের মতো ছোটাছুটি করল একটা জীপের শব্দ পেলাম। ব্যস্ততা।

শরীরের ভয়ঙ্কর অবসাদ টের পেয়ে আমার পা ভেঙে আসছিল আমি অজান্তে আস্তে আস্তে দেওয়াল ধরে মেঝেতে বসে পড়লাম।

মুখোমুখি সেল্-এর ভিতরে শিকের ফাঁক দিয়ে ছেলেটা আমা দিকে চেয়ে আছে। তেমনি জ্বলজ্বলে চোখ। আমাকে ব পড়তে দেখে একটু হাসল। বলল—খুব খারাপ লাগছে? লাগবে —প্ল্যানটা ভেস্তে গেল।

আমি মাথা নাড়লাম। বললাম—আমি কিছুই জানি না!

ছেলেটা ব্যঙ্গের হাসি হাসল—জানেন না।

—না।

ছেলেটা মুখে জিভ দিয়ে চুক্ চুক্ শব্দ করে বলল—আমার দলের ছেলেরা যখন আপনার পাত্তা নেবে তখন একথা বলবেন।

ছেলেটার মুখের দিকে চেয়ে টের পেলাম, আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত এক অদ্ভুত অসহনীয় ভয়। আমার সমস্ত শরীর কাঁপছে। আমি সম্মোহিতের মত ছেলেটার দিকে চেয়ে রইলাম। এরকম রাগ আর তীব্রতা আমি আর কোন মানুষের মধ্যে দেখি নি। ছেলেটার রাগ, ব্যঙ্গ, ঠাট্টা, শান্তভাব—সব যেন এক সুরে বাঁধা। একটা চরম বা শেষ কিছু করার জন্যই যেন জন্মেছে। স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম, এর আয়ু বেশি না। খুব অল্প কিছুদিনের মধ্যেই এর তার হাতে খুন হয়ে যাবে। কিন্তু যতক্ষণ ও বেঁচে আছে, ততক্ষণ ওর বেঁচে থাকার তীব্র স্পন্দন চারিদিকে ছড়িয়ে দিচ্ছে। ওকে ভয় না পেয়ে উপায় নেই।

আমার গলার স্বর ভেঙে অন্যরকম হয়ে যাচ্ছিল, কাঁপছিল বুক, হাত, পা। মাথার মধ্যে গুলিয়ে যাচ্ছে বোধবুদ্ধি। আমি বললাম – আমি তোমাকে চিনতাম না মণি।

ঠাণ্ডা গলায় সে বলল—চিনবেন! সময় যায় নি।

বুঝলাম, ওর কোন মায়া দয়া নেই।

আমি মিনমিন স্বরে বললাম—আমাকে ওরা ভুল বুঝিয়েছিল। আমি বুঝতে পারি নি যে, তুমি ওদের দলে নও।

ছেলেটা শরীর ঝাঁকি দিয়ে বলল—আমি কুত্তাদের দলে কেন

যাব। রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে মেয়েদের শিস্ দেওয়া কি কাজ? সাচ্চা বিপ্লবীরা ওসব ঘেন্না করে—বলে ছেলেটা সেল্-এর মধ্যে থুথু ফেলল।

তারপর আবার হাসল—আপনি চিরকাল এর-ওর পা চেটে এসেছেন, বিধানসভার নমিনেশনের জন্য। আজ আবার এদের পা চাটছেন—কিসের জন্য? আমি আপনাকে এবং আপনাদের চিনি, এবার আপনারা একটু আমাদের চিনুন। আমার নাম মণি বোস—এঞ্জিনিয়ারিংয়ের ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র ছিলাম। ভাল ছাত্র—পরীক্ষা দিলে ফার্স্ট ক্লাস পেতাম। মাদ্রাজে আমার বাবা আমার জন্য ভাল চাকরি ঠিক করে রেখেছিল। আমাকে বিয়ে করার জন্যে ছেলেবেলা থেকে একটি খুব সুন্দর মেয়ে অপেক্ষা করে আছে। সব কিছুই ছিল আমার ফেভারে। সে-সব ছেড়ে আমি বিপ্লবে নেমেছি কেন?

আমি ভীতমুখে তাকিয়েছিলাম। প্রশ্ন করলাম—কেন?

ছেলেটা হাসল, বলল—কারণ বিপ্লব মানে আমি মিছিল-মিটিং বুঝি না। বিপ্লবের মানে ক্যাডারদের লক্-আপ থেকে ছাড়িয়ে আনাও নয়। বিপ্লব মানে বিধান সভার সীট পাওয়াও নয়। আর বিপ্লবী বলেই আমি বৌয়ের পয়সায় বসে খাব—এও হয় না। লরীর পারমিটের জন্য ঘুরব তাও হয় না।

এই পরিণত বয়সে আমি এই প্রথম একটি বাচ্চা ছেলের কাছে বিপ্লবের মানে শুনছিলাম। বেশ উৎকর্ণ হয়েই শুনছিলাম।

ছেলেটি লক্আপের ভিতর থেকে এমনভাবে আমাকে দেখছিল, যেন আমিই লক্আপে আছি, সে সম্পূর্ণ স্বাধীন।

বলল—সত্যিকারের বিপ্লব এ সব কিছুকেই ধুয়ে-মুছে দিয়ে যাবে। আমি সব ছেড়েছি কাজেই সব কিছুর শেষ দেখে যাব।

বলে সে মুখ ফিরিয়ে নিল।

জীপের শব্দটা ফিরে এল।

ছেলেটা উৎকর্ণ হয়ে শব্দ শুনল। তারপর আমার দিকে চেয়ে বলল—পুলিশ আপনার কুত্তাদের কয়েকজনকে বোধহয় ধরে এনেছে। এবার যান, দারোগার পা চেটে খালাস করুন গে।

আমি উঠলাম। দুর্বল লাগছিল খুব।

বাইরে থানার হাতায় তখন জীপটা থেমেছে। ও-সি নামলেন গম্ভীর মুখ। জীপের পিছন থেকে সিপাইরা ধরাধরি করে একজনবে নামাচ্ছিল। তার শরীর থেকে রক্ত পড়ছে টপ্ টপ্ করে। ছেলেটার মুখ আমি দেখলাম না। চোখ ফিরিয়ে বাইরের রাস্তায় ল্যা ল্যাম্পপোস্টের আলো ঝুপসী গাছের ছায়া, এবং দূরবর্তী বিরাট ব্যাপক অন্ধকারের দিকে চেয়ে রইলাম।

ও-সি আমাকে ডাকলেন—অতনুবাবু, ভিতরে আসুন। কথ আছে।

টেবিলে মুখোমুখী বসে আমি ও-সিকে সিগারেটের প্যাকেটট বাড়িয়ে দিলাম। যেমন বরাবর দিই। উনি সিগারেট নিলেন না হাতটা নেড়ে বললেন—একজনকে ধরেছি, কিন্তু আনহার্ট নয় এক্ষুণি হাসপাতালে পাঠাতে হবে। তবে আগে আপনি একবু দেখুন। আইডেণ্টিফাই হওয়া দরকার।

আমি চুপ করে রইলাম।

সিপাইরা ছেলেটাকে বারান্দায় শুইয়ে প্রাথমিক ওষুধপা লাগাচ্ছিল। আমি উঠে গিয়ে দেখলাম। মাথার একটা দিব থেঁতলে গেছে প্রায়, পায়ের দিকটা গুরুতর জখম। মুখটা দেখে চিনলাম, যে ছেলেটা সবার আগে-ভাগে ছিল সে-ই, নাম জানি না

ও-সিকে বললাম—নাম জানি না। তবে ঐ দলে ছিল।

ও-সি আবার হাত নাড়লেন—ঠিক আছে। নাম-ধাম আমর পেয়ে যাব। দলে ছিল কিনা সেটাই বড় কথা।

তিনি আবার আমাকে ঘরে এনে বসালেন। কিছু একটা লিখলেন ডায়েরিতে, তারপর পেন্সিলটা তুলে মুখের সামনে আড়া আড়ি ধরে বললেন—মনে হচ্ছে, আপনি ওদের ভাল করে চেনেন না।

আমি মাথা নাড়লাম—না। তবে পাড়ার ছেলে, চিনি।

ও-সি শ্বাস ছেড়ে বললেন—সেই মুখচেনার ওপর নির্ভর করে এত রাত্রে ওদের সঙ্গে আসা আপনার ঠিক হয়নি। ওরা আপনাকে কাজে লাগিয়েছিল। আপনার কথায় আমি বোসকে ছেড়ে দিলে আজ রাত্রেই মণি মার্ডার হত ওদের হাতে। তখন আপনি কী করতেন।

আমি নিঃশব্দে সিগারেট টানতে লাগলাম।

উনি আবার বললেন—কতখানি ঝুঁকি নিয়েছিলেন, বুঝতে ারছেন?

আমি মাথা নাড়লাম—পারছি।

উনি হাসলেন—আপনাদের আমলে রাজনীতি একরকম ছিল। খন অন্যরকম। একটু বুঝে চলবেন।

আমি মাথা নাড়লাম।

উনি শ্বাস ছেড়ে বললেন—এখন আপনি একটু বিপদের মধ্যে াছেন কিন্তু। ঐ দলের যারা পালিয়েছে, তারা পাড়ার রাস্তাতেই াধহয় অপেক্ষা করছে আপনার জন্য।

আমি শীতলতা অনুভব করলাম শরীরে।

উনি বললেন—আমাদের প্রিজন ভ্যান ছেলেটাকে হাসপাতালে পৌঁছে দেবে। আপনি ঐ ভ্যানে চলে যান। হাসপাতাল ঘুরে াপনার বাড়িতে দিয়ে আসবে।

কথা বলতে পারছিলাম না। কেবল আবার মাথা নাড়লাম।

ুলু জেগে অন্ধকার ঘরের জানালায় দাঁড়িয়েছিল। গাড়ি থামতেই াস্তে দরজা খুলল। আমি ঢুকতে সাবধানে আবার দরজা দিয়ে লল—তুমি পুলিশের গাড়িতে এলে?

—হুঁ।

—কেন?

—ওরাই পৌঁছে দিল।

দুলু শ্বাস ছেড়ে বলল—একটু আগে দুটো ছেলে এসে খোঁজ করে গেছে তুমি ফিরেছ কিনা।

আমি অন্ধকারে কেঁপে উঠলাম। বললাম—কেন?

—কেন তা তো আমিই জানতে চাইছি। তুমি তো ওদের ঙ্গেই গিয়েছিলে, তবে ওরা তোমার খোঁজ করছিল কেন?

—তুমি ওদের জিজ্ঞেস করোনি?

—করেছিলাম। ওরা কেবল বলল—কাজ আছে!

ঘরে ঢুকে দুলু বাতি জ্বালতে হাত বাড়িয়েছিল। আমি নষেধ করলাম—বাতি জ্বেলো না।

কেন ?

—দরকার কী। আলো জ্বাললে ছোটনটা হয়তো জেগে যাবে অন্ধকারে জামাটা ছেড়ে শুয়ে পড়ব এক্ষুনি।

দুলু আলো জ্বালল না। একটু চুপ করে হঠাৎ বলল—জানালাটা বন্ধ করে দেব ?

আমি থমকে গেলাম। দুলু বোধহয় বুঝতে পেরেছে কিছু।

একটু ইতস্তত করে বললাম—দাও।

জানালাটা শীত-গ্রীষ্ম সব সময়ে খোলা থাকে। আবছা এক রাস্তার আলোর আভা ঘরে আসে। দুলু জানালাটা বন্ধ করতে নিবিড় অন্ধকার আর গুমোটে ঘর ভরে গেল। তবু নিশ্চিন্ত এখন আর বাইরে থেকে আমাকে দেখা যাবে না।

শোওয়ার কোন মানে হয় না। ঘুম অসম্ভব। একটা সিগারেট জেলে বিছানায় বসলাম মশারি সরিয়ে। দুলু তখনো শোয় নি। অন্ধকারেই জল খেল। তারপর তার হাই তোলা শব্দ পেলাম।

—তুমি কতক্ষণ জেগে থাকবে ? দুলু জিজ্ঞেস করে।

—বেশিক্ষণ না। সিগারেটটা শেষ করেই শোব। তুমি শুয়ে পড়ো।

অন্ধকারে ওকে দেখা যাচ্ছিল না। কিন্তু টের পেলাম, আমার কাছে আসছে। শাড়ির শব্দ, চুড়ির শব্দ, মারকোলাইজ ওয়াক্স-এর গন্ধ। আমার গা ঘেঁষে বসল এসে। তারপর হা বাড়িয়ে আমার সিগারেটটা কেড়ে নিয়ে বলল—আমি একটু খাই

অন্ধকারেই দেখলাম, ও সিগারেট টানছে। আগুনের আভা মাঝে মাঝে উজ্জ্বল হয়ে উঠছে মুখ। বাধা দিলাম না। অনেকক্ষ সিগারেটটা খেল দুলু, শেষ ধোঁয়া মুখ থেকে বের করে বলল—মাথা ধরেছিল খুব। সিগারেটে সেরে গেল। বেশ জিনিস তো এবার থেকে মাঝে মাঝে খাবো।

—খেও।

—বকবে না ?

হাসলাম। দুলুকে তো কখনো আমি বকি না।

নিবিড় অন্ধকারে দুলুর একখানা নরম ভারি হাত আমা

গলাটা জড়িয়ে ধরল, পরমুহূর্তে আর একখানা হাত জড়াল আমার পিঠ। ওর উষ্ণ দুই ভেজা ঠোঁট চুম্বকের মত লাগল এসে আমার ঠোঁটে। আমি ওকে দুই হাতে ধরে বললাম—আস্তে, মশারি ছিঁড়বে।

—ছিঁড়ুক।

দুলুকে আমি ঠিক বুঝি না। মুহূর্তে মুহূর্তে ও পাল্‌টে যায়। কখনো আমাকে চেনেই না, কখনো বা এত বেশি চেনে যে, আমার হাঁফ ধরে যায়।

ঠাট্টা করার মত মন নেই। তবু বললাম—হয়তো আবার ছোটনের মত কোন দুর্ঘটনা ঘটে যাবে।

ও ঘন শ্বাসের সঙ্গে বলল—ঘটুক।

আমি মশারি তুলে দুলুকে বিছানার ভিতরে আনলাম। দুলু আমাকে তার আদর সোহাগ দিয়ে যথেষ্ট আক্রমণ করছিল। খুবই সুখের ঘটনা সেটা। কালেভদ্রে আমি দুলুর স্বাদ পাই। কিন্তু এই মুহূর্তে দুলুকে শরীরে জড়িয়েও আমি ওর স্বাদ পাচ্ছিলাম না। অন্ধকারে আমার চোখের সামনে তখন সেল্‌-এর গরাদের ফাঁক দিয়ে তীব্র একখানা তাম্রাভ মুখ ধক্‌ ধক্‌ করে জ্বলছে। কেবলই টের পাচ্ছি, শিয়রের বন্ধ জানালার ওপাশে কয়েকজন দাঁড়িয়ে আছে।

আমার অনিচ্ছা বোধহয় বুঝতে পারল দুলু। হঠাৎ আদর থামিয়ে বলল—কোনদিন তোমাকে কিছু জিজ্ঞেস করি নি, আজ করছি—ঐ ছেলেদুটো তোমার খোঁজ করছিল কেন?

—কি জানি।

—তুমি কেন পুলিশের গাড়িতে ফিরলে?

হাসলাম।—বললাম তো ওরা এদিকেই আসছিল, আমাকে পৌঁছে দিল। একটু চুপ করে থেকে দুলু আবার জিজ্ঞেস করে—আমার আদর তোমার ভাল লাগছে না কেন?

—লাগছে তো।

—না। তুমি খুব অন্যমনস্ক। সেই ছেলেটা ছাড়া পায় নি বুঝি?

আমি অবসন্ন গলায় বললাম—না।

—কেন? ও-সি তোমার কথা শুনলেন না?

—তা নয়। ছেলেটা ছাড়া পেতে চাইল না।

—জামিনেও না?

—না।

—কেন?

—এখনকার ছেলেদের ধাত আলাদা। ওরা কষ্ট পেতে ভালবাসে। কষ্ট দিতেও।

দুলু আমার কাছেই শুয়ে রইল। অন্য বিছানায় গেল না। আমি তাকে মাঝে মাঝে আদর করছিলাম, যান্ত্রিকভাবে। আদর না করলে পাছে ও কিছু মনে করে। ওদিকে আমি উৎকর্ণ হয়ে আছি কখন আমার শিয়রের জানালায় টোকা পড়ে।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য টোকা পড়ল না। বোধহয় আমাকে পুলিশের গাড়িতে ফিরতে ওরা দেখেছে। হয়তো পুলিশের গন্ধেই ওরা আসছে না। কিন্তু আসবে। আজ না হয় কাল। দেখা হয়ে যাবে। হয় এ দলের সঙ্গে, নয়তো ও দলের। কোথায় পালাবে বাবা—হুঃ! হুঃ!

আমার কোলের কাছেই দুলু ঘুমিয়ে পড়েছিল। ভোরের আবছা আলোয় তার ঢলঢলে মুখখানা মন দিয়ে দেখলাম। দুলু আমাকে ভালবাসে? কেউ কি ভালবাসে? কারো কাছে কি এখনো আমার কোন মূল্য আছে? ভাবতে ভাবতে ভোর রাত্রে ঘুমিয়ে পড়লাম।

বেলায় ঘুম ভাঙল। টের পেলাম, ঘুমের মধ্যে আমি অস্বস্তিকর স্বপ্ন দেখছি। সারা শরীরে জ্বরের অবসাদ। মুখ তেতো। সবচেয়ে ক্লান্ত মন। কিছু ভাবতে পারছি না। মাথার মধ্যে নানা চিন্তা গুলিয়ে যাচ্ছে। সে দিনটা আর বেরোলাম না। শুয়ে রইলাম। ঝিমুলি মর্নিং স্কুল থেকে ফিরে এসে আমার মাথা টিপে দিল। অনেকক্ষণ ছোটনকে বুকে নিয়ে তার শরীরের গন্ধ নিলাম। ভাল লাগছিল।

বিকেলের দিকে দুলু স্কুল থেকে ফিরল। ওর মুখ-চোখ সাদা দেখাচ্ছিল। স্কুল থেকে ফিরে ও রোজ দুটো ভাত খায়। আজ খেল না। শাড়ি-টাড়ি পাল্টে, বাথরুম ঘুরে এসে অনেকক্ষণ ধরে

চুল আঁচড়াল। আমি অপেক্ষা করছিলাম, হয়তো ও আমাকে কালকের ব্যাপারে আর কিছু জিজ্ঞেস করবে।

কিন্তু সে ব্যাপারে কোন কথা না বলে হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে বলল—তুমি আজ বেরোও নি?

—না।

—সে কী। সূর্য আজ কোন দিকে উঠেছিল?

হাসলাম, বললাম—শরীরটা ভাল নেই। বয়সও হচ্ছে।

—সেটা বুঝতে এত সময় লাগল।

চুপ করে রইলাম।

ও মুখ ফিরিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বলল—শরীরটা আমারও ভাল যাচ্ছে না। ভাবছি কিছুদিন বাইরে থেকে ঘুরে এলে কেমন হয়। যাবে?

আমি একটু অবাক হয়ে বললাম—তুমি যেতে চাও? কিন্তু তোমার স্কুল আর টিউটোরিয়াল?

—তারা পালাবে না। ছুটি নিচ্ছি।

একটু ভেবে বললাম—আমার তো অনন্ত ছুটি। কবে যাবে?

—কালই চল।

অবাক হয়ে বলি—এত তাড়াতাড়ি?

ও আয়নার দিকে তাকিয়ে সিঁথিতে সিঁদুর দিতে দিতে বলল—তাড়াতাড়িই ভাল। দেরি করলে উৎসাহ নিভে যায়। তাছাড়া আবার কোন বাধা আসে ঠিক কী!

ইতস্তত করে বললাম—কিন্তু যাওয়ার তো একটা প্রস্তুতি আছে। রিজার্ভেশন নেই, কোথায় যাওয়া ঠিক নেই, তাছাড়া পার্টি-অফিসে আর দুচার জায়গায় খবরও দিয়ে যেতে হবে—

ও দৃঢ় গলায় বলল—না। কোথাও খবর দিতে পারবে না। আমরা চুপ করে চলে যাব, বাড়ির লোক ছাড়া কেউ জানবে না, কোথায় যাচ্ছি তা বাড়ির লোককেও বলে যাব না।

অবাক হয়ে বললাম—কেন?

—আমার ইচ্ছে। ছেলেবেলা থেকে আমার একটা শখ ছিল কারো সঙ্গে পালিয়ে যাবার। যাওয়া হয় নি। বুড়ো হয়ে যাচ্ছি, তাই শখটা মিটিয়ে নিই। তোমার সঙ্গে কাল আমি পালাব।

ক্লিষ্ট হাসলাম। বললাম—ছেলেমেয়েরা ?

—ওরাও যাবে।

—কোথায় যাওয়া হবে ?

—এখন বলব না। স্কুলের বেয়ারাকে টিকিট কাটতে পাঠিয়েছি, সন্ধ্যে নাগাদ এসে দিয়ে যাবে।

—কিন্তু থাকার জায়গা ?

ও হাসল, ব্যাগ থেকে একটা চিঠি বের করে দেখিয়ে বলল—যেখানে যাচ্ছি সেখানে সারাবছর অনেক বড়লোকের বাড়ি খালি পড়ে থাকে। তাদের একজনকে পাঠিয়ে এই চিঠি এনেছি। ওখানে মালী থাকে। চিঠি দেখালেই সে বাড়ি খুলে দেবে।

এত অল্প সময়ে এত ব্যাবস্থা দুলু করেছে দেখে খুবই অবাক হলাম। কিন্তু প্রতিবাদ করলাম না। উত্তরবাংলা ছাড়ার পর দশ বছর হয়ে গেছে কোথাও যাওয়া হয়নি। গাছপালা, পাহাড়-জঙ্গলের জন্য মন কাঁদে। তাই হঠাৎ এ অবস্থায় ভালই লাগছিল। কিন্তু ব্যাপারটা আমি বুঝতে পারছিলাম না। দুলু কি টের পেয়েছে আমার খুব বিপদ !

আমার বাবা এই বুড়ো বয়সেও মেরুদণ্ড সোজা রেখে রোজ বিকেলে অনেকটা হেঁটে আসেন। সেদিনও এলেন। এসেই উত্তেজিতভাবে বাইরের ঘরে মাকে জিজ্ঞেস করলেন—অনু কই ? বাইরে-টাইরে যায় নি তো ?

মা বললেন—না বোধহয়। বিকেলেও ঘরে শুয়ে ছিল। শরীরটা বোধহয় ভাল নেই।

—না বেরিয়ে ভাল করেছে ! দিনকাল বড় খারাপ।

—কেন ?

—বেড়াতে বেরিয়েছিলাম, হঠাৎ নজরে পড়ল দেয়ালে কারা ওর নামে কী সব লিখছে। অনেকগুলো দেয়ালেই লেখা।

—কি লিখেছে ?

—চোখে ভাল দেখি না, ঠিকমত পড়তে পারি না। তবে মনে হল লিখেছে—বিশ্বাসঘাতক, মুণ্ডু চাই, আরো কী কী যেন। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পড়তে ঠিক সাহস হল না।

ঘর অন্ধকার হয়ে এসেছিল। মশার জন্য টেকা যাচ্ছিল না।

আমি আস্তে আস্তে উঠে বসলাম। দুলু কেন কালকেই আমাকে নিয়ে পালাতে চাইছে তা খানিকটা বোঝা গেল।

মা তখনো ব্যগ্রকণ্ঠে বাবাকে জিজ্ঞেস করছে—ওর নামে লিখবে কেন? ও তো কিছু করে নি।

বাবা তেতো গলায় বললেন—আর কিছু না করুক পলিটিক্স তো করেছে।

—কিন্তু কারো ক্ষতি করে নি। আমি ওকে জানি।

—আরো কারো না করুক, নিজের ক্ষতি যথেষ্ট করেছে। কাল রাতে যারা ওকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল তাদের একজন ধরা পড়েছে, শুনেছিলাম।

—তাকে কি ও ধরিয়ে দিয়েছে?

—কী জানি!

মা চুপ করে রইল।

অন্ধকারে বসে নিঃশব্দে আমি এইসব শুনলাম। মনটা বিস্বাদে ভরে গেল। কারা বিশ্বাসঘাতক তা আমি জানি না। তবে এটুকু জানি, কাল রাতে নিজের অজান্তে আমি একটি ফাঁদে পা দিয়েছিলাম। কিন্তু আমার বাবা কী মনে করেন, বিশ্বাসঘাতক আমিই। আর দুলু? সে কী ভাবছে? আমার ওপর কী এদের বিশ্বাস নষ্ট হয়ে যাচ্ছে! এতক্ষণ আমি এদিকটা ভাবি নি। ভেবে মন বড় খারাপ হয়ে গেল!

কাউকে কিছু জানানো হল না। পরদিন সন্ধ্যের পর ট্যাক্সি ডাকা হল। স্তব্ধতা, ভয়, সন্দেহের মাঝখানে আমি, দুলু আর আমার তিন ছেলেমেয়ে হাওড়া স্টেশনে এসে গাড়ি ধরলাম।

রওনা হওয়ার সময়ে বাবাকে বলেছিলাম—সাবধানে থেকো।

বাবা গম্ভীর চিন্তিত গলায় বললেন—আমরা বুড়ো হয়েছি। আমাদের জন্য আর চিন্তা কী। তোমাদের এখনো বয়স আছে, সাবধানে তোমরা থেকো। বুদ্ধি-বিবেচনা হারিয়ে ফেলো না। চারদিকে বিপদ।

'বিপদ' কথাটা সারারাত গাড়ির শব্দের সঙ্গে নূপুরের মত বাজল। সারারাত দুলু আর ছেলেমেয়েরা থার্ডক্লাশের ভিড়ে শুয়ে বসে ঝিমোলো, আমিই কেবল অপলক চোখে বাইরের অন্ধকারের দিকে চেয়ে রইলাম।

ভোর-রাত্রে যশিডি জংশনে গাড়ি থামল। আমরা নামলাম।

আবছা অন্ধকারে টাঙ্গা চড়াই-উৎরাই ভেঙে চলেছে। ঘোড়ার পায়ের কপ্ কপ্ শব্দ। আমার গা ঘেঁষে দুলু। দুলুর কোলে ছোটন ঘুমোচ্ছে। তিতু টাঙ্গাওয়ালার পাশে জড়োসড়ো হয়ে বসে ভোরবেলার দেওঘর দেখছে। ঝিমলি টাঙ্গার ছইয়ের তলায় হাঁটু মুড়ে বসে আছে। ওর মুখে চোখে ভয়। যেতে যেতে মাঝে মাঝে আকাশের দিকে চেয়ে দেখছিলাম। স্তব্ধ, হিম আকাশ! মনটা জুড়িয়ে যাচ্ছিল। আজকাল দেখছি আকাশের দিকে তাকাতে ভাল লাগে।

দুলুকে সে কথা বললাম।

সে হাসল—আকাশ সংসারের বাইরের জিনিস, তাই তোমার ভাল লাগে। সংসারের কিছু তো কোনদিন ভাল লাগল না তোমার।

এই কথা শুনে দুলুর দিকে তাকালাম। আবছায়ায় দেখলাম সেই মুখে প্রশান্ত ভাব। কলকাতা থেকে হঠাৎ বাইরে এলে বিশাল প্রকৃতির মধ্যে মানুষের খুব অবাক লাগে। সেই বিস্ময় ওর মুখে ফুটে আছে।

বললাম—সংসারের বাইরে এসে তোমার খারাপ লাগছে?

—না। ও মাথা নাড়ল, তারপর হেসে বলল—আমিও আকাশ দেখছি। বুড়ো বয়সে বোধহয় এইসব ভাল লাগে। আমরা বুড়ো হলাম।

হঠাৎ আমার বুক মুচড়ে উঠল একটা দুঃখে। আচমকা বললাম—দুলু, তুমি আমাকে সন্দেহ করো না তো?

ও অবাক হয়ে বলল—কেন?

আমি বললাম—ঐ ছেলেটাকে কিন্তু আমি ধরিয়ে দিই নি!

দুলু চুপ করে রইল।

খানিকটা ভেবে আমি আস্তে আস্তে শ্বাস ছেড়ে আবার বললাম—দুলু, আসলে ওকে বোধহয় আমিই ধরিয়ে দিয়েছি।

দুলু একটু শিউরে উঠল। তারপর অনেকক্ষণ স্তব্ধ থেকে বলল—তুমি পরশু থেকে ঘরের বার হও নি। তাই কোন খবর জান না। ছেলেটা কাল হাসপাতালে মারা গেছে। আজ সকালে শোক-মিছিল বেরোনোর কথা। দেওয়ালে তোমার নামে পোস্টার পড়েছে।

একটা শ্বাস ছেড়ে বললাম—জানি।

দুলু তাড়াতাড়ি বলল—কিন্তু আমি জানি, ওরা বাজে ছেলে। তুমি কিছু অন্যায় করো নি।

আমি চুপ করে আকাশের দিকে তাকালাম। ওখানে বড় শান্তি মনে হল।

এখানে আমি আগে আর কখনো আসিনি। ভোরের আলোয় প্রথম দেখে জায়গাটি বড় ভাল লাগল। ছোট টিলা, পাহাড়, ছোট্ট নদী ধারোয়া, নানা চড়াই-উৎরাই জুড়ে নির্জন শহরের প্রসার। ক্যাস্টর টাউন খুবই নির্জন জায়গা। ইউক্যালিপটাস গাছ, আর বোগেনভেলিয়ার লতানে রঙিন ফুলের ভিতরে বাগানঘেরা বিরাট বাড়িগুলো ঝিমিয়ে আছে। বেশিরভাগ বাড়িতেই কেউ থাকে না। কালে-ভদ্রে লোকজন আসে। আমাদের বাড়িটা পুরনো, বাগানে খুব আগাছা জন্মেছে।

গেটের কাছে একটা বাচ্চা ছেলে দাঁড়িয়ে হাই তুলছে। আমাদের টাঙ্গা থামতেই দু'এক পা এগিয়ে এল। লক্ষ্য করলাম, খোঁড়া। পায়ের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, ডান পায়ের পাতাটা অর্ধেক নেই। তার উঁচু দাঁত পুরু দুই ঠোঁটে ঢাকা পড়ে না। তার ওপর সে আবার সব সময়েই হাসে।

জিজ্ঞেস করলাম—মালী নেই?

সে ঘাড় নাড়ল—আছে।

— ডাকো তো।

খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে সে ভিতরে গেল। একটু পরেই বুড়ো মত একটা লোককে নিয়ে এল। অবাক হয়ে দেখি খালি গা আর ময়লা হেঁটো ধুতি পরা লোকটার চোখে ভারি একটা চশমা। একটা কাচ আবার ঘষা। বুঝলাম, হয় ও চোখটা নেই, নয়তো ছানি আছে।

আমাদের চিঠিটা সে হাত বাড়িয়ে নিল। তারপর ভাঙা বাংলায় বলল—আমার চোখ কমজোরী। এ কী দাশবাবুর চিঠি?

—হ্যাঁ। ঘর-দোর খুলে দাও!

—জী।

তারপর সেই খোঁড়া ছেলেটাকে বলল—সামান উতরো।

টাঙ্গাওয়ালা আর সেই খোঁড়া ছেলেটাতে মিলে আমাদের মালপত্র ধরাধরি করে বারান্দায় তুলতে লাগল।

কাঠের জাফরি দেওয়া বারান্দা, তারপর বিশাল ঘরগুলি। প্রকাণ্ড দরজা খুলতেই পুরনো বাতাস বেরিয়ে এল।

বারান্দায় পা দিয়েই বললাম—দুলু, এ বাড়ি একপুরুষের নয়। ক্ষুধিত পাষাণ।

দুলু উত্তর দিল—হুঁ।

তারপর মালীকে বলল—ঘর-দোর ভাল করে পরিষ্কার করে দাও। কত পোকামাকড় বাসা বেঁধে আছে কে জানে।

বন্ধুগণ, ঐ যে দেখুন, একটা গুবরে পোকা দেওয়ালে ঠোক্কর খেয়ে চিৎ হয়ে পড়ল। যেমন বোকা স্বভাব, তেমনি বেঢপ শরীর। হাত-পা নেড়ে প্রবল চি-র্-র্ শব্দে চিৎ হয়ে ঘুরপাক খাচ্ছে, চেষ্টা করছে উপুড় হতে। ওকে লক্ষ্য করুন। উপুড় হতে ও

করবে কি ? আবার সেই ওড়া, উড়ে উড়ে দেওয়ালে ঠোক্কর খেয়ে চিৎ হয়ে পড়ে আবার উপুড় হওয়ার চেষ্টা। নিরন্তর, অর্থহীন, একঘেয়ে এই চেষ্টা থেকে ওকে মুক্তি দেওয়ার জন্যই পোকাটির ওপর স্প্রে গান-এর মুখটা ধরলাম আমি। নাক পর্যন্ত আমার মুখের অর্ধেক রুমাল বাঁধা। রুমালের আড়ালে আমি সামান্য একটু হাসলাম। বন্ধুগণ, পোকাটার জন্য আমার একটু মায়াও হচ্ছে। আমার হাতে নতুন কেনা স্প্রে-গান, তার মধ্যে তীব্র কীটানুনাশক বিষ। যন্ত্রটার হাতল টেনে আমার হাত একটু থেমে আছে। বস্তুতঃ এই পোকাটা মরতে চায় না। যতই অর্থহীন হোক তার বাঁচা, তবু সে বাঁচতেই চায়। বন্ধুগণ, স্প্রে-গান-এর ওপরে আমার হাত থেমে আছে, মুখ রুমালে ঢাকা, আমি এখন কী করতে পারি ?

সামান্য একটু সময়। দ্বিধা বা মনুষ্যত্ব—যা বলুন। ঐটুকু সময় পোকাটা বেঁচে রইল। তারপর আস্তে হাতলটায় চাপ দিই। চিড়বিড় করে ওঠে পোকাটা, লাট্টুর মত ঘুরপাক খেতে থাকে। এবার দ্বিধাহীনভাবে জোরে স্প্রে করি আমি। তীব্র ঝাঁঝালো কীটানাশকের গন্ধে ভরে গেল ঘর। ধোঁয়ার মত তা ঢেকে ফেলল পোকাটাকে। শুনতে পাচ্ছি, পোকাটা চিৎকার করছে। ভাষাটা বোঝা যায় না। কিন্তু এসময়ে সকলেরই ভাষা এক আমি তা বুঝতে পারি, কিন্তু তা বলে থামি না। তীব্র ঝাঁঝ বিষে ভিজিয়ে দিই তাকে। হঠাৎ পোকাটা উল্টে গেল। উড়ল। ভাবলাম, পালাবে বুঝি। পারল না। এক চক্কর ঘুরল ঘরের ভিতরে, তারপর দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে পড়ল। শেষ কয়েকটা চিরু-শব্দ। তারপর চুপ।

হাতের উল্টো পিঠে কপালের চুল সরিয়ে রুমালের আড়ালে একটু হাসি। নতুন কেনা পোকাদের বিষ, তার প্রথম শহীদ একটা গুবরে পোকা। হত্যাকারী অতনু সেন, একজন হতে পারত এম. এল এ.।

পা দিয়ে পোকাটাকে জোর একটা লাথি কষাই। খাটের দু' পায়ার ফাঁক দিয়ে ভিতরে ঢুকে গেল সেটা। গো-ও-ল। গোলদাতা অতনু সেন—দুলুর স্বামী, তিতু-ঝিমলি ছোটনের বাবা।

রুমালের আড়ালে আমি হাসি। হত্যাকাণ্ডের সবে তো শুরু। এখনো অনেক বাকি। হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকি খাটের নীচে। বহুকাল ধরে বন্ধ পড়েছিল ঘর। যদিও সকালেই আজ ভাল ঝাড়পোঁছ হয়েছে, জলের দাগ এখনো মুছে যায় নি, তবু বন্ধ ঘরের একটা গন্ধ আছেই। আর কে জানে, ফাটা মেঝে কিংবা দেয়ালে, কোন ঘুপচিতে কোথায় ঘাপটি মেরে আছে কাঁকড়া তেঁতুল বিছে। আরশোলাই কি কম! আর ছারপোকা! সবচেয়ে বেশি অবশ্যই মশা। কাজেই হত্যা-হাহাকারের সবে শুরু। রুমালের আড়ালে আমি হাসি। পিঁচ পিঁচ করে বিষের ঝরণা ছড়াই। ধুন্ধুমার লেগে যায় কীটের জগতে। চোঁ-ও-ও, চিড়িক, পিড়পিড়—কতরকম সর্বনাশের শব্দ ওঠে তাদের জগৎ থেকে! রুমালের উপর আমার দু'টি চোখ উগ্র কৌতূহলে তাদের লক্ষ্য করে। বিষে ভিজিয়ে দিই বাতাস। মশা আর শ্যামাপোকা, কয়েকটা বাচ্চা মথ দেয়ালে উড়ে উড়ে বসে, বিন্ বিন্ করে পাগলের মত ঘোরে। আমি স্প্রে-গান্ তুলে ধরি। মেঘের মত বিষ উড়ে যায় পোকাদের কাছে। নম্র স্পর্শ করে তাদের শরীরে। দেয়াল থেকে একটি একটি করে খসে পড়ে মশা, শামাপোকা, মথ। দরজা-জানালা বন্ধ, কোথাও পালানোর উপায় নেই। বড় জোর চেষ্টা করে সিলিং পর্যন্ত উঠতে পারে। তবে তাই ওঠো। তাতে পড়াটা হবে আরো চমৎকার।

কিছুক্ষণের মধ্যেই কীটানুনাশকের কণায় তেলতেলে হয়ে গেল ঘরের মেঝে। মেঝের ওপর মরা-আধমরা পোকা গিজ্ গিজ্ করছে। একটা লালচে ফড়িং বোধহয় উত্তরের ঘাসফুলের জঙ্গল থেকে এসে বেভুলে ঢুকে পড়েছিল। সে এখনো মরেনি। চিৎ হয়ে পড়ে থেকে শরীরের সরু নিম্নাংশ আমার দিকে আঙুলের মত একবার তুলল। হাঁটু গেড়ে ফড়িংটাকে একটু দেখি। ভারী সুন্দর তো! এমন লাল ফড়িং কখনো দেখি নি। আগে দেখলে জানালা খুলে তাড়িয়ে দিতাম। এখন আর কিছু করার নেই। সুন্দর ফড়িংটার দিকে চেয়ে বললাম—গিল্টি মিলর্ড। শান্তভাবে ফড়িংটা তার শরীর নামিয়ে নিয়ে মারা গেল। যতদূর দেখা যাচ্ছে যুদ্ধক্ষেত্র শান্ত। একটি পোকারও ওড়া-উড়ি নেই। বিষের ঝাঁঝে চোখে জল আসছে,

সুড়সুড় করছে নাক। বাতি নিভিয়ে ঘর বন্ধ করি আমি।

বাইরের ঘরটায় সোফা, টেবিল, চেয়ার, ফুলদানী, একটা ক্যাম্প-খাট। এই ঘরেও স্প্রেটা ভালই ছড়ালাম আমি। অভ্যাসে মানুষের লক্ষ্য স্থির হয়। প্রায় পঞ্চাশটা আরশোলা মরল আমার হাতে, একটা বাচ্চা ইঁদুর পালাল বটে কিন্তু একঝাঁক বিষ খেল সে-ও। একটা টিকটিকির বুকেও ঢুকে গেল খানিকটা বিষ। একটা উড়ন্ত বোলতাকে কয়েক ঝাঁক বিষ খাওয়ালাম আমি। সেটা মরল। ক্রমে বাইরের ঘরটাও স্তব্ধ, বিষপূর্ণ হয়ে গেল।

এতক্ষণ প্রবল এক উত্তেজনা বোধ করছিলাম আমি। সেটা এবার থিতিয়ে এল। স্প্রে-গানটা রাখলাম উদোম টেবিলের ওপর। টস্‌টসে ঘাম জমেছে কপালে। রুমালের আড়ালে ভারী শ্বাস। ওষুধের গন্ধে গুলোচ্ছে পেট। শরীর ক্লান্ত।

বাতি নিভিয়ে দরজা খুলে বারান্দায় পা দিতেই একঝলক পরিষ্কার ঠাণ্ডা বাতাসে শীত করে উঠল। রুমালটা খুলে ফেলতেই পরিষ্কার বাতাসে ভরে গেল বুক।

বারান্দার সিঁড়িতে ছেলেমেয়ে নিয়ে বসে আছে দুলু। বসে আকাশপাতাল ভাবছে। ঝিমলি বসে আছে সিঁড়ির শেষ ধাপটায়, ওর পায়ের কাছে বুড়ো মালীর ছেলে বুধিয়া। বুধবারে জন্ম হয়েছিল বলে ওর এ নাম। দুপুরবেলা আমার ঘুম হয় না। খাওয়া দাওয়ার পর দুলু যখন ছেলেমেয়ে নিয়ে ভিতরের ঘরে ঘুমোচ্ছিল, তখন বাইরের ঘরে ক্যাম্প-খাটে শুয়ে আমি বুধিয়ার গল্প শুনছিলাম। গত বছর রেল ইয়ার্ডে কয়লা কুড়োতে গিয়েছিল, সে সময়ে খালাশীদের বড় বড় ছেলেরা তাড়া করে। পালাবার সময়ে লাইন ডিঙোতে গিয়ে আই বাপ্‌—এক শান্টিং এঞ্জিন। এঞ্জিনটা ওর পা মাড়িয়ে দিয়ে গেল। পায়ের জন্য ওর খুব একটা দুঃখ নেই। পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে গেলে হাত-পা চোখ সব যে সবসময়ে ঠিকঠাক থাকবেই তার কোন মানে নেই। ওর বাবার একটা চোখে ছানি বেশী পেকে গিয়েছিল, ডাক্তাররা ছুরি চালাতেই খানিকটা পুঁজ বেরোলো—ব্যাস, চোখটা ঘুটঘুটে অন্ধকার হয়ে গেল। আর একটা চোখেও ছানি আসছে, ওটা কাটলেও যদি

—পুঁজ বেয়োয় তো পুরো দুটো চোখ অন্ধকার হয়ে যাবে—তা বলে কি বাবা কাঁদতে বসবে? ভিখ্‌মাঙ্গা সুরদাসেরা কি বেঁচে নেই? তেরো-চোদ্দ বছর বয়সে বুধিয়ার এই হল জীবন-দর্শন।

এখন ছিমলির পায়ের কাছে বসে সে ভূতের গল্প বলছে। দক্ষিণের ঐ শিমুল গাছের ডাল বেয়ে দু একটা পরী এসে নামে পিছনের গোলাপ-বাগানে। সুযোগ পেলে তারা মানুষকে উড়িয়ে নিয়ে যায় তাদের রাজ্যে। দু চারদিন খুব তোয়াজ করে, নানা সুখাদ্য খাওয়ায়, গোলাপজলে স্নান করায়। সুন্দর ফুলের বিছানায় শুতে দেয়। তারপর আবার ফিরিয়ে দিয়ে যায়। কিন্তু যাকে পরীতে নেয় সে ফিরে এলেও তার আর পৃথিবীর কিছুই ভাল লাগে না। না খাবার, না বিছানা, না ঘর-সংসার। সে তখন কেবলই পরীর রাজ্যের কথা বলতে থাকে। বলতে বলতে আর ভাবতে ভাবতে হয়ে যায় পাগল। খাবার খেতে পারে না বলে, না খেয়ে খেয়ে হয়ে যায় কাঠির মত রোগা। তারপর একদিন মরে যায়। কতদিন বুধিয়ার বাপ রাতবিরেতে গোলাপবাগানে জ্যোৎস্নার মত গায়ের রংওয়ালা পরীদের দেখেছে।

দুলুর দিকে চেয়ে বললাম—আর আধঘন্টা। তারপর দেখো, আর একটাও পোকামাকড় নেই।

দুলু অন্যমনস্কভাবে গেট-এর দিকে চেয়েছিল। আমার কথায় চমকে উঠে মুখ ফেরাল। একটুক্ষণ চেয়ে থেকে বলল—কয়েকটা ছেলে রাস্তা দিয়ে হেঁটে গেল। এইমাত্র।

—তাতে কী হয়েছে।

দুলুর মুখ গম্ভীর। বলল—এদিকে খুব তাকাতে তাকাতে যাচ্ছিল।

ভিতরে ভিতরে একটু চমকে উঠলাম। অজান্তে আমার মুখের রক্ত সরে যাচ্ছিল। সামলে নিয়ে হাসলাম—কত ছেলে আছে। এখানকার লোকাল ছেলেই হবে হয়তো।

—তাহলে তাকাবে কেন?

—বাঃ! খালি বাড়িতে নতুন লোক এলে তাকায় না?

দুলু তবু স্বস্তি পেল না। ওর কোলে ছোটন ছটফট করছে। তবু আঁকড়ে ধরে আছে দুলু। সে অন্যমনস্ক।

আমি ছোটনের দিকে হাত বাড়িয়ে বললাম—আয় বাবা, চল বেড়িয়ে আসি।

ছোটন হাত বাড়িয়ে আসছিল। দুলু তাকে আমার দিকে বাড়িয়ে দিতে দিতে থমকে বলল—হাত ধুয়েছ?

—না তো।

—পোকামারার ওষুধ বিষ—জান না?

—খেয়াল ছিল না।

—খেয়াল রাখতে হয়। ছেলেপুলে নিয়ে ঘর—

ছোটন হওয়ার আগে একরাতে বিছানায় শুয়ে জেগে থেকে দেখছিলাম, দুলু ভ্রূণ নষ্ট করবার বড়ি জল দিয়ে গিলে খাচ্ছে। মুখে জল নিয়ে হাঁ করে ঊর্ধ্বমুখ দুলু যখন বড়িটা মুখে ফেলতে যাচ্ছে, ঠিক সেই সময়ে আমি চোখ বুজে ফেলেছিলাম। কী নির্দয় দেখিয়েছিল দুলুকে! আজ দুলু ভাবতেও পারে না সেই সব দৃশ্য। অথচ এখনো ছোটন বয়সের অনুপাতে রোগা, তার মাথায় দীর্ঘস্থায়ী ঘা।

আমি বাথরুম থেকে হাত ধুয়ে এলাম।

—সাবধানে যেও। বেশীদূর যাওয়ার দরকার নেই। বেরোবার আগে দুলু সাবধান করে দিল।

কোলে ছোটন, দুধারে ঝিমলি আর তিতু. আগে আগে খোঁড়া বুধিয়া, তার হাতে একটা বেতের লাঠি। আমরা ক্যাস্টর টাউনের নির্জন রাস্তায় বিকেলের পড়ন্ত রোদে ইউক্যালিপটাসের ছায়ায় পা দিই। সুগন্ধী নির্জনতা, লাল কাঁকরের পথ, বহুদূর পর্যন্ত কাউকে চোখে পড়ে না। শেষ বর্ষায় এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে দুপুরে, তাই বহু দূরে কুয়াশার মত ভাপ উঠছে। মৃদু বাতাস বইছে। ঘরে ফেরা পাখি ডাকছে খুব। ঝিমলি আর তিতু এই সৌন্দর্যে মূক হয়ে যায়। জন্মাবধি তারা কলকাতার বাইরের জগৎ দেখেনি। আমার গা ঘেঁষে হাঁটতে থাকে তারা। ছোটন আমার কোল থেকে বড় বড় চোখে চেয়ে থাকে।

একটা ঢালু বেয়ে পথটা নেমেছে, আবার চড়াই বেয়ে উঠেছে অনেকটা ওপরে। ঢালু বেয়ে নামতেই একটা কালভার্ট। কয়েকটা

হনুমান বাচ্চা বুকে নিয়ে রাস্তা পেরোচ্ছে। ভয়ে ঝিমলি আর তিতু আমাকে জড়িয়ে ধরে। হেসে গড়ায় বুধিয়া।

হাঁটতে হাঁটতে একসাথে তিতু আর ঝিমলি এগিয়ে গিয়ে বুধিয়ার সঙ্গে হাঁটে। রাজ্যের গল্প করে বুধিয়া। আমার কোলে ছোটন তার হাত তুলে এটা ওটা দেখায়। প্রশ্ন করে। অন্যমনস্ক ভাবে আমি হাঁটি।

চৌরাস্তার মোড়ে কয়েকটা দোকানপাট। তিন-চারটে রিক্সা দাঁড়িয়ে আছে। লোকজনের চলাচল দেখা যায়। চার প্যাকেট সিগারেট কেনার জন্য দাঁড়াই। ততক্ষণে বুধিয়া, ঝিমলি আর তিতুকে নিয়ে কোন রাস্তায় চলে গেল খেয়াল করিনি। সিগারেটের প্যাকেট পকেটে ভরে ফেরত পয়সার জন্য হাত বাড়াতেই হঠাৎ খেয়াল হয়, ওরা কোন রাস্তায় গেল লক্ষ্য করিনি তো।

চিন্তার কিছু নেই। সঙ্গে বুধিয়া আছে, জায়গাটাও নিরিবিলি, ওরা হারাবে না। তবু একটু খুঁজে দেখা দরকার। যে পথটা সোজা গেছে, সে পথটাতেই যাওয়া সম্ভব। এই ভেবে আমি চৌরাস্তা পার হয়ে সোজা হাঁটি। কিন্তু রাস্তাটা সোজা গেছে, বহু দূর পর্যন্ত কাউকে দেখা যায় না। আমি আবার ফিরে আসি চৌরাস্তায়।

পান-সিগারেটের দোকানদারকে জিজ্ঞেস করি—দুটো বাচ্চা ছেলেমেয়ে আর একটা খোঁড়া ছেলেকে যেতে দেখেছ?

লোকটা মাথা নাড়ে—খেয়াল করিনি।

একটা ছোকরা রিক্সাওয়ালা তার রিক্সার সীট থেকে টপ করে নেমে বলল—লেংড়া বুধিয়ার সঙ্গে দুটো খোকাখুকি তো?

—হ্যাঁ হ্যাঁ—

—এই তো এই রাস্তায় গেছে। চলুন না নিয়ে যাচ্ছি।

—না, রিক্সার দরকার নেই।

ডানদিকের রাস্তাটাই দেখাল রিক্সাওয়ালা। পথটা একটা চড়াই ভেঙে বেঁকে গেছে। আমি আস্তে আস্তে এগোই। ছোটনকে কোল বদলে নিই। ছেলেটাকে ক্রমশঃ ভারী লাগছে, ঘেমে যাচ্ছে আমার গা।

বাঁক পেরোতেই আবার উৎরাই, আবার একটা বাঁক। ওদের

দেখা গেল না। দিনের আলো আস্তে আস্তে মরে আসছে। একটা ধোঁয়াটে মেঘ ঢাকা দিয়েছে পশ্চিম আকাশ। বাড়ী থেকে বহুদূর চলে এসেছি। অন্ধকার হয়ে আসছে। আমার ভাল লাগছে না।

বাতাসে তীব্র ফুলের গন্ধ। ভেজা মাটির গন্ধ। সিগারেটের জন্য আনচান করেছে শরীর। কোলে ছোটনকে ক্রমশঃ ভারী লাগছে।

ছোটনকে বললাম—একটু নামবে বাবা?

সে মাথা নেড়ে আমাকে জোরে আকড়ে ধরল।

—নিজেকে একটু হাল্কা করে বাবা, অত জোরে আঁকড়ে ধরো না।

ছোটন গম্ভীরভাবে আমাকে ধরেই রইল।

ডানদিকে প্রচন্ড একটা ভুতুড়ে বাড়ির বাগান পেরিয়ে একটা ছোট্ট পরিষ্কার মাঠ। সেইখানে ছায়াহীন স্পষ্ট দিনের আলো পড়ে আছে।

একটু জিরিয়ে নিতে ইচ্ছে করছে। সিগারেটের জন্য আনচান করছে শরীর। ছোটকে মাঠের ওপর ছেড়ে দিয়ে বললাম—একটু হেঁটে এসো তো বাবা!

ছোটন হাঁটল না। আমার হাঁটু খামচে দাঁড়িয়ে রইল। আমাকে বসতে দেখেই কাঁদতে লাগল—মা-র কাছে যাব।

বিরক্তিতে একটা থাপ্পড় তুলেছিলাম। অমনি সেই দৃশ্যটা মনে পড়ল—ঊর্ধ্বমুখে দুলে জল নিয়ে বড়ি গিলছে। আর মারা হল না। কোলের কাছে টেনে বসিয়ে বললাম—কাঁদে না, এক্ষুণি দাদা আর দিদি আসবে এই রাস্তা দিয়ে দেখো।

গোটা দুই সিগারেট শেষ হয়ে গেল, সামনের রাস্তাটা দিয়ে কেউ ফিরল না। মাঠের ওপর আলো নিস্তেজ হয়ে এল। ভেজা মাটির ভাপ উঠে কুয়াশার মত ঢেকে দিয়েছে চারধার। মাটি ভিজে উঠছে। বাতাসে হিমভাব! বার বার বিরক্তিতে কেঁদে উঠছে ছোটন—বাড়ি যাব, মা-র কাছে যাব।

তিতু আর ঝিমলির জন্য দুশ্চিন্তা নিয়ে উঠলাম। কোলে ছোটন। রাস্তায় ভাল আলো নেই। দুধারে অন্ধকার সব বাগান। বাগানের

মধ্যে নিঝুম বড় বড় বাড়ি। কদাচিৎ কোন বাড়িতে আলো চোখে পড়ে। দুশ্চিন্তা নিয়ে হাঁটলাম। চড়াইটা ভাঙছি, হঠাৎ ওপর দিকে চেয়ে দেখি চড়াইয়ের মাথায় চারটে ছেলে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। ওদের মাথার ওপর একটা ল্যাম্প-পোস্ট। তার ম্লান আলোতে দেখা যাচ্ছে, পরনে সরু প্যাণ্ট, গায়ে চেক শার্ট, কিংবা গেঞ্জী। স্থির দাঁড়িয়ে চারজন আমাকে দেখছে। সিগারেট জ্বলছে তাদের হাত এবং মুখে।

আমার পাঁজরে দ্রুত হাতে ধাক্কা মারল হৃৎপিণ্ড। আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম।

এত তাড়াতাড়ি ওরা খবর পাবে, আমি জানতাম না। কত সহজেই ওরা পেয়ে গেল আমাকে। আমার বন্ধু প্রকাশ মরার সময় টুঁ শব্দটিও করতে পারেনি। তার সমস্ত শরীর ছোরায় ছোরায় লণ্ডভণ্ড হয়ে গিয়েছিল, উপর্যুপরি রডের আঘাতে সমস্ত মাথাটা দুমড়ে গিয়ে ফেটে চৌচির হয়ে গিয়েছিল! অতটা করার দরকার ছিল না। একটা রডের ঘা, দুচারটে ছোরার আঘাতই যথেষ্ট। প্রকাশ দীর্ঘদিন ধরে ভুগছিল ডায়াবেটিসে, হার্টও তার ভাল ছিল না। তবু যে অতটা করা হয়েছিল তার শরীর নিয়ে—আমার মনে হয়—তার কারণ দুটো। এক, ঘৃণাকে যতখানি সম্ভব প্রকাশ করা। দুই, লোকের মনে ঐ বীভৎসতার দ্বারা প্রচণ্ড আতঙ্ক সৃষ্টি করা। দুটো উদ্দেশ্যই সফল। প্রকাশের মৃতদেহে আমি কাঁধ দিয়েছিলাম। তার ফলে আজও সেই ভাঙা চৌচির মাথা আর ছোরার ঘায়ে হাঁ হয়ে থাকা তার এলানো শরীর যতবার ভাবি ততবার আমার ভিতরে কী একটা রী-রী করে ওঠে। মৃগী রুগীর মত আমি দাঁতে দাঁত চেপে ধরি হাত মুঠো হয়ে যায়! চিন্তা-ভাবনা গুলিয়ে যায়।

ঢালুর ওপর চারটে ছেলে শান্তভাবে অপেক্ষা করছে। জ্বলছে সিগরেট। অপেক্ষা করছে হয় আমি তাদের কাছে উঠে যাব, নয়তো তারাই আমার কাছে নেমে আসবে। আমি তাদের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছি। তারা আমার দিতে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কয়েক মুহূর্তের জন্য আমার কোলে যে ছোটন রয়েছে সে কথা আমি ভুলে গিয়েছিলাম।

হঠাৎ সেই স্তব্ধতার মধ্যে ছোটন আমাকে পায়ের ধাক্কা দিয়ে বলল, চল বাবা বাড়ি যাব।

—হ্যাঁ চল।

তারপর আমি ফিস্ ফিস্ করে নিজেকে বললাম—ঠিক আছে। কেন বললাম, তা জানি না। ছোটনকে আমি আর একটু জোরে চেপে ধরলাম বুকে। একবার পিছন ফিরে দেখলাম—অন্ধকার সর্পিল রাস্তা। নির্জন। আমার দুটো ছেলেমেয়ে আর বুধিয়া গেছে এই পথে। ফেরেনি। কোথায় গেল ওরা, শেষবারের মত ওদের মুখ যদি দেখতে পেতাম!

প্রকাশের কথা মনে না করার চেষ্টা করছিলাম। তবু মনে এল। অমনি সমস্ত শরীর কুঁকড়ে গেল আমার শীত করল। ঘাম দিল। অবশ লাগল। মাথার মধ্যে ঘূর্ণীঝড়ে ওড়া খড়কুটোর মত চিন্তারাশি এলোমেলো উড়তে লাগল। মাথা নীচু করে আমি আস্তে আস্তে উঠতে লাগলাম। ছোটন বাড়ি যাবে। যতটা পথ সম্ভব তাকে এগিয়ে দিই।

ল্যাম্প-পোস্টের কাছাকাছি উঠে এলাম। মুখ তুলে দেখি চারটে ছেলে একই ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে। আমাকে দেখছে। তাদের জুলপী বড়। মাথায় লম্বা চুল! লম্বাটে তাদের চেহারা। তাদের স্থির-নিশ্চিত ভঙ্গী দেখে আমার আর কিছুই বোঝবার বাকি রইল না। কী জানি কেন আমি তাদের দিকে চেয়ে একটু কাঠ হাসি হাসলাম। তারা হাসল না। তাকিয়ে রইল।

ঢালুটা সম্পূর্ণ উঠে তাদের মুখোমুখি হতেই আমার ভুল ভাঙল। দলে তারা চারজন নয়। ছয়জন। অদূরে রাস্তার পাশে এক বাগানবাড়ির বাগানের দেয়ালে পেচ্ছাপ করে বাকী দুজন প্যাণ্টের বোতাম আঁটতে আঁটতে আসছে। তাদের একজন চেঁচিয়ে বলল--বুঝলি পরিতোষ, এদের বাগানে যা জল দিয়ে গেলাম না, দারুণ ফলন হবে—

এরা চারজন হাসল। এরা ওদের অপেক্ষায় দাঁড়িয়েছিল এতক্ষণ।

আমি ছোটনকে কোলে নিয়ে তাদের পেরিয়ে গেলাম। তারা ঢাল্ বেয়ে নামতে লাগল।

বেঁচে থাকা কী রকম ভাল। মানুষ কত বন্ধুর মত একে অন্যকে পেরিয়ে যায়, আক্রমণ করে না।

ঢালুর ওপর দাঁড়িয়ে আমি একবার পিছু ফিরে চাইলাম। নেমে যেতে যেতে ছয়জনের একজন একবার ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল। আমি মুখ ফিরিয়ে নিলাম।

ছোটন বাড়ি যাবে। আমি দ্রুত হাঁটতে লাগলাম। সামনেই চৌরাস্তা। কয়েকটা রিক্সা দাঁড়িয়ে, আলো, লোকজন। আমি ডাকলাম—এই রিক্সা—

গেট-এর কাছে দুলু দাঁড়িয়ে, তার পাশে ঝিমলি, তিতু। রাস্তায় খানিকটা এগিয়ে দাঁড়িয়ে আছে প্রায় অন্ধ মালীটা। রিক্সা থামতেই তিতু আর ঝিমলি চেঁচিয়ে উঠল—এই তো বাবা—ছোটন সোনা—

দুলু গেট খুলে এগিয়ে এল, বলল—এর চেয়ে আমাকে মেরে ফেল।

—কেন?

—উঃ, চিন্তায় চিন্তায় আমার মধ্যে আমি নেই। রোগা ছেলে-টাকে নিয়ে গেছ—ইস্—কখন থেকে না খেয়ে আছে ছেলেটা—

—ওরা কখন এল?

- অনেকক্ষণ, ওরা একটা শর্টকাট ধরে এসেছে। এসে বলল, তুমি ওদের পেছন পেছন আসছ। তারপর অনেকক্ষণ আসছ না দেখে, একটু আগে, বুধিয়াকে পাঠালাম আবার—দাঁড়িয়ে আছি কখন থেকে—

তিতু আর ঝিমলি আমার দুহাত ধরে ঝুলে পড়ে—বাবা আমরা কী রকম শালজঙ্গলের ভিতর দিয়ে এলাম! আমরা তো ভেবেছি তুমি পিছনেই আসছ, জানতাম না তো যে তুমি হারিয়ে গেছ!

সন্ধ্যে পার করে চাঁদ উঠল। আমি বাইরের সিঁড়িতে একা বসে। সামনে চরাচর, জ্যোৎস্না। বড় বেশী নির্জনতা এখানে। এই নিস্তব্ধ জ্যোৎস্না ও দূরের বিশাল প্রসার, তার একাকীত্ব আমি সহ্য করতে পারছি না। একসময়ে মাঠ-ঘাট আমার প্রিয় ছিল, ভাল বাসতাম অরণ্য, পাহাড়। কী জানি, নিজের অজান্তে কবে

কলকাতার বুক-চাপা ভীড়, ভাল লেগে গেছে। ভিতরে এক বাঘের আস্তানা। সেই বাঘের নাম ভয়, নিঃসঙ্গতা, দুশ্চিন্তা। একা হলেই সেই রঙীন বাঘ লাফ দিয়ে ধরে এসে। ছিঁড়ে খায় অস্তিত্ব। এখন আর গাছের ছায়া ভাল লাগে না, ভাল লাগে না বিশাল ফাঁকা বাড়ি, জনহীন রাস্তাঘাট, কিংবা অন্ধকার।

ঐ যে ছয়জন, ওদের একজন আমাকে পিছন ফিরে দেখেছিল। দুবার। ও কি চিনেছিল আমাকে? হবেও বা। আমি যে জীবন যাপন করেছি, তাতে অনেকেই চিনে রেখেছে আমাকে, চিহ্নিত করে রেখেছে। অথচ, তাদের অধিকাংশকেই আমি চিনে রাখিনি। চিনে রেখে তারা মনে মনে ভাবছে—কোথায় পালাবে বাবা! হুঁ-হুঁ!

দুলু নিঃশব্দে এসে ভরা জ্যোৎস্নায় দাঁড়াল সিঁড়ির মাঝের ধাপে! কয়েক পলক মুগ্ধচোখে চেয়ে দেখল চাঁদ। শ্বাস ফেলল একটা।

জিজ্ঞেস করলাম—ছেলেমেয়েরা খেয়েছে?

—হুঁ। ঘুম পাড়িয়ে এলাম।

—তাহলে এবার বোসো এখানে।

দুলু বসল। বসে বলল—বাড়িটা বড্ড পুরনো। একটু আগে একটা বিছে মারলাম রান্নাঘরে। বড় বিছে। বাচ্চাদের যদি কামড়ায় তো শেষ হয়ে যাবে।

—সাবধানে থেকো। ওসব প্রকৃতির জীব, সব জায়গায় আছে। খামোখা কামড়ায় না।

—তবু, ভয় করে।

ভয় করে—কথাটা শোনামাত্র আমার শরীরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে গেল। স্নায়ুমজ্জায় সেতারের ঝঙ্কারের মত বাজতে লাগল! ভয় করে, আমাদের বড় ভয় করে।

দুলু বাইরের দিকে চেয়ে থেকে অন্যমনস্কভাবে আস্তে আস্তে ববল, তুমি পোকামারা ওষুধ দিয়েছিলে ঘরে। আধঘণ্টা পর যখন ঘর ঝাঁট দিলাম তখন—মাগো—কত পোকা যে বেরোলো। ওজন করলে কয়েক সের হবে। তার মধ্যে কয়েকটা আবার বেঁচে ছিল। অত পোকা একসঙ্গে দেখে গা শির শির করছিল!

—এখন আর পোকা নেই। হলে, আবার ওষুধ দেব।

দুলু আমার দিকে তাকিয়ে বাচ্চা মেয়ের মত লাজুক হাসি হেসে বলল—সে কথা না। ভাবছিলাম, আমরা অত পোকা মারলাম, পোকারা যদি কখনো তার শোধ নেয়।

আমি হো হো করে হেসে বললাম—দুলু, ভয় পেতে পেতে ভয় তোমার বিকারে দাঁড়িয়ে গেছে!

দুলু মাথা নীচু করে বলল—বুধিয়া পোকাগুলো কাগজে করে নিয়ে বাইরে ফেলতে যাচ্ছিল। বাচ্চা ছেলে তো! বোধহয় কষ্ট হয়ে থাকবে। বলল, এতগুলো জীব মেরে ফেললেন! এমন-ভাবে বুকটা কেঁপে উঠল।

আমার আর হাসি পেল না! কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললাম—দুলু তোমার ছুটি ক'দিনের?

—একমাস।

—একমাস পর কি আমরা ফিরব?

—দেখি। কলকাতার চিঠি আসুক। অবস্থা বুঝে ফিরব।

—যদি অবস্থার উন্নতি না হয়?

—ছুটি বাড়াব।

—এভাবে কতদিন চলবে?

দুলু অনেকক্ষণ ঝিম মেরে থেকে খুব হতাশার গলায় বলল, কী জানি। আমি অত ভাবতে পারি না।

আমি আস্তে করে বললাম তোমার জমানো টাকা খরচ হয়ে যাবে। সোর্স অফ্ ইনকাম বন্ধ। এভাবে চলে না। এখানকার নির্জনতাও আমার খুব একটা সহ্য হচ্ছে না। তার চেয়ে চল ফিরে যাই—

দুলু চকিত মুখ তুলে বলল—কী বলছ। কলকাতায় পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে—দুলু বাকীটুকু বলল না। থেমে গেল।

—সঙ্গে সঙ্গে কী? আমি জিজ্ঞেস করি।

—কেন তুমি জান না?

আমি চুপ করে রইলাম। সামনে এক ভয়াবহ বন্য জ্যোৎস্না, নিস্তব্ধ চরাচর। ছয়জনের মধ্যে একজন আমাকে মুখ

ফিরিয়ে দুবার দেখেছে। ও কী চেনে আমাকে। আমি চুপ করে ভাবতে লাগলাম।

তিতু একটি ফড়িং ধরে দুহাতে তার পাখনা ছিঁড়ছে! তার মুখ নির্বিকার। এই সাঙ্ঘাতিক দৃশ্য আমি এক আশ্চর্য প্রকাণ্ড জানালায় দাঁড়িয়ে দেখছিলাম। তিতু বাগানে, খেজুরগাছের মত, কিন্তু আরো সুন্দর এক গাছের তলায় দাঁড়িয়ে। যে ফড়িংটার পাখনা সে ছিঁড়ছে সেটা একটা সুন্দর লাল ফফিং। আমি তার মুখের নিষ্ঠুরতা দেখে আতঙ্কে চীৎকার করে বলছি—তিতু—তিতু—তোর মায়া-দয়া নেই! ও তুই কী করছিস!

তিতু নিষ্ঠুর চোখে আমার দিকে তাকাল। তারপর হঠাৎ পকেটে হাত ঢুকিয়ে মুঠো বের করে আনল। মুঠো খুলতেই দেখলাম, এক মুঠো মরা মশা, মথ, একটা বোলতা। মুঠোর সেই পোকাদের বাগানের মাটিতে ছড়িয়ে দিয়ে হি হি করে হাসতে লাগল তিতু, চেঁচিয়ে বলল—বাবা, পোকাদের গাছ হবে। দেখ।

একটা গাঢ় লাল আলো এসে পড়ল বাগানে। সূর্যের আলো অত লাল হয়, জানতাম না। সেই লাল আলো এসে পড়তেই দেখি ঘাসের ফল থেকে বীজের মত জন্ম নিচ্ছে পোকামাকড়, বোলতা। উড়ে আসছে—উড়ে আসছে—আমাদের ঘরের দিকে।

দুলুর ডাক শুনে আমার ঘুম ভাঙল। ঘুম ফেঙে দেখি বাইরের ঘরে ক্যাম্পখাটে শুয়ে আছি। গায়ে ঘাম।

ওঘর থেকে দুলু বলল— জেগেছ?

—হ্যাঁ।

—ইস্‌ তোমাকে বোবায় ধরেছিল। ঠিক হয়ে শোও।

—ঠিক আছে।

—এমন ভয় পাইয়ে দাও না ! খারাপ স্বপ্ন দেখেছিলে বুঝি ?

দুলু ঘুম গলায় বলল। তারপর আমার উত্তর না পেয়ে ও আবার ঘুমিয়ে পড়ল, টের পেলাম।

এ বাড়ির বেশীরভাগই কাচের শার্সি'ওলা পাল্লা। কাঠের পাল্লা প্রায় নেই। তাকিয়ে দেখি, কাচের শার্সি দিয়ে বাইরের ম্লান জ্যোৎস্নায় বাগান দেখা যাচ্ছে। রাতে আবার কখন এক পশলা বৃষ্টি হয়েছে বুঝি। বাইরে জ্যোৎস্নায় একটা শাদা ধোঁয়াটে ভাব মিশে আছে।

অস্বস্তিকর ঘুমহীনতা নিয়ে সেইদিকে চেয়ে রইলাম। যতবার চোখ ফিরিয়ে নিতে চাই, যতবার চোখ বুজি, ততবার আপনা থেকে চোখ খুলে যায়। সম্মোহিতের মত শার্সিটার দিকে চেয়ে থাকি। বাইরে বন্য, ভয়ঙ্কর, রহস্যময় জ্যোৎস্না। বিশাল নিস্তব্ধ চরাচর। ভয় করে। বড় ভয় করে।

চেয়ে আছি। চেয়ে থাকাই আমার নিয়তি। হঠাৎ একটা ছায়া লাফ দিয়ে উঠল শার্সির গায়ে। চিৎকার করে উঠতে গিয়েও করলাম না। একটা বেড়াল। একটু দাঁড়িয়ে থাকল। তারপর ভাঙা শার্শির ভিতর দিয়ে সন্তর্পণে ঘরে এল। অন্ধকারে সে একপলক তাকাল মশারির দিকে। সবুজ ফসফরাস জ্বল্ জ্বল্ করে উঠল। নিঃসাড়ে পড়ে রইলাম। একটু পরে আমাদের এঁটো বাসন কোসনের কাছে তার চপ্ চপ্ খাওয়ার শব্দ শুনতে পেলাম।

কখনো ঘুম, কখনো জাগরণের মধ্যে রাত কেটে গেল। ভোর-রাতে যখন মুর্গী ডাকছে, তখন শার্সির রং উজ্জ্বল। নিশ্চিন্ত হয়ে আমি গভীর ঘুমে ঢলে পড়লাম।

আউট-হাউসের দিকে বুধিয়াদের একটা ছোট্ট ভুট্টার ক্ষেত। সকালে বাজারে বেরোবার সময় চোখে পড়ল, ভুট্টার ক্ষেতে লুকোচুরি খেলছে ঝিমলি, তিতু আর বুধিয়া। ঘাসের জঙ্গলে উদাসভাবে বসে বিড়ি খাচ্ছে বুড়ো মালী, হাতে ঘাস নিড়োবার হেঁসো। তার চশমার কাচে রোদ ঝিকিয়ে উঠেছে। চারিদিকে আলোয় আলো।

মনটা আবার হঠাৎ ভাল হয়ে গেল।

ভুট্টা-ক্ষেত থেকে মুখ বার করে তিতু চেঁচিয়ে বলল—বাবা, প্যাঁড়া এনো—

ঝিমলি দৌড়ে আসে—বাবা, দু'গজ লাল রিবন। আমার রিবন আনতে মা ভুলে গেছে।

তিতু ঝিমলির এইসব আনন্দিত চিৎকার আমার মনের মধ্যে রিন্ রিন্ করে বাজতে থাকে। অনেক বেলা হয়েছে, তবু একটা কুয়াশার মত ভাব চারিদিকে। ছায়াহীন রোদ পড়ে আছে। আমি হাঁটতে থাকি।

বাজারের মুখে পুরনো একটি মিনার। মিনারের তলায় দোকান। দোকানের সামনে কয়েকজন দাঁড়িয়ে জটলা করছে। সেদিকে একপলক তাকিয়ে চোখ ফিরিয়ে নিচ্ছিলাম, হঠাৎ চোখে পড়ল সেই জটলা থেকে লম্বা মত একজন—তার চোখে কালো চশমা—ঘাড় ঘুরিয়ে আমাকে দেখছে। গতকালের সেই ছয়জনের একজন কি? কে জানে! আমি মুখ ফিরিয়ে নিলাম।

বাজারে ঢুকতেই বুড়ো এক পান্ডা সঙ্গ ধরল—চল, বৈদ্যনাথজী দর্শন করিয়ে দিই।

আমি মাথা নাড়ি—আমার ভগবানে বিশ্বাস নেই বাপু।

লোকটা অবাক মানে—বিশ্বাস নেই। সাক্ষাৎ বৈদ্যনাথজীকে বিশ্বাস নেই। তুমি কি ম্লেচ্ছ?

—হবে তাই।

—তুমি হিন্দু না?

—উঁহু। আমার বাবা হিন্দু, আমি নই।

লোকটা অবাক হয়—তুমি কি তবে ধর্মত্যাগী?

—তাও না। আমি মোটে ধর্মেই বিশ্বাস করি না। আমি ম্লেচ্ছ।

সে হাসে—তোমার বাপ যখন হিন্দু তুমিও হিন্দুই। ম্লেচ্ছ কী করে হবে?

আমি তর্কের মধ্যে না গিয়ে পাশ কাটাই। মেছোবাজার পর্যন্ত লোকটা আমার পিছু পিছু আসে। তারপর হতাশ হয়ে চলে যায়।

দিন কেটে যায়। একই ভাবে। সাতটা দিন।

মাঝে মাঝে বিকেলের দিকে স্টেশনে যাই। একটা খবরের কাগজ কিনি। একটা চায়ের স্টলে বসে একভাঁড় চা নিয়ে তন্ন তন্ন করে কাগজটা খুঁজি। বেহালার খবর খুব একটা নেই। তবে লাশ পড়েছে নানা জায়গায়। মৃতদের নাম দেখি, চেনা নাম চোখে পড়ে না।

এখানকার ঠিকানা জানিয়ে বাবাকে চিঠি দেওয়া হয়েছে, তার কোন উত্তর নেই। সাতদিন হয়ে গেল, আমাদের বাড়িতে কী হচ্ছে কে জানে। এখানকার ঠিকানা বাবাকে জানানোর ইচ্ছে দুলুর ছিল না। বাবা বুড়ো মানুষ, যদি কেউ বাবাকে ভয় দেখিয়ে ঠিকানাটা জেনে নেয়।

মাঝে মাঝে লক-আপে গরাদের ওপারে একখানা ধারালো উগ্র মুখ চোখের সামনে ভেসে ওঠে। অস্বস্তি বোধ করতে থাকি।

বিকেলের দিকে যশিডি থেকে একটা শাট্ল্ ট্রেন আসে। অমনি খবরের কাগজের আড়ালে মুখ ঢেকে চোখ জ্বালিয়ে যাত্রীদের লক্ষ্য করি। দেহাতীরা নামে, নামে বৈদ্যনাথধামের তীর্থযাত্রীরা। অল্প কয়েকজন যাত্রী, কিছুক্ষণের মধ্যেই স্টেশন আবার ফাঁকা হয়ে যায়। সন্ধ্যের ঘোর লাগবার আগেই আস্তে আস্তে হেঁটে ক্যাস্টর টাউনের ইউক্যালিপটাসের ছায়ায় পা দিই। একটা চড়াই ভেঙে উঠলেই দেখা যায় দূরে মাতৃকুটিরের বাগানের গেট। তখন নিশ্চিন্ত লাগে।

শুক্লপক্ষ শেষ হয়ে গেছে। এখন সন্ধ্যার পর চাঁদ ওঠে না। ঘোর এক অন্ধকার কালো বেড়ালের মত লাফ মেরে নামে বাইরের বাগানে। সিঁড়িতে আমরা বসি। আমি, দুলু, ঝিমলি আর তিতু, দুলুর কোলে ছোটন। সিঁড়িতে শেষ ধাপে বসে বুধিয়া বলে—ঐ যে আকাশের তারা—ওগুলো হচ্ছে ভগবানের চোখ। যতগুলো মানুষ পৃথিবীতে আছে ততগুলো চোখ আছে ভগবানের। এক এক চোখে ভগবান এক একজনকে নজরে রাখেন। যেই পৃথিবীতে একটা মানুষ মরে যায়, অমনি নিভে যায় আকাশের একটা তারা, আবার যখনই কেউ জন্মায়, তখনই নতুন একটা তারা ফুটে ওঠে।

ঝিমলি আর তিতু অবাক হয়ে শোনে।

—সত্যি বাবা ? ঝিমলি জিজ্ঞেস করে।

অন্যমনস্কভাবে বলি—হুঁ।

একটু রাত হলে ওরা খেয়ে ঘুমোতে যায়, আমি তখনো বাইরে বসে, ভগবানের অলীক চোখে ভরা আকাশের দিকে চেয়ে থাকি। জল বয়ে যাওয়ার শব্দের মত অবিরল শালবনে বাতাস লাগবার শব্দ ভেসে আসে।

বাচ্চারা ঘুমোলে দুলু বাইরে আসে। বলে—আজও কলকাতার চিঠি এল না।

—হুঁ।

—কী যে হচ্ছে ওখানে !

আমি চুপ করে থাকি।

দুলু হঠাৎ বলে—আজ তুমি যখন বিকেলে বেরিয়েছিলে তখন একটা ছেলে এসেছিল।

একটু চমকে উঠি।

—কী রকম ছেলে ?

—ফর্সা, লম্বা, ছিপছিপে, খেলোয়াড়ের মত দেখতে, বাইশ-তেইশ বছর বয়স। কথাবার্তায় খুব ভদ্র। জিজ্ঞেস করল, এ বাড়িতে অতনু বলে কেউ থাকে কিনা।

—তুমি কি বললে ?

—বললাম না ! এখানে এনামে কেউ নেই।

—শুনে চলে গেল ?

—না। একটু হেসে ক্ষমা টমা চেয়ে বলল, রাস্তায় ঠিক অতনু সেনের মত একজনকে সে দেখেছে। একটু খোঁজ নিতেই একজন রিক্সাওয়ালা এই বাড়ি দেখিয়ে দেয়।

—কেন খোঁজ করছে জিজ্ঞেস করলে না ?

—করলাম। তখন ও আমাকে জিজ্ঞেস করল, আমি অতনু সেনের নাম শুনেছি কিনা। আমি বললাম, শুনি নি। ও বলল অতনু সেন খুব বড় লীডার হতে পারতেন। এত পড়াশুনা ছিল তাঁর। বাংলাদেশে অনেকেই অতনু সেনকে তাঁর রাজনৈতিক পাণ্ডিত্যের জন্য সম্মান করে। অতনু একবার বিধানসভায় দাঁড়িয়েছিলেন। যে কন্স্টিটুয়েন্সি থেকে দাঁড়িয়েছিলেন, সেখানের

এক চা-বাগানের ডাক্তার হচ্ছে ছেলেটির বাবা। একবার সে-বাগানে মিটিং করতে গিয়ে ঝড়ের রাতে অতনু সেন ফিরতে না পেরে ওদের বাসায় ছিলেন। আর তখন, সেই রাতে অতনুর সঙ্গে ছেলেটির খুব ভাব হয়ে যায়। অতনু তাকে অনেক গল্প বলেছিলেন। তারপর আর অতনুর সঙ্গে তার দেখা হয় নি। কাগজে অবশ্য মাঝে মাঝে নাম দেখেছে।

আমার আবছা মনে পড়ছিল, এক ঝড়ের রাতে আমি হায়পাথাড় চা-বাগানে আটকে পড়েছিলাম। ডাঃ আশুতোষ রায়ের বাড়িতে ছিলাম একরাত্রি। তার একটি ফুটফুটে ছেলে ছিল। খুব ভাল লেগেছিল আমার।

আমি আস্তে বললাম—ছেলেটা বোধহয় সত্যি কথাই বলে গেছে।

দুলু বলল—আমারও সেটা মনে হচ্ছিল। তবু আমি কিছুই স্বীকার করি নি। বলেছি, অতনু সেন না, আমার স্বামীর নাম মিহির দাশগুপ্ত। বেসরকারী অফিসের কেরানী। স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য এসেছি। অবশ্য আমি ছেলেটিকে আবার আসতে বলেছি। যদি আসে তবে তুমি ছেলেটিকে ভাল করে দেখে নিও। সাবধানের মার নেই। স্বীকার করো না যে তুমিই অতনু সেন।

আমি ঠাট্টা করে বললাম—কেন দুলু, আমি কি নেই?

দুলু গম্ভীর গলায় বলল—না, আমরা নেই। আমরা আমাদের কথা ভুলে যাব।

আমরা নেই আমরা নেই, ভাবতে ভাবতে সেই রাতে ঘুমিয়ে পড়লাম।

বুড়ো মালী ঘাস-জঙ্গলের অনেকটা নিড়িয়ে দিয়েছে। ছাতিমতলা এখন পরিষ্কার। দুপুরে আমি জাফরি-ঢাকা বারান্দায় বসে বইপত্র পড়ি। চেয়ে দেখি, ছাতিমতলায় ছোট একটা জনসভা বসেছে। শ্রোতা দু'জন—ঝিমলি আর বুধিয়া। বক্তা তিতু। অবিকল আমার মত বাঁ হাতখানা পিছনে নিয়ে সামনে ঝুঁকে তিতু বলছে—বন্ধুগণ, আজ এই সভায়……

অপলক তাকিয়ে থাকি। একসময়ে হঠাৎ চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। তিতু যেন কখনো রাজনীতি না করে। বরং চিরকাল ও আমাকে নিয়ে ঠাট্টা করুক।

এখানে এসে ক্রমে ক্রমে আমি গৃহী হয়ে যাচ্ছি। রোজ বাজার করি। স্নানের সময় নিজের গেঞ্জি রুমাল কেচে দিই। ঘরের কাজে দুলুকে সাহায্য করি। অনেক সময়ে রান্নাঘরের চৌকাঠে বসে বলি—দুলু, মা যে পোস্ত বাটা দিয়ে ডাঁটার চচ্চড়ি রাঁধে—ওরকম একবার রেঁধে খাওয়াবে?

শুনে দুলু খুশী হয়। চিরকাল আমি খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে উদাসী। যা পাই খাই। পাঁউরুটি আর জল খেয়ে কতদিন কেটে গেছে। আমার যে কোন কিছু ইচ্ছে হয় তা জানতামই না। এখন নিজের পছন্দমত অনেকক্ষণ ধরে বাজার করি। পুঁইশাক কিনলে কুমড়ো কিনতে ভুলি না। খেতে বসে নুন কম, কিংবা ঝাল বেশি—এইসব মতামত দিই। এখন জানি, ঝোল শুষলে ডালনার স্বাদ হয়।

দুলুর মুখে চিরকাল আমার প্রতি এক নিরক্ত নিষ্ঠুরতা দেখে এসেছি। এখন আমি ওর কাছাকাছি থাকলে ওর মুখে লাজুক রক্তাভা দেখা যায়। আমি মাঝে মাঝে ভাবি—এখনো বোধহয় আমাদের খুব বেশী বয়স হয়ে যায় নি। বোধহয় খুব বেশি সময় আমি নষ্ট করি নি জীবনের।

আয়নায় দেখি, অবিরল দুশ্চিন্তার মধ্যে বাস করেও আমার গালে মাংস লেগেছে, ঢেকে গেছে কণ্ঠার হাড়। পুরনো গেঞ্জিগুলো শরীরে আঁট হয়ে বসে। দুলুর মুখের দিকে চেয়ে মনে হয়, ঐ রক্তাভাটুকু কেবল লজ্জার নয়, ওতে স্বাস্থ্য আছে। ব্লাউজের হাতার নীচে ওর হাতের ডৌল ফেটে পড়েছে। ছোটন আর তেমন ঘ্যান্ ঘ্যান্ করে না তো; একা বসে বারান্দায় রাজ্যের খেলনা নিয়ে খেলে। মাথার ঘা শুকিয়ে আসছে আস্তে আস্তে। এখন মামড়ি খসছে। তিতু বহুদূর দম ধরে দৌড়ায়, অবিরাম স্কিপিং করে ঝিমলি। কেউই সহজে হাঁফায় না। কখনো বা তিতু আর ঝিমলির সঙ্গে চোর-চোর খেলি। ফাঁকা, প্রকাণ্ড বাড়ি, একটা টু দিলে দশটা ফিরে আসে।

আমাকে চমকে অবাক করে দিয়ে প্রায় রাত্রেই দুলু বাইরের ঘরে চলে আসত। ওঘরে বড় বিছানায় ছেলেমেয়েরা ঘুমোয়। রাত গভীর হয়। তখন দুলু আসে। অন্ধকারে তার কলপ দেওয়া শাড়ির খস্‌খস্ শব্দ পাই, চুড়ির শব্দ হয়, তার শরীরের সুগন্ধে ভরে যায় ঘর। মশারি তুলে সে বিছানায় চলে আসে। ক্যাম্বিসের ছোট খাটে শব্দ হয়। দুধার থেকে ক্যাম্বিসের ঢালু নেমে এসে ঝুলে থাকে, মাঝখানটায় অপরিসর একটা গর্তের মতো। দুলু সেই চাপা জায়গায় আমার সঙ্গে আঠার মতো লেগে থাকে। ঘন শ্বাস ফেলে আমার মাথার চুল মুঠো করে ধরে চাপা গলায় বলে—বুড়ো, বুড়ো। মাথায় টাক পড়ছে, দাঁত নেই—বুড়ো বর। এই বর নিয়ে আমি কী করব! কী করব!

মাথার ভিতরে মেঘ করে আসে স্মৃতি। পাণ্ডুর পাঁচ নম্বর ফেরীঘাটে বিয়ের পর কয়েকটা দিন মনে পড়ে। দুলু আমাকে দু'হাতে আঁকড়ে জিজ্ঞেস করত—তুমি কে? তুমি কে গো? চিনি না তো! অচেনা মানুষের এ কেমন ব্যবহার একটা মেয়ের সঙ্গে! আমার কিছুই রাখলে না তুমি? সব নিয়ে নিলে?

অন্ধকারে দুলু হাসত। সেই হাসি তার বুকের গভীর থেকে উঠে আসত। মাঝখানে খরা গেছে বহু কাল। আজকাল আবার দুলু সেরকম হাসে। কিন্তু আমি যে হাতে তাকে জড়িয়ে ধরি সেই হাত শিথিল হয়ে গেছে অনেক। তেমন শক্ত হাতে ধরতে

পারি না। যেন বা আমার দাবিদাওয়ার সাহস নেই আর। ভিখিরির হাত বাড়িয়ে যতটুকু পাই নিই! তাই জোর আসে না। বরং আবার উল্টে বলতে ইচ্ছে করে—তুমি কে? তুমি কে গো! চিনি না তো! অচেনা পুরুষের সঙ্গে এ তোমার কেমন ব্যবহার?

দুলু ঠাট্টা করে—তুমি ধরতেও শেখো নি আমাকে!

আমি হাসি—অভ্যেস নেই কিনা!

দুলু পায়ে পা ঘষে বলে—অভ্যেস নেই কেন! কে অভ্যেস করতে বারন করেছিল? তুমিই তো ছেড়ে দিলে আমাকে, ফিরেও তাকাও নি!

আমি মৃদু কণ্ঠে বলি—জীবনে আমি নিজের জন্য খুব বেশী কিছু চাই নি দুলু। যে দু' একটা জিনিস মুখ ফুটে চেয়েছিলাম তার মধ্যে তুমি একটা।

দুলু গভীর গলায় বলে—চেয়েছিলে ঠিকই, কিন্তু নাও নি।

আমি চুপ করে থাকি ভয়ে। পাছে পুরোনো কথা উঠে পড়ে।

কিন্তু দুলু ছাড়ে না, বলে—নিলে আমার দিন এত দুঃখে কাটত না। কতদিন দুধ জোটে নি বলে তিতু আর ঝিমলিকে শটীফুড খাইয়েছি, কিংবা বার্লি'র জল। সে-সব কি পেটে থাকে, সারাদিন খিদেয় কাঁদত। পাড়া-প্রতিবেশীরা ঠাট্টা করে বলত—হবু এম-এল-এ-র বৌ। কী লজ্জা! রাত জেগে পড়ে, টিউশানি করে আমার শরীর গেল কর্কশ হয়ে, বয়স গেল বয়ে। কারো আদর পাইনি কখনো, কী দিয়েছো তুমি আমাকে, বলো তো?

উত্তর দিই না। দুলু আক্ষেপে আমার বুকে তার হাত দিয়ে ঘন ঘন চাপড় দিয়ে বলে—নষ্ট করেছো। নষ্ট করেছো আমাকে। কিছুই দাও নি।

বলতে বলতে সে আমাকে আবার আশ্লেষে জড়িয়ে ধরে। প্রবল চুমু খায়! আবার চুমু খেতে খেতে কাঁদতে থাকে—কেন একটা জীবন আমাদের বয়ে গেল! তোমার লজ্জা করে না? কোন লজ্জায় তুমি আমার মুখোমুখী হও?

অনেকক্ষণ কাঁদে দুলু, তারপর হঠাৎ বলে—আমাকে আদর করো। শীগগির।

আদর খেতে খেতে বলে—শত্রু। মহাশত্রু তুমি আমার।

বুঝতে পারি, এইসব আবেগ আর আদরের পিছনে পরোক্ষে প্রকাশের মৃত্যু কাজ করছে। দুলু হঠাৎ সচেতন হয়ে বুঝতে পেরেছে, তার স্বামীর আয়ু বড় অনিশ্চিত। কোথায়, কোন লুকানো জায়গায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে আমার অপ্রত্যাশিত ঘাতক তা কেউ জানে না। কেন মারবে—তার কারণ স্পষ্ট নয়। জীবনযাপন করতে করতে আমরা কেবলই ভুলে যাই যে মানুষ মরণশীল। ভুলে যাই বলেই এই দুর্লভ জীবন আমরা হেলা-ফেলায় যাপন করি। অবহেলা করি কাছের মানুষকে, চোখের সামনে দেখেও ভুলে যাই। নিষ্ঠুর উদাসীন আমাদের মুখ ফিরিয়ে রাখা। কিন্তু যখন হঠাৎ মৃত্যুর ছায়া এসে পড়ে, মরণ-শীলতা অমোঘ হয়ে দেখা দেয়, তখনই বোধহয় এইরকম ক্ষতি-পূরণ করে নিতে চেষ্টা করি। কেড়ে নিতে চাই শেষ সময়টুকু।

আজকাল রোজ সকালে স্নান করে দুলু। লালপেড়ে গরদ পরে বাগানের ফুল তোলে মন দিয়ে। বুধিয়া কোথা থেকে বেল-পাতা আর কাঁচা দুধ নিয়ে আসে। রিক্সাওয়ালার সঙ্গে বাঁধা বন্দোবস্ত করেছে দুলু। সকালে আটটার মধ্যে রিক্সা এসে ভেপু বাজাতে থাকে।

দুলু যায় বৈদ্যনাথের মন্দিরে পুজো দিতে! রোজ। অনেকক্ষণ ধরে পুজো দেয়। ফিরতে দুপুর হয়ে যায়। যাওয়ার সময় বলে যায়—উনুনে ডাল চড়িয়ে গেলাম। সম্ভার দিও। চার কৌটো চালের ভাত চাপিয়ে দিও। চাল ধুয়ে নিও ভাল করে। আমার ফিরতে দেরি হবে।

আমি হাসি। দুলুর কথামতো ডালে সম্ভার দিই। ভাত চাপাই। তারপর ছেলেমেয়েদের নিয়ে খেলা করতে থাকি।

দুলু ফিরে আসে। রোদে লাল হয়ে গেছে মুখ। ক্লান্ত দেখাচ্ছে। উপোস করে থাকে বলে ঠোঁট শুকিয়ে থাকে, চোখ বসে যায়। সকলের হাতে প্রসাদী সন্দেশের টুকরো দেয়, প্রসাদী ফুল মাথায় ঠেকায়। আমাকে প্রণাম করে।

খেতে বসে প্রায়দিনই বলে—বরটা বুড়ো হলে কী হবে, ভারী কাজের তো! ডালে কী সুন্দর সম্ভারের গন্ধ হয়েছে! ওমা!

আবার শুকনো লঙ্কা ভেজে দেওয়া হয়েছে! বুদ্ধি দেখ।

শুনে তিতু আর ঝিমলি হেসে গড়িয়ে পড়ে।

কখনো কখনো প্রকাশকে দেখি।

দুপুরে দুলু তার ছেলেমেয়ে নিয়ে ঘরে ঘুমোয়। আমি দুপুরের হা-হা বাতাসে বারান্দায় এসে বসি। কী নির্জন চারধার। লোক চলাচল নেই কোথাও। একটা কুকুরও হাঁটে না। কেবল বাতাস খেলা করে, রোদ ভেসে দায়। হঠাৎ দেখতে পাই প্রকাশ গেট-এর ওপাশে এসে দাঁড়িয়েছে। মুখে হাসি, অবিন্যস্ত চুল। ডানহাতের মুঠি উর্ধ্বে উৎক্ষেপ করে বলে—লড়াই অতনু। লড়াই!

বাড়িটা বিশাল। বহু ঘর বন্ধ পড়ে থাকে। এক-একদিন একা ভূতের মতো সময় কাটাতে এ-ঘর ও ঘর ঘুরে বেড়াই। একা একা কথা বলি। মাঝে মাঝে এমন হয়, একটা ঘরের দরজা খুলতেই দেখি, মেঝের ওপর প্রকাশ বসে আছে উবু হয়ে। আমাকে দেখে মুখ তুলে বলে—অতনু, আমার মা-বৌ-বাচ্চাদের খোঁজ নিলি না? কেমন আছে ওরা সব? কী করে চলছে ওদের? দ্যাখ, একদিন হঠাৎ বাবা মারা গিয়েছিল বলে আমি আর মা রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছিলাম। ভিখিরি হয়ে গিয়েছিলাম প্রায়। আমার ছেলেমেয়েগুলোরও ওরকম হয় নি তো? বড় ভয় করে। তোরা দেখিস।

আমার ঠোঁট কেঁপে ওঠে। বুক চেপে ধরে স্মৃতি। আমি সেই ফাঁকা ঘরে একা দাঁড়িয়ে গোপনে বাঁধ ভাঙা কান্না কাঁদি। প্রকাশ, যারা খুন করে তারা জানে না, একটা মানুষ মানে একটা জগৎ। কত সম্পর্কে জড়িয়ে থাকে একটা মানুষ—বৌ-বাচ্চা-মা-বাবা-ভাই-বোন-বন্ধু—ওরা তা ভুলে যায়। ওরা মারে বিচ্ছিন্ন একটা মানুষকে। সেই মার সেই লোকটাকে ছাড়িয়েও ছড়িয়ে যায়। একজন মানুষের সঙ্গে আরো কত মানুষ শেষ হয়। যারা খুন করে তারা কি তা জানে?

সারা বাড়িময় আমি উদ্দেশ্যহীন স্মৃতিতাড়িত হয়ে ঘুরে বেড়াই আর বলি—আমি নিরপরাধ ফেরারী প্রকাশ। এই অজ্ঞাত-

বাসে আমি এরকম সুখেই আছি। সারাটা যৌবনকাল দুলু ফিরেও তাকায় নি। এখন দ্যাখ, মৃত্যুর ছায়া পড়েছে বলে সে আমাকে আঁকড়ে ধরেছে। পৃথিবীতে কার কতদিন আয়ু তা কে বলতে পারে। পৃথিবীর অধিকার কার হাতে যাবে তার মীমাংসার সংগ্রামে কত লোক চলে যাবে! সময় তাই আমাদের বড় কম। বড় মূল্যবান। আমাকে এই সময়টুকু ভোগ করতে দে প্রকাশ। আমরা যারা লড়াই করেছিলাম তাদের পরিবার বরাবর ভেসে গেছে। তাদের ভাগ্যই দেখেছে তাদের। আমাকে তোর পরিবারের কথা ভাবতে বলিস না। আমি পারবো না। আমাকে ছেড়ে দে। নতুন উদ্বেগ নতুন দায়িত্ব—এ বড় ভয়ের ব্যাপার এখন। আমাকে ক্ষমা কর। আমাদের ভালবাসার সময় সকলের আগে শেষ হয়।

ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হলে নিঃঝুম হয়ে কোনো গাছের ছায়ায় গিয়ে বসি। বনস্থলীতে বিচিত্র ছায়া পড়ে। পাখী ডাকে, উড়ে যায়। আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়ি কখন। স্বপ্ন দেখি, পাখি হয়ে মানুষের অস্ত্রাঘাত থেকে উড়ে যাচ্ছি অনায়াসে। বন্দুকের শব্দ এড়িয়ে শরতের আকাশ লক্ষ্য করে তীরের মতো ছুটে যাচ্ছি। আকাশ নিরবধি, অনন্ত। কোন ভয় নেই। পালাবার পথ সেখানে শেষ হয়ে যায় না।

সন্ধ্যে হয়ে এলে দুলু আর ছেলেমেয়েরা ডাকতে ডাকতে আমাকে খোঁজে। তাদের গলার স্বরে উদ্বেগ। খুঁজে পেয়ে দুলু বড় বড় চোখে আমাকে দেখে—তুমি কী গো! জানো না, ভয়ে বুক শুকিয়ে থাকে আমার! একটা সময়ও নিশ্চিন্ত থাকি না।

ঝিমলি দুলে দুলে একটা ছড়া বলে প্রায়ই—পাটের শাড়ি বের করো মা, দখিন যাবো গো। তালতলা দিয়ে জল যাচ্ছে মা, ডুবে মরি গো।

ছড়াটা শুনতে শুনতে আমার মুখস্থ হয়ে যায়। এক একটা সময়ে তখন গভীর অন্যমনস্কতা আসে, তখন আপনমনে আমি ঐ ছড়াটার একটা লাইন বিড় বিড় করে বলি—তালতলা দিয়ে জল যাচ্ছে মা, ডুবে মরি গো···তালতলা দিয়ে জল যাচ্ছে মা, ডুবে মরি গো।

বলতে বলতে দেখতে পাই, কাটিহারে খালাসীটোলার নোংরা

ঘরে একটা বাচ্চা ছেলে রোগশয্যায় শুয়ে আছে। ধুম জ্বর উঠছে তার। বিকারের ঘোরে ঘোর লাগা চোখে চেয়ে আছে। তার মুখের ওপর ঝুঁকে আছে মায়ের মুখ। সে বলছে—তালতলা দিয়ে জল যাচ্ছে মা, ডুবে মরি গো···তালতলা দিয়ে জল যাচ্ছে মা, ডুবে মরি গো···

আমার শরীরে রোমকূপ শিউরে উঠে। আমার কোলের ওপর ছায়া ফেলে প্রকাশ সামনে দাঁড়ায়। বলে—অতনু, শোধ নিবি না?

মুখ ফিরিয়ে নিই।

সংসার আমার ভাল লাগে আজকাল। ভাল লাগে দুলু, ঝিমলি, তিতু, আর ছোটনের সঙ্গে মেখে-জুখে থাকতে। বাগানের একদিকে খানিকটা জমি বেছে নিয়ে আমি মাটি কোপাই। দুলু ফুলের চারা লাগাতে চায়। আমি চাই রাইশাক হোক। কিন্তু সে জন্য নয়, আসল কথা মাটি কোপান আমার ব্যায়াম। শরীরটাকে ঠিক করে নিতে হবে। অম্বলের ব্যথাটা আর টের পাই না। বর্ষা শেষ হয়ে এল। শরতের সাদা মেঘখণ্ড আকাশে ভেসে বেড়ায়। সকালে গেট-এর পাশে শিউলি ফুল ঝরে থাকে।

বুড়ো মালীটা নির্বিকার বাগানে বসে থাকে। সে কথা বলে কম, উদাসভাবে বসে থাকতে ভালবাসে। কিন্তু তার মুখে কোন দুঃখের ছায়া নেই। মাঝে মাঝে আগাছা নিড়োয়, তারপর গাছ-পালা মাটির সঙ্গে মিশে ঝিমু মেরে এই প্রকৃতির বৈরাগ্যকে নিজের ভিতরে অনুভব করে। নিজের চোখের কথা ওর বোধহয় বেশী মনে পড়ে না। বেঁচে থাকার কিছু কিছু মূল্য দিতে হয়—এরকমই সে জানে! ওর কাছ থেকে ঐ বৈরাগ্যটুকু সারাদিন ধরে অল্প করে শিখে নিই। আমার একটা জীবনে বহু উচ্চাকাঙ্ক্ষা নষ্ট হয়ে গেছে, সেটা ভুলতে ঐ বুড়ো মালীর বৈরাগ্যটুকু আমার বড় দরকার।

শিমুলগাছের তলায় একটা মসৃণ পাথর পড়ে আছে! নির্জনে সেখানে গিয়ে বসি। ডানদিকে ঢালু মসৃণ সবুজ, চারদিকে ভাঙের জঙ্গল, ভাটফুল কণ্টিকারী। পাখি-পাখালির অবিরল তীব্র ডাক। নিস্পন্দ বসে থাকি। হঠাৎ মনে হয় পৃথিবীর অধিকার

হাতবদল হচ্ছে। বিনা বিপ্লবে, নিঃশব্দে। পুরনো বাড়িটার মাথায় ফাটা দেওয়ালে ঐ যে অশ্বথের গাছ উঠছে নিশানের মত। ঐ নিশান বলছে, একদিন পৃথিবীর মানুষের সব সংগ্রাম শেষ হলে তারা আসবে। পা টিপে টিপে নিঃশব্দে এগিয়ে আসবে উদ্ভিদ জগৎ। অধিকার করে নেবে সবকিছু। তারাই ভেঙে ফেলবে বাড়ি-ঘর, ঢেকে ফেলবে রাস্তাঘাট, কলকারখানা চাপা দেবে মাটিতে। এইভাবে নিঃশব্দে হাতবদল হচ্ছে পৃথিবীর। শিমুলগাছের তলায় পাথরে বসে মাঝে মাঝে আমি এই বোধ করি। নিস্তব্ধতার মধ্যে অনুভব করি উদ্ভিদের পদসঞ্চার আমার গায়ে রোমকূপ খাড়া হয়ে ওঠে। কাঁটা দেয়।

দু'-একদিন পর পর আবার ঘর ভরে যায় পোকামাকড়ে। তীব্র কীটানুনাশক ছড়িয়ে দিই ঘর বন্ধ করে। অবিকল হত্যাকারীর মত দেখায় আমাকে। মুখে রুমাল ঢাকা, তার আড়ালে আমি হাসি। পোকাদের ডেকে বলি—বন্ধুগণ, আমি জানি, মানুষের হাত থেকে একদিন পৃথিবীর অধিকার যাবে তোমাদের হাতে। আমার এ সংগ্রাম বৃথা। চিন্তাশূন্য আমার এই আক্রমণ, তোমরা আমাকে ক্ষমা কর। তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছে সুন্দর প্রতিশোধ।

লক্ষ্য করি পরিশ্রমী পিঁপড়েদের সারিবদ্ধ চলাচল। মুগ্ধচোখে দেখি। পৃথিবীর অধিকার কার হাতে যাবে? পিঁপড়েদের? তবে তাই হোক। আমেন্। মানুষ হিসেবে আমাদের আর কিছু করণীয় নেই।

রাতে মাঝে মাঝে ঘুম ভাঙে। ক্যাম্প-খাটের পাশে টেবিলে ঢাকা দেওয়া জলের গ্লাস তুলে খাই। বাথরুম সেরে আসি। বাইরের জ্যোৎস্না দেখি নির্ভয়ে। সিগারেট ধরাই। কাশি। অনেকক্ষণ চুপ করে জেগে বসে থাকি। তখন কখনো চারপাশে অদৃশ্য কীটানুজগৎ অনুভব করি, বাতাসে জীবাণুদের জাতায়াত। আমার গা শিউরে ওঠে।

বন্ধুগণ, পৃথিবীর অধিকার হচ্ছে হাতবদল। নিঃশব্দে, বিনা বিপ্লবে।

টের পাচ্ছি, ক্রমে ক্রমে ভোঁতা হয়ে আসছে আমার মাথা। চিন্তা-ভাবনা হয়ে আসছে সীমাবদ্ধ। টের পেয়ে আমি আনন্দিত হই।

আনন্দিত মনে সকালের রোদে খালি গায়ে, খালি পায়ে, আমি মাটি কোপাচ্ছিলাম। মাটির ঢেলা ভেঙে চৌরস করছিলাম জমি। সেই সময়ের তির্যক-রোদে একটা লম্বা ছায়া পড়ল সামনের জমিতে। চোখ তুলে দেখি, একজন বাইশ-তেইশ বছরের ছেলে দাঁড়িয়ে! লম্বাটে, ফর্সা চেহারা। পরনে ধুতি-পাঞ্জাবী, চোখে কৌতূহল।

আমি মুখ তুলতেই হাতজোড় করে বলল, আমার নাম শচীন রায়। একদিন ভুল করে এ বাড়িতে ঢুকে পড়েছিলাম। সেদিন বৌদির সঙ্গে আলাপ হয়েছিল! আজ আপনার সঙ্গে আলাপ করতে এলাম।

কোদাল ফেলে আমি বললাম—আসুন।

মনে মনে একটু অস্বস্তি বোধ করছিলাম। আমার যে নকল নামটা দুলু একে বলেছিল সেটা কিছুতেই মনে পড়ছে না।

বারান্দায় তাকে বসিয়ে হাত-পা ধুয়ে আসার ছল করে আমি প্রথমেই গেলাম রান্নাঘরে দুলু-র কাছে।

—সেই ছেলেটা এসেছে।

—কোন ছেলেটা?

—ঐ যে অতনু সেনের ভক্ত, যে আর একদিন এসেছিল।

—ও।

—কিন্তু আমি তো অতনু সেন নই।

দুলু ঠোঁট টিপে হেসে বলল—ঠিকই তো।

—কিন্তু তা হলে আমি কে! যে নামটা বলেছিলে তা মনে আছে?

খুব মুশকিলে পড়ে গেল দুলু। ঠোঁট কামড়ে অনেকক্ষণ ভাবল তারপর জিভ কেটে বলল—যাঃ, ভুলে গেছি।

চিন্তিতভাবে বললাম—তাহলে বরং ছেলেটিকেই জিজ্ঞেস করি।

দুলু হাঁ করে চেয়ে থেকে বলল—আহা! ঢং!

তারপর একটু ভেবে বলল—তুমি এত লোকজনের সঙ্গে মিশেছ, আর এই একটুখানি ব্যাপার সামলে নিতে পারবে না?

হেসে বললাম—পারব বোধহয়।

বাথরুমে ছোট্ট হাত-আয়নাটা পেরেকে টাঙানো। হাত-মুখ ধুতে গিয়ে নিজের মুখের প্রতিবিম্বের দিকে চেয়ে হাসলাম। বললাম—তুমি আর তুমি নও। সাবধান! মনে রেখো। তুমি তুমি নও।

বাইরে এসে ছেলেটির মুখোমুখী বসলাম। বললাম—আমার স্ত্রী না জানলেও আমি কিন্তু অতনু সেনের নাম জানি।

ছেলেটি হাসল। বলল—আপনার সঙ্গে তার চেহারার আশ্চর্য মিল। আমি আপনাকে কয়েকদিন রাস্তায় দেখেছি। চেহারাটা চেনা। ভাবতে ভাবতে অতনু সেনের কথা মনে পড়ল।

আমি নিস্পৃহভাবে বললাম—অতনু সেন কোথায় আছে জানেন?

ছেলেটি মাথা নাড়ল—না।

আমি একটু চিন্তিতমুখে বললাম—বোধহয় ও'র রাজনৈতিক জীবন শেষ হয়ে গেছে।

ছেলেটি চুপ করে থেকে বলল—হতে পারে। রাজনীতিতে সকলে টেঁকে না। কিন্তু আমার মনে হয় উনি থেমে নেই। কাজ করছেন।

—এরকম কেন মনে হয় আপনার?

—রাজনীতিতে একটা ক্যারিয়ার আছে। সেখানে তিনি আন-সাকসেসফুল হতেও পারেন। সেটা বড় কথা নয়। বড় হচ্ছে অতনু সেন মানুষটা। আমি তাঁকে একরাত্রির জন্য দেখেছিলাম। তাতে আমার চোখ খুলে যায়।

—কী রকম? আমি সাগ্রহে জিজ্ঞেস করি।

—আমি তখন ছোট। উনি তখন নাম-করা নেতা। তবু মিটিংয়ের পর অনেক রাত পর্যন্ত তিনি আমাকে নানা গল্প বলেছিলেন। সেগুলো সবই ছিল মানুষের দুঃখের গল্প। তিনি একটা শাকওয়ালা বুড়ির গল্প বলেছিলেন, তার অনেক বয়স, ঘরে উপোসী কয়েকটা নাতি-নাতনী রেখে সে হাটে এসেছে শাক বেচতে। দু' পয়সা আঁটির শাক। সে বয়ে আনতে পেরেছে মাত্র বিশ-ত্রিশ আঁটি। শাক বেচে চল্লিশ কি ষাট পয়সা নিয়ে চাল কিনতে দেখে চালের সের টাকা টাকা, তখন সেই বুড়িটা ভাঙা হাটে পয়সা ক'টা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছে। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন—বুড়িটা কী ভাবছে বলতে পার? আমি পারি নি। তিনি বলে ছিলেন, মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞান কিছুতেই বুড়ির সেই ভাবনাচিন্তার নাগাল পাবে না। এই গল্প বলতে বলতে তিনি কেঁদেছিলেন। তিনি একটি চাষী পরিবারকে দেখেছিলেন একবার, বোলপুর স্টেশনে সেই চাষী পরিবার ডাউন দার্জিলিং মেলে উঠতে এসেছিল, যাবে বর্ধমানের এক মেলায়। চাষা, চাষার বৌ, আর বাচ্চা একটা মেয়ে। তারা যথাসাধ্য নতুন রঙীন জামাকাপড় পরে এসেছে, মেলায় যাওয়ার আনন্দ উত্তেজনায় মেয়েটি অধির, বৌটি ঘোমটা সরিয়ে চারদিক দেখছে। সেই ট্রেন অসম্ভব ভিড় ছিল, দরজার হাতলে ঝুলছিল লোক। চাষা তার বৌ আর মেয়ের হাত ধরে এক দরজা থেকে আর এক দরজায় ছোটাছুটি করছে, কেউ তাদের উঠতে দিচ্ছে না। বাচ্চা মেয়েটা তার প্রথম ট্রেনে চড়ার আনন্দে দু'হাত বুকের কাছে জড় করে ক্লিষ্ট একটু হাসি মুখে নিয়ে অধীর আগ্রহে কাঁপছিল। তারা উঠতে পারছিল না। উগ্র আগ্রহে একটা দরজায় ওঠবার জন্য তারা যখন প্রাণপণ চেষ্টা করছিল, তখন একটা লোক যে ঘাট থেকে ঝুলে ঝুলে যাচ্ছিল—ভীষণ বিরক্ত হয়ে চাষা লোক টাকে একটা লাথি মেরেছিল। অমনি চাষা পরিবার থমকে দাঁড়িয়ে গেল। অসহায় অপমানে, নিরুপায় দুঃখে চাষা তাকিয়ে আছে, চাষী-বৌ লজ্জায় আবার ঘোমটায় ঢেকেছে মুখ, মেয়েটা তখন কাঁপছে—তার হাসিটা বদলে আস্তে আস্তে কান্না হয়ে যাচ্ছে—এই দৃশ্যটুকুর ওপর দিয়ে ডাউন দার্জিলিং মেল সরে যাচ্ছিল আস্তে আস্তে। ঐ শিশু মেয়েটিকে মানুষের সভ্যতা কি দিল?

অতনু সেন না হয়ে অন্য কেউ হলে আমি নিশ্চয়ই এই গল্প শুনে হেসে উঠতাম। কিন্তু বস্তুতঃ মুশকিল এই যে, আমি অতনু সেন। এই সব ঘটনা আমার বুকে লেগে আছে, যেমন লেগে আছে ছেলেবেলায় খেলার মাঠে দেখা আমার বাবার অসহায় মুখখানা।

আমি হাসলাম না।

ছেলেটি বলল—অতনু সেন জানতেন কী করে গল্প বলতে হয়। মানুষকে ভাল না বাসলে ঐ সব তুচ্ছ গল্প ঐভাবে কেউ বলতে পারে না, যাতে চোখের জল আসে, বুকে কান্না জমে ওঠে সেই শিশু বয়সেও যা শুনে আমার রাতে ঘুম হয় নি। সেই প্রথম আমি মানুষের কথা ভাবতে শুরু করি। আজও অতনু সেনের সেইসব গল্প স্পষ্ট মনে আছে। এখনো চোখ বুজলেই ভাঙা হাটে সামান্য পয়সা হাতে এক বুড়িকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখি, দেখি বোলপুরের প্ল্যাটফর্মে অপমানিত বাবার হাত ধরে দাঁড়িয়ে এক শিশু মেয়ে। তাই, এখনো মাঝে মাঝে নিজেকে ধিক্কার দেওয়ার মত জোর আমি পাই। অতনু সেন আমার জন্য অনেক করেছেন, কতখানি করেছেন তা তিনিও জানেন না। আমার বিশ্বাস তিনি থেমে নেই। সেই বুড়ি বা সেই চাষী মেয়ের জন্য, বা ওরকম আরো অনেকের জন্য পৃথিবী তোলপাড় না করে ছাড়বেন না।

আমি কিছুক্ষণ তার দিকে চেয়ে থেকে, আস্তে আস্তে ধরা গলায় বললাম—অতনু সেন অনেকবার দল বদল করেছিল।

—তাতে কী? আমদের কোন দলই উপযুক্ত নয়। একদিন মানুষ আপনা থেকেই তাঁর চারদিকে দলবদ্ধ হবে। আমি নিজে তাঁর সন্ধানে আছি।

চমকে উঠলাম। চুপ করে রইলাম। দুলুর সতর্কবাণী মনে পড়ল। আমরা আর আমরা নই। আমি নই আমি। আমি আমাকে ভুলে যাব। যেতেই হবে।

পৃথিবীর অধিকার হয়ে যাচ্ছে হাতবদল। বৃথা মানুষের সংগ্রাম। আসছে উদ্ভিদ কীট, আসছে জীবাণুরা। হুররে!

দুলু চা নিয়ে এল। ছেলেটির দিকে চেয়ে মৃদু হেসে বলল—ভুল ভেঙেছে তো? ছেলেটি হেসে মাথা নাড়ল কেবল। অন্যমনস্ক

ছিল বলে উত্তর দিল না। তেমনি অন্যমনস্কভাবেই বসে বসে আস্তে আস্তে চা-টুকুও শেষ করল। ততক্ষণ আমি চুপ করে রইলাম।

তারপর এক সময়ে শচীন বলল—আপনাকে প্রথম দেখে ঠিক যেন মনে হয়েছিল এই অতনু সেন। তারপর জানলাম আপনি অতনু সেন নন। কী যেন আপনার নামটা বৌদি বলেছিলেন কিন্তু ঠিক মনে পড়ছে না—

আমি তাড়াতাড়ি বললাম—হিরন্ময় চৌধুরী।

ছেলেটা হাসল—ঠিক।

তারপর উঠে দাঁড়াল। হঠাৎ দেখি সকালের তীব্র আলোয় তার চোখ দুটো হঠাৎ ঝলসে উঠল, একটু হেসে সে বলল—অতনু সেনের আর একটা গল্প আপনাকে শুনিয়ে যাই। এটা ভৌতিক গল্প। একটা লোক তার নিজের ছায়াকে নিয়ে মুশকিলে পড়েছিল। ছায়াটা ঘড়ি ঘড়ি বদলে যায়। কখনো দেখে তার ছায়াটা একটা বাঘের ছায়া কখনো বা দেখে একটা বেড়ালের। কখনো বা দেখে ফণাতোলা একটা সাপের চেহারা নিয়েছে আবার কখনো বা একটা ঝুপসি গাছের মত হয়ে বাতাসে দোল খাচ্ছে। লোকটা ঐসব দেখে আর ভাবে তাই তো। তবে কি আমি মাঝে মাঝে হয়ে যাই বাঘ, কিংবা বেড়াল। হয়ে যাই সাপ কিংবা গাছ? লোকটা ভাবত আর দিন-রাত ছায়া দেখত। দেখতে দেখতে আর ভাবতে ভাবতে সে ক্রমে ক্রমে ছায়ার মতই হয়ে যেতে লাগল। বাঘের ছায়া দেখলে সে বাঘের মত গর্জন করত, সাপের ছায়া দেখলে করত ফোঁস ফোঁস, আবার গাছের ছায়া দেখলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হুবহু এক গাছের মত বাতাসে দোল খেত। শেষ জীবন পর্যন্ত লোকটা বুঝতেই পারল না, সে আসলে কী।

আস্তে আস্তে তার মুখ থেকে স্খলিত হয়ে আমার চোখ নীচে নেমে এল। নুয়ে এল মাথা।

সে বলল—চলি।

আমি উত্তর দিলাম না।

সে চলে গেল।

অনেকক্ষণ বাদে তাদের খেলা সেরে রাঙা মুখে তিতু আর

ঝিমলি এসে আমাকে একই ভাবে বসে থাকতে দেখল। তারা চিৎকার করে আমাকে হনুমান আর কাঠবেড়ালী দেখার গল্প বলল।

তারপর ঝিমলি বলল—কে একটা লোক এসেছিল না বাবা। ঐ লোকটা ঢুকবার সময়ে আমাদের ডেকে অনেক কথা জিজ্ঞেস করছিল।

—কী জিজ্ঞেস করেছিল?

—তোমার নাম কী, তুমি কী কর।

—তোমরা বললে?

—বললাম। আমার বাবার নাম অতনু সেন। আমার বাবা নেতা। ঠিক বলিনি বাবা?

আমি কষ্টে হাসলাম।

রাত অনেক। ছেলেমেয়েরা ঘুমোতে গেছে। শোওয়ার আগে দুলু তার শরীরে পাউডার ছড়াচ্ছিল।

আমি সেই সুন্দর দৃশ্য দেখছিলাম। দুই বাহু ঊর্ধ্বে তোলা। আধখোলা বুক উন্নত হয়ে পাতলা শাড়ি ভেদ করে আসছে। পিছল মসৃণ শরীর। লাবণ্যময়। একটু দেখে চোখ ফিরিয়ে নিলাম। আমার মাথার মধ্যে আবার ঝড় উঠেছে। স্মৃতি আর স্মৃতি। অনন্ত দুঃখের স্মৃতিগুলি শূন্য থেকে উড়ে আসে। মানুষের জন্য—মানুষের জন্য—মানুষের জন্য এখনো সংগ্রাম বাকী রয়ে গেছে। কে করবে? কে আছ কোথায়? কে করবে?

আমি বিড় বিড় করে বললাম—দুলু, আমরা উদ্ভিদের হাতে পৃথিবীকে ছেড়ে দেব না।

দুলু চমকে ঘুরে বলল—কী?

আমি বিভোর হয়ে বললাম—কীট-পতঙ্গের হাতেও না।

—কী বলছ? কী ছেড়ে দেবে না?

—পৃথিবীর অধিকার। দুলু, আমাকে আবার গোড়া থেকে শুরু করতে হবে। আমি ছাড়া আর কে করবে?

জীবন-পাত্র

নরেনবাবু লোকটিকে আমার পছন্দ হচ্ছিল না। লোকটা জ্যোতিষ-বিদ্যা জানুক, আর না-ই জানুক তার মধ্যে বেশ একটা নিরীহ ভাব আছে। আর খুব একটা ব্যবসাবুদ্ধি নেই।

আমার কোষ্ঠীর ছকটা গত পনেরো বছর ধরে আমার মুখস্থ আছে। কেউ জ্যোতিষ জানে শুনলেই সট সট করে কাগজে ছকটা এঁকে সামনে এগিয়ে দিই। বহু লোক আমাকে বহু রকম কথা বলেছে। নিজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনেক সময়ে আমি আশার আলো দেখেছি, কখনো বা নিভে গেছি। দীর্ঘদিন পর আবার জ্যোতিষীর দ্বারস্থ হয়ে আমি সামান্য কিছু উত্তেজনা বোধ করেছিলাম।

নরেনবাবু একটু আগে অফিস থেকে ফিরছেন। গ্রীষ্মকাল শেষ হয়ে মাঝে মাঝে বৃষ্টি পড়ছে আজকাল। বাইরে এখন মেঘের হাঁক-ডাক শোনা যাচ্ছে। ঘরে গুমোট। বাতাস থমু ধরা। গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন-এর ভিতরদিকে গলির ধাঁধার মধ্যে একটা অদ্ভুত আলো-বাতাসহীন ঘর। জানালা দরজা সবই আছে তবু আলো বা বাতাস কিছুই আসে না। একটা হলুদে বালবের আলো বোধহয় সারাদিনই জ্বলে। বহু আদ্যিকালের একটা পাখা ঘুরছে ওপরে। তার বিষণ্ণ শব্দ হচ্ছে ঘটাং ঘটাং। দেয়ালে পোঁতা গজালের সঙ্গে তার দিয়ে বাঁধা কয়েকটা কাঠের তক্তায় বিস্তর পুরোনো পঞ্জিকা জমা হয়ে আছে, বেশ কিছু সংস্কৃত আর বাংলা জ্যোতিষের বই, কয়েকখানা ইংরেজী বইও। পুরোনো একটা সেক্রেটারিয়েট টেবিলের ওপরে অসম্পূর্ণ একটা কোষ্ঠীপত্র পড়ে আছে, দোয়াতদান, কলম, ডটপেন, লাল, নীল আর কালো কালীর দোয়াত, চশমার খাপ, কোষ্ঠীর তুলোট কাগজ, নোট বই, চিঠি গেঁথে রাখবার কাঠের তলাওলা শিক, তাতে বিস্তর পুরোনো চিঠি। এ সবের মধ্যে নরেনবাবু বেশ মানানসই। বয়স পঞ্চাশের কাছা-

বলে একটু চিন্তিত হয়ে পড়লেন।

এ সবই আমার জানা কথা। রবি নিচস্থ, শনি পঞ্চমে।

নরেনবাবু বললেন—কেতুটাই ডোবাচ্ছে। বাঁদিকের ঘরে পড়ল কিনা! বাঁদিকে কেতু ভাল নয়।

আমি হতাশ বোধ করতে থাকি।

উনি মাথা নেড়ে বললেন—কার্তিক মাসে জন্ম হলে বড় মুশকিল। আমারও তাই। রবিটা নিচে পড়ে থাকলে কি করে কি হবে!

—কিছু হবে না?

নরেনবাবু গম্ভীর মুখে বলেন—এখনই সব যাবে না। আগে নবাংশটা দেখি। সময় লাগবে। আপনি বরং ও হপ্তায় আসুন। ততদিনে করে রাখবো। তবে বিদেশ যাত্রার একটা যোগ আছে। নবাংশটা না করলে বোঝা যাবে না। পাঁচুবাবু আপনার কে হন?

—খুব দূর সম্পর্কের দাদা।

নরেনবাবু গম্ভীর গলায় বললেন—অনেককাল দেখি না পাঁচু বাবুকে। আগে খুব আসতেন। উনি আমার প্রথম দিককার ক্লায়েন্ট।

—উনিই আপনার কথা বলেছিলেন আমাকে। বলতে গেলে উনিই পাঠিয়েছেন আমাকে।

নরেনবাবু মাথা নেড়ে বলেন—বরাবর উনি লোক ধরে নিয়ে আসতেন আমার কাছে। ওঁর ধারণা ছিল, আমি খুব বড় জ্যোতিষী হবো। জ্যোতিষীর যে ধৈর্য স্থৈর্য দরকার, আর হিসেবের মাথা, সে সব আমার ছিলও! কিন্তু নিজের কোষ্ঠী বিচার করে দেখেছিলাম, আমার দাম্পত্য জীবনটা ভাল হবে না। হলও না। পুরুষ মানুষের বৌ যদি ঠিক না হয় তো তার সব ভণ্ডুল হয়ে যায়। এই যে রাস্তায় ঘাটে অতি সাধারণ সব মানুষকে দেখেন তাদের মধ্যে অনেকের ছক বিচার করলে দেখবেন, অনেকেরই বড় বড় সব মানুষ হওয়ার কথা। কেউ নেতা, কেউ বৈজ্ঞানিক, কেউ সাহিত্যিক। বেশীরভাগেরই হয় না কেবল ঐ বৌয়ের জন্যই। বৌ বড় সাংঘাতিক জিনিস। পাঁচুবাবুরও খুব

আশা ছিল আমার ওপর। এই সংসারের জন্যই হল না। তা পাঁচুবাবু আজকাল আর আসেন না কেন?

আমি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলি—তার আর ভবিষ্যৎ কিছু নেই। হাসপাতালে পড়ে আছেন। মৃত্যুশয্যা।

নরেনবাবু বাইফোকাল খুলে রেখে চোখ দুটো ধুতির খুঁটে মুছলেন। আবার বাইফোকাল পরে নিয়ে বললেন—বয়স হল। সত্তর পঁচাত্তর তো হবেই।

—তা হবে।

—কোন হাসপাতালে?

—কবিরাজী হাসপাতাল, শ্যামবাজারে।

নরেনবাবু গম্ভীর হয়ে বললেন—চিনি।

আমি বলি—যাবেন নাকি একদিন দেখতে? খুব খুশী হবেন তাহলে। ওঁর তো কেউ নেই। চেনা লোক কেউ গেলে খুব খুশী হন।

নরেনবাবু উদাস হয়ে বলেন—আমার সময় কোথায়!

বলে একটু চুপ করে থাকেন উনি। তারপর টেবিলের ওপর সেই অসম্পূর্ণ কোষ্ঠীপত্রটা পেতে ঝুঁকে পড়ে বললেন—গিয়েই বা হবে কি? মরুণে মানুষকে দেখতে আমার ভাল লাগে না, মন খারাপ হয়। অনেককাল দেখিনি, ওঁকে খামোখা এখন দেখে মন খারাপ করার মানে হয় না। তার চেয়ে চোখের আড়ালে যা হয় হোক। সেই ভাল। হয়েছে কি?

আমি কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললাম—বুড়ো বয়সের নানা রোগ। ভীষণ খেতে ভালবাসতেন, সেই থেকে ডায়াবেটিস হয়েছিল। এখন শোনা যাচ্ছে, ক্যানসারও দেখা দিয়েছে। বাঁচবেন না, তবে এখনো বশ হাসিখুশী আছেন।

নরেনবাবু এই প্রথম একটু হাসলেন—পাঁচুবাবু বরাবরই সদানন্দ পুরুষ ছিলেন। ভাগ্যবান। মরাটা নিয়েই আমি ভাবি। কবে, কোথায়, খাবি খেতে খেতে মরব। পাঁচুবাবুর মতো আমি তো আর সদানন্দ পুরুষ নই। একবার এই গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন থেকে আমাকে হাঁটিয়ে নিয়ে গেলেন শোভাবাজার অবধি নিখুঁতি খাওয়াবেন বলে। অমন নিখুঁতি নাকি কোথাও হয় না।

চাচার হোটেলে বহুবার মাংস খাইয়েছেন। নানান শখ শৌখিনতা ছিল তাঁর যা দেখে বোঝা যেত ভিতরটা সব সময়ে রসে ডগমগ। প্রায়ই বলতেন, আশি বছর বয়সের পর ধর্মকর্মে মন দেব। খুব বাঁচার ইচ্ছে ছিল, আবার মরতেও খুব পরোয়া ছিল না। প্রায়ই কেওড়াতলা নিমতলা সব ঘুরে বেড়াতেন। কত সাধুসঙ্গ করেছেন, সারা ভারতবর্ষ ঘুরে ঘুরে টাকা খরচ করতেন। সেই পাঁচুবাবু মৃত্যুশয্যায়! এ কি ভাবা যায়?

পাঁচুদার কথায় আমিও দুঃখিত হয়ে পড়ি। বলতে কি কলকাতা শহরটা পাঁচুদাই আমাকে চিনিয়েছিলেন। সদানন্দ মানুষ, সংসারে কারো পরোয়া ছিল না। রাইটার্স বিল্ডিংসের ল্যান্ড রেভিনিউতে ভাল চাকরি করতেন। তাঁর যৌবনে এবং প্রৌঢ়ত্বে বাজার ছিল সস্তাগণ্ডা। পয়সা তাঁর ছড়াছড়ি যেত। মনে পড়ল গতকালও পাঁচুদা একটু তেলমুড়ি খাওয়ার বায়না করেছিলেন। সেটা যে খাওয়া বারণ তা নয়। তাঁর স্টেজে কিছুই বারণ নয় আর। যা খুশী খেতে পারেন। ডাক্তাররা অবস্থা বুঝে সব বারণ তুলে দেয়। কিন্তু পাঁচুদার তেলমুড়ি খাওয়ার পয়সা নেই এখন আর।

নরেনবাবু ফের বাইফোকালটা খুলে চোখ মুছে বললেন—নবাংশটা করে রাখব'খন। কিন্তু আমি বলি কি, আপনি বরং এখন থেকেই বিদেশ যাওয়ার চেষ্টা দেখুন। এক ঝলক বিচার করে যা দেখছি, হয়ে যাবে।

একটু শিউরে উঠে বলি—বলছেন?

—বলছি।

একটা ছোটো শ্বাস ফেলে উঠে আসি।

বস্তুতঃ সদ্য সদ্য জীবনের দশ দশটা বছর কষ্ট করে আমি এই সেদিন সুইজারল্যান্ড থেকে ফিরেছি। কিন্তু সে কথা নরেনবাবুকে বলার কোনো মানে হয় না। বিদেশে যাওয়াটাই যাদের জীবনের চরম লক্ষ্য আমি তাদের দলে নই।

খুব অল্প বয়সেই আমার জ্ঞানচক্ষু ফুটেছিল। ভিখিরির ছেলে অল্প বয়সেই নিজের রক্ষণাবেক্ষণ করতে শেখে। কারণ তাকে কেউ রক্ষণাবেক্ষণ করে না। লক্ষ্য করে দেখেছি, শীতে বর্ষায় কাঙাল গরীবের শিশু জল নিয়ে খেলা করে, ধুলো বালিতে

গড়ায়, অখাদ্য খায়, অসম্ভব নিষ্ঠুরতায় মারপিট করে। সেসবের প্রতিরোধশক্তি ওদের মধ্যে আপনা থেকেই তৈরি হয়ে যায়। নিদারুণ অভাব ওদের চারপাশের রুক্ষতাকে প্রেমহীন ভালোবাসাহীনভাবে গ্রহণ করতে শিখিয়ে দেয়, অল্প বয়সেই তারা তাদের পরিবেশ সম্পর্কে বিজ্ঞ হয়ে ওঠে। ধুলো-খেলা করতে করতে উঠে গিয়ে ভিক্ষের হাত পাতে, বিয়েবাড়ির ফুটপাতে রাস্তার কুকুর তাড়িয়ে খাবার খুঁটে আনে, দুধের শিশু মাকে ছেড়ে সারাদিন একা পড়ে থাকে, কাঁদে না। ঐ তাদের খেলা ও জীবন। মা-বাবা মরলে ছেলেমেয়ে কদাচিৎ কাঁদে, সন্তান মারা গেলে মায়ের শোক দীর্ঘস্থায়ী হয় না। অকারণ মায়া তাদের জীবনকে ভারাক্রান্ত করে না কখনো।

ভিখিরিদের সম্বন্ধে এত কথা বললাম, তার মানে এই যে আমাদের জীবনযাপন আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে তৈরি করে দেয়। শৈশবে আমার চেতনা হওয়ার পর থেকেই আমি স্বাভাবিকভাবেই জানতে পেরেছিলাম যে খিদে পেলেই খাবার এসে হাজির হয় না। এও জানতাম, ছোটোখাটো ব্যথা বেদনা, খিদে বা মারধরে কাঁদতে নেই। কান্না বৃথা, কেউ সেই কান্না ভোলাতে আসে না। এও জানতাম, আমার বাবার থাপ্পড়ের জোর খুব বেশী, মার নিস্পৃহতা ছিল পাহাড়ের মতো অটল। উনিশশো সাতচল্লিশের দেশ বিভাগের পরই ঢাকা থেকে উদ্বাস্তু হয়ে আসা আমাদের পরিবারের জনসংখ্যা খুব কম ছিল না। ঐ অত লোকের মধ্যে থেকে থেকে আমাদের আত্ম-সচেতনতাও অনেক কমে গিয়েছিল। রাণাঘাটের কাছে এক ক্যাম্পে তখন থাকি, অনেক উদ্‌ভ্রান্ত লোক চারিদিকে, খাওয়া পরার কোনো ঠিক নেই। মচ্ছবের মতো দুবেলা কারা যেন খিচুড়ি খাওয়াতে আসে। খাওয়া বলতে ঐটুকুই। সারাদিনে বহুবার খিদে পেত খিদে মরে যেত। প্রথমে কাঁদতাম খুব কিন্তু কাঁদতে কাঁদতে বুঝতে পারতাম কান্নার মূল্য দেওয়ার কেউ নেই। বাবার এক খুড়ী ছিল দলে, থুনথুনে বুড়ি, সেই ঠাকুমা মাঝে মাঝে কাছে ডেকে পিঠে হাত বুলিয়ে দিতেন, কাঁপা কাঁপা স্বরে কিছু বলতে চেষ্টা করতেন। তাঁর চোখের কোল ছিল ফোলা, চোখ ঘোলাটে, চোখের দোষেই সব সময়ে অশ্রুপাত করতেন, সেটা কান্না ছিল না। সেই ঠাকুমা ছাড়া আর কেউ বড় একটা পাত্তা দিত না।

দরমার বেড়া দেওয়া দমবন্ধ সেই ঘরে আমরা অবশ্য বেশীক্ষণ থাকতামও না। অনেক আমাদের বয়সী ছেলেমেয়ে জুটেছিলাম সেইখানে। ক্রমে খিদে ভুলে খেলায় মেতে থাকতে শিখেছিলাম। মার্বেল নেই, লাট্টু নেই, ঘুড়ি লাটাই জোটে না, তবু কত রকম তুচ্ছাতিতুচ্ছ খেলা আমরা তৈরি করে নিতাম। মাটির চাড়া ছুড়ে সিগারেটের খালি প্যাকেট জিতে নেওয়ার খেলা, দাড়িয়াবান্ধা, দড়ি পাকিয়ে বল তৈরি করে তাই দিয়ে ফুটবল। দেশের বাড়িতে আমরা নাকি তিনবার ভাত খেতাম, তা ছাড়া সারাদিন ধরে মুড়ি মুড়কি, আমটা জামটা তো ছিলই। সেই সব ভুলতে শিশুদের দেরি হয়নি। আমার খুব চট করে জীবনের রুক্ষতাকে টের পেয়ে তা গ্রহণ করতে শিখেছিলাম। রাণাঘাটে আমরা অবশ্য খুব বেশীদিন থাকিনি। সেখান থেকে হাবড়া, ব্যান্ডেল, গোসাবা হয়ে আমরা অবশেষে কলকাতায় আসি। বাবা পূর্বঙ্গে জমির আয় থেকে সংসার নির্বাহ করতেন, খুব বেশী লেখাপড়া বা বৃত্তিগত শিক্ষা তাঁর ছিল না। চাকরি-বাকরি পাওয়ার প্রশ্ন ছিল না, উদ্যোগের অভাব, আত্মবিশ্বাসহীনতা এবং উদ্বেগে তিনি আরো অপদার্থ হয়ে যাচ্ছিলেন। সহ-উদ্বাস্তুদের সঙ্গে সারাদিন কাজকর্মের চেষ্টায় ঘুরে বেড়াতেন, আর বাড়ি ফিরে কেবলই ফিসফাস করে পরামর্শ করতেন সকলের সঙ্গে। পরামর্শের শেষ ছিল না। কার্যকর কিছুই হত না। আমরা কাছাকাছি বয়সের চার ভাই, আর তিন বোন মিলে সাতজন, মা বাবা ঠাকুমা, এক কাকা কাকীমা আর তাদের তিন ছেলেমেয়ে, আবার এক ছোট কাকা—এই বিশাল পরিবার বিনা টিকিটে ট্রেনে, হাঁটাপথে, কিংবা যেমন তেমন ভাবে এখানে সেখানে ঘুরে ঘুরে হয়রান। কলকাতায় আমরা দমদমের কাছে এক খোলা মাঠে জড়ো হয়েছিলাম। ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। বাবা-কাকাদের মধ্যে খুব ভালবাসা ছিল, ছাড়াছাড়ি হওয়ার কথা কেউ ভাবেনি। কিন্তু বোঝা গিয়েছিল, ওইভাবে যৌথ পরিবার রক্ষার চেষ্টা করলে আরো মুশকিলে পড়তে হবে। মেজোকাকা তার পরিবার নিয়ে একদিন ভিন্ন হয়ে গেলেন। শোনা গেল, আদি সপ্তগ্রামে তাঁর এক খুড়শ্বশুরের জমিজমা আর কলাবাগান আছে, তদুপরি তিনি একটি মাত্র সন্তানকে হারিয়ে খুব নিঃসঙ্গ হয়ে

পড়েছেন। কাকাকে তিনি জমি বাগান তদারকির কাজ দিয়েছেন। কাকা সপরিবারে চলে গেলে পরিবারে লোকের চাপ কিছু কমল। যেখানে যাই সেখানেই আমাদের বয়সী কাঙাল ছেলেপুলে জুটে যায়। আমরা খুব খেলি। বলতে কি, সেই সময়ে একটা বড়সড় ছেলে আমাদের ভিক্ষে চাইতে শিখিয়েছিল। ক্যাম্প থেকে অনেক দূরে চলে গিয়ে আমরা বড় রাস্তায়, বাজারে এবং রেল স্টেশনে বহুবার ভিক্ষে করেছি। তবে কারো বাড়িতে গিয়ে ভিক্ষে চাইতে লজ্জা করত। আমরা বড়জোর পথচলতি মানুষের কাছে হাত পেতে বলতে পারতাম—দুটো পয়সা দেবেন? পয়সা পেলে নানা কুপথ্য কিনে খেতাম। ছোটখাটো চুরি করতাম কখনো সখনো। লাউটা, মুলোটা, ঘটি কি বাটি পেলে বেচে দিতাম। রেলের কামরায় উঠে খুঁজতাম যাত্রীদের ফেলে যাওয়া জিনিস। আমাদের বখে যাওয়ার ব্যাপারটা মা-বাবা কদাচিৎ লক্ষ্য করেছেন। মা দু দুটো কোলের মেয়েকে সামলাতে ব্যস্ত, বাবা অভাবে পাগল, ছোট কাকা সদ্য কৈশোর উত্তীর্ণ হয়ে লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বিষণ্ন। তিনি মানুষটা ছিলেন বড় ভাল, বুদ্ধিমান এবং মেধাবী। নীরবে তিনি তাঁর সঙ্গে আনা কিছু পুরোনো পড়ার বই বারবার পড়তেন। তাঁর তাড়া খেয়ে আমরা চার ভাই কিছু কিছু লেখা-পড়া শিখেছিলাম। লেখাপড়া আমার খুব খারাপ লাগত না, অক্ষর চেনা রিডিং পড়া যোগ বিয়োগ ইত্যাদির মধ্যে আমি কিছু নতুন রকম খেলার রহস্য টের পেয়েছিলাম। ছোটকাকার বিষণ্নতার গভীরতা আমরা টের পাইনি, যখন পেলাম তখন সেই আত্মহনন-কারীর দেহটি এক শীতের ভোরে দমদম জংশনের কাছে রেল লাইনে দ্বিখণ্ডিত হয়ে পড়ে ছিল। ছোটকাকার মৃত্যুর পর আমাদের পরিবারে জনসংখ্যা কমল, আরো কমল যখন আমার বড় দুই ভাই পর পর টাইফয়েড আর উদুরীতে মারা যায়। এইসব মৃত্যু খুবই শোকাবহ বটে কিন্তু তবু বলি স্বাভাবিক নিশ্চিন্ত জীবনে এই রকম শোক যতখানি ধাক্কা দিতে পারত ততটা হয়নি। ক্যাম্পে মৃত্যু দেখে আমরা অভ্যস্ত। শুধু খুনখুনে বুড়িঠাকুমা চোখের দোষেই হোক আর শোকেই হোক অবিরল অশ্রুপাত করে বিলাপ করতেন। মা বাবা অচিরে সামলে উঠলেন। শোকের সময় কই?

শুনতে পেলাম, বাবা কন্ট্রোলের কাপড়ের একটা ব্যবসা পেয়েছেন। সেটা ভাল না খারাপ এসব বিচার তখন মাথায় আসে না। একটা কিছু পাওয়া গেছে, একমাত্র সংবাদ। কয়েকদিনের মধ্যেই হঠাৎ আমাদের বাড়িতে বেশ কয়েকপদ রান্না হয়, একটু নতুন জামাকাপড়ের মুখ দেখি। বাবা একটা হাতঘড়ি পর্যন্ত কিনে ফেললেন। অতিলোভে বোধহয় তাঁতি নষ্ট হল। সে ব্যবসা বাবার চেয়ে বিচক্ষণতর লোকেরা হাতিয়ে নেয়। একটা রেশনের দোকানে বাবা কিছুকাল চাকরি করলেন। অভিজ্ঞতা বাড়ছিল। এর পরই বাবা এক বড় উকিলের মুহুরি হলেন। তার পরের পর্যায়ে বাবা স্বাধীনভাবে শিয়ালদা কোর্টে বসে কোর্ট ফি পেতে লাগলেন, দলিল তৈরি, রেজিস্ট্রেশন ইত্যাদির দালালি করে তাঁর জীবনের চূড়ান্ত স্বার্থকতায় পেঁাছে গেলেন। অর্থাৎ আমরা অত্যন্ত দীন দরিদ্রের মতো, খুবই সামান্য খাওয়া-পরার মধ্যে একরকমের নিশ্চয়তা পেয়ে গেলাম। এক সেই বুড়ি ঠাকুমার অনুল্লেখ্য মৃত্যু ছাড়া আর তেমন অঘটন কিছু ঘটেনি। আমি ছোটকাকার কাছে শেখা সামান্য লেখাপড়ার ব্যাপারটি ভুলিনি। তিনি মারা গেলে তাঁর বইগুলো আমার দখলে আসে। সেগুলো নিয়েই আমার অনেক সময় কাটত। বাবা কোর্টের কাজ পাওয়ার পর, প্রায় দশ বছর বয়সে আমি দমদমের একটা ওঁছা ইস্কুলে ভর্তি হয়ে যাই। সেই স্কুলে যে যায় তাকেই ভর্তি করা হয়, যে ক্লাসে যার খুশী। নামকোবাস্তে একটা ভর্তির পরীক্ষা নেওয়া হয় মাত্র। আমি যেতেই তাঁরা জিজ্ঞেস করেন, আমি কোন ক্লাসে ভর্তি হতে চাই। আমি বললাম—সিক্সে। তাঁরা কয়েকটা ট্রানশ্লেসন জিজ্ঞেস করলে আমি চটপট বলে দিই। একজন মাস্টারমশাই বললেন—বাঃ, ভেরী ইন্টেলিজেন্ট। আমি ভর্তি হয়ে গেলাম। পরের পরীক্ষা থেকেই আমি প্রথম স্থান অধিকার করতে থাকি। স্কুলটা যথার্থ খারাপ বলেই আমার মত মাঝারি ছাত্রের পক্ষে ফার্স্ট হওয়া কঠিন ছিল না। কিন্তু তাতে একটা সুবিধে হয়েছিল, এভাবে আমার আত্মবিশ্বাস বেড়ে যেতে থাকে। প্রায় দিনই টিফিনের পর স্কুল ছুটি হয়ে যেত। ক্লাস প্রায়ই ফাঁকা পড়ে থাকত মাস্টারমশাইয়ের অভাবে। পড়ানো ছিল খুবই

দায়সারা গোছের। আমি তাই বাড়িতে পড়তাম। দমদমের কাছে আমাদের কলোনীর পরিবেশ ছিল খুবই খারাপ। চুরি, গুণ্ডামি, মারপিট, জবর দখল, চরিত্রহীনতা, অশ্লীল ঝগড়া এ সব ছিল আমাদের জলভাত। এই পরিবেশ সহ্য করতে পারতেন না আমার ছোটকাকা। তা ছাড়া জীবনের হতাশার দিকটাও তাঁর সহ্য হয়নি, তাই তাঁকে মরতে হয়েছিল। আশ্চর্য এই, তাঁর মৃত্যুর পর থেকেই তাঁকে আমার বড় বেশী মনে পড়তে থাকে এবং আমার জীবনে তিনিই সবচেয়ে স্থায়ী প্রভাব ফেলেছিলেন। সেই উদ্বাস্তু পল্লীর সবচেয়ে অশ্লীল-গালিগালাজ আমার একসময় ঠোঁটস্থ ছিল, বখামির চূড়ান্ত একসময়ে আমি করেছি। কিন্তু ক্রমে আমার এই পল্লীর কুশ্রীতা থেকে মানসিক মুক্তি ঘটে। আমি আমার আর তিন ভাই বোনকেও প্রাণপণে এই অসুস্থ পরিবেশ থেকে আড়াল করতে চেষ্টা করতাম। বাবাকে বলতাম—চলুন, আমরা অন্য কোথাও বাসা করি। বাবা খুব বিরক্ত হয়ে বলতেন—তোমার বুদ্ধি লোপ পেয়েছে লেখাপড়া করে। আর কিছুদিনের মধ্যেই জমির স্বত্ব আমরা পেয়ে যাবো। মাগনা জায়গা ছেড়ে আহাম্মক ছাড়া কেউ যেতে চায় ?

আমি বাবার মতো করে বুঝতে শিখিনি। জমির জন্য তো মানুষ নয়। মানুষের জন্যই জমি। সেই মানুষই যদি হাতছাড়া হয়ে যায়, মানুষকেই যদি নীতিহীনতায় পশুত্বে নেমে যেতে হয় তো জমিটুকু আমাদের কতটুকু অস্তিত্বের আশ্রয় হতে পারে ? অবশ্য বাবা একটা যুক্তিসিদ্ধ কথাও বলতেন—দেখ, পরিবেশ থেকে পালানোর চেষ্টা কোরো না। সর্বত্রই পরিবেশ একই রকম। যদি পারো, যদি সাধ্য থাকে তো পরিবেশকে শুদ্ধ করে নাও।

আমি তখন ছেলেমানুষ, আদর্শের কথা ভিতরে সাঁ করে ঢুকে তীরের মতো গেঁথে যেত। তার থরথরানি থাকত অনেকক্ষণ। বুঝতাম, সত্যিই কোথায় যাবো ? বেলঘরিয়া থেকে গড়িয়া পর্যন্ত সর্বত্র ঘুরে এর চেয়ে ভাল বা সুস্থ পরিবেশ খুব একটা নজরে আসেনি তো ? আমাদের কলোনীতে দুচারজন ভাল লোক ছিলেন ঠিকই। তাঁরা দশের ভাল করতেন, উপকার করে বেড়াতেন, ঝগড়া কাজিয়া মেটাতেন, তা সত্ত্বেও বলতে পারি তাঁরা আমাদের মধ্যে

এমন কিছুর সঞ্চার করতে পারেননি যার দ্বারা আমরা উদ্বুদ্ধ হই, সংবর্ধিত হই। এ বাড়ির মেয়ে পালিয়ে যায়, ও বাড়ির ছেলে কালোবাজারী করে, অমুকের বৌ পরপুরুষের সঙ্গ করে—এই ছিল আমাদের নিত্যকার ঘটনা। প্রচণ্ড অভাবের চাপে মানুষ কত কি করে! এই সব মরীয়া ও নৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে-যাওয়া মানুষের কাছে ধরবার ছোঁবার মতো কোনো বাস্তব আদর্শ কেউ দিতে পারেনি। ভাল কথা সবাই বলছে, দেশ জুড়ে বক্তৃতার অভাব নেই, কিন্তু কেউ জানে না কোন পথে, কোন আদর্শে মানুষকে তার লক্ষ্যে পেঁৗছে দেওয়া সম্ভব। তার ওপর নানা বিরুদ্ধ মতেরও জন্ম হচ্ছে রোজ। সেই মতামতের ঝড়ে আমরা আরো উদ্‌ভ্রান্ত। কোন দিকে গেলে ঠিক হয় তা বুঝতে পারি না। তবু দল বেঁধে বক্তৃতা শুনতে যাই। এর বক্তৃতাতেও হাততালি দিই, ওর বক্তৃতাতেও হাততালি দিই। কে কেমন বলল সেইটে নিয়ে মাথা ঘামাই। এদিকে দরমার বেড়া বা চালের টিন পাল্টাতে আমাদের জেরবার হয়ে যায়, পুজোর জামা-কাপড়ের জন্য বাবাকে প্রচণ্ড চিন্তিত হয়ে পড়তে দেখি। পুজো উপলক্ষে জামাকাপড় কেনা হয় বটে, কিন্তু বছরে ঐ একবারই আমাদের যা কিছু কেনা হয়। সেটা না হলে লজ্জা নিবারণের সমস্যা। আমরা এ সব নিয়ে ব্যস্ত; এর চেয়ে দূরের বস্তু, অর্থাৎ পুরো দেশ কিংবা মানুষের ভবিষ্যৎ—এ সব আমাদের ভাববার সময় নেই।

প্রথম বিভাগে স্কুল ফাইন্যাল পাস করা গেল। আমাদের পরিবারে এ নিয়ে খুব একটা হৈ-চৈ করার অবস্থা আমাদের নয়। বাতাসা লুট দেওয়া হল মাত্র। বাবা কিছু বেসামাল রইলেন কয়েক-দিন। তাঁর মেজো ছেলে মানুষ হচ্ছে, এরকম একটা বিশ্বাস তাঁর হয়ে থাকবে। তখন তিনি প্রায়ই আমায় ছোটকাকার সঙ্গে তুলনা করে বলতেন—প্রভাসটা ঠিক ছানুর মত হয়েছে। ছানুও বেঁচে থাকলে আজ কত বড় মানুষ হত। এই তুলনায় কেন জানি না আমি অত্যন্ত আহ্লাদ বোধ করতাম। কৈশোরোত্তীর্ণ ছোটকাকা কবে মরে গেছেন, তবু আমার ভিতরে ঐ মানুষটি এক বিগ্রহের মতো স্থির হয়ে থাকে। ঐ সৎ, নিরীহ, মেধাবী মানুষটিকে ভালবাসা আমার শেষ হয়নি। আমার হতভাগ্য পরিবেশে যত মানুষ দেখেছি

তার মধ্যে তিনিই ছিলেন সবচেয়ে কোমল। চোখ বুজলেই দেখতে পাই, একটা জীর্ণ হলুদ চাদরে খালি গা ঢেকে খুপরির মধ্যে জানালার ফুটোর ধারে একমনে গণিতের বই খুলে বসে আছেন। মেয়েদের দিকে তাকাতেন না, খিদের কথা বলতেন না, কখনো কোনো অসুবিধে বা অভাবের অভিযোগ ছিল না। অল্প কথা বলতেন। কখনো কখনো আমাদের পড়ানোর পর গল্প শোনাতেন, কিংবা চুপ করে আমাদের নিয়ে বসে থাকতেন। শুনতে এইটুকু। কিন্তু আমার জীবনে কোনো মানুষই তাঁর মতো অত অল্প আচরণের ভিতর দিয়ে অত বেশী শেখাতে পারেনি।

বি এস-সি পর্যন্ত পাস করতে আবার খুব একটা কষ্ট হয়নি। ফিজিক্সে অনার্স নিয়েছিলাম, পরীক্ষার আগে সেটা ছেড়ে দিতে হয়। তার কারণ আমরা ভাই-বোনেরা বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সংসারের চাহিদা বাড়ছে, বাবার রোজগার বাড়ছে না। ফলে আমাকে বেশ কয়েকটা টিউশানী নিতে হয়। অপুষ্টির ফলে আমার শরীর ভাল ছিল না, চোখের দোষে মাথা ধরত, লো-প্রেশার ছিল, বেশী রাত জেগে পড়াশুনো করতে গিয়ে স্নায়ুর দোষেই বুঝি খুব খিটখিটে আর অধৈর্য হয়ে পড়েছিলাম। মাসান্তে আমার রোজগারের টাকা তখন সংসারের পক্ষে অপরিহার্য। কম বয়সে এসব দায়িত্ব নিয়ে বেশ বুড়িয়ে গেছি অল্প বয়সেই। সে এক রাহুগ্রস্ত যৌবন। ছোটভাইটা বড় হতেই বুঝলাম তার লেখা-পড়ার মাথা নেই! বোন দুটোরও প্রায় একই দশা। টেনেটুনে স্কুল ফাইন্যালটাও যদি পাস করানো যায় এই ভরসায় আমি ছোট ভাইটার পিছনে খুব খাটতাম। সে বখাটে ছেলে ছিল না, আমাকে ভয়ও পেত। কিন্তু তার মাথা পড়াশুনো নিতে পারত না। অবোধ শিশুর মতো সে চেয়ে থাকত আমার দিকে। মাঝে মাঝে প্রচণ্ড মারতাম তাকে। মনে হত, এই নির্বোধদের ভরণপোষণ করাই বুঝি হবে আমার একমাত্র কাজ সারাজীবন। তাই ঐ রাগ ও বিরক্তি। মন ভাল থাকত থাকত না। আই. এস-সি-র রেজাল্ট খারাপ ছিল না আমার। ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের অ্যাডমিশন টেস্টের লিস্টে নাম উঠেছিল। কিন্তু সেই ব্যয়সাপেক্ষ পড়াশুনোর অবস্থা নয় বলে পড়িনি। বি. এস-সি-র অনার্সটাই ছিল আশা-

ভরসা। কিন্তু ফাইন্যালের আগে বুঝতে পারলাম, হবে না। আমার মনঃসংযোগ নেই, ধৈর্য নেই, শরীরেও সয় না। অনার্স ছেড়ে বিষণ্ণ চিত্তে পরীক্ষা দিয়ে দেদার নম্বর পেয়ে ডিস্টিংশনে পাস করলাম। এম এস-সি পড়া হল না! একটা চাকরি পেয়ে গেলাম ডবলিউ. বি. এস পরীক্ষা দিয়ে। তুমুল আনন্দিত হল আমার পরিবার। ইঞ্জিনীয়ারিং পড়া হয় নি, ফিজিক্সের অনার্সটাও হল না, জীবনের অনেক বড় সার্থকতা আমার হাতের নাগাল দিয়ে পালিয়ে গেছে। সেই তুলনায় সরকারী চাকরিটুকু আমাকে কি আর দিতে পারে? তাই তখন আমার উচ্চাকাঙ্ক্ষা বড় বেশী প্রবল হয়ে উঠেছিল। নিজের পরিবারের প্রতি এক প্রচণ্ড আক্রোশও তখন থেকে জন্ম নেয়। এরা আমাকে এদের দুর্ভাগ্যের সঙ্গে জড়িয়ে আটকে রেখেছে। আমাকে বড় হতে দিচ্ছে না, আমার অন্তর্নিহিত গুণগুলির বিকাশ ঘটতে দিচ্ছে না।

এই নির্মম আক্রোশ থেকেই তলায় তলায় আমি গোপনে বিদেশে যাওয়ার চেষ্টা করতে থাকি। জানতাম, আমি চলে গেলে এদের সাংঘাতিক বিপদ ঘটবে, সরকারী চাকরির নিশ্চিত আয় এদের আশ্রয় দেবে না। তবু আমার উচ্চাকাঙ্ক্ষা আমাকে বড় বেশী নিষ্ঠুর করে তুলেছিল। জার্মানীতে প্রথম একটি চাকরি পেয়ে যাই, তারা যেতে লিখল। গোপনে পাসপোর্ট করলাম, ভিসার আবেদন জমা দিলাম। বাড়ির কেউ জানল না। কিছু টাকা জমানো ছিল দু বছর চাকরির। সেই টাকা দিয়ে জাহাজের টিকিট কেটে বাড়িতে খবর দিলাম। এক নিস্তব্ধতা নেমে এল বাড়িতে। সকলেই এক অবিশ্বাসের চোখে চেয়ে দেখেছিল আমাকে। তারা যতদূর সাফল্যের কথা ভাবতে পারে, আমি তো ততদূর সফলতা অর্জন করেছি। কম্পিটিটিভ পরীক্ষা দিয়ে অফিসারের সরকারী চাকরি করি। গেজেটে নাম ওঠে, আমার জন্য সচ্ছল পরিবার থেকে পাত্রীর খবর আসছে। মা বাবাও উদ্যোগ করছেন। এর মধ্যে এ কি! তারা আমাকে বিশ্বাস করতে পারছে না। আমি এতদূর হৃদয়হীন হতে পারি তাদের ধারণা ছিল না। অবশ্য কেউ কোনো জোরালো আপত্তি তুলল না। আমি অবশ্য তাদের বোঝালাম, আমার এবং সকলের ভবিষ্যতের

জন্য এটা দরকার। বাবা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, মাথায় হাত দিয়ে বসে রইলেন। মা তৎক্ষণাৎ কাঁদতে শুরু করে। বোনেরাও খুশী হয় নি। কেবল ভাইটা খুব খুশী হয়েছিল, দাদা না থাকলে তাকে আর ওরকম প্রচণ্ড মারধর বকুনি সহ্য করতে হবে না।

জার্মানীতে চলে গিয়েছিলাম দশ বছর আগে। তারা আমাকে শ্রমিকের চাকরি করাত। বহু কষ্টে অনেক চেষ্টায় আমি গেলাম অ্যামেরিকায়। মোটামুটি ভাল খেতাম, পরতাম, মাঝারি চাকরি জুটেছিল। কিন্তু আমার উচ্চাকাঙ্ক্ষা? তার কি হবে? কেবল ভাল খাওয়া-পরার জন্য তো আমি এতদূর আসিনি। কিছু একটা শিখে, জেনে যেতে হবে যা আমাকে অনেক উঁচুতে তুলে দেবে। অত্যন্ত দ্রুতবেগসম্পন্ন পাশ্চাত্য জীবনের সঙ্গে তাল রেখে চলতে গিয়েই আমার সময় ফুরিয়ে যেত। উচ্চাকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণ হল না। কমপ্রেসর মেশিন সম্পর্কে শিখবার জন্য অবশেষে আমি চলে আসি সুইজ্যারল্যান্ডে। ব্যল শহরে দীর্ঘকাল লেগে থাকলাম একটা কারখানায়। বেতনের প্রচণ্ড অসাম্য। জার্মান, ইটালিয়ান শ্রমিকেরা বেশী অংকের পে-প্যাকেট পায়, আমরা অনেক কম। তবু প্রচণ্ড পরিশ্রম করতাম। কিন্তু অতবড় কম্প্রেসর তৈরির কারখানার কাজ আমি একা শিখব কি করে। আমার মৌলিক কারিগরিবিদ্যা নেই, পরিকল্পিতভাবে আমি আসিওনি। কেবল ভসভসে আবেগ সম্বল করে এসে চাকরিতে ঢুকেছি। বুঝেছি কেবল চাকরিই সার হল। এই হতাশা কাটাতে আমি এক জার্মান মেয়েকে দুবছর বাদে বিয়ে করি। তার দেড় বছর বাদে সে ছেড়ে চলে যায়। আর ততদিনে দশ দশটা বছর পার হয়ে গেল। খবর পেয়েছি, বাবা মা এখনো কোনক্রমে বেঁচে আছে, ভাই রেলের পোর্টার, বোনেরা যে যার রাস্তা দেখেছে। হতাশায় ভরে আমি এক দিন ফেরবার প্লেনে চাপলাম।

অলকা

ভোরের প্রথম আলোটি পূবের জানালা দিয়ে এসে আমার জয়পুরী ফুলদানীটার ওপর পড়েছে। ফুলদানীতে কাল সন্ধ্যের রজনীগন্ধা একগোছা। ফুল এখনো সতেজ। কালকের কয়েকটা কুঁড়ি আজ ফুটেছে। সাদা ফুলের ওপর ভোরের রাঙা আলো এসে পড়েছে, জয়পুরী ফুলদানীটার গায়ে চিকমিক করে আলো। ড্রেসিং টেবিলের ওপরেই ফুলদানী, তাই আয়না থেকেও আলোর আভা এসে ওকে সম্পূর্ণ আলোকিত করেছে। তিন আয়নার ড্রেসিং টেবিল ফুলদানী আর ফুলের তিনটে প্রতিবিম্ব বুকে ধরে আছে। একগোছা রজনীগন্ধা চারগোছা হয়ে কি যে সুন্দর দেখাচ্ছে।

আমার বদ অভ্যাস, খুব ভোরে আমি উঠতে পারি না। আমার বাপের বাড়ির দিকে সকলেরই এই এক অভ্যাস। কেউ ভোরে ওঠে না। আমাদের বাপের বাড়িতে সবার আগে উঠত আমার বুড়ি ঠাকুমা। ভোরে চারটেয় উঠে খুটুর-খাটুর করত, জপতপ করত। আর তারপর সাড়ে সাতটা বা আটটা নাগাদ আর সবাই। এ আমাদের ছেলেবেলার অভ্যাস। বিয়ে হওয়ার পর এই বদ অভ্যাস নিয়ে অনেক ঝামেলায় পড়তে হয়েছে আমাকে। আমার শ্বশুরবাড়ির লোকেরা সব রাত থাকতে উঠে ঘর গেরস্থালীর কাজ শুরু করে দিত। প্রথম প্রথম নতুন বৌ-পনা দেখিয়ে আমিও ভোরে উঠতাম, কিন্তু তাতে শরীর বড় খারাপ হত। সারাদিন গা ম্যাজ-ম্যাজ, ঘুম-ঘুম, অস্বস্তি। কপালক্রমে আমার বিয়ে হয়েছিল এক ধার্মিক পরিবারে। ধর্ম ব্যাপারটা আমি দুচোখে দেখতে পারি না। আমার বাপের বাড়িতে অবশ্য একটু লক্ষ্মীর পট, কালীর ছবি, বালগোপাল বা শিবলিঙ্গ দিয়ে একটা কাঠের ছোট্ট ঠাকুরের সিংহাসন ছিল, এবং তার সামনে ঠাকুমা একটু ফুল জল বাতাসাও দিত। কিন্তু ঐটুকুই।

আমাদের আর কারো ধর্মীয় ব্যাপারে কোনো উৎসাহ ছিল না। বড় জোর বৃহস্পতিবার পাঁচালী পড়ত মা, শনিবারে কোনো কোনোদিন লুট দেওয়া হত। কিন্তু এ সবই ছিল দায়সারা। আমাদের ঠাকুরঘরটাই ছিল শোওয়ার ঘর। সেই ঘরে সবাই জুতো পরেই ঢুকতো আর ঠাকুরের সিংহাসনের বাঁ দিকে যে আলনা ছিল তার নিচের তাকে জুতো রাখত সবাই। বাবার গলায় পৈতা বলে কোনো বস্তু ছিল না, আমার দাদা বা ভাইদের কারোই পৈতে টৈতে হয়নি। আমাদের কুলগুরু বংশের শেষ গুরু ছিল কেশব ভট্টাচার্য। আমার বয়স যখন তের তখন কেশবের বয়স হবে বড় জোর পঁচিশ ছাব্বিশ। সে লোকটা ছিল ডাক-পিওন। মাঝে মধ্যে সে আমাদের বাড়ি এলে আমরা তাকে নিয়ে হাসাহাসি করতাম। সে কুলগুরুর তোলা আদায় করতে বেরোতো। যদিও তার শাস্ত্রজ্ঞান ছিল না, তার কাছে ঠাকুমার পর আর কেউ মন্ত্র নেয়নি। কিন্তু ঠাকুমা তাকে ভীষণ শ্রদ্ধাভক্তি করত, ঐ পুঁচকে কেশবের পায়ের ওপর উপুড় হয়ে অনেকক্ষণ ধরে পায়ের ধুলো নিত, নিজে উপোস থেকে সারাদিন রান্নাবান্না করে কেশবকে খাওয়াত, মোটা দক্ষিণা দিত, পালে পার্বণে ধুতি চাদর দেওয়া তো ছিলই। বলতে কি, কেশব বেশ সুপুরুষ ছিল। নাদুস নুদুস চেহারা, ফর্সা রঙ, চোখদুটো খুব বড় বড়। কিন্তু সে সাজতে জানত না, সাদামাটা ধুতি, ময়লা পিরান, খোঁচা দাড়ি নিয়ে আসত। সে এসে খুব তাকিয়ে দেখত আমাকে। আমরা যদিও তাকে নিয়ে হাসাহাসি করতাম, সে কিছু মনে করত না। মান-অপমান বোধ তার খুবই কম ছিল। বরং সে মাঝে মাঝে ভ্যাবলার মতো হাসত। ধর্মের কথা সে জানতও না, বলতও না। সে এলেই আমার দাদা অভিজিৎ চেঁচিয়ে বলত— ঐ কেশবশালা এসেছে মাসকাবারী নিতে। ও কেশব, আজ আমাদের জামাকাপড় কেচে দিয়ে যাবি, বাসন মেজে দিয়ে যাবি। শুনলে ঠাকুমা রাগারাগি করত, কিন্তু কেশব নির্বিকার। সে বরং কখনো সখনো এমন কথাও বলত—দূর শালা, গুরুগিরির বড় ঝামেলা। সব জায়গায় লোক হুড়ো দেয়।

আমি বাসি কাপড় ছাড়তাম না, পায়খানার কাপড় পালটাতাম

না, এঁটোর বিচার ছিল না। ভাত খেতে বসে আমরা সবাই বরাবর বাঁ হাতে জল খেয়েছি। বাবা শুয়োর গরুর মাংস খেতেন, হুইস্কি টুইস্কি তো ছিলই। আমরা এই পরিবেশে মানুষ হয়েছি। শ্রীরামপুরে গঙ্গার ধারে আমাদের আদি বনেদী বাড়ি। সেইখানে জন্মে আমরা বড় হয়েছি। কোনদিন অভাব টের পাইনি। যদিও আমাদের বংশগৌরব আর উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া সম্পত্তি সবই শেষ হয়ে গিয়েছিল, তবু আমাদের অসুবিধে ছিল না। বাবা ইঞ্জিনীয়ার ছিলেন, অনেক টাকা সাধু ও অসাধু উপায়ে আয় করতেন। জাতি, ধর্ম, বর্ণ মানতেন না।

আমাদের পুরোনো বাড়িটার নাম আমরা দিয়েছিলাম 'বার্ড'স হাউস'। প্রকাণ্ড এজমালি বাড়িটায় যে আমাদের কত দূরে ও নিকট সম্পর্কের শরিকেরা বাস করতেন তার আদমসুমারি হয়নি। সারাদিন অত লোকের আর মেয়েছেলের চেঁচামেচিতে বাড়ি থাকত সরগরম। শরিকের ঝগড়া তো ছিলই। কার ভেজা কাপড় কার গায়ে লাগল, কে তার সামনের বারান্দায় টিন দিয়ে ঘিরে নতুন ঘর তুলবার চেষ্টা করছে, কে তার ভাগের জায়গায় বাচ্চাকে হিসি করিয়েছে—এই সব সমস্যা অহরহ সকলের মাথা গরম করে রাখত।

শোনা যায়, আমার বাবা যৌবন বয়সে খ্রীস্টান হয়েছিল। কিন্তু গোটা ধর্মের প্রতি তাঁর এমন বিরাগ ছিল যে শেষ পর্যন্ত খ্রীস্ট ভজনাও তাঁর হয়ে ওঠেনি। আমাদের সেই বিশাল এজমালি বাড়িতে আমরা মোটামুটি একঘরে হয়েই ছিলাম, অন্য সবাই আমাদের ম্লেচ্ছ বলে এড়িয়ে চলত।

আমার একুশ বছর বয়সের সময় বিয়ে হয়। বিয়ে হল এক গোঁড়া ব্রাহ্মণ পরিবারে। তাঁরা শ্রীহট্ট জেলার লোক, চৈতন্যদেবের ভক্ত। আমার স্বামী যদিও খুব বড় চাকরি করতেন না, তবু তাঁদের পরিবারটি বেশ সচ্ছল ছিল। আমার স্বামী জয়দেব চক্রবর্তী স্মল স্কেল এণ্ড কটেজ ইণ্ডাস্ট্রীর অফিসার ছিলেন। ছোটোখাটো চেহারা, বেজায় ভালোমানুষ, তবে কখনো কখনো তাঁকে বদরাগী বলে মনে হত। স্বামী সম্পর্কে 'আপনি' 'আজ্ঞে' করে বলছি, সেটা খুব ভাল লাগছে না, বরং বলি জয়দেব লোকটা

ভালই ছিল। কিন্তু সে যতখানি সুপাত্র ছিল, তার চেয়ে বোধহয় তুলনামূলকভাবে আমি আরো ভাল পাত্রী ছিলাম? চেহারার জন্য আমার খ্যাতি ছিল সর্বত্র। লোরেটো স্কুলে আমি কিছুকাল পড়েছি। কিন্তু আমার চরিত্রের সুনাম ছিল না বলে সেই স্কুল ছাড়তে হয়। পরে আমি একটা সাদামাটা স্কুল থেকে পাশ করি। তাহলেও আমি গড়গড় করে ইংরিজি বলতে পারতাম, নাচে গানে ছিলাম চমৎকার, অভিনয়ে সুনাম ছিল। সোজা কথায়, গৃহকর্ম করে জীবন কাটানোর জন্য তৈরি হইনি। তেরো চৌদ্দ বছর বয়স থেকেই আমার নানারকম লঘু যৌন অভিজ্ঞতা হয়েছিল। এবং লোরেটোতে পড়বার সময়ে আমি যখন ক্রীক রোতে এক মাসীর বাড়ীতে থাকতাম তখনই আমার কয়েকবার সম্পূর্ণ যৌন অভিজ্ঞতা ঘটে যায়। আর, এজন্য কখনোই আমার কোন অনুশোচনা বা প্রতিক্রিয়া হয়নি, কারণ ছেলেবেলা থেকেই আমাদের পরিবারের ঢিলেঢালা নৈতিক পরিবেশে আমি মানুষ। আমার মা খুব উঁচু সমাজের মেয়ে, বাবাও উচ্চাভিলাষী এবং নৈতিক আদর্শবোধ থেকে মুক্ত ছিলেন। কাজেই আমরা শরীরকে শরীর ভাবতেই শিখেছি, তার সঙ্গে মন বা বিবেককে মেশাইনি। এমন কি আমার যৌবন প্রাপ্তির পর বাবাও অনেক সময়ে আমাকে ফচ্‌কেমি করে জিজ্ঞেস করেছেন—কি রে মেয়ে, কটা ছেলের বুকে ছুরি মেরেছিস? অর্থাৎ আমরা খুবই উদার পরিবেশে বড় হয়েছি। আমার বড় দাদা, বাবা এবং মার সামনেই সিগারেট খেত। সে কিছু রোগা ছিল বলে বাবা প্রায়ই তাকে বলতেন—তুই মাঝে মাঝে বীয়ার খাস, তাতে শরীরটা অনেক ফিট থাকবে। উত্তরে আমার দাদা অভিজিৎ বলত—দূর, বীয়ার আমার পোষায় না, আমার প্রিয় ড্রিঙ্কস হচ্ছে হুইস্কি।

আমি সুন্দরী ছিলাম, নইলে ঐ গোঁড়া পরিবারে আমার বিয়ে হত না। কিন্তু বিয়েটা যে কেন হয়েছিল সেটা আমি ভেবে পাই না। প্রথম কথা, ওর চেয়ে ঢের ভাল বিয়ে আমার হওয়ার কথা। দ্বিতীয়ত আমাদের দুই পরিবারের দৃষ্টিভঙ্গীর এত পার্থক্য যে বিয়ের প্রস্তাবই উঠতে পারে না। তবু হয়েছিল। একদিন কলকাতা থেকে বোধহয় কিছু মার্কেটিং করে দাদার সঙ্গে লোকাল

ট্রেনে ফিরছিলাম, তখন বেলা এগারোটা হবে। ট্রেন ফাঁকা, আর একটা ফাঁকা কামরায় জয়দেবের বাড়ির লোকজন—মা, পিসি, জ্যাঠা গোছের সবাই যাচ্ছে তারকেশ্বরে! আমি তাদের পাশেই বসে-ছিলাম। বিধবা পিসি আমার দিকে কয়েকবার তাকিয়ে হঠাৎ বলে উঠলেন—আহা মা, বড় সুন্দর দেখতে গো তুমি? কোথায় থাকো বাছা?

এইভাবে পরিচয়। তারপর বলতে কি তাদের বাড়ি থেকেই লোকজন এসে খোঁজখবর করল, বিয়ের প্রস্তাব দিল। ভাংচি দেওয়ার লোকও ছিল এজমালি বাড়ির শরিকদের মধ্যে। তারা গিয়ে পাত্রপক্ষকে গোপনে জানিয়ে এল যে বাবা খ্রীস্টান, আচার বিচার মানে না, আমাদের চরিত্র খারাপ। কিন্তু তাতে আটকাল না। আমাকে তাদের বড় বেশী পছন্দ হয়ে গিয়েছিল। বিয়েটা ভেঙে গেলে অবশ্য ভালই হত। আমার মায়ের অনিচ্ছা ছিল, শুনেছি জয়দেবের বাবারও আপত্তি ছিল। জয়দেবের বাবা গুজব-গুলিকে উড়িয়ে দিতে পারছিলেন না। কিন্তু তাঁর বোন, অর্থাৎ জয়দেবের পিসিই তাঁকে বুঝিয়ে রাজী করিয়েছিলেন। অন্য দিকে আমার বাবা হঠাৎ তাঁর হিসেবীবুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পেরেছিলেন যে নীতিহীনতা ও অনাদর্শ দিয়ে তিনি তাঁর মেয়েকে মানুষ করেছেন সেগুলি মেয়ের বিয়ের সময়ে প্রবল বাধা হয়ে দাঁড়াবে। বিশেষতঃ আমাদের তো শত্রুর অভাব নেই। তাই বাবা হঠাৎ বিয়ের প্রস্তাব পাওয়ার পর থেকেই তাঁর স্বভাববিরুদ্ধভাবে আমাকে বিয়েতে রাজী করালেন, দীর্ঘ আলোচনার পর। মায়েরও মত হল। এবং সে সময়েই মা আমাকে গোপনে জিজ্ঞেস করে জেনে নেন যে আমি সত্যিকারের কুমারী আছি কিনা। তাঁর কোনো কারণে সন্দেহ হয়ে থাকবে। আমি অবশ্য স্পষ্ট জবাব দিইনি। কিন্তু মায়েরা তো বোঝে।

জয়দেবকে আমি খুব নিরাসক্তভাবে বিয়ে করি। পাত্র আমার পছন্দ ছিল না। ছোটোখাটো চেহারার পুরুষ এমনিতেই আমি দেখতে পারি না, তার ওপর তার আবার নানারকম নৈতিক গোঁড়ামি ছিল। সেগুলি আরো অসহ্য। যেমন, বিয়ের কয়েক-দিনের মধ্যে সে শারীরিক দিক দিয়ে আমার সঙ্গে মিলিত হয়নি।

যেদিন হল, সেদিন মিলনের আগে সে আমার কুমারীত্ব পরীক্ষার চেষ্টা করেছিল। অবশ্য কিভাবে পরীক্ষাটা করেছিল তা আমি বুঝতে পারিনি তখন, পরে বুঝেছিলাম। কিন্তু এটা কোন মেয়ে আজকাল সহ্য করবে ?

পরীক্ষা করে অবশ্য সে বুঝতে পেরেছিল যে আমি কুমারী নই। আর আমিও তার বাতিক দেখে বুঝতে পারছিলাম যে এ লোকটা স্বামী হওয়ার উপযুক্ত নয়। কি করে যে ও আমার সঙ্গে আর আমি ওর সঙ্গে ঘর করব সেটা বিয়ের পরেই আমাদের সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়।

শ্বশুরবাড়িতে আমার নতুন নামকরণ হল, লতিকা। এটা ওদের বাড়ির নিয়ম, নতুন বৌ এলে ওরা তার নাম পাল্টে নতুন নাম রাখে। এতে আমার আপত্তি ছিল। হুট বলতে কেন যে কেউ আমার জন্মাবধি নিজস্ব নামটা বাতিল করে দেবে। আমি যে নিজেকে বরাবর অলকা বলে জানি। অচেনা লতিকা আমি হতে যাবো কোন দুঃখে ? আমি খুব লাজুক মেয়ে নই, ভীতুও নই, তাই শ্বশুরবাড়ির নিয়মকানুনগুলোর বিরুদ্ধে কিছু মতামত প্রকাশ করেছিলাম। এটা ওরা ভাল চোখে দেখেনি। জয়দেবকে নাম বদলানোর ব্যাপারটা বলতেই ও খুব বিরস মুখে বলল—তোমার নামধাম বদলে ফেলাই ভাল।

—কেন ? আমি চমকে উঠে প্রশ্ন করলাম।

—তোমার অতীতটা খুব ভাল নয় তো, তাই।

আমি স্তম্ভিত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম—আমার অতীত কি খারাপ ?

—খুব।

—কি করে বুঝলে ?

জয়দেব তার বোকা এবং ভাবলেশহীন চোখে চেয়ে বলল—যারা বোঝে তারা ঠিক বোঝে।

আমি কি বলব ওকে, কি বললে ওর চূড়ান্ত অপমান হয় তাই ভাবছিলাম। ও আমাকে বলল—কেন, তুমি কি জানো না ?

—কি জানার কথা বলছ ?

—তুমি যে খারাপ !

সাধারণ বাঙালী মেয়েদের মতো আমার হুট্‌ করে চোখের জল আসে না। বরং সে সব পরিস্থিতিতে আমার একরকমের পুরুষের রাগের মতো রাগ হয়, থাপ্পড় কষাতে ইচ্ছা করে।

অবশ্য জয়দেবকে আমি থাপ্পড় কষাইনি, শুধু বলেছি—না, আমি খারাপ বলে নিজেকে জানি না। বরং মানুষকে যারা সাদা মনে গ্রহণ করতে পারে না তাদেরই খারাপ বলে জানি।

জয়দেব গম্ভীর হয়ে বলল—মানুষকে সাদা মনে গ্রহণ করব! কেন?

—কেন করবে না?

—কেন করব? মানুষ নিজের সম্পর্কে যা বলে তা কি সব সময়ে সত্যি হয়?

—নাই হল। ভালমন্দ মিশিয়েই মানুষ, মানুষ হওয়াটাই তার যোগ্যতা।

জয়দেব একটু হাসল। কিন্তু সে ঠিক হাসি নয়। বরং হাসির মুখোশে ঢাকা নিষ্ঠুরতা।

সে বলল—এই যে তুমি, তোমার কথাই যদি ধরা যায় নিজের সম্পর্কে বলছ যে তুমি খারাপ নও! কিন্তু তোমার শরীর বলছে যে তা নয়।

—আমার শরীর কি বলেছে তোমার কানে কানে?

—বলেছে যে বিয়ের সময় তুমি কুমারী ছিলে না।

এই প্রথম, বিয়ের এক মাসের মধ্যেই ও স্বীকার করল যে ও আমাকে পরীক্ষা করেছে। শুনে আমি তো ভীষণ অবাক। এসব যে বোঝা যায় তা আমার জানা ছিল না।

বললাম—গাধার মতো কথা বলো না, তোমার মতো সন্দেহ-বাতিক যাদের তারা বিয়ে করে কোন মুখে?

জয়দেব মুখ কঠিন করে বলে—যাদের বাতিক নেই তারাই বোকা, যারা মানুষকে বিনা প্রশ্নে গ্রহণ করে তারাই অবিবেচক।

—তুমি কি করে বুঝলে যে আমি কুমারী ছিলাম না! তুমি কি ডাক্তার না হঠযোগী?

জয়দেব বলে—ডাক্তার বা হঠযোগী হওয়ার দরকার হয় না।

একটু সন্ধিৎসু হলেই চলে, আর একটু বুদ্ধিমান হলেই হয়। কেন, তুমি কি অস্বীকার করতে চাও ?

—নিশ্চয়ই। তুমি পিশাচের মতো কথা বলছ।

—না। শোনো, শরীর পরীক্ষা করে সবই বোঝা যায়। তুমি হয়তা জানো না, আমি জানি।

—তুমি ছাই জানো। তুমি পাগল, তোমার বাড়িসুদ্ধ পাগল। আমার খুব ভুল বিয়ে হয়েছে, বুঝতে পারছি।

জয়দেব রেগে গেল না। খুব রাগী মানুষ জয়দেব ছিলও না। ওর রাগ খুব ঠাণ্ডা আর দৃঢ়।

ও বলল—বিয়ে যে ভুল হয়েছে তাতে সন্দেহ কি। পিসিমার জন্যই হল। কিন্তু হয়ে যখন গেছেই তখন এটাকে যতদূর সাকসেসফুল করা যায় সেটা দেখাই আমার লক্ষ্য।

আমি মাথা নেড়ে বললাম—না, সন্দেহ দিয়ে শুরু হলে বিয়ে সাকসেসফুল হয় না। তার চেয়ে সম্পর্ক ভেঙে ফেলাই ভাল।

জয়দেব এই প্রথম একটু ভয় পেল যেন, একটু চঞ্চল হয়ে বলল —এ তো সাহেব রাজত্ব নয় যে যখন তখন বিয়ে ভাঙা যাবে!

—সে তোমরা বুঝবে না।

জয়দেব আমার দিকে চিন্তিতভাবে চেয়ে বলল—শোনো, সাহেবদের দেশে একটা মানুষের সঙ্গে একটা মেয়েমানুষের বিয়ে হয়, বিয়েটা সেখানে ব্যক্তিগত ঘটনা, তার সঙ্গে পরিবার বা সমাজের তেমন কোনো সম্পর্ক নেই। আমাদের দেশে তো তা নয়।

—তত্ত্বকথা শুনতে আমার ভাল লাগে না। তুমি যদি অত বড় অপমানটা আমাকে না করতে তাও না হয় হত। আমি ওসব বুঝি না, বুঝবোও না।

—তোমাকে একটু বুঝতেই হবে যে। বলতে গিয়ে জয়দেবের স্বর যথেস্ট নরম হয়ে এল। তার মুখচোখে ভীতু-ভাবও একটু ফুটে উঠল কি ?

আমি শুনতে চাইছিলাম না। উঠে চলে আসছি, জয়দেব তাড়াতাড়ি এসে আমার হাত ধরে ফেলল। ঝনাৎ করে নতুন চুরি শাঁখায় ভরা হাতটা শব্দ করে উঠল। আমি হাত টেনে বললাম— ছেড়ে দাও।

সেও হাত ধরে রেখে বলল—একটু শোনো, দুটো কথা······

ও ছোটোখাটো মানুষ, আমার হাত ধরে আটকে রাখার মতো যথেষ্ট গায়ের জোরই ওর নেই। নেচে কুঁদে বরং আমার গায়েই সেই আধা পুরুষটা দুহাতে আমার কোমর জাপটে ঝুলে পড়ল, বলল—যেও না! শুনে যাও।

ওর পা থেকে কোমর অবধি মেঝেয় লুটোচ্ছে, ঊর্ধ্ব অঙ্গ ঝুলছে আমার কোমর ধরে, হাস্যকর দৃশ্য। কিন্তু আমার হাসি পায়নি। ওর ঐ সর্বস্ব দিয়ে ঝুলে থাকা টানে হাঁটু ভেঙ্গে পড়ে যেতে যেতে আমি ওর মুখে থাবড়া দিলাম কয়েকটা। ও তবু ছাড়ল না। আমি টাল সামলাতে না পেরে থপ্ করে বসে পড়লাম মেঝেতে। দরজা অবশ্য বন্ধ ছিল, তখন ছুটির দিনের দুপুরবেলায় বাড়ির বেশীর ভাগ লোকই ঘুমোচ্ছে, তাই কথাবার্তা শুনে কেউ কৌতূহলী হতে পারে তো! বিশেষ করে জয়দেব এসব ব্যাপারে খুব খুঁতখুঁতে ছিল। দিনের বেলায় সকলের সামনে আমার সঙ্গে কখনো কথা বলত না। বিয়ের একমাসের মধ্যেও দুপুরবেলা কখনো শারীরিক ভাবে মিলিত হয় নি। সে নাকি শাস্ত্রে বারণ আছে। অসহ্য। অবশ্য মিলিত হয়েও সে যে আমাকে সুখী করতে পারত এমন নয়।

যাই হোক, দুজনে এক অস্বাভাবিক কুস্তির প্যাঁচ কষে যখন বসে বা শুয়ে আছি তখন জয়দেব আমাকে এইভাবে ধরে থেকে বলল—রাগ করে বুদ্ধি হারিও না। বিয়ে ব্যাপারটাকে আমরা সামাজিক কর্তব্য হিসেবে মনে করি, তাতে দুই পরিবারের মান মর্যাদাও জড়িত। তাই বলি হঠাৎ ডিভোর্সের কথা চিন্তা করে সব ভণ্ডুল কোরো না।

—আমাকে চিন্তা করতেই হবে। আর চিন্তাই বা কি, আমি ঠিক করে ফেলেছি।

জয়দেব কোমর ধরে পড়ে আছে। সুযোগ বুঝে সে হঠাৎ আমার কোলের মধ্যে মাথা গুঁজে দিয়ে বলল—তাতে তোমার আমার কারো সম্মান বাড়বে না। লোকে ছি ছি করবে।

সেই মুহূর্তে জয়দেবকে হাতের মুঠোয় পেয়ে গেলাম। লোকটার কিছু দুর্জয়, কুসংস্কার আর লোকলজ্জা আছে, যার

জন্য ও আমার সব কলঙ্ককেও হজম করে যাবে। এটা বুঝে আমি আর একটু চাপ সৃষ্টি করার জন্য বললাম—তাহলে বলো, কি করে বুঝলে যে আমি কুমারী নই।

জয়দেব ভীত চোখে চেয়ে রইল একটুক্ষণ, তারপর আমার কোলে মাথা রেখে শুয়ে থেকেই হঠাৎ চোখ বুজে বলল—আমার ভুল হতে পারে অলকা।

—তার মানে?

—তার মানে কুমারীত্ব পরীক্ষার কোনো নিশ্চিত উপায় নেই।

—তবে বললে কেন?

—দেখলাম, তুমি স্বীকার করো কিনা।

আমি মেয়েমানুষ, মেয়েমানুষের জন্মগত কিছু বুদ্ধি তো থাকেই। এই বোকাটা কি করে ভাবল যে আমি স্বীকার করব? আমি বললাম—কী স্বীকার করব?

জয়দেব হঠাৎ খুব বদলে গিয়ে বলল—আমাকে ক্ষমা করো।

বলতে নেই, সেই ক্ষমা প্রার্থনার কারণটা ছিল প্রবল কামেচ্ছা। হঠাৎ ঐ রাগারাগি থেকে শারীরিক টানাটানির ফলে পরস্পরের নৈকট্য, ঘন শ্বাস, দেহগন্ধ, স্পর্শবিদ্যুৎ—সব মিলেমিশে এক প্রবল চুম্বকের ক্ষেত্র তৈরি করে দিল। দেহ অভিজ্ঞতা তো তখনো আমাদের নতুন, তাই সামলাতে পারল না জয়দেব। ঝগড়াটা শরীরের মিলন দিয়ে শেষ হল।

আবার হলও না।

প্রভাসরঞ্জন

সুইস এয়ারের যে উড়োজাহাজে আমি ফিরছিলাম তাতে খুব একটা ভীড় ছিল না। জানালার ধারে এক জার্মান বুড়ি, তার পাশে এক বুড়ো, পরের সীটটায় আমি। বুড়োর হাতে আর্থ-রাইটিসের ব্যথা, তাই বুড়ি বুড়োকে কফি কাপ ধরে ধরে খাইয়ে দিচ্ছিল, খাবার মুখে তুলে দিচ্ছিল। বুড়োর মুখেও বোধহয় প্যারালাইসিসের ছোঁয়া আছে। ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে সুপ গড়িয়ে

পড়ে, মাংসের টুকরো হড়াৎ করে কোলের ওপর পড়ে যায়। ন্যাপকিন তুলে বুড়ি বার বার মুখ মুছিয়ে দেয়, আর আমার দিকে অপ্রতিভ হাসি হেসে চেয়ে কেবলই ক্ষমা চায়। বুড়োর কাঠামোটা বিশাল, এক সময়ে যৌবনকালে দাঙ্গাহাঙ্গামা করত বোধহয়। এখন বয়সে বড় জব্দ। কথা জড়িয়ে জড়িয়ে যায়, খুব জোরে শিস্ দেওয়ার মতো শব্দ করে শ্বাস ছাড়ে। অনবরত সেই শব্দে প্রেসারাইজড আবহাওয়ার উড়োজাহাজের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়তে পড়তেও আমি জেগে উঠি। বিরক্ত হই। বুড়ো আমার দিকে একটু একটু অপরাধবোধ নিয়ে তাকায়। বুড়ো বুড়িকে আমার খারাপ লাগছিল না। বেশ ভালবাসা দুজনের। আমার জার্মান বৌ সিসি আমাকে খুব ভালবাসত, যদি বিয়েটা টি'কত আর আমরা এরকম বুড়ো হতাম, তবে কি তখনো আমার জন্য এতটা করত সে?

Jaykrishna

সিসির কথা একটু একটু ভাবছিলাম। ফ্র্যাঙ্কফর্টে তার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। জার্মান মেয়েদের মতো গায়ে গতরে বিশাল ছিল না, বেশ একটু নরম-সরম ছোটো মাপের চেহারা। রোগাটে, সাদাটে, ভাবালু। খুব ভুলো মন ছিল তার। সেই সব দেখে আমি ঝপাং করে তার প্রেমে পড়ে গেলাম। সে তো পড়লই, যৌবনকালে ওরা বড় বেশী প্রেমে পড়ে। পরিচয়ের পর প্রেম হওয়ারও আগে আমরা এক বিছানায় বিস্তর শুয়েছি। যাকে ফুর্তিবাজ বলে আমি ঠিক তা নই। বিদেশে মেয়েদের গা-দেখানো এবং গায়ে পড়ার প্রবণতা এত বেশী ছিল যে সেখানে তাদের জলের মতো ভোগ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। আমারও এরকম অভিজ্ঞতা কিছু ঘটেছিল। সিসি তাদের মধ্যেই একজন। একসঙ্গে কিছুদিন থাকার জন্য ভূমিকা-টুমিকা করতে হয়নি। এবং কিছুকাল থেকে সরে পড়াতেও বাধা ছিল না। ফ্র্যাঙ্কফর্টে আমার পনেরো দিনের ভ্রমণ শেষ করে দেশে ফেরবার আগের দিন অবধি আমি সিসির এক ঘরের ছোট্ট বাসায় ছিলাম। থাকার খরচটা আমার বেঁচে যাচ্ছিল। ওকে আমার পছন্দও হচ্ছিল খুব। আসার দিন সকালে ঘুম থেকে ভাল করে ওঠার আগে বিছানাতেই ওকে আমি বিয়ের প্রস্তাব দিই। ও খুব হেসে বলল—ঠিক এরকম ভঙ্গীতে আর কেউ কাউকে বিয়ের

প্রস্তাব দিয়েছে বলে আমি জানি না। সিসি কিন্তু প্রস্তাব পেয়ে ভীষণ খুশী। ওর জীবনে সেটাই প্রথম প্রস্তাব। সেই দিনই রেজিস্ট্রি করে আমি ব্যলে চলে আসি। দেড় মাস পর সিসিও এল, আমরা দুজনে বেশ একটু কষ্ট করে থাকতাম। কারণ, ও এসে প্রথম প্রথম চাকরি পায় নি। তার ওপর গর্ভবতী। চাকরি পেলেও করতে পারত না। ও তখন রক্তাল্পতায় ভুগছে, সঙ্গে আনুসঙ্গিক নানা অসুস্থতা। আমার বেতন খুব বেশী ছিল না, সিসির চিকিৎসা আর যত্নের জন্য পুরো টাকাটা বেরিয়ে যেত। মাস চারেক পর একটু সুস্থ হয়ে সে ফিরে গেল ফ্রাঙ্কফর্টে, আবার কদিন পর এল। আমিও যেতাম। ব্যলেই অবশেষে সে চাকরি পায় আমার কোম্পানীতেই। যথাসময়ে আমাদের এক পুত্রসন্তান হয়। তার গায়ের রঙটা আমার রঙ ঘেঁষা বটে কিন্তু দুরন্ত ইউরোপীয় রক্ত শরীরে বইছে, বিশাল ছেলেটা জন্মেই জার্মানদের মতো গাঁক গাঁক চিৎকার করে কাঁদতে থাকে।

ছেলেটা যখন মাস চার পাঁচেকের হল তখন সে আমার অতি আদরের ধন। বড়সড় চেহারা, কান্নাকাটি নেই, আমার কোলে উঠলে খুব চেঁচাত আনন্দে। অবিকল কাকাতুয়ার মত শব্দ করত সে উত্তেজনার সময়ে। টি ভি দেখতে খুব পছন্দ করত, কি কারণে জানি না লাইটার বা দেশলাই জ্বাললে খুব ভয় পেত। এরোপ্লেনের আওয়াজ শুনলেই কাঁদো কাঁদো মুখ হয়ে যেত। তার চার মাস বয়সে রঙ অনেক ময়লা হয়ে গেল, দাঁত উঠবার সময়ে বেশ রোগাও হয়ে গেল সে। তার প্রিয় খাবার ছিল মিষ্টি, চকোলেট বা ক্যান্ডি পেলে মুখের নাল দিয়ে মাখামাখি করে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে চুষতে ভালবাসত। সে বেশ বড়সড় বাচ্চা ছিল, তবু তাকে দেখলেই বোঝা যেত যে সে ভারতীয়ের সন্তান, মুখে সিসির আদল থাকা সত্ত্বেও।

তার যখন পাঁচ মাস বয়স তখনই সিসি আর আমি আলাদা হওয়ার মনস্থ করি। আমার দিক থেকে ব্যাপারটা ছিল মর্মান্তিক, বাচ্চাটাকে ছেড়ে কি করে থাকব! সিসিও জার্মানীতে ফিরে যাওয়ার জন্য এবং ভিন্ন জীবনের জন্য খুবই উদগ্রীব। আমার মতো নিস্পৃহ এবং কম আমুদে লোককে সে সহ্য করতে

পারত না ! যেমন আমি পারতাম না তার অতি উচ্ছল ও খানিকটা নীতিবিগর্হিত চলা ফেরা। আমার ভিতরে এক তেমাথাওলা ভারতীয় গেঁয়ো বুড়োর বাস। সে কেবলই সতী-অসতী, ভাল-মন্দ, নীতি-অনীতি বিচার করে যায়। কতবার তার মুখে হাতচাপা দিতে গেছি, থামাতে পারিনি। অশান্তির শুরু সেখানেই। এক সময়ে আমার এও মনে হয়েছিল, সিসি চলে গেলেই বাঁচি, দেশে ফিরে একজন বাঙালী মেয়ে বিয়ে করে সুখে থাকব।

কিন্তু ছেলেটাই মস্ত বাধা।

আমার আর্থিক অবস্থা সচ্ছল ছিল না, আগেই বলেছি। সেটাও এই বিচ্ছেদের আর একটা কারণ। উপরন্তু সিসির বাবা মা বার্লিন থেকে তাকে ক্রমাগত চিঠি দিচ্ছিল ফিরে যাওয়ার জন্য। সিসি একটা মস্ত ভুল করেছে, তাদের ধারণা। সব মিলিয়ে একটা ঘোঁট পাকাল।

তারপর বিচ্ছেদ। ছেলের নাম রেখেছিলাম নীলাদ্রি। পরে সেই নাম সিসি বদলে দিয়েছিল কিনা জানি না। নীলুর জন্য আজও আমার মন বড় কেমন করে।

নীলু তার মার সঙ্গে জার্মানীতে ফিরে গেছে, আর আমার সঙ্গে তার দেখা হবে না! দেখলে চিনবেও না তেমন করে। এত-কাল ইউরোপে তবু তার কাছাকাছি ছিলাম। উড়োজাহাজ যখন উড়িয়ে আনছিল আমাকে পুবের দিকে তখন কেবল মনে হচ্ছিল, নীলুর কাছ থেকে কত দূরে সরে যাচ্ছি।

পাশের বুড়োটা আমার হাঁটুতে হাত রাখল হঠাৎ। তন্দ্রা ভেঙে চমকে উঠি। তাকাতেই বুড়ো নাকের বাঁশি বাজিয়ে জড়ানো গলায় কি যেন বলে। আমি অস্পষ্ট শুনতে পাই—হাইজ্যাক !

ততক্ষণে বুড়িও সটান উঠে বসেছে। বুড়িও বলল—হাইজ্যাকারস্ !

আন্তর্জাতিক বিমানে আজকাল সবসময়েই হাইজ্যাকের ভয়। বিমানের দুর্ঘটনার ভয়ের চেয়ে এই ভয় কিছুমাত্র কম নয়। কোথায় কোন গেরিলা বা লিবারেশন আন্দোলনের বিপ্লবী পিস্তল-বোমা নিয়ে উঠে বসে আছে কে জানে! মধ্যপ্রাচ্যে, আফ্রিকায়, ল্যাটিন আমেরিকায় সর্বত্রই গভীর অসন্তোষ। দেশপ্রেমিক বা

ভাড়াটে গেরিলা সর্বত্রই বিরাজ করছে। কখন কোন বিমানকে ভয় দেখিয়ে তারা অজানা ঠিকানায় উড়িয়ে নিয়ে যায়, মুক্তিপণ হিসাবে কতকজনকে আটকে রাখে বা হত্যা করে তার কোনো ঠিক নেই। তাই আজকাল আন্তর্জাতিক বিমানে উঠলে অনেকেরই বুক একটু ধুকপুক করে।

তাই বুড়ো বুড়ির চাপা আর্তনাদ শুনে চমকে উঠে তাকিয়ে সামনের তিন সারি দূরত্বে একজন আরবকে দেখতে পাই। অবশ্য সে আরব কিনা তা বলা খুবই মুশকিল, তবে সে যে মধ্যপ্রাচ্যের লোক সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। গাল ও থুতনি জুড়ে চাপা দাড়ি। চমৎকার মোটা গোঁফ। বাচ্চা একটা হাতির মতো তার বিশাল চেহারা। তাকে কয়েকবারই টয়লেটের দিকে যেতে দেখেছি উড়োজাহাজ ওঠার পর থেকে। পেটের রোগ, বহুমূত্র বা বাতিক না থাকলে অতবার কেউ বাথরুমে যায় না। কিন্তু তখন তাকে সন্দেহ হয়নি। এখন দেখি, কাঁধে একটা এয়ার ব্যাগ নিয়ে সে দাঁড়িয়ে পিছু ফিরে এক দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। তার কাঁধ থেকে স্ট্র্যাপে এয়ার ব্যাগটা ঝুলছে, ব্যাগের চেন খোলা, তার বাঁ হাতটা ব্যাগের মধ্যে ঢোকানো। খুবই সম্ভব, সে ব্যাগের মধ্যে গুপ্ত গ্রেনেড বা পিস্তল ছুঁয়ে আছে, এবং পিছনের দিকে তার কোনো সহ-গেরিলার দিকে তাকিয়ে নিচ্ছে—সব প্রস্তুত কিনা।

একটু আগেই নীলুর কথা ভেবে আমার চোখে জল আসছিল। ছেলেকে ইউরোপে রেখে আমি চলে যাচ্ছি। তার সঙ্গে আমার আর দেখা হবে না, আমার পরিচয় তার জীবন থেকে মুছে যাবে, আমরা সম্পূর্ণ অপরিচিত হয়ে যাবো পরস্পরের কাছে। অথচ সে আমারই বীজ, আমার শরীর থেকে তার অস্তিত্বের জন্ম। এতখানি আমাদের আত্মিক সম্পর্ক, তবু সে আজ আমার কেউ না। খুবই শিশু অবস্থায় সে আমার কাছ থেকে চলে গিয়েছিল, সেই বয়স পর্যন্ত তার হাবভাব. হাসা-কাঁদা, অবোধ শব্দ সবই আমার ভিতরে টেপ রেকর্ড করা আছে। স্মৃতির বোতাম টিপে দিলেই টেপ রেকর্ড বাজতে থাকে। সবই মনে পড়ে। আমার মাথার ভিতর থেকে একটা প্রোজেকটার মেশিন চোখের পর্দার ওপরে তার

সব চলচ্চিত্র ফেলতে থাকে। ছেলেটাকে কিছুতেই ভুলতে পারি না, অধিকারবোধ ছাড়তে চায় না। নীলু আমার ছেলে—এই বাক্যটা ধ্রুবপদের মতো মনের মধ্যে ঘুরে ঘুরে ফেরে। একটা অসহায় ভালবাসা বাৎসল্য আমাকে খুবই উত্তেজিত এবং অবসন্ন করে দেয়। দেশে ফিরে যাচ্ছি, সেখানেও আমার জন্য কোল পেতে কেউ বসে নেই। আদরে আহ্লাদে আমার দুঃখ ভুলিয়ে দেওয়ার কেউ নেই। ছেলেবেলা থেকেই আমাদের পরিবারে ভালবাসার চাষ কম দেখেছি। দুঃখে দারিদ্র্যে হতাশায় আধমরা মানুষ ছিলাম আমরা, পেটের ভাতই ছিল তখন ভালবাসার চরম নিদর্শন।

বাবা মা বুড়ো হয়েছেন। সংসার প্রায় অচল। প্রথম প্রথম আমি টাকা পাঠিয়েছি। বিয়ে করার পর তাও পাঠাতে পারিনি। কিভাবে সংসার চলে তা আমার জানা নেই, জানতেও চাইনি। ওসব জানতে গেলে মন ভারাক্রান্ত হয়। তাই না জানারই চেষ্টা করেছি। বাবার চিঠিতে যে অংশে সংসারের দুঃখের বিবরণ থাকত সেই অংশ আমি বাদ দিয়ে পড়তাম। জানতাম, তাদের জন্য আমার আর কিছু করার নেই, খামোখা তবে তাদের দুঃখের কথা জেনে কি হবে!

এরোপ্লেনে বসে আমি সারাক্ষণ আমার দুটো জীবনের কথা ভাবছিলাম। স্বদেশে আমার দারিদ্র্যপীড়িত জীবন, বিদেশে আমার নানা আকাঙ্ক্ষার ব্যর্থতা। এর ওপর নীলুর স্মৃতি! বিদেশীর মধ্যে এত বেশী সন্তানস্নেহ বোধহয় নেই। অন্তত আমার মত পিপাসার্ত পিতৃহৃদয় আমি কারো দেখিনি। নিজের বাপ মায়ের মধ্যেও পুত্রস্নেহের কোনো বাহুল্য প্রকাশ পেত না। তাহলে আমার এই প্রবল স্নেহ এল কোথেকে?

পরে আমি অনেক ভেবে এর একটা উত্তর খুঁজে পাই। আসলে স্বদেশে যারা আমার আপনজন তাদের কোনোদিনই আপন বলে মনে হয়নি। একমাত্র ছোটকাকাকে মনে হত। কেন মনে হত তা ব্যাখ্যা করা মুশকিল। কিন্তু যেই তাকে সত্যিকারের ভালবাসতে শুরু করি সেই তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। আবার বিদেশেও তাই। আমার ছেলেটিকে বুকে চেপে যখনই

ভাবতে শুরু করি এই আমার নিজস্ব সন্তান, তখনই তার ছেড়ে যাওয়ার সময় হল।

আশ্চর্য এই, নীলাদ্রির মুখে আমার ছোটকাকার মুখের ছাপ ছিল। এও হতে পারে, স্নেহের দুর্বলতা থেকেই আমি তার মুখে কাকার আদল দেখতাম। পৃথিবীতে আমার প্রিয়জনের সংখ্যা খুব কম। বাবা মার প্রতি আমার দুর্বলতা বা শ্রদ্ধা খুব বেশী থাকার কথা নয়। শিশুকাল থেকে অভাব, আর সংসারের ভার কাঁধে বয়ে তাঁদের ওপর আমার বীতশ্রদ্ধা এসে গিয়েছিল। মনে হত, আমার কোমরে শেকল দিয়ে সংসারটা কে যেন বেঁধে দিয়েছে, যার জন্য আমার ইঞ্জিনীয়ারিং পড়া হয়নি, অনার্স ছাড়তে হয়েছিল, জীবনের অনেক সার্থকতা আমাকে বরণ করার জন্য প্রস্তুত ছিল, কিন্তু লগ্ন পার হয়ে গেল। তাই নিজের আত্মীয় স্বজনদের প্রতি আমার এক বিরূপ মনোভাবের জন্ম হয়। যখন বিদেশে সিসিকে বিয়ে করলাম তখন সাময়িকভাবে মনে হয়েছিল, এই বুঝি ভালবাসার আশ্রয় পেলাম। ভুল, খুবই ভুল সেটা। যে ভালবাসার শুরু দেহের প্রেম দিয়ে তার বিয়ে কতদূর নিয়ে যেতে পারে আমাদের! শরীর জুড়োলো তো ভালবাসা ফুরোলো। আমরা কেবল শরীর দিয়ে পরস্পরকে ভালবাসার চেষ্টা করেছি। পরস্পরের সান্নিধ্য রাখা ছিল সামাজিক কর্তব্যের মতো। সেখানে বিশাল ও ব্যপ্ত কর্মময় জীবনে সিসিও যেমন ব্যস্ত, আমিও তেমন, তাই আমাদের পরস্পরের ওপর নির্ভরতা কমে গিয়েছিল। ভারতীয় সংস্কারবশতঃ আমি তার স্বাধীন চলাফেরা বা বহির্মুখীনতা খুব বেশী পছন্দ করতে পারতাম না। তাই সিসি নয়, কিন্তু নীলুই ছিল আমার একমাত্র অবলম্বন। তার মুখের দিকে তাকালে আমার বুক ঠাণ্ডা হয়ে যেত। তাই নীলু চলে গেলে সারা পৃথিবীতে আমার আর কেউ রইল না।

না বিদেশে, না স্বদেশে, কোথাও আমার কেউ নেই—এরকম একটা বোধ আমার বুকে পাথরের মতো জমে আছে। বিদেশে থাকার আনন্দ নেই, স্বদেশে ফেরার আনন্দ নেই। আমার মতো এমন উদ্বাস্তু কে আছে কোথায়! এরকম মনের অবস্থায় মাঝে মাঝে আমার মরতে ইচ্ছে করত। কিন্তু মরাটা জীবনে একবার

ঘটে, তাই সেই নিশ্চিত অভিজ্ঞতাটিকে আমি কিছু বিলম্বিত করছিলাম। দেখা যাক, মরবার আগে কোথাও কোনো ভালবাসা বা প্রিয়ত্বের আলো ছিটিক দেয় কিনা। তারপর আমার হাতের মুঠোয় মৃত্যু তো আছেই। এরকম মানসিকতা থেকে আমার মৃত্যুভয় কেটে গিয়েছিল। অন্ততঃ কেটে গেছে বলেই ধারণা ছিল আমার।

আরব লোকটা যখন ঐরকম একটা অদ্ভুত ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে ঘুরে তার সঙ্গীকে দেখছে আর আমার পাশের বুড়োটার একটা প্রকাণ্ড কাঁপা-কাঁপা ঘামে ভেজা হাত এসে আমার কব্জি পাকড়ে ধরল, আর বাঁশির মতো শ্বাস ফেলতে ফেলতে যখন সে বারবার বলতে থাকল—'আইজ্যাক, অ্যাইজ্যাক', তখন অন্য অনেক যাত্রীও তন্দ্রা ভেঙে সচকিত হয়ে বসে পরিস্থিতি লক্ষ্য করেছে, তাদের অনেকের মুখেই ভয়ের পাঁসুটে ভাব, তখন আমিও হঠাৎ টের পেলাম, বাস্তবিক আমি আন্তরিক ভাবে কোনদিন মরতে চাইনি। মনে হল, জীবন কত সুন্দর ও বিশাল ছিল আমার। বয়স পড়ে আছে অঢেল। এখনো চেষ্টা করলে জীবনে কত কি করতে পারি।

আরব লোকটা তার প্রচণ্ড ঘন ভ্রূ দিয়ে ভ্রূকুটি করে 'আলিজা' কিংবা অনুরূপ একটা চাপা ধ্বনি করল। সম্ভবতঃ কারো নাম। ভয়ে আমি কাঠ হয়ে গেলাম। একটু আগেই ডিনার হয়ে গেছে, সেই অতি সুস্বাদু খাবারের স্বাদ এখনো জড়িয়ে আছে জিভে। সামান্য একটু মদ খেয়েছিলাম, তার রিমঝিম নেশা এখনো মাথায় রয়ে গেছে। সুন্দর একটা শারীরিক তৃপ্তির পর একটু আগে কফি শেষ করে সিগারেট খেয়েছি। সেইটাই কি জীবনের শেষ পানভোজন? কে জানে, কে বলবে?

ও পাশের বুড়িটা একটা ফোঁপানীর শব্দ করল। সাহেব মেমরা কম কাঁদে। প্রকাশ্যে তো কখনোই কাউকে কাঁদতে দেখিনি। কিন্তু বয়সের দোষে এবং ভয়বশতঃ বুড়ি কাঁদছিল। কথাপ্রসঙ্গে জেনেছিলাম, তাদের ছেলেপুলে নেই, দুজনেরই আগে একবার করে বিয়ে হয়েছিল। কিন্তু তাদের পরস্পরের এই বিয়েটা অনেকদিন স্থায়ী হয়েছে, মৃত্যুর আগে তাদের ছাড়াছাড়ি হবে না—বলেছিল বুড়ি। বুড়োর গা একটা কম্বলে ভাল করে ঢেকে-ঢুকে

দিচ্ছিল একটু আগে তাতে আমিও সাহায্য করেছি। আমার জীবনে ভালবাসা নেই বলেই বোধহয় তাদের ঐ ভালবাসা আমার খুব ভাল লেগেছিল। এই তো এরা দুনিয়ার আর কারো পরোয়া করে না, পরস্পরকে নিয়ে কেমন মেতে আছে। প্রিয়জনের ভিতর দিয়ে ছাড়া কিছুতেই তো এই পৃথিবী আর জীবনকে উপভোগ করা সম্ভব নয়। জীবনের একেবারে শেষভাগেও এই দুই অথর্ব স্বামী-স্ত্রী নিজেদের বেঁচে থাকাকে একরকম করে উপভোগ করেছে দেখে আমার একটু ঈর্ষা মেশানো আনন্দ হচ্ছিল।

আরব লোকটা কাকে ডাকল কে জানে। কিন্তু পেছন থেকে কোনো উত্তর এল না। আরবটা তখন তার সীট থেকে বেরিয়ে মাঝখানের প্যাসেজটায় দাঁড়াল, তখন ব্যাগের মধ্যে হাত। খুব সম্ভবত সেই লুকানো হাতটা গ্রেনেডের সেফটি ফিউজ আলগা করছে আস্তে আস্তে। প্যাসেজে দাঁড়াতেই তার বিশাল চেহারাটা আরো বিশাল নজরে পড়ল। তার বাহুর ঘের বোধ হয় আমার বুকের সমান হবে। বুকটা মাঠের মতো ধু ধু করা বিরাট। ইচ্ছে করলে ও বোধহয় ঘুষি মেরেই পলকা প্লেনটাকে তুবড়ে দিতে পারে। কিন্তু আপাততঃ সে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে চোখে ভ্রূকুটি। ডান হাতটা মুঠো পাকিয়ে খানিকটা আছে। যাত্রীরা সবাই দৃশ্যটা দেখছে, কিন্তু কেউ নড়ছে না। কিন্তু অস্ফুট 'হাইজ্যাক' শব্দটা চারপাশ থেকে শুনতে পাচ্ছি। ফিসফাশ শব্দ হচ্ছে। একটা বছর ছয়েকের বাচ্চা প্লেনের পিছন দিকে রয়েছে, তার পরিষ্কার কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম, পরিষ্কার ইতালীয়ান ভাষায় সে তার মাকে জিজ্ঞেস করছে—মরে গেলে আমাদের কি রোমে ফিরতে দেরি হবে?

আমাদের দমদমের বাড়িতে একদিন একটা কাক ডানা ভেঙে পড়ে গিয়ে ধুঁকতে ধুঁকতে মারা যায়, আর তাকে ঘিরে সারাদিন হাজারটা কাক চেঁচামেচি করেছিল। আমার ছোটো ভাই দৃশ্যটা খুব করুণ চোখে দেখেছিল। পরদিন যখন আবার এঁটো কাঁটা কাক খেতে এসে উঠোনে নামছে তখন সে আমাকে হাত ধরে টেনে নিয়ে গিয়ে একটা কাককে দেখিয়ে বলল—দাদা, ঐ কাকটা কাল মরে গিয়েছিল না রে?

সেই স্মৃতিটা মনে আসতেই এক ঘোর মায়ায় আমার বুক ভরে গেল। শিশুরা তো মৃত্যুকে জানে না! ঐ মেয়েটির কণ্ঠস্বর আমাকে যেন চাবুক মারল। নীলুর কথা মনে এল, ছোটো ভাই-টার কথা মনে এল। স্নেহ মায়ায় বুক ভরে গেল। আর ঐ তীব্র চেহারার আরব লোকটির দিকে স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে আমার ভিতরে মৃত্যুভয়ে একটা বিস্ফোরণ ঘটালো যেন।

আরবটা এক পা, এক পা করে কয়েক পা এগিয়ে এল। দাঁড়ালো। আবার এগোলো। দাঁড়ালো। সেই একই ভঙ্গীতে তার ডান হাত মুঠো পাকানো। বাঁ হাত ব্যাগের মধ্যে ভরা। একটু বাদেই কিছু একটা ঘটবে। লোকটার মুখে চোখে এক কঠিন আত্মপ্রত্যয়। মৃত্যুর প্রতি সে নির্মমভাবে উদাসীন। সব রকম বিপদকে নিয়েই সে বেঁচে আছে।

আর তখন হঠাৎ আমার মানসিক একটা বিকলতা ঘটে গেল। হঠাৎ যেন এরোপ্লেনের মৃদু চাপা শব্দ, আর অতি ক্ষীণ থরথরানী থেমে গেল। আর আমি এক স্বপ্নময় দৃশ্যের মধ্যে ঢলে পড়লাম।

সেই দৃশ্যটা সম্পূর্ণভাবে বাস্তবতাবর্জিত।

দেখি একটা বিচিত্র দেশে আমি পেঁছে গেছি। এখানে মাটির রঙ নীল, তার ওপর হলুদ সবুজ লাল গোলাপী, হরেক রকমের ঘন ঘাস গজিয়ে চারধারে যেন এক বিভিন্ন রঙের দাবার ছক তৈরী করে রেখেছে। এইসব রঙীন ঘাসের নিখুঁত চৌখুপীর ধারে ধারে নাতিদীর্ঘ গাছে সম্পূর্ণ খোলা রামধনু। ছবিতে যেমন সব কাল্পনিক পাখি দেখা যায়, তেমনই সব পাখি উড়ছে চারধারে। আকাশের রঙ উজ্জ্বল নীল, তাতে গোল গোল সুন্দর নানাবর্ণের মেঘ। তারাগুলো অনেক কাছে কাছে ফুটে আছে। আর প্রতিটি তারার মধ্যেই নাক মুখ চোখ আঁকা। আকাশের একধারে এত বড় একটা চাঁদ দেখা যাচ্ছে যে মনে হয় দিগন্তের প্রায় বারো আনা অংশ জুড়ে আছে। চারধারে ছোটো ছোটো ঢিলা রঙীন কাঁচ আর কাঠ দিয়ে তৈরি বাড়ি। রাস্তা দিয়ে পুতুলেরা হেঁটে যাচ্ছে। দুটো কুকুর অবিকল মানুষের ভাষায় কথা বলছে রাস্তায় দাঁড়িয়ে। গ্রসারী শপ-এর সামনে একটা টেকো পুতুল একটা পাখির সঙ্গে তার স্বরে ঝগড়া করছে। তিনজন

পরী উড়ে উড়ে রামধনুগুলোয় আরো ভালো করে রঙ দিয়ে দিচ্ছে। একটা খেলনা মোটরগাড়ি মোরগের ডাকের মতো ভেঁপু বাজিয়ে চলে গেল। চারধারে কি এক অপরিসীম শান্তি, এক মৃত্যুহীন নিরাপদ শাশ্বত জগৎ।

পরিষ্কার বুঝতে পারছিলাম, নীলুর জন্য যে সব ছবির বই কিনে দিয়েছিলাম আমি, তারই কোনটার মধ্যে এই ছবিটা ছিল। আমি সেই রকমই একটা ছবির মধ্যে ঢুকে পড়েছি।

আমি হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠলাম—নীলু!

আরব লোকটা সেই মুহূর্তেই আবার ডাকল—আলিজা!

এবার পিছন থেকে একটা শব্দ এল। তারপর একটা লম্বা, সুন্দরপানা মেয়ে উঠে এল কোথা থেকে। তারও অবিকল মধ্য-প্রাচ্যের চেহারা। সে এসে এই বিশাল লোকটার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দুর্বোধ্য ভাষায় খুব উত্তেজিত হয়ে কথা বলতে লাগল। এই মেয়েটাই কি ওর সহ-গেরিলা?

আমরা অপেক্ষা করতে লাগলাম।

অলকা

এই সকালবেলায় আমার ঘরখানা চমৎকার দেখাচ্ছে। সারা দিনের মধ্যে আমার সবচেয়ে পছন্দের সময় হল সকালবেলা। আমি খুব ভোরে উঠতে পারি না বলে আমার একরকম দুঃখ আছে। তবে মাঝে মাঝে বেশ ভোরে ঘুম ভেঙে গেলে ঘরময় সকালের রোদ দেখি। কি সুন্দর যে লাগে ভোরের একটা আলাদা গন্ধ। লক্ষ্য করে দেখেছি, সকালে ঘুম থেকে উঠলেই মানুষকে সবচেয়ে ভাল দেখায়।

পার্ক সার্কাসের এই ফ্ল্যাটটা প্রথমে ভাড়া করেছিল আমার এক মাসতুতো দাদা। আমার বিয়ের ছ মাস পর আমি আর জয়দেব হানিমুন করতে যাই শিলঙে। বুদ্ধিটা কার ছিল কে জানে। জয়দেবের পরিবারে হানিমুনের চল ছিল না। কিন্তু আজকাল বাঙালী সমাজে হানিমুনের চল হয়েছে। আমার মনে হয় জয়দেবই

আমার সঙ্গে বোঝাপড়ার করার জন্য পরিবার থেকে কিছুদিন আমাকে নিয়ে আলাদা হতে চেয়েছিল। সেইটেই হল কাল।

শিলঙে আমরা একটি হোটেলের ঘরে দুটো ঝগড়াটে বেড়ালের মতো দিনরাত ফোঁসফাঁস করতাম। কেউ কাউকে সহ্য করতে পারতাম না।

জয়দেব হয়তো বলল—এক গ্লাস জল দাও তো!

আমার প্রেস্টিজে লাগল, বললাম—গড়িয়ে খাও, নয়তো বেয়ারাকে বলো।

—তুমি তো আমার বৌ, এটুকু করলে তো দোষ হয় না।

—বৌ মানে তো ঝি নয়।

একদিন একটা মেয়েকে দেখে জয়দেব বলল—দেখ, মেয়েটি কি সুন্দর!

স্বামী কোনো যুবতাকে সুন্দর দেখলে স্ত্রীর একটু হিংসে হওয়ার কথা, আমার হল না। বললাম—বেশ সুন্দর!

—আলাপ করব?

—করো না! তবে তুমি তো তেমন স্মার্ট নও, ভাল করে ভেবে-চিন্তে কথা বলো।

জয়দেব অবশ্য গেল না কথা বলতে। চেরাপুঞ্জী দেখতে গিয়েও খুব তুচ্ছ কারণে একচোট ঝগড়া হল। জয়দেব বলল—চেরাপুঞ্জীতে পৃথিবীর সবচেয়ে বেশী বৃষ্টি হয় এটা কিন্তু সত্যি নয়। আমি রিসেণ্টলি একটা বিদেশী ম্যাগাজিনে পড়েছি আর একটা কোন জায়গায় যেন এর চেয়ে বেশী বৃষ্টি হয়।

চেরাপুঞ্জীতে না হয়ে অন্য কোথাও পৃথিবীর সবচেয়ে বেশী বৃষ্টি হলেই বা আমার ক্ষতি কি? কিন্তু যেহেতু জয়দেব বলছে সেই হেতু আমার কথাটা ভাল লাগেনি, মনে হয়েছিল ও একটু পাণ্ডিত্য দেখানোর চেষ্টা করছে।

আমি বললাম—আন্দাজে বলো না।

—না অলকা, আমি পড়েছি।

—মিথ্যে কথা। চেরাপুঞ্জীতেই বেশী বৃষ্টি হয়।

জয়দেব রেগে বলে—আমি বলছি আমি পড়েছি।

—পড়লেও ভুল পড়েছো। আমরা ছেলেবেলা থেকেই চেরাপুঞ্জীকে সবচেয়ে বেশী বৃষ্টির জায়গা বলে জানি।

—ভুল জানো।

—তুমি ভুল পড়েছো।

এইভাবেও আমাদের ঝগড়া হত।

শিলং বা চেরাপুঞ্জীর দোষ নেই, ভূগোল বই বা বিদেশী ম্যাগাজিনও দায়ী নয়। আমরা দুজনেই ঠেলিফোনে দুটো-রং নাম্বার পেয়ে অচেনা লোককে চেনা টাওরাবার অভিনয় করছি।

শিলং থেকে দুজনেই কিছু রোগা হয়ে ফিরে এলাম। শ্বশুর-বাড়িতে কিছুকাল থেকে শরীর আরো খারাপ হল। লোকে ভাবল বোধহয় মা হতে চলেছি। ডাক্তার দেখে বলল—না, পেটে ফাংগাস হয়েছে।

শরীর সারাতে বাপের বাড়ি গেলাম। মাসখানেক পর জয়দেব নিতে এল! গেলাম না। জয়দেব তখন গ্রামে গ্রামে ঘুরে কটেজ আর স্মল স্কেল ইন্ডাস্ট্রিজ-এর জন্য কি সব কাজ করে বেড়ায়। বাড়িতে খুব একটা থাকে না। শুনলাম, প্রাচীন মন্দিরের ওপর থিসিস লিখছে ডকটরেট করার জন্য। আমি শ্বশুরবাড়ি যেতে চাই না শুনে রাগ করে বলল—আমি কুড়ি দিন বাইরে বাইরে ঘুরে ফিরলাম, তুমি এ সময়ে যাবে না আমার কাছে?

আমি প্লেটে করে আচার খাচ্ছিলাম, জিভে টকাস টকাস শব্দ করে বললাম—আমাকে দিয়ে তোমার কি হবে? বৌ-গিরি করতে আমার ভাল লাগে না।

জয়দেব আমার আচার খাওয়া দেখছিল। ঐ সিরিয়াস অবস্থাতেও ওর মুখ রসস্থ হয়ে গিয়েছিল, মুখের ঝোল টেনে বলল —বৌ-গিরি কথাটা কি ভাল?

আমি হেসে ফেললাম। বললাম—ভাল না মন্দ কে জানে! আমার তো তাই মনে হয়।

জয়দেব হাল না ছেড়ে বলল—তুমি কি আমাকে একটুও সহ্য করতে পারো না?

—পারতে পারি। যদি তুমি আলাদা থাকো।

—আলাদা থাকলে কি হবে?

—আমি আলাদা বাসায় স্বাধীনভাবে থাকতে পারি। তোমাদের বাড়ির অত লোকের মধ্যে থাকতে আমার ভাল লাগে না। তুমি আলাদা বাসা করে খবর দিও। যাবো।

—এই কি শেষ কথা ?

—হ্যাঁ।

—আমার বাড়ির লোক তোমার কি ক্ষতি করেছে ?

—তা জানি না। তবে যদি আমাকে চাও তো বাড়ি ছাড়তে হবে।

জয়দেব ভাবল। ফিরে গেল। মনে হল, কথাটা সে ভেবে দেখবে।

কিন্তু জয়দেবকে আমি তখনো ঠিক চিনতে পারিনি। বাড়ি ছাড়বার ছেলে জয়দেব ছিল না। কদিন পর তার একটা পরিষ্কার চিঠি এল। বাঁকুড়ার এক গ্রাম থেকে লিখে পাঠিয়েছে—অলকা, বিয়ে ভাঙার জন্য যা করতে হয় তা তুমি করতে পারো। আমি ইনিসিয়েটিভ নেবো না। বিয়ে ভাঙা আমি পাপ বলে মনে করি। কিন্তু তুমি যদি চাও তো দাবি ছেড়ে দেবো।

চিঠিটা পেয়ে যে খুব উল্লসিত হয়েছিলাম তা নয়। কোথায় যেন আমার মেয়েমানুষী অহংকারে একটু ঘা লাগল। যত যাই হোক, একবার বিয়ে হয়ে গেলেই তো মেয়েরা আর কুমারী রইল না। এই বাংলাদেশে কুমারী যে নয়, সে একা হলে বড় মুশকিল !

এই চিঠি এলে আমাদের পরিবারেও হুলস্থুল পড়ে গেল। বাবা যত প্রগতিপন্থী হোন, মা যত আধুনিকা হোন, মেয়ে বিয়ে ভেঙে স্বামী ছেড়ে চলে আসবে এটা তাঁরা সহজভাবে মেনে নিতে পারেননি।

বাবা উত্তেজিত হয়ে বললেন—চল অলকা, আজই তোকে তোর শ্বশুরবাড়িতে দিয়ে আসি।

মাও বাবার সঙ্গে একমত। আমার ঠাকুমা ভীষণ চেঁচামেচি শুরু করলেন। দাদাও খুশী নয়।

অথচ আমিই বা কেন শ্বশুরবাড়ি যাবো ?

বাড়ির লোকজনের সঙ্গে আমার তুমুল ঝগড়া লাগল। আমি

স্পষ্ট বললাম, যদি জয়দেব বাড়ি থেকে আলাদা হয় একমাত্র তবেই আমি ফিরে যেতে পারি।

বাড়ির লোকজন আমার মতে মত দিল না। জোর করতে লাগল। আমি প্রায় একবস্ত্রে মাসীর বাড়ি চলে এলাম।

মাসীও বাঙালী হিন্দু ঘরের মেয়ে। আমাকে চূড়ান্ত প্রশ্রয় দিয়েছে এক সময়ে! সব রকম আধুনিকতায় শিক্ষিত করেছে, তবু দেখা গেল আমার এই বিয়ে-ভাঙার ব্যাপারটা ভাল চোখে দেখছে না। বলল—দূর মুখপুড়ি, স্বামীর সঙ্গে যত ঝগড়াই করিস, বিয়ে ভাঙতে যাস না। এ দেশে যারা বিয়ে ভাঙে তাদের ভবিষ্যত নেই। ভেবে-চিন্তে কাজ করতে হয়। হুট করে এই কম বয়সে ও সব করিস না।

মাসীর সঙ্গে বনল না। অথচ কেন জানি না মনটা বড্ড আড় হয়ে আছে, জয়দেব বা তার পরিবারের কাছে ফিরে যাওয়ার কথা ভাবতেও পারি না।

আমার আর এক মাসীর ছেলে অসীমদা তখন বিলেত যাচ্ছে। বৌ-বাচ্চা নিয়েই চলে যাবে। পাঁচ-সাত বছর ফিরবে না। তার পার্ক সার্কাসের ফ্ল্যাটটা তালাবন্ধ থাকবে এমন কথা হচ্ছিল। কলকাতায় বাসা পাওয়া প্রচণ্ড সমস্যা বলে তারা ফ্ল্যাটটা ছাড়তে চাইছিল না। তখন আমি অসীমদাকে বললাম—ফ্ল্যাটটায় আমাকে থাকতে দাও।

অসীমদা খুশী হয়ে বলল—তবে তো ভালই হল। কতগুলো দামী ফার্নিচার রয়েছে, তুই আর জয়দেব থাকলে ভালই হবে।

জয়দেব থাকবে না, আমি একা থাকব—এটা আর অসীমদার কাছে ভাঙলাম না। ওরা যেদিন রওনা হয়ে গেল সেদিন বিকেলে গিয়ে ফ্ল্যাটটা দখল করলাম। জীবনে এই প্রথম একা থাকা। একদম একা। একটু ভয়-ভয় করছিল ঠিকই, কিন্তু সেই সঙ্গে একটা প্রচণ্ড আনন্দও হচ্ছিল। একা আর স্বাধীন হওয়ার মধ্যে কি যে আনন্দ।

বাড়ি থেকে মা বাবা আত্মীয় স্বজনরা এসে ফিরে যাওয়ার জন্য অনেক জ্বালাতন করল, আমি জেদবশতঃ গেলাম না। বাড়িতে ফিরে গেলেই ক্রমাগত আমার ওপর নানাদিক থেকে চাপ সৃষ্টি

হবে। অনেক ঠেস-দেওয়া বাঁকা কথা, অনেক চোরা-চাউনি আর মুচকি হাসি সইতে হবে। তার চেয়ে বেশ আছি। ফিরে গেলাম না বলে সকলেরই রাগ, মা তো মুখের ওপর বলেই গেল—তুমি বদমাশ হয়ে গেছ। নষ্টামি করার জন্যেই একা ফ্ল্যাটে থাকবার অত শখ।

ব্যাপারটা তা নয়। বিয়ের আগে যা হওয়ার তা হয়েছে। কিন্তু বিয়ের পর থেকে আমার মনের কিছু পরিবর্তন ঘটেছে। পুরুষদের প্রতি আমার এক ধরনের অনাগ্রহ, উদাসীনতা, কেন জানি না, জন্মেছে।

একা ফ্ল্যাটে থাকতে হলে চাকরি চাই। কলকাতায় চাকরির বাজার তো তেমন সুখের নয়। তবু চেষ্টা-চরিত্র করে এক চেনা সূত্র ধরে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের এক অধ্যাপকের বাচ্চা রাখার কাজ পেলাম। ইংরিজিতে বলে বেবী সীটার। ওরা স্বামী-স্ত্রী দুজনেই চাকরি করে। স্ত্রী ডাক্তার। তারা মানুষ বেশ ভাল! বালীগঞ্জ প্লেসে তাদের বাড়িতে সকাল আটটা থেকে বিকেল ছ'টা পর্যন্ত সাত আর তিন বছরের দুটো ছেলেমেয়েকে সামলে রাখতাম। দুপুরের খাবার দিত আর দুশো টাকা মাইনে। সাত বছরের ছেলেটা কনভেন্টে পড়তে যেত। তাই তাকে বেশী আগলাবার দরকার পড়ত না। তিন বছরের মেয়েটাকে সারাদিন ঘড়ি ধরে সাজাতাম, খাওয়াতাম, গল্প বলে ঘুম পাড়াতাম। বেশ লাগত। অসম্ভব মিষ্টি আর দুষ্টু মেয়েটা, সাত দিনেই সে আমার বড় বেশী ন্যাওটা হয়ে গেল। তার কচি মুখের দিকে চেয়ে বুকের মধ্যে ঢেউ দিত একটা কথা—আমার যদি এ রকম একটা মেয়ে থাকত!

যে সব বাচ্চার মা চাকরি করে তাদের যে কী দুরবস্থা হয় তা এই দুটো বাচ্চাকে দেখেই বুঝতাম। দুজনেই কিছু অস্বাভাবিক রকমের চঞ্চল, অভিমানী, আর কিছু নিষ্ঠুরও ছিল। প্রথমে গিয়েই আমি বাচ্চাদুটোর মধ্যে কেমন ভয়-মেশানো, সন্দেহ-মেশানো এক রকমের দৃষ্টি দেখেছিলাম চোখে। সারাদিন ওরা মায়ের জন্য অপেক্ষা করত মনে মনে। ডাক্তার মায়ের ফিরতে রাত হত। তখন মেয়েটা ঘুমিয়ে পড়েও জেগে জেগে 'মা' বলে ডেকে ফের ঘুমোতো।

অন্য কোনো বাচ্চা দেখলেই মেয়েটা তাকে গিয়ে মারত, খিমচে দিত, চোখে খোঁচা দেওয়ার চেষ্টা করত। সব সময়ে সে যেন তার প্রতি এক অজানা অন্যায়ের শোধ নেওয়ার চেষ্টা করত। বড় কষ্ট হত আমার।

মাস তিনেকের মধ্যেই আমি বাচ্চা দুটোর আসল মা হয়ে উঠলাম। সারাদিন আমি তাদের নিয়ে থাকি। আমার নিজের ছেলেমেয়ে হলে তাদের নিয়ে কী করতাম সেই ভেবে মায়ের মতো সব হাবভাব করি, বায়না রাখি, শাসন করি। ওরা তাই আমার মধ্যে হারানো মা কিংবা নতুন মা খুঁজে পেল। নিজেদের মার জন্য খুব বেশী অস্থির হত না। বরং আমি সন্ধ্যেবেলা চলে আসবার জন্য তৈরি হলে মেয়েটা ভয়ংকর কান্নাকাটি করত। তাকে ঘুম না পাড়িয়ে আসা মুশকিল হয়ে উঠল। এইভাবেই জড়িয়ে পড়লাম ওদের সঙ্গে। কিন্তু বাচ্চাদের বাবা রোহিতাশ্ব চৌধুরী একদিন আমাকে বললেন—অলকা, আপনি তো খুবই শিক্ষিতা এবং ভদ্রঘরের মেয়ে, এ কাজ আপনার উপযুক্ত নয়। যদি বলেন তো আপনার জন্য একটা ভদ্রগোছের চাকরি দেখি।

তাই হল। এ কথার মাস দুয়েকের মধ্যে আমি একটা বাঙালী বড় ফার্মে টাইপিস্ট-ক্লার্কের চাকরি পেলাম। বাচ্চাদের জন্য মনটা খুব ফাঁকা লাগত। ওরা আর একজন বেবী সীটার রেখেছে জেনে মনটাও খারাপ হয়ে গেল। মাঝে মাঝে গিয়ে দেখে আসি ওদের, এটা সেটা কিনে দিই। কিন্তু মাতৃত্বের এক অসম্ভব ক্ষুধা বুকের মধ্যে কেবলই ছটফট করে।

জয়দেবের সঙ্গে আমার বিবাহবিচ্ছেদের কোনো সক্রিয় চেষ্টা আমি করিনি। সে বড় হাঙ্গামা। উকিলের কাছে যাও, সাক্ষী যোগাড় কর। তা ছাড়া আমার অভিযোগ বা কি হবে জয়দেবের বিরুদ্ধে? তাই ও সব নিয়ে মাথা ঘামাইনি। আলাদা আছি বেশ চলে যাচ্ছে, আর কেন মামলার হাঙ্গামায় যাওয়া? জয়দেব তো আমাকে চিমটি দিচ্ছে না!

যুবতী মেয়ে! একা থাকি। আমার কি কোনো বিপদ হয়নি?

হয়েছিল। কিন্তু সে তেমন কিছু নয়! অসীমদার ফ্ল্যাটে একটা

ফোন ছিল, তাতে প্রথম কিছুদিন একটি ভীতু ছোকরা আমার সঙ্গে প্রেমালাপ করার চেষ্টা করে। আমি ফোন তুলে গলা চিনেই ফোন ছেড়ে দিতাম। তিন মাস পর সে হাল ছেড়ে দেয়। ওপর-তলার এক মহিলার ফ্ল্যাটে মদ আর জুয়ার আড্ডা বসত। একবার সেখানকার এক মাতাল আমার ঘরের কড়া নেড়েছিল, আমি দরজা খুললে সে আমাকে ধরবারও চেষ্টা করে। কিন্তু সেটা মাতলামি। পরে সে ক্ষমাও চেয়ে নিয়েছিল।

এ রকম দু একটি ছোটখাটো ঘটনা বাদ দিলে আমার জীবন ছিল বেশ নিরাপদ। আমি একা থাকি না দোকা থাকি সেটাও তো সবাই জানত না। কলকাতায় কে কাকে চেনে!

তবে আমি যে ফার্মে চাকরি করতাম সেই ফার্মের একটি উজ্জ্বল সুপুরুষ আর স্মার্ট ছেলে আমার প্রতি কিছু দুর্বল হয়ে পড়ে। তার সঙ্গে দু একবার রেস্টুরেন্টে গেছি, বেড়িয়েছি এদিক ওদিক। কিন্তু কি জানি তার প্রতি আমার কখনো কেন আগ্রহ জাগল না।

তবে সে একবার আমাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়।

প্রভাসরঞ্জন

আমার জীবন শুরু হয়েছে কয়েকবার। শৈশবে যে জীবন শুরু করেছিলাম দেশভাগের পর তা শেষ হয়ে যায়। নতুন এক রুক্ষ ভিখিরির স্নেহহীন জীবন শুরু করেছিলাম। মধ্যে যৌবনে বিদেশে গেলাম নতুন আর একরকম জীবন শুরু করতে। কতবার কতভাবে শুরু হল, আবার শেষও হয়ে গেল। এখনো আয়ু অনেকটা পড়ে আছে, কতবার আরো নিজের জন্ম ও মৃত্যু দেখতে হবে কে জানে?

ফেরার সময়ে সেই এরোপ্লেনেই যেমন, গেরিলারা যদি প্লেন হাইজ্যাক করে নিয়ে যেত, যদি মুক্তিপণ হিসেবে বন্দী করত আমাদের এবং যদি প্রতি ছ ঘণ্টা অন্তর এক একজন যাত্রীকে গুলি করে মেরে ফেলত তাদের দাবির বিজ্ঞপ্তি হিসেবে? না, সে সব

কিছুই হয়নি। না হলেও সেই কয়েকটা মুহূর্তের আকণ্ঠ মৃত্যু-ভয় আমাকে একেবারে শেষ করে ফেলল।

সেই রূপসী তরুণীটি দৈত্যাকার লোকটির সঙ্গে দুর্বোধ্য ভাষায় চেঁচিয়ে কি বলছিল তা বোঝার সাধ্য আমার ছিল না। চোখের পলক না ফেলে হা করে চেয়ে দেখছি দৃশ্যটা, আমার পাশে বসা বুড়োর নাকে বাঁশির শব্দ হচ্ছে, বুড়ি অস্পষ্ট স্বরে কেঁদে কি যেন বলছে বুড়োকে। প্লেনসুদ্ধ যাত্রীরা আতঙ্কে চেয়ে আছে দৃশ্যটার দিকে।

মেয়েটা কথা বলতে বলতে এক পা দু পা করে এগিয়ে গেল লোকটার দিকে! লোকটা পাথরের মতো দাঁড়িয়ে আছে, চোখ দুখানায় বাদামী আগুন ঝলসাচ্ছে। তারা দুজন চারদিকের যাত্রীদের চোখকে গ্রাহ্য করছে না, যেন আর কেউ যে উপস্থিত আছে এ তারা জানেই না।

মেয়েটা খুব কাছাকাছি এগিয়ে গেলে দৈত্য লোকটার চোখ মুখ হঠাৎ খুব নরম হয়ে গেল। দুটো প্রকাণ্ড গাছের গুঁড়ির মতো হাতে লোকটা সেই পলকা মেয়েটাকে বুকের মধ্যে টেনে নিল। তারপর চকাস্ চকাস্ করে চুমু খেতে লাগল।

ঠিক এরকমটার জন্য আমরা প্রস্তুত ছিলাম না। ডানদিকে একটা লোক হেসে উঠল। পাশের বুড়ি বুড়োকে বলছে—ও গড, হি উইল ব্রেক দ্য গার্ল'স ব্যাক। পিছন থেকে একটা হাততালির শব্দ আসে। একজন বলে ওঠে—হ্যাপী এন্ডিং। পিছনের ইটালিয়ান বাচ্চাটা বিস্মিত স্বরে বলে ওঠে—ওরা কখন মারবে? চুমু খাওয়ার পর?

দুজন সুন্দরী হোসটেস এতক্ষণ সামনের দিকে পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে ছিল এদিকে চেয়ে। এবার তারা প্রাণ পেয়ে হাসিমুখে হঠাৎ এগিয়ে আসে। দৈত্যটির পিঠে টোকা দিয়ে একজন জার্মান ভাষায় বলে—ইচ্ছে হলে আপনি আপনার বান্ধবীকে নিয়ে আলাদা বসতে পারেন। সামনের দিকে একটা টুইন সীট আছে।

লোকটা মেয়েটাকে খানিক নিষ্পিষ্ট করে মুখ তুলে বলে—ড্রিঙ্ক আনো, আমার তেষ্টা পেয়েছে।

পিছনে যেখানে অলিজা বসেছিল তার পাশের সীটে একজন দীর্ঘকায় সুপুরুষ মধ্যপ্রাচ্যের তরুণ ছিল। তাকে কেউ লক্ষ্য করিনি এতক্ষণ। সবাই ঘাড় ঘোরাচ্ছে দেখে আমিও পিছু ফিরে ছেলেটাকে দেখতে পাই। একটা বাদামী শার্ট গায়ে, গলার টাইটা আলগা, মুখটা অসম্ভব লাল, দাঁড়িয়ে আছে। মনে হল, সে এই প্রেমের দৃশ্যটা সহ্য করতে পারছে না, অসম্ভব রেগে গেছে এবং এক্ষুনি সে একটা কিছু করবে।

কি সে করত জানি না, তবে দৈত্যকায় লোকটির বুকে সেঁটে থেকেই মেয়েটা একবার পিছু ফিরে চেয়ে চোখের একটা ইশারা করল তাকে। সে বসে পড়ল ধীরে ধীরে।

দৈত্য লোকটা সেই মেয়েটিকে নিয়ে আরো সামনের দিকে কোথাও গিয়ে বসল।

আমি হোসটেসকে ডেকে একটু ড্রিঙ্কস্ চাইলাম। আর সেটি পরিবেশনের সময়ে জিজ্ঞেস করতেই, সুন্দরী হোসটেসটি মৃদু স্বরে বলল—লাভ ট্রাংগল।

কিন্তু একটু বাদে পিছনের ছেলেটি হোসটেসকে ডেকে নীচু স্বরে কি যেন বলল অনেকটা সময় ধরে। তারপর দেখি, তরুণী হোসটেস ছাইরঙা এক আতঙ্কিত মুখে খুব তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছে বেতার ঘরের দিকে। কিছু বুঝতে পারছিলাম না। হোসটেসের মুখের ভাব অনেকেই লক্ষ্য করেনি। তাই বেশীর ভাগ লোক নিশ্চিন্তে বসে আছে! আমি স্বস্তি পাচ্ছিলাম না।

বেইরুটে প্লেন থামতে দরজা খুলে কয়েকজন বিশালদেহী যাত্রী উঠল। তাদের চেহারা হৃদয়হীন, নিষ্ঠুর। উঠে মুহূর্তের মধ্যে তারা প্লেনের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল। চোখের পলকে দেখি তাদের হাতে হাতে উঠে এসেছে এল. এম. জি, কারবাইন, থম্পসন অটোমেটিক। চারজন সেই দৈত্যের মতো লোকটা আর তার বিস্মিত বান্ধবীকে ঘিরে ফেলল। দুজন গিয়ে ধরল পিছনের ছেলেটিকে।

বাচ্চা হাতির মতো লোকটা উঠে দাঁড়িয়ে পিছু ফিরে চাইল। রাগে তার মুখ টকটকে লাল। চেঁচিয়ে সে তার দুর্বোধ্য ভাষায়

কি যেন গালাগাল করছিল পিছনের ছেলেটিকে। আর সেই ছেলেটিও কি যেন জবাব দিচ্ছে বেপরোয়া মুখে।

ছদ্মবেশী আর্মড গার্ড, তিনজনকেই নামিয়ে নিয়ে গেল মেশিনগান আর অটোমেটিকের নল গায়ে ঠেকিয়ে। তারপর ঘণ্টা-খানেক ধরে সার্চ করা হল প্লেন। গুঞ্জন শোনা গেল, ঐ তিন-জনই ছিল গেরিলা। বেইরুটের পর তারা প্লেন হাইজাক করত। প্রেমের ত্রিকোণ বাধা হয়ে না দাঁড়ালে কি হত বলা মুশকিল। প্রেমে ব্যর্থ পিছনের ছেলেটি হোসটেসকে ডেকে তাদের সব গুপ্তকথা বলে দিয়েছিল।

গেরিলাদের ক্ষেত্রে এরকম বড় একটা হয় না, আমি জানি। সর্বত্রই আমি মৃত্যুপণ গেরিলাদের লক্ষ্য করে দেখেছি। প্রেম তাদের কাছে কোনো সমস্যাই নয়। আমার এখনো মনে হয়, ওরা গেরিলা ছিল না। পিছনের ছেলেটি নিজেদের গেরিলা বলে পরিচয় দিয়ে ইচ্ছে করেই গণ্ডগোল পাকিয়েছিল। কিন্তু সত্যি-কারের ঘটনা কি তা আমি আজও জানি না। কিন্তু প্লেন বেইরুট থেকে উড়লে মনে হয়েছিল, আমরা আবার জীবন ফিরে পেলাম। আমি যে জীবন ফিরে পেলাম সেটা কেমন? সে জীবন শেষ হলেই বা কি ক্ষতি ছিল?

দমদমের দরিদ্র বাড়িটিতে এসে যখন পেঁছোলাম তখন আমার বাবা, মা যথাসাধ্য আনন্দ প্রকাশ করলেন। ইতিমধ্যে আমার ছোট ভাই একটা বিয়ে করেছে। আমার ভাই, ভ্রাতৃবধূও যথাসাধ্য খুশীর ভাব দেখাল। ভাইয়ের সদ্য একটি ছেলে হয়েছে। আমি বিদেশ থেকে কিছু লোভনীয় জিনিস এনেছিলাম। সেগুলো বাড়ির লোকদের বিলিয়ে দিলাম। সবাই অসম্ভব খুশী হল তাতে। একেই তারা ভাল জিনিস চোখে দেখেছে কম, তার উপর এত সব হরেক রকম মহার্ঘ দ্রব্য দেখে উত্তেজিত হয়ে পড়ল।

এই উত্তেজনা বাড়াতে আমার বোনেরা তাদের বাচ্চা কাচ্চা আর স্বামী নিয়ে চলে এল বেড়াতে। খুবই হতাশ হই তাদের দেখে। দুই ভগ্নীপতির মধ্যে একজনকে দেখলেই মনে হয় লোফার। অন্য-জন কিছুটা ভদ্রলোক আর সুপুরুষ হলেও নির্বোধ। কারোরই সংসারের অবস্থা বিশেষ ভাল নয়। মা আমাকে চুপি চুপি জানাল,

ছোটো জামাই নাকি গুন্ডামি, চুরি, ছিনতাই করে। বড়জন একটা প্রাইভেট ফার্মে কেয়ারটেকার।

এরা সব এক জায়গায় জুটতে খুব হট্টগোল হল। ঝগড়াঝাঁটিও প্রায়ই লেগে যায় দেখলাম। একদিন বাবা খুব গম্ভীরভাবে আমাকে গোপনে ডেকে নিয়ে বললেন—শোনো বাবা প্রভাস, তোমার ছোট ভাই আর তার বৌ এখন চায় আমি আর তোমার মা আলাদা হয়ে অন্যত্র গিয়ে থাকি।

আমি অবাক হয়ে বললাম—আপনি আর মা যাবেন কেন? এ বাড়ি তো আপনার, দরকার হলে ওরা চলে যাবে।

—সে সব আইনের কথা শুনছে কে? আমাদের বুড়ো বয়সে আর তেমন তেজ নেই যে গলাবাজি করে গায়ের জোরে দখল রাখবো। তার উপর নিজের সন্তান যদি শত্রুতা করে, তবে আর কি করার আছে? ওরা দুজনে মিলে আমাদের প্রাণ অতিষ্ঠ করে তুলছে দিন রাত। তোমার মা অবশ্য ওদের দিকে টেনে চলেন, কিন্তু তাতেও সুরাহা হবার নয়। যদিও বা তোমার মাকে ওরা আশ্রয় দেয় আমাকে থাকতে দেবে না।

কথাটা শুনে আমি ভয়ঙ্কর রেগে যেতে পারি না। হঠাৎ কেন যেন নিজের ছেলেবেলার কথা আদ্যন্ত মনে পড়ে! ভাবি, আমাদের নিষ্ঠুর ছেলেবেলা আমাদের স্বার্থপরতা ছাড়া আর কি শেখাবে! আমার ভাই তার নিজের জীবন ও পরিবেশ থেকে সেই শিক্ষাটাই নিয়েছে। ওর বৌও উঁচু পরিবারের মেয়ে নয়। কথায় কথায় মা একদিন বলে ফেলেছিলেন। বৌমার মা নাকি ঝিগিরি করত। তবে আগে ওরা ভদ্রলোক ছিল, অবস্থার ফেরে এই দশা। সে যাই হোক, আমার ভাইয়ের বৌ নিমি খুব খোঁপায় চোপায় মেয়ে। টকাটক কথা বলে, মেজাজ দেখাতে ভয় পায় না, কাউকে তোয়াক্কার ভাব নেই। এ ধরনের মেয়েরা সহজেই স্বামীকে বশ করতে পারে। মা বাবাকে আলাদা করার প্রস্তাবটি হয়তো তার মাথাতেই প্রথম এসে থাকবে। যথাসময়ে আমার ভাই সেই ভাবনায় ভাবিত হয়েছে।

বাবাকে বললাম—বোঝাপড়া করে নিন। আমিও বলবখ'ন।

বাবা বললেন—এ বাড়ির অর্ধেক স্বত্ব তোমারও। আমি

বলি কি, তুমি যখন এসেই গেছ ভাল সময়ে, তখন বাড়িটা ভাগ করে নাও। আমি তোমার ভাগে থাকব, তোমার মা না হয় তাঁর ছোট ছেলের কাছে ইচ্ছে হলে থাকবেন।

শুনেই আমার গা রি-রি করে ওঠে। এই ঘিঞ্জি কলোনীর তিন কাঠা জায়গায় দীনদরিদ্র একটুখানি দরমার বাড়ি—এর আবার ভাগ-বাঁটোয়ারা! তার উপর এখানে স্থায়ীভাবে থাকার ইচ্ছেও আমার কখনোই হয়নি, নিজের আত্মীয়স্বজন আমার এখন আর সহ্য হয় না।

আমি বললাম—ভাগ-বাঁটোয়ারা করার ইচ্ছে হয় না। এইটুকু জায়গা ভাগ করলে থাকবে কি?

বাবা বলেন—তবে বাবা, তুমি আলাদা কোথাও বাড়ি কর, বুড়ো বয়সে আমি গিয়ে তোমার কাছে শান্তিতে মরি।

আমি সামান্য ক্রুদ্ধ হয়ে বলি—বরাবরই কি আপনাদের বোঝা আমাকে বইতে হবে নাকি? একটা জীবন সংসারের পিছনে অপচয় করেছি। এখনো কি আমাকে স্বাধীনভাবে থাকতে দেবেন না?

বাবা খুব অবাক হয়ে বললেন—তোমাকে কোন কাজে কবে বাধা দিলাম বলো তো! ঠিক কথা তোমার ইঞ্জিনীয়ারিং পড়া হয়নি, কিন্তু অত ভাল সরকারী চাকরী ছেড়ে বিদেশে গেলে, আমরা তো বাধা দিইনি। এত বছর তো আমরা তোমার গলগ্রহ হয়ে থাকিনি। এই বুড়ো বয়সে এখন আব তোমরা ছাড়া আমাদের অভিভাবক কে আছে।

আমার নিষ্ঠুর মন এখন আর সহজে গলে না। খুব তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললাম—আচ্ছা, সুহাসের সঙ্গে কথা বলে বাড়ি ভাগ করে দেবো, আপনারা আমার ভাগেই থাকবেন। কিন্তু আমি এ বাড়িতে থাকবো না।

বাবা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ করে রইলেন।

বাসায় খুব একটা ভাল লাগে না। কারণ, এখানে আমার আপনজন বলতে কেউ নেই, সারা পৃথিবীতে কেউ নেই, একমাত্র নীলু ছাড়া। বোন ভগ্নীপতিরা চলে গেল, তবু বাড়িতে

গণ্ডগোল থামে না। প্রায় সারাদিনই সুহাসের বৌ নিমি মা বাবাকে বকাবকি করে। মা খুব একটা পাল্টা ঝগড়া করে না, কিন্তু ছেড়েও দেয় না। বাবা মাঝে মাঝে লাঠি হাতে তেড়ে ছেলের বৌকে মারতে যায়। অমনি নিমি বেরিয়ে এসে কোমরে হাত রেখে—ই-ইঃ মারবে! মারুক তো দেখি! বাবা ভয়ে পিছিয়ে আসে, আর নিমি তখন এক নাগাড়ে যাচ্ছেতাই বলে যায়। আমি যে বিদেশ-ফেরতা ভাসুর বাড়িতে আছি তা গ্রাহ্য করে না। ঝিয়ের মেয়েই বটে। সুহাস কোথায় কাজ করে তা আমি এখনো ভাল জানি না, তবে যা-ই করে, তা যে খুব উঁচু ধরনের কাজ নয় তা ওর আচার আচরণ থেকেই বোঝা যায়। ওর সহকর্মীরা যে নীচুতলার লোক তা সুহাসের কথা শুনলেও টের পাই। কথায় কথায় মুখ খারাপ করে ফেলে। একটু আড়াল হয়ে বিড়ি টানে দেখি। বৌকে নিয়ে সপ্তাহে দুবার নাইট শো দেখতে যায়।

বাড়ির খাওয়া-দাওয়া অত্যন্ত নীচু মানের। আমি এসে অবধি বাড়িতে বেশ কিছু সংসার খরচ দিয়েছি, তবু খাওয়ার মান ওঠেনি তেমন। তবে মাঝে মাঝে আমার মুখরক্ষা করতে মুর্গী রান্না হয়। প্রথম দিন আমাকে খাওয়ার সময়ে কাঁটা চামচ দেওয়া হয়েছিল দেখে হেসে ফেলেছিলাম।

বাড়িতে বেশীক্ষণ থাকতে পারিনি। বাইরে বাইরে খামোখা ঘুরে ঘুরে বেড়াই। কোথাও যাওয়ার ঠিক থাকে না। চাকরি-বাকরি করবো না ব্যবসা করব, তা নিয়ে ভাবি না। বেশ একটা ছুটি-ছুটি মনের ভাব নিয়ে আছি।

বিদেশে আমার যে টাকা জমেছিল তা নেহাত কম নয়। এ দেশের মুদ্রামানে প্রায় হাজার চল্লিশ টাকা। তাই এখনই চাকরির জন্য ব্যস্ত হয়ে লাভ নেই।

পাঁচুদার সঙ্গে খুব খাতির ছিল। তার খোঁজ করতে গিয়ে শুনলাম ভদ্রলোক মরতে চলেছেন।

উঠে পড়লাম।

বেশ বেলা হয়ে গেছে। ঝি সরস্বতী আজ আসবে কিনা বুঝতে পারছি না। এত বেলা তো সে কখনো করে না। আসতেও পারে, নাও আসতে পারে। এক রিকশওয়ালার সঙ্গে তার মেয়ের বিয়ে ঠিক হয়েছে। আমার কাছে একশোটা টাকা চেয়েছিল। দেবো কোত্থেকে? আমার বাড়িতে টাকা যা আছে তা বড় অল্পে অল্পে জমানো। দিই কি করে?

দাঁত মেজে এক কাপ চা করে খেলাম। বিছানা তুলতে ইচ্ছে করছে না। থাকগে, কে-ই বা আসছে দেখতে! সরস্বতী যদি আসে তো তুলবে'খন। সকালের চা করা, বিছানা তোলা এসব ও-ই করে।

আমি খবরের কাগজ রাখি না। ছোট্ট একটুখানি একটা ট্রানজিস্টার রেডিও আছে। সেটাই আমার সঙ্গী। অবশ্য এ ফ্ল্যাটে মস্ত একটা রেডিওগ্রাম আছে অসীমদার, কিন্তু সেটার যন্ত্রপাতিতে মর্চে ধরেছে, চলে না। আমার ট্রানজিস্টার সেটটারও ব্যাটারি ডাউন। চেরা আওয়াজ আসে। রেডিওটা চালিয়ে একটা ফ্যাসফেসে কথিকা হচ্ছে, শুনে বন্ধ করে দিলাম।

আজ ছুটি। কিন্তু ছুটির দিনগুলোই আমার অসহ্য। সময় কাটতে চায় না। শ্রীরামপুরের বাড়িতে চলে যেতে ইচ্ছে হয় মাঝে মাঝে, কিন্তু গেলেই অশান্তি। মাসীর বাড়িতেও যাওয়া হয় না। রোহিতাশ্ব চৌধুরীর বাড়িতে যেতে কেমন যেন লজ্জা করে আজকাল, ওদের বাড়িতে বেবী সীটারের চাকরি করেছি বলেই বুঝি এক হীনমন্যতা কাজ করে।

মুশকিল হল আমার বাসাতেও কেউ আসে না। আজ রোববারে কেউ কি আসবে? আসবে না, তার কারণ আমাকে কেউ ভাল চোখে দেখে না। আমার তেমন বন্ধু-বান্ধবও নেই। মাঝে মাঝে খুব কথা বলতে ইচ্ছে করে।

এখনো বর্ষা নামেনি এ বছর। গরম কালটা বড় বেশীদিন চলছে। এইসব ভয়ংকর রোদের দিনে ঘরের বাইরে যাওয়ার ইচ্ছেও হতে চায় না। একা ঘরে সারাদিনটা কাটাবোই বা কি করে?

জানলা দরজা খোলা। আলোয় আলোয় ভেসে যাচ্ছে ঘর। আমি বাথরুমে ঘুরে এসে আয়নার সামনে বসে একটু ফিটফাট করে নিই নিজেকে। চুল আঁচড়াই, মুখে অল্প একটু পাউডার মাখি, কপালের একটা ব্রণ টিপে শাঁস বের করি। বেশ চেহারাটা আমার। লম্বা টান সতেজ শরীর, গায়ে চর্বি খুব সামান্য, মুখখানা লম্বা ধাঁচের, পুরু কিন্তু ভরন্ত ঠোঁট, দীর্ঘ চোখ। নাকটা একটু ছোটো কিন্তু তাতে কিছু ক্ষতি হয়নি। গায়ের রঙে জেল্লা আছে।

অনেককাল নাচি না। আজ একটু ইচ্ছে হল। কোমরে আঁচল জড়িয়ে উঠে দাঁড়িয়ে অল্প একটু পা কাঁপিয়ে নিলাম। তারপর কয়েকটা সহজ মুদ্রা করে নিয়ে ধীরে ধীরে নাচতে থাকি। কিন্তু বুঝতে পারি শরীর আর আগের মতো হালকা নয়। বেশ কষ্ট হয় শরীর ভাঙতে, দমও চট করে ফুরিয়ে গেল। হাঁপিয়ে বসে পড়লাম। তাতেও হল না। পাখা চালিয়ে শুয়ে রইলাম মেঝেয়। ঠাণ্ডা মেঝে, বুক জুড়িয়ে গেল। শুয়ে থেকে হঠাৎ মনে হল— আজ কেউ আসবে। অনেককাল কেউ আসে না। আজ আসবে। ভাবতে ভাবতে ঝিমধরা মাথায় কখন যে তন্দ্রা এল। সরস্বতী আসেনি, হরিণঘাটার ডিপো থেকে দুধের বোতল আনা হল না। সকালের জলখাবার বলতে কিছু খাইনি এখনো, খিদে পেয়েছে! এ সব ভাবতে ভাবতেও তন্দ্রা এল। কি আলিস্যি আর অবসাদ যে শরীরটার মধ্যে! বয়স হচ্ছে নাকি! মাগো!

খুব বেশীক্ষণ মটকা মেরে পড়ে থাকা হল না। পিয়ানোর হালকা শব্দ তুলে কলিং বেল পিং আওয়াজ করলো। সদর দরজাটা ভেজানো আছে, সরস্বতী হলে বেল না বাজিয়ে হুড়ুম হুড়ুম করে ঢুকে পড়তো। এ সরস্বতী নয়, অন্য কেউ।

দরজা খুলে একটু খুশীই হই। আমার অফিসের সেই স্মার্ট ও সুপুরুষ যুবক সুকুমার দাঁড়িয়ে আছে হাসিমুখে। যদিও

সুকুমারকে আমি সেই অর্থে ভালবাসি না, তবু ওর সঙ্গ তো খারাপ নয়। জানি না বাপু আমাদের মনের মধ্যে কি পাপ আছে। পাপ একটু আধটু আছে নিশ্চয়ই। নইলে সুকুমারের ঐ দুর্দান্ত বিশাল জোয়ান চেহারা আর হাসির জবাব রঙ্গ রসিকতায় ভরা কথাবার্তা আমার এত ভাল লাগে কেন। আমরা পরস্পরকে 'তুমি' করে বলি, সেটাও পাঁচজনের সামনে নয়, দুজনে একা হলে তবেই। তাহলে নিশ্চয়ই এর মধ্যে একটু পাপ-টাপের গন্ধ পাওয়া যাবে।

বাইরের ঘরে বসে ও তেমনি হাসি মুখে বলল—তোমাকে একটু বিরহী বিরহী দেখাচ্ছে অলি।

ওর হাসিটা যেন একটু কেমন। মানুষ খুব নার্ভাস হয়ে পড়লে মাঝে মাঝে ও রকম হাসি হাসে। ওর মতো চটপটে বুদ্ধিমান ছেলের নার্ভাস হওয়ার কথা নয়।

আমি বললাম—বিরহ নয় বিরাগ। বোসো, আজ আমার ঝি আসেনি, নিজেকেই চা করতে হবে।

ও বিরস মুখ করে বলে—ও, আমি ভেবেছিলাম তোমার বাসায় আজ ভাত খাবো দুপুরে। কিন্তু ঝি যখন আসেনি—

কথাটা আমার কানে ভালো শোনাল না। ভাত খাবে কেন? এ প্রস্তাবটা কি একটু বাড়াবাড়ি হচ্ছে না?

আমি বললাম—আমি নিজে কতদিন না রেঁধে শুকনো খাবার খেয়ে কাটিয়ে দিই। আজও অরন্ধন।

সুকুমার নড়ে চড়ে বসে বলল—এসে তোমার ডিসটার্ব করছি না তো!

—মোটেই নয়। আজ আমার খুব একা লাগছিল।

—আমারও।

—মনে হচ্ছিল কেউ আসবে।

সুকুমারের মুখ হঠাৎ খুব উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ও বলে—কে আসবে বলে ভেবেছিল? আমি?

—না। বিশেষ কারো কথা নয়। যে কেউ।

—আমার কথা তুমি ভাবো না অলি?

পুরুষমানুষদের এই এক দোষ। তারা চায় মেয়েরা সব সময়

তাদের কথা ভাবুক। বড় জ্বালা। জয়দেবও বোধহয় তাই চাইত।

আমি একটু হেসে বললাম—ভাবব না কেন? তবে আমার ভাবনা খুব ভাসা ভাসা। গভীর নয়।

সুকুমারের স্মার্টনেস আজ যে কোথায় গেল? সে আজ একদম বেকুব বনে গেছে। মুখের রঙ অন্যরকম। আমি বাতাসে একটা বিপদের গন্ধ পাচ্ছি।

আজ সুকুমার খুব ভাল পোশাক পরে এসেছে। সাদা রঙের ওপর নীল রঙের নকশা করা পাতলা টেরিভয়েলের ছ্যাঁদাওয়ালা জামা, খুব সুন্দর ধূসর রঙের প্যান্ট পরা, পায়ে ঝকঝকে মোকাসিন। হাতে এই ছুটির দিনেও একটা পাতলা ভি আই পি স্যুটকেশ। রুমালে মুখ মুছে বলল—অলি, হঠাৎ এলাম বলে কিছু মনে করো না।

আমি হেসে বললাম—তুমি এর আগেও একবার এসেছিলে, তখনও কিছু মনে করার ছিল না। মনে করব কেন?

সুকুমার ভাল করে কথা বলতে পারছে না আজ। আমার দিকে ভাল করে তাকাচ্ছেও না। বলল—ভীষণ খারাপ সময় যাচ্ছে আমার।

—কেন, খারাপের কি? সদ্য একটা লিফ্ট্ পেয়েছো?

সুকুমার ব্যথিত হয়ে বলে—সবসময়ে টাকার পয়েন্টে লোকের ভাল মন্দ বিচার করা যায় না। সেসব নয়। আমার মনটা ভাল নেই।

—কেন?

—তোমার সেটা বোঝা উচিত।

আমি এ ব্যাপারে খানিকটা নিষ্ঠুর। সুকুমার কি বলতে চায় তা আমার বুঝতে দেরি হয়নি। কিন্তু এ সব প্রস্তাবকে গ্রহণ বা গ্রাহ্য করা আমার সম্ভব নয়। বললাম—তোমার প্রবলেম নিয়ে আমি চিন্তা করব কেন? আমার ভাববার মতো নিজস্ব প্রবলেম অনেক আছে।

—অলি, তুমি কিন্তু সেল্ফ সেন্টারর্ড।

—সবাই তাই। তুমিও কি নিজের স্বার্থ থেকেই সব বিচার কর না ?

সুকুমার সিগারেট খেল কিছুক্ষণ। ওর হাত বশে নেই। বলল—সেটা ঠিকই। কিন্তু তুমি যে হ্যাপী নও এটা নিয়েও আমি ভাবি।

আমি হেসে বললাম—সেটা ভাবতে না যদি আমার ওপর তোমার লোভ না থাকতো।

—লোভ! বলে আঁতকে উঠল সুকুমার। বলল—লোভ অলি? লোভ কথাটা কত অশ্লীল জান? লোভের কথা বললে কেন?

—তবে কি বলব, প্রেম? ভালবাসা?

সুকুমার অবাক হয়ে চেয়ে থেকে বলে—আমি তো তাই ভাবতাম।

মাথা নেড়ে বললাম—পুরুষমানুষ আমি কম দেখিনি। লোভ কথাটাই তাদের সম্বন্ধে ঠিক কথা। পুরুষেরা মেয়েদের চায় বটে, কিন্তু সে চাওয়া খিদের খাবার বা নেশার সিগারেটের মতো।

তুমি বড্ড ঠোঁটকাটা। বলে সুকুমার হাসে একটু। বলে—সে থাকগে। তর্ক করে কি কিছু প্রমাণ করা যায়? বরং যদি আমাকে একটা চান্স দিতে অলি, দেখতে মিথ্যে বলিনি—

—চা করে আনব?

—আনো।

চা খেয়ে সুকুমার নিজের হাতের তেলোর দিকে নতমুখে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ।

আমার একটু মায়া হল। ও আমাকে ভয় পাচ্ছে। এত বড় চেহারা, এত ভাল দেখতে, তবু একটা মেয়েকে অত ভয় কেন পুরুষমানুষের?

নরম গলায় বললাম—কি বলবে বল।

—কি বলব, বলার নেই।

—শুধু বসে থাকবে?

—না, উঠে যাবো এক্ষুনি।

—সে তো যাবেই জানি। কিন্তু মনে হচ্ছিল, আজ তুমি কি একটা বলতে এসেছিলে।

সুকুমার হঠাৎ তার যাবতীয় নার্ভাসনেস ঝেড়ে ফেলতে গিয়ে মরীয়া হয়ে খাড়া হয়ে বসল। আমার দিকে সোজা অপকট চোখে চেয়ে বলল—শোন অলি, তোমাকে আমি ছাড়তে পারব না। অনেক চেষ্টা করেছি মনে মনে, পারিনি।

এসব কথা শুনলে আমার হাই ওঠে। অবাস্তব কথা সব, একবিন্দু বিষয়বুদ্ধি নেই এসব আবেগের মধ্যে। আমি এ'টো কাপ তুলে নিয়ে চলে আসি। বেসিনে রেখে ট্যাপ খুলে দিয়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম একা, ভাল লাগে না।

হঠাৎ সুকুমার ঘরের বাইরের থেকে ভিতরে চলে এল, খুব কাছে পিছনের দিকে দাঁড়িয়ে আমার দু কাঁধ আলতো হাতে ধরে অল্প কাঁপা গলায় আর গরম শ্বাসের সঙ্গে বলল—অলি, এর চেয়ে সত্যি কথা জীবনে বলিনি কাউকে। গত তিন রাত ঘুমোতে পারিনি। কিছুই ভাল লাগছে না, তাই আজ দীঘা যাওয়ার টিকিট কেটে এনেছি।

—যাও ঘুরে এসো। সমুদ্রের হাওয়ায় অনেক রোগ সেরে যায় এটাও হয়তো যাবে।

—রোগ! কিসের রোগ! আমার কোন রোগ নেই।

কলের জল পড়ে যাচ্ছে হিলহিল করে। সেই দিকে চেয়ে থেকে বললাম—কাঁধ থেকে হাত সরিয়ে নাও, তোমার হাত ভীষণ গরম।

এসব সময় যা হয়, তাই হল। অপমানিত পুরুষ যেমন জোর খাটায়, তেমনি সুকুমারও আমাকে জড়িয়ে ধরল হঠাৎ। একটা বিরক্তিকর অবস্থা।

হঠাৎ সরস্বতীর ভৌতিক গলা চেঁচিয়ে উঠল—উরেব্বাস, এ কি গো!

সুকুমার প্রায় স্ট্রোকের মুরগীর মতো অবশ হয়ে টলতে টলতে সরে গেল। সরস্বতী দরজায় দাঁড়িয়ে।

লজ্জায় মরে গিয়ে বললাম—এই হচ্ছে তোমার দাদাবাবু। ফেরাতে এসেছে।

জয়দেব আর আমার বিয়ে ভাঙার ব্যাপারটা সরস্বতী জানে। তাই সে বুঝল সুকুমারই জয়দেব। খুব হাসি মুখে বলল—

তাহলে এতদিনে বাবুর মতি ফিরেছে, ভূত নেমেছে ঘাড় থেকে !

আমি কথাটা চাপা দেওয়ার জন্য বললাম—দেরি করলে যে বড়। সারা সকাল আমি কিছু খাইনি জানো !

—কি করব দিদি, টাকার জোগাড় করতে সেই মোমিনপুর গিয়েছিলাম কুসমীর কাকার কাছে। সে পানের দোকান করে। পয়সা আছে। দয়া-ভিক্ষে করতে পাঁচশটা টাকা দেবে বলেছে।

আমি বললাম—কাজকর্ম তাড়াতাড়ি সারো তো। বোকো না।

—দাদাবাবুর জন্য মিষ্টি-টিষ্টি এনে দেবো নাকি? দাও তাহলে পয়সা। চায়ের জল চড়িয়ে দোকান থেকে আসি।

কঠিন গলায় বললাম—না।

বসবার ঘরের ঠিক মাঝখানটায় সম্পূর্ণ গাড়লের মতো দাঁড়িয়ে ছিল সুকুমার। ভাল পোশাক, চমৎকার চেহারা তবু কি অসহায় আর বোকা যে দেখাচ্ছে !

আমি হেসেই বললাম—মাথা ঠাণ্ডা রেখো, বুঝলে ! আমারও তো কিছু নিজস্ব পছন্দ অপছন্দ থাকতে পারে।

—সে জানি।

—ছাই জানো। আমার স্বামী লোকটা খুব খারাপ নয়। অন্তত লোকে তাকে খারাপ বলে না। তবু তাকে আমার পছন্দ হয়নি বলেই তার সঙ্গে থাকিনি। তুমি কি ভাবো আমি একা থাকি বলে খুব সহজে বশ করে নেওয়া যাবে আমাকে ?

—তুমি কখনোই আমাকে বুঝলে না অলি। বোধহয় ভালবাসা তুমি বুঝতেই পারো না। থাকগে, যা হয়েছে তার জন্য ক্ষমা করে দিও।

সুকুমার চলে যাচ্ছিল। আমি বললাম—এখন কি সোজা দীঘায় যাবে ?

সুকুমার হতাশ গলায় বলল—দীঘায় একা যাওয়ার প্রোগ্রাম তো ছিল না।

—তাহলে ?

—ইচ্ছে ছিল তোমাকেও নিয়ে যাবো। দুটো কটেজ বুক করে

রেখেছি, বম্বে এক্সপ্রেসে দুটো ফার্স্ট ক্লাস টিকিট কেটে রেখেছি। কিন্তু সে সব ক্যানসেল করতে হবে।

ওর দুঃসাহস দেখে আমি হতবাক। বলে কি! আমাকে নিয়ে দীঘা যেতে চেয়েছিল?

কিন্তু এ বিস্ময়টা আমার বেশীক্ষণ থাকলো না। ও রকম পাগলামির অবস্থায় মানুষ অনেক বেহিসেবী কাজ করে। বললাম, আমাকে দীঘায় নিয়ে কি করতে তুমি?

সুকুমার মনোরুগীর মতো হাসল একটু। বলল—আমাকে বিশ্বাস কোরো না অলি? আমার মাথার ঠিক নেই। কত কি ভেবে রেখেছি কত কি করতে পারি এখনো।

আমি মাথা নেড়ে বললাম—এ সব ভাল নয়। তুমি আমার ক্ষতি ছাড়া কিছু করতে পারো না আর।

—বোধহয় তুমি ঠিকই বলেছো। আমি নিজেও আর বিশ্বাস করি না।

আমি বললাম—দাঁড়াও, এক্ষুনি চলে যেও না।

—কেন?

—মনে হচ্ছে, তুমি একটা বিপদ করবে। বসে একটু বিশ্রাম করো। আজ বরং দুপুরে এখানেই খেয়ে যাও।

সুকুমার বসল।

সুকুমার প্রায়ই এর ওর হাত দেখে ভবিষ্যৎ বলে। আসলে ও হাত দেখার কিছুই জানে না, কেবল ব্লাফ মারে। কিন্তু ভবিষ্যৎ-বাণীগুলো বানায় বেশ চমৎকার। নতুন ধরনের কথা বলে। কাউকে হয়তো বলে শীতকালটায় আপনি খুব বিষণ্ন থাকেন। আমাদের অফিসের বড় কর্তাকে একবার বলেছিল—সামনের মাসে আপনাকে চশমার পাওয়ার পালটাতে হবে, একটা দাঁত তোলাবেন ফেব্রুয়ারী মাসে। এই রকম সব। অফিসের মেয়েদের হাত দেখে এমন সব কথা বলে যে মেয়েরা পালাতে পারলে বাঁচে। একবার আমার হাত দেখে সুকুমার বলেছিল—শুনুন মহিলা, আপনার একটা মুশকিল হল আপনি সকলের সঙ্গে বেশ সহৃদয় ব্যবহার করতে ভালবাসেন। স্নেহ-মায়া আপনার কিছু বেশী। কিন্তু তার ফলে লোকের সব সময়ে মনে হয় যে আপনি তাদের প্রশ্রয় দিচ্ছেন

বা প্রেমে পড়েছেন। একটু রূঢ় ব্যবহার করতে শিখুন, ভাল থাকবেন।

কি ভীষণ মিথ্যা কথা, আবার কি ভীষণ সত্যিও। সুকুমারের ঐ ভুয়ো ভবিষ্যৎবাণী তার নিজের সম্পর্কেই খেটে গেল।

স্নেহবশে মায়ায় ওকে আমি দুপুরে খেয়ে যেতে বললাম। আসলে ঐ ছুতোয় ওকে একটুক্ষণ আটকে রাখার জন্যই। নইলে ওর যে রকম মনের অবস্থা দেখছি, হয়তো রাস্তায় গিয়ে গাড়ি চাপা পড়বে। আর সেই আটকে রাখাটাই বুঝি ভুল হল। সুকুমার ভাবল, আমার মানসিক প্রতিরোধ ভেঙে পড়েছে, আমি ওকে প্রশ্রয় দিতে শুরু করেছি।

দুপুরের খাওয়া শেষ করে সুকুমার বাইরের ঘরে বসে সিগারেট ধরাল। সরস্বতী চলে গেছে, কাল সকালে ফের আসবে। যাওয়ার আগে সে সুকুমারের সঙ্গে কিছু তরল রসিকতাও করে গেল আমাকে নিয়ে।

আমি মনে মনে চাইছিলাম সুকুমার এখন চলে যাক। সুকুমার গেল না। সারা বেলা আমাদের খুব একটা কথা হয়নি। আমি রান্নাঘরে রেঁধেছি, সুকুমার বাইরের ঘরে বসে বইপত্র পড়েছে।

দুপুরে রোদ আর গরমের ঝাঁঝ আসে বলে দরজা জানলা সরস্বতী যাওয়ার আগেই বন্ধ করে দিয়ে যায়। বেশ অন্ধকার আবছায়ায় সুকুমারের সিগারেট জ্বলছে। আমার অস্বস্তি হচ্ছিল। ছুটির দিনে আত্মীয়-স্বজন কেউ যদি হুট করে চলে আসে, তো আমার কোনো সাফাই কেউ বিশ্বাস করবে না। কিন্তু সুকুমারকে কি করে চলে যেতে বলি?

মুখোমুখী বসেছিলাম। বললাম—তুমি কি বিশ্রাম করবে, না যাবে এক্ষুনি?

সুকুমার আয়েসের স্বরে বলল—এই গরমে বের করে দেবে নাকি?

—তা বলিনি—বলে অস্বস্তিতে চুপ করে থাকি। ভেবে চিন্তে বললাম—তাহলে এ ঘরে বিশ্রাম নাও। আমি ওঘরে যাই।

শোওয়ার ঘরে এসে কাঁটা হয়ে একটু শুতে না শুতেই আবছা একটা মূর্তি এসে হঠাৎ জাপটে ধরল আমাকে। সুকুমার।

আমি প্রতিমুহূর্তে এই ভয় পাচ্ছিলাম। ওর শ্বাস গরম, গা গরম, উন্মাদের মতো আশ্লেষ। ও খুনে গলায় বলল—তোমাকে মেরে ফেলব অলি, যদি রাজি না হও আমাকে বিয়ে করতে।

আমার কোনো কথাই ও শুনতে পাচ্ছে না। গ্রাহ্য করছে না আমার কিল, ঘুষি, আঁচড়, কামড়।

হঠাৎ বহুকাল নিস্তব্ধতার পর বিপদসঙ্কেতের মতো টেলিফোনটা বেজে উঠল। সেই শব্দে চমকে সুকুমার একটু থমকাল। আমি নিজেকে সামলে গিয়ে টেলিফোন তুলে বললাম —হ্যালো।

একটা গম্ভীর গলা বলল—আপনার ঘরে কে রয়েছে?

এত ভয় পেয়েছিলাম যে রিসিভার হাত থেকে খসে পড়ে যাচ্ছিল প্রায়, ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলাম—আপনি কে বলছেন?

উত্তর এল—ঐ লোকটাকে ঘর থেকে বের করে দিন।

টেলিফোনটা কেটে গেল আচমকা!

প্রভাসরঞ্জন

সকাল থেকেই আজ মেজাজে আছি। কোনো খুশখবর নেই, মন ভাল থাকার কোনো কারণ দেখছি না, তবু কেন মনটা নবাবী করছে?

ঐ রকম হয় মাঝে মাঝে। বেঁচে থাকাটাকে যখন শবদেহ বহনের মতো কষ্টকর লাগে সব সময়ে তখন মাঝে মধ্যে বুঝি প্রাকৃতিক নিয়মে মরবার আগে হঠাৎ সুস্থ হয়ে ওঠার ছদ্ম লক্ষণ প্রকাশ পায়। ঈশ্বর করুণাপরবশ হয়ে এক বিন্দু খুশী মিশিয়ে দেন জীবনে। তখন বুঝতে হয় যে কঠিন দিন আসছে।

সে যাকগে। অতীতের চিন্তা আর ভবিষ্যতের ভাবনা দিয়ে এখানকার খুশীর মেজাজটাকে নষ্ট করার মানেই হয় না। দীর্ঘদিন ইউরোপে থেকে শিখেছি, বর্তমানটাকে যতদূর সম্ভব উপভোগ করাটাই আসল। যে সময় চলে গেছে বা যে সময় আসেনি, তার

কথা চিন্তা করা এক মস্ত অসুখের কারণ! যদি আমুদে হতে চাও তো সে চিন্তা ছাড়ো।

প্রায় এক মাস হয়ে গেল দমদমের বাড়ি ছেড়ে পার্ক সার্কাসে চলে এসেছি। স্থায়ীভাবে এসেছি এ কথা বলা যায় না। মা-বাবাকে সে রকম কিছু বলে আসিনি। তবে দমদমের বাড়িতে আর ফিরে যাওয়ার ইচ্ছেও নেই। সেখানে বড্ড বেশী অশান্তি। আমার ভাদ্রবধূটি বাড়িটাকে নরক করে তুলেছে।

একদিন বীভৎস ঝগড়ার পর আমি ভাইকে ডেকে বললাম—পাড়ার পাঁচজনকে ডাকো, বাড়ি ভাগ হোক।

তাতে সুহাসের আপত্তি। সে বলে—ভাগাভাগি কিসের!

আমি গম্ভীর হয়ে বলি—বাবা চাইছেন তোমার আমার মধ্যে ভাগ করে দিতে।

সে বলল—তুমি তো আর এখানে থাকবে না! চলেই যাবে অন্য কোথাও তবে ভাগ করব কেন?

সুহাসের বৌ তেড়ে এল—আপনার কোনো দাবী নেই। আপনি তো বাইরের লোক হয়ে গেছেন। আমরা থাকি, বাড়িতে আমাদের স্বত্ব বেশী।

কথাটা অযৌক্তিক, কিন্তু এত জোর দিয়ে বলল যে আমি খুব অসহায় বোধ করতে লাগলাম। আমার মাও, কেন জানি না, বাড়ি ভাগাভাগির বিরুদ্ধে। কেবল বাবা ভাগাভাগি চাইছেন, এবং খুব মরীয়া হয়ে চাইছেন। কাজেই ফের ঝগড়া লেগে গেল।

নিমি আমাকে স্পষ্ট বলল—আপনার তো চরিত্র খারাপ। বিদেশে কি সব করে বেড়িয়েছেন তা কি আমরা টের পাইনি।

সুহাস নিমির পক্ষ নিয়ে বলে—তোমাকে তো ওদেশ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে, তাই এসে ঘাড়ে পড়েছো। বেশী স্বত্ব টত্ব দেখিও না, খারাপ হয়ে যাবে। এ পাড়ায় এখনো আমার এক ডাকে দুশো লোক চলে আসবে।

সুহাসের কথা শুনে খুব অবাক হই না। এ রকমটাই আশা করছিলাম এতদিন। আর ও কথাটা ঠিক, এ পাড়ায় ওর বেশ হাঁক-ডাক আছে।

এ রকম কুৎসিৎ পরিস্থিতিতেই ছেলেবেলায় মানুষ হয়েছি। ঝগড়া, মারামারি, পৃথিবীর সবচেয়ে নোংরা গালাগালি এ সবই আমাকে গঙ্গাজলে শুদ্ধ করেছে বহুবার।

ভয়টয়ও বড় একটা হল না। শুধু ঠাণ্ডা গলায় সুহাসকে বললাম—বাড়ি ভাগ ঠেকাতে পারবে না। দরকার হলে আমি পুলিশকে খবর দেবো, বলবো যে তুমি আমাকে ওয়ার্নিং দিয়েছো।

কিন্তু কে কার কথা শোনো! সুহাস আর তার বৌ ঝগড়ার চোটে প্রায় নাচতে লাগল! সুহাস তড়পায়, পেছন থেকে নিমি তাতে সাহস দেয়। শক্তিদায়িনী নারী কাকে বলে জানলাম। দুজনেই দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য, কাপড়-চোপড় গা থেকে খসে পড়ছে প্রায়।

এ বাড়ি ভাগ করা যে আমার কর্ম নয় তা বুঝলাম। ভীমরুল চাক বেঁধেছে, ঢিল মাবলে রক্ষে নেই। বাবাকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে বললাম—দেখছেন তো ওদের অ্যাটিচুড। বাড়ি ভাগ কি করে হবে?

বাবা অসহায়ভাবে বললেন—তুমি আলাদা বাসা করো।

সেই পুরানো কথা। বিরক্ত হয়ে বলি—সেটা সম্ভব নয়। আলাদা বাসা করলেও আমি আপনাদের সঙ্গে থাকব না। আমার একা থাকা দরকার।

বাবা চুপ করে রইলেন। অনেকক্ষণ বাদে বললেন—বাবা প্রভাস, আমি সারা জীবন কখনো সুখে থাকিনি। গত জন্মের দোষ ছিল বোধহয়। তা এখন কি করতে বলো আমাকে? গলায় দড়ি দেবো?

আমি কিছু লজ্জা পেয়ে চুপ করে থাকি।

বাবা বললেন—তুমি বিদেশ থেকে ফিরে এসেছো দেখে বড় আশায় বুক বেঁধেছিলাম। বিশ্বাস ছিল তুমি আমাকে ফেলবে না। কিন্তু এখন—

আমি বললাম—তার চেয়ে কোনো হোস্টেলে গিয়ে—

বলতে বলতে বুঝতে পারি, বিদেশের মতো তো আর এখানে বুড়ো বুড়ির জন্য হস্টেল নেই। বাবা অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে

দেখে কথাটা ঘুরিয়ে নিয়ে বললাম—কোনো আশ্রম-টাশ্রমে যদি বন্দোবস্ত হয় তাহলে ?

বাবা মাথা নাড়লেন। চোখে বুঝি জল এসেছিল, সেটা মুছে নিয়ে বললেন—বুঝেছি। আপত্তি কি ? তাই না হয় দেখ।

বাবাকে ভরসা দিয়ে বললাম—টাকা যা লাগে আমি কষ্ট করে হলেও দেবো'খন।

—সে জানি। দিও। তোমরা না দিলে গতি কি ?

যোগাযোগ করে নানা মুরুব্বি ধরে বাবার জন্য কাশীতে একটা বন্দোবস্ত হল। মাসখানেক আগে বাবা একখানা তোরঙ্গ আর শতরঞ্চিতে বাঁধা বিছানা নিয়ে ট্রেনে চাপলেন।

মার জন্য খুব চিন্তা নেই। মা যেন কি ভাবে এই সংসার প্রোথিত বৃক্ষের মতো রয়েই গেল। সাধারণত শাশুড়ির সঙ্গে বৌদের অবনিবনা দেখা যায়। আমাদের বাড়িতে উল্টো নিয়ম দেখি। তার মানে এই নয় যে নির্মিতে আর মাতে ঝগড়া হয় না। বরং খুবই হয়। কিন্তু সুহাসের বুঝি মায়ের প্রতি একটা টান আছে। বাড়িতে ঢুকেই বিকট একটা 'মা' ডাক দেয় রোজ। আর একটা ব্যাপার হল, এ সংসারে হাজারো কাজে মা জান বেটে দেয়। বিনি মাগনা কেবল খোরাকী দিয়ে এমন বিশ্বস্ত ঝি-ই বা নির্মি কোথায় পাবে। তাই ঝগড়াঝাঁটি হলে, মাকে ফেলতে চায় না। মায়েরও আবার সুহাসের ওপর টান বেশী। এ সব টানের কোনো ব্যাখ্যা হয় না। সবচেয়ে অপদার্থ ছেলেটাকেই মা কেন ভালবাসে তা বিশ্লেষণ করা বৃথা।

বাড়ির এই পরিস্থিতিতে যখন আমি বাড়ি ছাড়বো-ছাড়বো ভাবছি, সেই সময়ে মুমূর্ষু পাঁচুদা একদিন আমাকে বললেন—তোর যখন বনছে না তখন আমার বাসাটায় গিয়ে থাক না কদিন। তালাবন্ধ পড়ে আছে।

বাঁচলাম হাঁফ ছেড়ে। শোনার পর আর অপেক্ষা করিনি। সে রাতটা ভাল করে ভোর হওয়ার আগেই পাঁচুদার পার্ক সার্কাসের ফ্ল্যাটে এসে উঠেছি।

ব্যাচেলার মানুষ পাঁচুদা। ঘরে রান্নাবান্নার সব বন্দোবস্ত রয়েছে। আসবাবপত্রও কিছু কম নেই। সারাজীবন নিজের শখ

শৌখিনতার পিছনে অজস্র টাকা পয়সা ঢেলে গেছেন। টাকা পয়সা জমাননি বড় একটা। ঠকবাজেরাও লুটেপুটে নিয়েছে। ফ্ল্যাটে এসে শুনলাম ছ'মাসের ভাড়া বাকি পড়ে আছে। অথচ বাথরুমে গীজার, ঘরের মেঝেয় কার্পেট, রান্নাঘরে মিনি রেফ্রিজারেটার—কি নেই ?

হাসপাতালে দেখা করতে গেলে পাঁচুদা বললেন—যদি আমি বেঁচে যাই তো আলাদা কথা, নইলে ঐ ফ্ল্যাট তোকেই দিয়ে গেলাম। সব জিনিসপত্র শুদ্ধু।

আমি বললাম—অত কিছু বলার দরকার নেই পাঁচুদা। আপনি মরছেন না শীগগীর। আপাতত কিছুদিন থাকার জায়গা পেলেই আমার যথেষ্ট।

বাড়িওয়ালাকে ছ'মাসের ভাড়া আমাকে শোধ করতে হল। লোকটা গণ্ডগোল শুরু করেছিল। টাকা পয়সা খরচ হল বটে, কিন্তু মোটামুটি একটা থাকার জায়গা পেয়ে বড় খুশী লাগল। দমদমের নরক থেকে তো দূরে আছি।

জ্যোতিষ নরেনবাবু কিন্তু মাস দুয়েক আগে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন মাসখানেকের মধ্যে বাসস্থানের পরিবর্তন।

লোকটার ওপর শ্রদ্ধা বেড়ে যায়।

সারাদিন প্রায়ই কাজ থাকে না। রান্নাবান্না করি, খাই। দুপুরে একটু ঘুম। বিকেলের দিকে নরেনবাবু কিংবা পাঁচুদার ওখানে যাই। বন্ধু বান্ধব কেউ নেই। নিরালা, নির্জন সময় কাটে। বেঁচে থাকার অর্থ নেই।

এ বাড়ির দোতলা থেকে প্রায়ই একটা মেয়েকে নামতে উঠতে দেখি। চেহারাটা বেশ। বিয়ের বয়স হয়েছে তো বটেই, একটু বেশীই হয়েছে বুঝি। মাথায় সিঁদুর দেখি না। খুব সাজগোজ করে অফিসে যায়। তার বন্ধুবান্ধব বা আত্মীয়স্বজনও কেউ আসে না বড় একটা। মেয়েটা আমার মতোই একা কি ?

ভেবে ভেবে একটু কেমন হয়ে গেল মনটা, দীর্ঘদিন বিদেশে থেকে আমার মেয়েদের সম্পর্কে বাঙালীসুলভ লজ্জা সংকোচ হয় না। আবার কাউকে দুদিন দেখলেই প্রেমে পড়ে যাওয়ার মতো দুর্বলতাও নেই আমার। বরং মেয়েদের ব্যাপারে আমি এখন অতিশয় হিসেবী।

নিচের তলায় পাশের ফ্ল্যাটের ভদ্রলোক বড় একটা ইংরেজি কাগজের রিপোর্টার। অল্প ক'দিনেই আমার সঙ্গে বেশ খাতির হয়ে গেছে। তাঁর বৌকে বৌদি বলে ডাকি। মাঝে মধ্যে মাংস বা মাছ পাঠিয়ে দেন, কফি করে ডেকে নিয়ে খাওয়ান। দুজনেরই বয়স চল্লিশের ওপরে। রিপোর্টার ভদ্রলোকের নাম মধু মল্লিক। নিজের কাজে তাঁর বেশ সুনাম আছে। ইউরোপ, জাপান অনেকবার ঘুরে এসেছেন। নিজের কাজকে প্রাণাধিক ভালবাসেন। আর সেই কারণেই তাঁকে অনবরত বাইরে ঘুরে বেড়াতে হয়। গত কয়েকমাসে দেখলাম, মধু মল্লিক একবার দিল্লি-বম্বে, একবার অরুণাচল প্রদেশ, একবার ওড়িশা ঘুরে এলেন। তা ছাড়া দিন রাত অফিসের গাড়িতে শহর চক্কর মারা তো আছেই। বলেন—ভাই, এই চাকরি করতে করতে এমন অভ্যাস হয়ে গেছে যে দুদিন ঘরে থাকতে হলে হাঁপিয়ে পড়ি। তাই ভয় হয়, রিটায়ার করলে এক হপ্তাও বাঁচব না।

বৌদি সারাদিনই প্রায় একা। তিনটে ছেলে মেয়ে আছে যথাক্রমে চৌদ্দ, বারো আর তিন বছরের। ছোটোটি ছেলে, বড় দুটি মেয়ে। মেয়ে দুজন ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ে মডার্ন স্কুলে। নাচ গান শেখে, একজন ওরিগামী শেখে, অন্যজন ল্যাংগুয়েজ ক্লাশ করতে রামকৃষ্ণ মিশনে যায়। বেশ ব্যস্ত তারা। ছোট ছেলেটিকে নিয়ে বৌদি খানিকটা নিঃসঙ্গ। আমাকে ডেকে নিয়ে গল্প করতে বসেন। বেশ একটা মা-মা ভাব তার মধ্যে। মোটাসোটা গিন্নিবান্নি চেহারা। মুখে সর্বদা পান আর হাসি।

সে যাকগে। বৌদির একটা সময় কাটানোর শখ আছে। স্বামী খবরের কাগজের রিপোর্টার, বৌ পাড়ার যাবতীয় খবরের সংবাদ সংস্থা। পরিচয় হওয়ার সাত দিনের মধ্যে আমি এ পাড়ার যাবতীয় খবর জেনে গেছি। তার মধ্যে একটা খবরই কেবল বৌদি ভাল করে জানেন না। সে হল ওপর তলার ওই মেয়েটির খবর।

দুঃখ করে বললেন—অলকার বড্ড ডাঁট, বুঝলেন। অসীমবাবুরা যেমন সোশ্যাল মানুষ ছিলেন, বোনটি ঠিক তেমন আনসোশ্যাল। কারো সঙ্গে কথাবার্তা বলে না, নিজেকে নিয়ে ও রকম থাকে কি করে?

আমি বললাম—নিশ্চয়ই একা থাকতে ভালবাসে। এর মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু নেই।

বৌদি হেসে বলেন—আপনি বিদেশে ছিলেন বলেই মেয়েদের একা থাকায় দোষ দেখেন না।

সে অবশ্য ঠিক। আমাকে স্বীকার করতেই হয়!

বৌদি বললেন—একা কি আর সাধ করে আছে! স্বামী নেয় না, সে এক কথা। আবার শুনি মা বাপের সঙ্গেও বনিবনা নেই।

—দেখতে কিন্তু বেশ।

—হ্যাঁ। কিন্তু নাকটা চাপা। রঙও এমন কিছু ফর্সা নয়।

হাসলাম। মেয়েদের ঐ এক দোষ। কাউকে সুন্দর দেখতে চায় না। একটু না একটু খুঁত বের করবেই।

বৌদি বললেন—ওকে যে কেন সবাই এত সুন্দর দেখে বুঝি না। আমাদের কর্তাটিও প্রথম প্রথম ওকে দেখে মূর্ছা যেতেন।

আমি জিজ্ঞেস করলাম—মেয়েটি কেমন?

বৌদি ভ্রূ কুঁচকে বললেন—ভাল আর কি! এ সব মেয়েরা আর কত ভাল হবে? তবু মিথ্যে কথা বলব না। এ বাড়িতে তেমন কিছু দেখিনি ওর। একা একা চুপচাপ থাকে। কারো দিকে লক্ষ্য করে না। বরং তিনতলার অবাঙালি পরিবারটা ভীষণ বাজে।

তবু অলকা সম্পর্কে খুব বেশী জানা গেল না। ওর স্বামী কে, কেন তার সঙ্গে ওর বনিবনা নেই, সে সব জানা থাকলে বেশ হত।

মধু মল্লিক একদিন জিজ্ঞেস করেন—ও মশাই, চাকরি বাকরি চান নাকি কিছু? আপনার তো বিদেশের টেকনোলজি জানা আছে।

আমি বললাম—কলকারখানার চাকরি করা আর পোষাবে না। ব্যবসা কিছু করতে পারি।

উনি তখন বললেন—জার্নালিজম করবেন? আপাতত একটা ফিচার লেখার বন্দোবস্ত করে দিতে পারি।

রাজি হলাম। টাকার জন্য নয়, সময় কাটানোর জন্য। গোটা দুই ফিচার লেখার বরাত পেয়ে ক'দিন বেশ ছোটাছুটি আর ব্যস্ততার মধ্যে কেটে গেল। প্রথম ফিচারটা ছিল কলকাতার হোটেলের ব্যবসার ওপর, দ্বিতীয় ফিচার ছিল যে সব ইন্ডাস্ট্রি এদেশে নেই সেগুলোর ওপর।

প্রথম ফিচারটির মাল মশলা সংগ্রহ করতে সারা কলকাতা চার পাঁচদিন দাবড়ে বেড়াতে হল। তারপর একদিন বসে মধু মল্লিকের টাইপরাইটার নিয়ে এসে লেখা শুরু করলাম। গরম পড়েছে বড্ড। পাখা চালিয়ে ঘরের দরজা খুলে হাট করে বসে কাজ করছি, এমন সময়ে একজন বেশ লম্বা চওড়া লোককে ওপরতলায় উঠতে দেখলাম। প্রথমটায় কিছু সন্দেহ হয়নি, কিন্তু একটু বাদেই বৌদি এসে এক কাপ চা রেখে বললেন—ভাই প্রভাসবাবু, একটু আগে একটা লোক—বেশ সুন্দর চেহারা অলকার ঘরে ঢুকেছে।

আমি বললাম—ভাই-টাই কেউ হবে।

—না মশাই, ভাই-টাই নয়।

—তবে ?

—সেইটেই রহস্য।

—ওর স্বামী নয় তো !

—না না, স্বামীদের হাবভাব অন্যরকম। এ লোকটাকে বেশ নার্ভাস দেখাচ্ছিল। প্রেমে পড়েছে এমন চেহারা।

—যে খুশী হোক গে। আমি অবহেলাভরে বললাম।

বৌদি বিরসমুখে বললেন—ভাবসাব ভাল নয়। একা অসহায় পেয়ে মেয়েটাকে যদি কিছু করে! আমাদের কর্তা থাকলে ঠিক ইন্টারফিয়ার করত। ওর খুব সাহস।

আমি পাত্তা দিলাম না। বৌদি চলে গেলেন। অনেকক্ষণ ধরে মন দিয়ে লেখাটা তৈরি করছিলাম। প্রথম ফিচার বেরোবে খবরের কাগজে, একটু যত্ন নিয়ে কাজ করাই ভাল।

দুপুরবেলা যখন খাচ্ছি, তখন বৌদি এসে শেষতম বুলেটিন দিলেন—লোকটা এখনো নীচে নামেনি।

আমি অবাক হয়ে বললাম—তাতে কি ?

বৌদি হঠাৎ লাজুক স্বরে বললেন—ওপরতলায় একটা হুটো-পাটির আওয়াজও পাচ্ছি।

আমি টেলিফোন তুলে নম্বরটা ডায়াল করলাম। বৌদি অবাক হয়ে দেখছিলেন। তারপর হেসে কুটিপাটি।

অলকা

লণ্ড্রীওয়ালা আমার একটি শাড়ি হারিয়েছে। মনটা ভীষণ খারাপ। লণ্ড্রীওয়ালা অবশ্য বলেছে—পাওয়া যাবে, ভাববেন না। কিন্তু আমার ভরসা নেই। আজ সকালে গিয়ে লোকটাকে খুব বকাবকি করেছিলাম। প্রথমটা তেমন রা করেনি। তারপর হঠাৎ কথার পিঠে কথা বলতে শুরু করল। বলল—সব লণ্ড্রীতেই ওরকম হয়। আমাদের নিয়ম যা আছে ওয়াশিং চার্জের দশগুণ ক্ষতিপূরণ নিয়ে যেতে পারেন।

আমি অবাক, বলে কি? ধোলাই তো মোটে তিন টাকার, তার দশগুণ হয় ত্রিশ টাকা। কিন্তু আমার চান্দেরী শাড়িটার দাম পড়েছিল একশ নব্বই, জয়দেব একটা এক্জিবিশন থেকে কিনে দেয়। খুব বেশী শাড়ি টাড়ি জয়দেব আমাকে কিনে দেয়নি ঠিকই, কিন্তু যে ক'খানা কিনে দিয়েছিল তার কোনটাই খেলো ছিল না। এসব ব্যাপারে ওর রুচিবোধ ছিল দারুণ ভাল।

শাড়িটার জন্য রাগে দুঃখে আমি পাগল পাগল। বললাম—ইয়ার্কি করছেন নাকি? দুশো টাকার শাড়ির ক্ষতিপূরণ ত্রিশ টাকা? আমি ক্ষতিপূরণ চাই না, শাড়ি খুঁজে দিন।

লণ্ড্রীওয়ালাও মেজাজ দেখাল—হারানো শাড়ির দাম সবাই বাড়িয়ে বলে। ওসব আমাদের জানা আছে। যা নিয়ম আছে সেই অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ নিতে পারেন, শাড়ি পাওয়া যাবে না। যা করবার করতে পারেন, যান।

শেষের ঐ 'যান' কথাটাই আমাকে ভীষণ অবাক আর কাহিল করে দিল। লণ্ড্রীওয়ালা লোকটার চেহারা ভীষণ লম্বা, কালো, গুণ্ডার মতো, বয়সেও ছোকরা। কয়েকদিন কাচিয়েছি এ দোকানে,

খুব একটা খারাপ ব্যবহার করেনি। আজ হঠাৎ মনে হল, এই ইতর লোকটাই বুঝি দুনিয়ার সেরা শয়তান। আমারই বা কি করার আছে? কি অসহায় আমরা! 'যান' বলে তাড়িয়ে দিচ্ছে।

রাগে দুঃখে ফেটে পড়ে আমি বললাম—যান মানে? কেন যাবো? আপনি যে কাপড়টা চুরি করে নেননি তার প্রমাণ কি? ওয়াশিং চার্জের দশগুণ ক্ষতিপূরণ দিলেই যদি অমন দামী একখানা কাপড় হাতিয়ে নেওয়া যায়—!

লোকটা বুক চিতিয়ে বলল—অ্যাঃ, দামী কাপড়! আমরা ভদ্রলোকের ছেলে বুঝলেন! দামী জিনিস অনেক দেখেছি, ফালতু পার্টি নই।

দোকানের দু একজন কর্মচারী মালিকের পক্ষে সায় দিয়ে কথা বলছে। খুব অসহায় লাগছিল আমার। এ সময় একজন জোরালো পুরুষ সঙ্গীর বড় দরকার হয় মেয়েদের।

একথা ভাবতে না ভাবতেই হঠাৎ যেন দৈববলে একজন ভদ্রলোক রাস্তা থেকে উঠে এলেন দোকানে। বেশ ভদ্র চেহারা, তবে কিছু রোগাভোগা। চোখেমুখেও বেশ দুঃখী বিনয়ী ভাব।

লোকটা দোকানে ঢুকে কয়েক পলক আমাকে দেখে নিয়ে মাথা নীচু করে বলল—ট্রাবলটা কি?

শোনাবার লোক পেয়ে আমি বেঁচে গেলাম। অবিরল ধারায় কথা বেরিয়ে আসছিল মুখ থেকে।

লোকটা শুনল। কথার মাঝখানে মাথাও নাড়ল! দোকানদার বাধা দিয়ে নিজের কথা বলতে চাইছিল, কিন্তু লোকটা তাকে পাত্তা দিল না। সম্পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে আমার কথা শুনে টুনে একটা বড় শ্বাস ফেলে বলল—হুঃ।

লোকটাকে আমার চেনা-চেনা ঠেকছিল প্রথম থেকেই। কোথায় যেন দেখেছি। কিন্তু তখন শাড়ি হারানোর দুঃখ আর লণ্ড্রীওয়ালার অপমানে মাথাটা গুলিয়ে ছিল বলে ঠিক বুঝতে পারছিলাম না।

লোকটা লণ্ড্রীওয়ালার দিকে একটু ঝুঁকে খুব আস্তে, প্রায় ফিস ফিস করে কি যেন বলল। লণ্ড্রীওয়ালা সম্মতির ভঙ্গীতে মাথা নাড়ল, দেখলাম।

আমি একটু দূরে দাঁড়িয়ে দৃশ্যটা দেখছি। কিছু শুনতে পাচ্ছি না। মনে হচ্ছিল লোকটা যেন লন্ড্রীওয়ালার বন্ধু, আবার আমারও শুভানুধ্যায়ী।

খানিকক্ষণ ঐসব ফিসফাস কথাবার্তার পর হঠাৎ লন্ড্রীওয়ালা আমার দিকে তাকিয়ে বলল—দিদি, একটা শেষ কথা বলে দেবো? আমি একশ টাকা দিতে পারি খুব জোর।

আমি ভীষণ অবাক হয়ে যাই। যদিও আমার শাড়িটার দাম অনেক বেশী, তাহলেও সেটা তো অনেকদিন পরেছি। তা ছাড়া ত্রিশ টাকার জায়গায় একশ টাকা শুনে একটা চমক লেগে গেল। তবু বেজার মুখ করে বললাম—তাও অনেক কম। তবু ঠিক আছে।

লন্ড্রীওয়ালা টাকা নিয়ে কোন গোলমাল করল না, সঙ্গে সঙ্গে একটা ড্রয়ার টেনে টাকা বের করে দিল। রসিদ সই করে দিলে লন্ড্রীওয়ালা লোকটিকে বলল—প্রভাসবাবু, আপনি সাক্ষী হিসেবে একটা সই করে দিন।

লোকটা সই করলে আমি নামটা দেখলাম। প্রভাসরঞ্জন। কোনো পদবী লিখল না।

বেরিয়ে আসার সময় প্রভাসরঞ্জনও এল সঙ্গে সঙ্গে। রাস্তায় কাঠফাটা রোদ। এই সকালের দিকেই সারা দিনের অসহনীয় গরমের আন্দাজ দিচ্ছে। আমি ব্যাগ থেকে সানগ্লাস বের করে পরে নিলাম। এখন অফিস যাবো, তাই ট্রাম রাস্তার দিকে মুখ ঘুরিয়ে চলে যাওয়ার আগে প্রভাসবাবুকে বললাম—আপনাকে ধন্যবাদ। আপনি না এলে লোকটা টাকাটা দিত না।

প্রভাসবাবু মৃদু হেসে বললেন—আপনি কি টাকাটা পেয়ে সন্তুষ্ট হয়েছেন?

আমার ভ্রূ কুঁচকে গেল। প্রশ্নটার মধ্যে একটু যেন খোঁচা আছে। বললাম—না। কেন বলুন তো!

—একটা শাড়ির সঙ্গে কত কি স্মৃতি জড়িয়ে থাকে। শাড়ির দামটা তো বড় নয়।

আমি মৃদু হেসে বললাম—তাই। তা ছাড়া শাড়িটাও বড় ভাল ছিল।

প্রভাস মাথা নেড়ে বলেন—বুঝেছি। ও টাকা দিয়ে কি আর একটা ওরকম শাড়ি কিনবেন?

—কিনতে পারি। কিন্তু একরকম শাড়ি তো আর পাওয়া যায় না। দেখা যাক।

প্রভাসরঞ্জন আমার সঙ্গে ট্রাম রাস্তার দিকে হাঁটতে হাঁটতে বললেন—শাড়িটা আপনাকে কে দিয়েছিল।

এবার আমি একটু বিরক্ত হই। গায়েপড়া লোক আমার দু-চোখের বিষ। বললাম—ওটা আমার খুব পারসোনাল ব্যাপার।

প্রভাসরঞ্জন আমার দিকে এক পলক তাকিয়েই চোখ সরিয়ে বললেন—আমি অবশ্য আন্দাজ করতে পারি।

করেছিস না হয় একটু উপকার, তা বলে কিছু নেওয়ার কি? পুরুষগুলো এমন বোকা হয়, কি বলব। তবু ভদ্রতা তো আর আমাদের ছাড়ে না। আমার আবার ঐ এক দোষ, সকলের সঙ্গে প্রশ্রয়ের সুরে একটু কথা বলে ফেলি! তা ছাড়া, লোকটার কথা শুনে মনে হচ্ছে ওর আন্দাজটা সত্যিই হতে পারে বা।

বললাম—কি আন্দাজ করলেন?

প্রভাসরঞ্জন মৃদু স্বরে বললেন—আপনার স্বামী।

আমি একটু কেঁপে উঠলাম মনে মনে। কপালে বা সিঁথিতে আমি সিঁদুর দিই না। সম্পূর্ণ কুমারী চেহারা আমার। তা ছাড়া যে এলাকায় আছি সেখানকার কেউ আমাকে চেনে না। এ লোকটা জানল কি করে যে আমার একজন স্বামী আছে?

এবার একটু কঠিন স্বরে কথা বলাটা একান্ত দরকার। লোকটা বড্ড বাড়াবাড়ি করে ফেলছে।

বললাম—আমার স্বামীর খবর আপনাকে কে দিল? আমার স্বামী টামী কেউ নেই।

লোকটা অবাক হয়ে বলে—নেই। তাহলে তো আমার আন্দাজ ভুল হয়ে গেছে!

—হ্যাঁ! এরকম অকারণ আন্দাজ করে করে আর সময় নষ্ট করবেন না। পুরুষমানুষদের কত কাজ থাকে। পরের ব্যাপার নিয়ে মেয়েরা মাথা ঘামায়!

প্রভাসরঞ্জন কিন্তু অপমান বোধ করলেন না। বড্ড গরম আর

রোদে ভদ্রলোক ঘেমে নেয়ে যাচ্ছেন। একটা টার্কিশ রুমালে ঘাড় গলা মুছলেন। পরনে একটা পাজামা আর নীল শার্ট। শার্টের কাটছাঁট বিদেশী। বাঁ হাতে বড়সড় দামী ঘড়ি। চেহারা দেখে স্বচ্ছল মনে হয়।

অপমান গায়ে না মেখে প্রভাসরঞ্জন বললেন—আমি আপনার ফ্ল্যাটের নীচের তলায় থাকি। আপনি তো ঠিক চিনবেন না আমাকে। পাঁচুবাবু নামে যে বুড়ো ভদ্রলোক হাসপাতালে গেছেন আমি তাঁরই ফ্ল্যাটে—

আমি হাসলাম। বললাম—ও, ভালই তো। আমি অবশ্য ও বাড়ির কারো সঙ্গে বড় একটা মিশি না।

—ভুল করেন।

—কেন ?

—মেশেন না বলেই আপনাকে নিয়ে লোক খুব চিন্তা ভাবনা করে নানা গুজব রটায়।

আমি তা জানি। রটাবেই, বাঙালীর স্বভাব যাবে কোথায় ? বললাম—আমি ভুল করি না, ঠিকই করি। ওদের সঙ্গে মিশতে আমার রুচিতে বাধে।

প্রভাসরঞ্জন দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলেন—সেটা হয়তো ঠিকই। তবে আমি অন্য ধাতুতে গড়া, সব রকম মানুষের সঙ্গে মিলে মিশে আমার অভ্যাস হয়ে গেছে।

উনি কার সঙ্গে মিশেছেন, কেন মিশেছেন সে সম্পর্কে আমার কৌতূহল নেই। পার্ক সার্কাসের ট্রামস্টপে দাঁড়িয়ে আমি সানগ্লাসের ভিতর দিয়ে পার্কের দিকে চেয়ে থাকি। একটা কাক বুঝি ডানা ভেঙে কোন খন্দে পড়েছে, তাকে ঘিরে হাজারটা কাকের চেঁচামেচি। কান ঝালাপালা করে দিল। তবু কাকের মতো এত সামাজিক পাখি আমি আর দেখিনি। ওদের একজনের কিছু হলে সবাই দল বেঁধে দুঃখ জানাতে আসে। মানুষের মধ্যে কাকের এই ভালটুকুও নেই।

ট্রামের কোনো শব্দ পাচ্ছি না। বললাম—তাই নাকি ?

এই 'তাই নাকি' কথাটা এত দেরী করে বললাম যে প্রভাসরঞ্জন একটু অবাক হয়ে বললেন—কিছু বললেন ?

আমি বললাম—কিছু না।

প্রভাসরঞ্জন আমার কাছেই দাঁড়িয়ে রইলেন চুপচাপ। রোদ গরম, সব উপেক্ষা করে। আজকাল প্রায়ই পুরুষেরা আমার প্রেমে পড়ে যায়। এঁর সম্পর্কেও আমার সেই ভয় হচ্ছে। বেচারা।

একটু ভদ্রতা করে প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে বললাম—লন্ড্রীওয়ালা কি আপনার চেনা?

—না তো! বলে ফের বিস্ময় দেখালেন উনি।

আমি বলি—আপনার কথায় লোকটা তাহলে ম্যাজিকের মতো পাল্টে গেল কেন?

—ওঃ! সেও এক মজা। ওর দোকানে আমিও কাচাতে-টাচাতে দিই, সেই সুবাদে একটু চেনা। একবার একটি প্যান্টের পকেটে ভুলে আমার পাসপোর্টটা চলে গিয়েছিল। সেইটে দেখে ও হঠাৎ আমাকে সমীহ করতে শুরু করে।

—পাসপোর্ট! আপনি বিদেশে ছিলেন নাকি?

—এখনো কি নেই? গোটা পৃথিবীটাই আমার বিদেশ।

ট্রাম কেন এখনো আসছে না এই ভেবে আমি কিছু অস্থির হয়ে পড়লাম। কারণ, আমার মনে হচ্ছিল, এ লোকটা পাগল। এর সঙ্গে আমি এক বাড়িতে থাকি ভাবতেও খুব স্বস্তি পাচ্ছিলাম না।

প্রভাসরঞ্জন হাতের মস্ত ঘড়িটা দেখে কিছু উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন —আপনার ট্রাম তো এখনো এল না। অফিস ক'টায়?

আমি বললাম—দশটায়। তবে দশ পনেরো মিনিট দেরি করলে কিছু হবে না।

ব্যথিত হয়ে প্রভাসরঞ্জন বললো—ওটা ঠিক নয়। দশ পনেরো মিনিট দেরি যে কী ভীষণ হতে পারে।

আমি হেসে বললাম—কী আর হবে! সকলেরই একটু দেরি হয়। ট্রাম বাসে সময়মতো ওঠাও তো মুশকিল।

—হুঃ! প্রভাসরঞ্জন বললেন,—তার মানে কোথাও কেউ একজন দেরি করছে, সেই থেকেই দেরিটা সকলের মধ্যে চারিয়ে যাচ্ছে। ধরুন একজন স্টার্টার বাস ছাড়তে দেরি করল, ড্রাইভারও একটা পান খেতে গিয়ে দু মিনিট পিছোলো, বাস দেরি করে ছাড়ল, সেই বাস ভর্তি অফিসের লোকেরও হয়ে গেল দেরি। এই রকম

আর কি। একজনের দেরি দেখেই অন্যেরা দেরি করা শিখে নেয়।

আমি হাসছিলাম।

উনি বললেন—কি করে অবস্থাটা পাল্টে দেওয়া যায় বলুন তো!

—পাল্টানো যায় না। ঐ বুঝি আমার ট্রাম এল—

—হ্যাঁ। কিন্তু খুব ভিড়, উঠতে পারবেন না।

ভিড় ঠিকই। ট্রাম বাসের একটু দেরি হলেই প্রচণ্ড ভিড় হয়। তবে আমার অভ্যাস আছে।

—চলি। বলেই ট্রামের দিকে এগোই।

প্রভাসরঞ্জন হঠাৎ আমার পিছন থেকে অনুচ্চ স্বরে বললেন—সেদিন দুপুরে কে একটা লোক আপনার ঘরে ঢুকেছিল বলুন তো, আপনার স্বামী?

কথাটা শুনে আমি আর ঘাড় ফেরালাম না; শুনিনি ভান করে ভিড়ের ট্রামে ধাক্কাধাক্কি করে উঠে গেলাম ঠিক।

আমার কোনোদিনই তেমন ঘাম হয় না, ইসিনোফিলিয়া আছে বলে প্রায় সময়ই বরং আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে হঠাৎ হঠাৎ শীত করে ওঠে। কিন্তু আজ আমি অবিরল ঘামছিলাম। সারাদিন বড় বেশী অন্যমনস্কও রইলাম আমি। মনে হচ্ছে, লন্ড্রীতে ওই লোকটার আসা, গায়ে পড়ে উপকার করা আর তার পরের এত সব সংলাপ এ সবই আগে থেকে প্ল্যান করে করা। এতদিন আমার জীবনটা যত নিরাপদ আর নির্বিঘ্ন ছিল এখন যে আর ততটা নয় তা বুঝতে পেরে মনটা খারাপ হয়ে গেল। এরা বা এই লোকটা অন্তত আমার বিয়ের খবর রাখে।

সাত দিন কেটে গেছে, প্রভাসরঞ্জনের সঙ্গে দেখা হয়নি। তবে সিঁড়ি দিয়ে ওঠবার সময় বা নামবার মুখে পাঁচুবাবুর বাইরের ঘর থেকে খুব টাইপ রাইটারের আওয়াজ পাই। দরজা ভেজানো থাকে, কাউকে দেখা যায় না। আমিও তো আবার সিঁড়ির গোড়ায় বেশীক্ষণ থাকি না। বরং ভূতের ভয়ে কোনো জায়গা দিয়ে যেতে যেমন গা ছম্‌ছম্‌ করে, তেমনি একটা ভাব টের পাই। তাই সিঁড়ির মুখটা খুব হালকা দ্রুত পায়ে পেরিয়ে পক্ষিণীর মতো উড়ে যাই।

আমি খুব সাবধান হয়ে গেছি আজকাল। বাইরের দরজাটায় সব সময় ল্যাচ্‌কীতে চাবি দিয়ে রাখি। স্পাই হোল দিয়ে না দেখে আর নাম ধাম জিজ্ঞেস না করে বড় একটা দরজা খুলি না। অবশ্য আমার ঘরে আসবেই বা কে? শুধু কি আসে।

একদিন আমার দাদা অভিজিৎ এল। সে বরাবর রোগা দুর্বল যুবক, শীত গ্রীষ্মে গলায় একটা সুতির কম্ফর্টার থাকবেই। ঠাণ্ডা জলে স্নান করতে পারে না, সারাবছর তার সর্দি থাকে। ডাক্তার বলেছে এ রোগ সারার নয়।

সকালবেলায় দাদা এসে ঘরে পা দিয়েই ঝগড়া শুরু করল—এ তুই শুরু করেছিস কি বল তো! আমাদের পরিবারটা মর্ডান বটে কিন্তু তুই যে সব লিমিট ছাড়িয়ে গেলি!

রাগ করে বললাম—ও কথা বলছিস কেন? একা থাকি বলে যত খারাপ সন্দেহ, না?

—বটেই তো। জয়দেবের সঙ্গে না থাকিস আমরা তো রয়েছি। এ দেশের সমাজে একা থাকে কোন মেয়ে?

—আমি থাকব।

—না, থাকবি না। তোর ঝাটি-পাটি যা আছে গুছিয়ে নে, আমি ট্যাক্সি ডাকি।

নিজের বাড়ির কোনো লোককেই আজকাল আমার সহ্য হয় না। ওরা আমাকে স্বাভাবিক জীবন গ্রহণ করতে শেখায়নি। সেটা আজকাল আমি বড় টের পাই। চারিদিকে যখন স্বামী-স্ত্রীর বসবাস দেখি তখনই আমার মনে হয়, আমারই যেন কি একটা ছিল না, হয়তো সইবার শক্তি বহনের ক্ষমতা, যা না থাকলে বিবাহিত জীবন বলে কিছু হয় না।

আমি দাদার জন্য চা করতে গিয়ে মনটাকে শক্ত করলাম খুব।

ফিরে এসে বললাম—জয়দেব বা আর কারো সঙ্গে আমি থাকবো না।

—জয়দেবেরই বা দোষটা কি?,

—যাই হোক। সব কি তোকে বলতে হবে নাকি?

কথায় কথায় ঝগড়া লেগে গেল। দাদা খুব জোরে চেঁচিয়ে কথা বলছিল। এই সময় ফোনটা আবার বাজল। দৌড়ে গিয়ে

রিসিভার কানে তুলতেই সেই ধীর গম্ভীর গলা বলল—আপনার ঘরে লোকটা কে?

আমি ঈষৎ ব্যঙ্গের সুরে বললাম—আসুন না প্রভাসবাবু একটু হেল্প করবেন। এ লোকটা আমার দাদা, বাসায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছে।

টেলিফোনে গলাটা শুনেই আজ আমি লোকটাকে চিনে ফেলেছি। কথা কটা বলার সঙ্গে সঙ্গেই ওপাশে হাসি শোনা গেল। প্রভাসরঞ্জন বললেন—বড্ড মুশকিল হল দেখছি। চিনে ফেললেন! দাদা কি বলছেন?

—ফিরে যেতে।

—তাই যান না।

—আমি যাবো না।

—জয়দেববাবুর তো কোনো দোষ নেই।

—আপনি সেটা জানলেন কি করে?

—খোঁজ নিয়েছি! ইন ফ্যাক্ট আমি জয়দেববাবুর সঙ্গে দেখাও করেছি ক'দিন আগে।

—মিথ্যে কথা।

—না, মিথ্যে নয়। আমি এখন একটা ডেইলী নিউজ পেপারের স্পেশাল রিপোর্টার। মধু মল্লিক যে কাগজে কাজ করেন।

—তাতে কি?

—সেই কাগজের তরফ থেকে স্মল স্কেল আর কটেজ ইন্ডাস্ট্রির একটা সারভে করেছিলাম। জয়দেববাবু ইন্টারভিউ দিয়েছিলেন। খুব পন্ডিত লোক।

—আমার কথা উঠল কি করে?

—উঠে পড়ল কথায় কথায়।

দাদা এসে এ ঘরে দাঁড়িয়ে হাঁ করে ফোনের কথা শুনছে! একবার চোখের ইশারা করে জিজ্ঞেস করল—কে?

আমি হাত তুলে ওকে চুপ থাকতে ইঙ্গিত করে ফোনে বললাম না, আপনিই আমার কথা তুলেছিলেন।

—তাই না হয় হল, ক্ষতি কি?

—ক্ষতি অনেক। তার আগে বলুন, আপনার এ ব্যাপারে এত ইন্টারেস্ট কেন?

প্রভাসরঞ্জন কিছু গাঢ় গলায় ইংরিজিতে বললেন—বিকজ আই হ্যাভ অলসো লস্ট সাম অফ মাই হিউম্যান পজেসনস।

ফোন কেটে গেল।

দাদা বলল—কে রে?

—একজন চেনা লোক।

দাদা গম্ভীর হয়ে বলল—চেনা লোক! বাঃ বেশ। চেনার পরিধি এখন পুরুষ মহলে বাড়ছে তাহলে।

আমি ছোট্ট করে বললাম—বাড়লে তোর কি?

—আমার অনেক কিছু। সে থাকগে, এ লোকটা তোকে কি বলছিল?

আমি হঠাৎ আক্রোশে রাগে প্রায় ফেটে পড়ে বললাম—তোরা কেউ কি আমাকে শান্তিতে থাকতে দিবি না!

দরজার কাছ থেকে প্রভাসরঞ্জন বললেন—শান্তিতে কি এখনই আছেন? যান তো, একটু চা করে এনে খাওয়ান।

আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম লোকটার সাহস দেখে।

প্রভাসরঞ্জন

পাঁচুদাকে দেখেই বুঝি যে লোকটার হয়ে গেছে। ব্যাচেলার মানুষ আত্মীয়স্বজন বলতেও কাছের জন কেউ নেই, মরলে কেউ বুক চাপড়াবে না, অনাথা বা অনাথ হবে না কেউ। সেই একটা সান্ত্বনা। তবু একটা মানুষ ছিল, আর থাকবে না, এটা আমার সহ্য হচ্ছিল না। বলতে কি পাঁচুদার জন্য বেশ দুঃখিত হয়ে পড়েছিলাম।

ব্যাচেলারদের বেশী বয়সে কিছু না কিছু বাতিক হয়ই। সম্ভবত কামের অচরিতার্থতা, নিঃসঙ্গতা ইত্যাদি মিলেমিশে তাদের বায়ুগ্রস্ত করে তোলে। পাঁচুদারও তাই হয়েছিল। চিরকাল তাঁর দূর সম্পর্কের যত আত্মীয়স্বজন তাঁর কাছ থেকে পয়সাকড়ি বা জিনিসপত্র হাতিয়েছে। ভণ্ড সাধু সন্ন্যাসী জ্যোতিষেরাও কাজ

গুছিয়েছে কম নয়। পাঁচুদা কয়েকবারই জোচ্চোরদের পাল্লায় পড়ে ব্যবসাতে নেমে ঠকে এসেছেন। তাঁর বাপের কিছু টাকাও তিনি পেয়েছিলেন, চাকরির বেতন তো ছিলই, সব মিলেই বেশ শাঁসালো খদ্দের। লোকে ঠকাবে না কেন? প্রতি বছর মাসখানেক ধরে তীর্থ ভ্রমণ করতেন। ভারতবর্ষের এমন জায়গা নেই যেখানে যাননি। শেষ বয়সটায় বেশ কষ্ট পেলেন।

আমার মধ্যে একটা পাপবোধ ছিল। আমাদের ছেলেবেলায় যখন প্রচণ্ড অভাবের সময় চলছিল তখন এই পাঁচুদা বেশ কয়েকবার আমাদের অনাহার থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন। সেই থেকেই তাঁর প্রতি আমাদের একটা মতলববাজ মনোভাব জন্মায়। পাঁচুদা মানেই হচ্ছে আদায়ের জায়গা। তাই পাঁচুদা আমাদের বাড়িতে এলেই আমরা খুশী হতাম, যখন তখন তাঁর বাসা বা অফিসে গিয়ে নানা কাঁদুনি গেয়ে পয়সা আদায় করেছি। আমার স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার ফী তিনিই দেন। আর, আমি তাঁর একটা সোনার বোতাম চুরি করেছিলাম।

এ সব কথা তাঁকে আর বলার মানে হয় না। তবু যখন শ্যামবাজারের আয়ুর্বেদীয় হাসপাতালে তাঁকে দেখতে গিয়ে এক কঙ্কালসার চেহারাকে দেখি তখনই সেইসব পাপের কথা মনের মধ্যে জেগে ওঠে। নিজেকেই বলি—প্রভাসরঞ্জন, পাপের কথা স্বীকার করে নাও, খৃস্টানরা যেমন যাজকদের কাছে করে।

আমার কথা শুনে পাঁচুদা হেসে বললেন—যা যা জ্যাঠা ছেলে, চুরি করেছিস বেশ করেছিস। সেই চুরির বোতাম আজ তোকে দান করে দিলাম, যা।

ক্যানসারের কষ্ট তো কম নয়। শরীর শুষে ছিবড়ে করে ফেলেছে প্রতিনিয়ত। কিছু খেতে পারেন না। যা খান তা উঠে আসে ভেতর থেকে। ক্রমশ শরীর ছেড়ে যাচ্ছে তাঁর সব শক্তি। এখন কঙ্কালসার হাতখানা তুলতেও তাঁর বড় কষ্ট। মাঝে মাঝে দেখি বুকের কম্বলটা টেনে মুখ ঢাকা দিয়ে কাঁদেন। সে কান্নাও অতি ক্ষীণ। যেমন পাঁজরের খাঁচা থেকে এক বন্দী ভোমরার গুঞ্জনধ্বনি উঠে আসে।

পত্রিকা অফিস থেকে আজকাল প্রায়ই নানা জায়গায় পাঠায়।

আর দু এক মাসের মধ্যেই আমাকে পাকা চাকরিতে নেওয়া হবে। সাংবাদিকের এই চাকরি আমার খুব খারাপ লাগছে না। কিন্তু সব সময়ে একটা এই দুঃখ, আমি নানা দেশ ঘুরে যে প্রযুক্তি শিখেছি তা কোনো কাজে লাগল না। জীবনের দশ দশটা বছর আমি বৃথা অন্বেষণে কাটিয়ে এসেছি। আয়ুক্ষয়।

সুইজারল্যান্ডে আমাদের কারখানা দেখতে সেবার এক জাপানী প্রতিনিধি দল এল। বেঁটে বেঁটে চেহারার হাস্যমুখ, বুদ্ধির আলোজ্বলা ছোটো ছোটো চোখের মানুষ। প্রত্যেকেই বড় বড় ইঞ্জিনীয়ার তাদের দেশে। কারখানা দেখার অনুমতি চাইল। ওপরওয়ালা আমাকে এবং আরো কয়েকজনকে ডেকে ওদের কারখানা দেখাতে বলে দিলেন। অনুমতি পেয়ে জাপানীদের চেহারা ধাঁ করে পাল্টে গেল। পরনের স্যুট খুলে ওভারঅল পরে নিল সবাই, খাতা-পেনসিল-পেন-কম্পাস সাজিয়ে নিল। তারপর প্রতিটি যন্ত্র আর যন্ত্রাংশের মধ্যে ওরা কালি ঝুলি মেখে ঢুকে যেতে লাগল। ভাল করে লাঞ্চ পর্যন্ত করল না। ভূতের মতো শুয়ে বসে দাঁড়িয়ে যন্ত্রের সমস্ত রহস্য জেনে নিতে লাগল। পর পর সাত দিন এক নাগাড়ে তারা কারখানাটিকে জরীপ করতে লাগল। শেষ দিকে ওদের চলাফেরা যন্ত্রের ব্যবহার এবং কথাবার্তায় হঠাৎ বুঝতে পারলাম, আমি এ কারখানায় এতকাল থেকেও যে সব রহস্য জানি না ওরা অল্প দিনেই তা সব জেনে গেছে।

জাপানীরা দেশে ফিরে যাওয়ার দু বছরের মধ্যে জাপান থেকেই বিশ্বের বাজারে কম্প্রেসর মেশিন ছাড়া হল। সুইস কম্প্রেসরের চেয়ে তা কোনো অংশে খারাপ তো নয়ই, বরং দামে অনেক সস্তা। এমন কি ওরা সুইস যন্ত্রের নকল করেছে বলেও মনে করবার কারণ নেই। যন্ত্রের মৌল রহস্যটা জেনে গিয়ে ওরা ওদের মতো যন্ত্র বানিয়েছে।

এ ঘটনার বছর খানেকের মধ্যেই একটি ভারতীয় প্রযুক্তিবিদের দল সুইজারল্যান্ডে যায়। ব্যাল-এ এসে তারা আমাদের কারখানাতেও হানা দিয়েছিল। স্মিড সাহেব আমাকে ডেকে বললেন—তোমার দেশের লোকদের তুমিই এসকর্ট করে নিয়ে কারখানা দেখাও।

ভারতের লোক এসেছে শুনে আমি খুবই উৎসাহ বোধ করি। দলে একজন বাঙালিও ছিলেন, আমি তাঁর সঙ্গে বাংলায় কথা বলতে তিনি একটু অবাক হলেন। কিন্তু তিনি দেশে খুব বড় চাকরি করেন, আর আমি এ কারখানার একজন স্কিল্‌ড লেবারার মাত্র। তাই তিনি আমার সঙ্গে বিশেষ মাখামাখি করলেন না, একটু আল্‌গো আল্‌গো ভালবাসা দেখালেন।

মোট ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যে তাঁরা অত বড় কারখানাটার হাজারো যন্ত্রপাতি দেখে ফেললেন। যাই দেখাই তাই দেখেই বলেন—ওঃ, ভেরি গুড। হাউ নাইস। ইজ ইট। যন্ত্রপাতি তাঁরা ছুঁয়েও দেখলেন না। তারপর ম্যানেজারের ঘরে বসে কফি খেয়ে চলে গেলেন। পরে স্মিড সাহেব আমাকে ডেকে বললেন—তোমার দেশের লোকেরা এত অল্প সময়ে এতবড় প্রোজেক্টের সব বুঝে ফেলল?

তখন আমি ঠিক করেছিলাম এরা যা করেনি তা আমাকেই করতে হবে। তারপর কিছুদিন আমি একা একা পুরো যন্ত্রপাতির নকশা কপি করতে শুরু করি। এমনিতেই ভূতের মত খাটুনি ছিল, তার ওপর বাড়তি খাটুনি যোগ হল। হয়তো পেরেও যেতাম। কিন্তু ঠিক সেই সময় বিয়ে ভেঙে যাওয়ায় আমার ভিতরকার সব উৎসাহ নিভে যায়। তবু যা শিখেছিলাম, যা কপি করেছিলাম তাও বড় কম নয়। যে কোনো ইঞ্জিনীয়ারের চেয়ে আমার প্রযুক্তির ধারণা অনেক প্রাঞ্জল এবং বাস্তব। আমি হাতে-কলমে যন্ত্র চালিয়েছি। যন্ত্রের সব চরিত্রই আমার জানা। এখনো ভারী কম্প্রেসর মেশিনের যে কোনো কারখানায় আমার অভিজ্ঞতা অসম্ভব রকমের কার্যকরী হতে পারে।

কিন্তু তা হল না। আমি এখন নানা চটুল বা রাশভারী বিষয় নিয়ে খবরের কাগজে ফিচার লিখছি। লিখতে আমার খারাপ লাগে না ঠিকই, কিন্তু সব সময়েই আমার অধীত বিদ্যার অপচয়ের জন্য কষ্ট হয়। যা কষ্ট করে শিখে এসেছি তা এ দেশে কাজে লাগল না। অবশ্য আমি এখানকার কলকারখানায় চাকরি করতে আর উৎসাহীও নই। আমি চেয়েছিলাম নিজেই একটি কারখানা প্রতিষ্ঠা করব।

এখন টাইপ রাইটারের খটখটানির মধ্যে এক রকমের নতুন জীবনের খবর পেয়ে যাচ্ছি। মধু মল্লিক এসে প্রায়ই খবর দেন, আমার ফিচারগুলো কাজের হচ্ছে।

মধু মল্লিক একদিন এসে বললেন—কস্ট অফ প্রোডাকশন কমিয়ে আনার ব্যাপারে আপনার ফিচারটা সাঙ্ঘাতিক হয়েছে। কিন্তু প্রভাসবাবু, আমাদের সবচেয়ে বেশী দরকার কটেজ আর স্মল স্কেল। শুধু হেভী ইন্ডাস্ট্রি দিয়ে এদেশের ইনকাম স্টেবলু করা যাবে না। আপনি কি এ কথা মানেন?

আমি মানি। মধু মল্লিকও মানেন দেখে খুব খুশী হলাম। বললাম—কটেজ বা স্মল স্কেল না থাকলে দেশের প্রাণ নষ্ট হয়ে যায়। এ আমি স্বীকার করি তা ছাড়া এদেশে লক্ষ লক্ষ লোক ঐ সব নিয়ে আছে। কৃষিভিত্তিক সমাজকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে ওটার খুবই দরকার।

—লিখুন না এবার স্মল আর কটেজ নিয়ে। মধু মল্লিক বললেন। কাজ সহজ নয় তবে আমার অফিস থেকে প্রচুর সাহায্য করা হল এ ব্যাপারে! কুটিরে এবং ছোট ছোট শিল্পের ওপর পত্রিকা চারটে সিরিয়াল ছাপাবে। আমাকে সে জন্য গোটা পশ্চিমবাংলার গাঁয়ে গঞ্জে চলে যেতে হল। সরকারী লোকদের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে দেখা সাক্ষাৎও করতে হল মেলা।

এই করতে গিয়েই জয়দেবের সঙ্গে দেখা বাঁকুড়ায়। ভারী দুঃখী চেহারার লোক এবং খুবই ভালমানুষ! ডক্টরেট হয়েছেন সম্প্রতি, জানেনও বিস্তর। একখানা নতুন বই লিখেছেন ফোক আর্ট সম্পর্কে। কথায় কথায় বিয়ের কথা উঠতে আমি বলেছিলাম—আমার বৌ-ছেলে সব পর হয়ে গেছে। সেই ভ্যাকুয়ামটা পূর্ণ করতে এখন আমার অনেক কাজ চাই। নইলে একা হলেই ভূতে পায়।

জয়দেব আমার হাত চেপে ধরে বললেন—আমার কেসও আপনার মতো। আমার ছেলেপুলে নেই, কিন্তু বৌ ছিল। প্রায় বিনা কারণে সে আমাকে ছেড়ে গেছে।

যোগাযোগটা খুবই অদ্ভুত। অলকার স্বামীকে যে এত সহজে দুম করে খুঁজে পাবো কখনো ভাবিনি। পরিচয় বেরিয়ে

পড়তে যখন অলকার খবর দিলাম তখন জয়দেব হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে জিজ্ঞেস করল—ও কি আবার বিয়ে করবে?

—না, না।

—ওকে বলবেন, মেয়েদের দু'বার বিয়ে হতে নেই। সেটা খুব খারাপ। ও আমাকে ছেড়ে যাওয়ায় আমাদের পরিবারে মস্ত ঝড়ের ধাক্কা গেছে। এখনকার ছেলেমেয়েরা তো কখনো সমাজ বা পরিবারের পারস্পেকটিভে দাম্পত্য জীবনের কথা ভাবে না। যদি ভাবতো তাহলে অলকা অত সহজে ছেড়ে যেতে পারত না। অপছন্দের স্বামীকেও মানিয়ে নিত। আর এও তো সত্যি যে, আজকের অপছন্দের লোক কালই প্রিয়জন হয়ে উঠতে পারে, যেমন আজকের প্রিয়জন হয়ে যায় কাল দু'চোখের বিষ!

সত্যি কথা। সহ্য করা বা বহন করা আজকের মানুষের ধাতে নেই। অপছন্দের জিনিস তারা খুব তাড়াতাড়ি বাতিল করে দেয়। নতুন জিনিস নিয়ে আসে। আর এইভাবে তাদের স্বভাব হয়ে উঠেছে পিছল ও বিপজ্জনক।

আমি বললাম—আপনি কি এখনো অলকাকে ভালবাসেন?

কেমন একরকম লোভী শিশুর মতো তাকাল জয়দেব। অনেকক্ষণ বাদে মাথা নেড়ে বলল—তাতে কি যায় আসে! ও তো আমাকে ভালবাসে না!

আমি চিন্তা করে বললাম—দেখুন, ভালবাসাটা সব সময়েই তো আর হুস্ করে মাটি ফুঁড়ে ফোয়ারার মতো বেরোয় না। ওটা একটা প্র্যাকটিসের ব্যাপার। ভালবাসার চেষ্টা থেকেই ভালবাসা আসে।

—সে হতে পারে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সেই চেষ্টারও অভাব রয়েছে। তিলমাত্র মমতা থাকলে তাকে বাড়িয়ে বিরাট ভালবাসা জন্মাতে পারে। কিন্তু যেখানে সেই তিলমাত্রও নেই।

আমি ভাবিত হয়ে পড়ি। এবং ফিরে আসি।

কলকাতায় এসেই একটু ঝামেলায় পড়ে গেলাম।

একদিন অনেক রাত অবধি টাইপ মেশিন চালিয়ে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়েছি। ভোর রাতে ঘুম ভাঙাল সুহাস।

দরজা খুলে তাকে দেখে খুব খুশী হই না, বললাম—কি রে, কি চাস?

—মার খুব অসুখ। এখন-তখন। কি করব?

শরীরে একটা ধনুকের টংকার বেজে উঠল। মা!

কথা আসছিল না মুখে। অবশ হয়ে চেয়েছিলাম, সুহাস বলল—কিছু টাকা দাও।

—টাকা দেবো? অবাক হয়ে বলি—টাকা দেবো সেটা বড় কথা কি! আগে গিয়ে মাকে একটু দেখি! তুই ট্যাক্সি ডাক্ তো—

বলে আমি ঘরে গিয়ে জামাকাপড় পরছিলাম। সুহাস ট্যাক্সি আনতে যায়নি, দরজার কাছে দোনো মোনো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চোখে পড়তে বলল—তুমি বিশ্রাম নাও না। এক্ষুনি যাওয়ার দরকার নেই খুব একটা। অবস্থা যতটা খারাপ হয়েছিল ততটা এখন নয়। তুমি দু'চারদিন পরে যেও।

ওর কথা বুঝতে পারছিলাম না একদম। কি আবোল-তাবোল বলছে? এই বলল খারাপ অবস্থা, আবার বলছে তত খারাপ নন। কেমন একটু সন্দেহ হল মনে। বললাম—তোর মুখে সত্যি কথা-টথা আসে তো ঠিক?

—বাঃ, মিথ্যে বলছি নাকি?

—মার অসুখ, তা আমাকে যেতে বারণ করছিস কেন?

—তোমার অসুবিধের কথা ভেবেই বলেছি। যাবে তো চলো।

—ট্যাক্সি ডেকে নিয়ে আয়, আমি যাবো।

দমদমের বাসার কাছে এসে যখন ট্যাক্সির ভাড়া মেটাচ্ছি তখন সুহাস 'এই একটু আসছি' বলে কোথায় কেটে পড়ল। বাড়িতে ঢুকে দেখি মা পিছনের বারান্দায় বসে কুলোয় রেশনের চাল বাছছে।

আমি গিয়ে মার কাছে বসতেই মা কুলো ফেলে আমাকে দুহাতে আঁকড়ে ধরে বলল—ওরা বলে তুই নাকি খুব খারাপ হয়ে গেছিস্! কোন এক বিধবা না সধবার সঙ্গে নাকি তোর বিয়ে সব ঠিক?

আমি স্তম্ভিত হয়ে মাকে দেখি। অনেকক্ষণ বাদে বলি—তোমার কি হয়েছে? শুনলাম তোমার খুব অসুখ।

—হলে বাঁচি বাবা। সে অসুখ যেন আর ভাল না হয়। কিন্তু গতরে তো অসুখও একটা ধরে না তেমন।

—সুহাস আজ সকালে গিয়ে তোমার অসুখের নাম করে টাকা চেয়েছিল।

মা হাঁ করে একটু চেয়ে থেকে বলে—ওর অবস্থা খুব খারাপ বাবা, নুন আসতে পান্তা ফুরোয়। তাই বোধহয় একটি ফিকির করেছিল।

রান্নাঘর থেকে নিমি খুব হাসিমুখে এককাপ চা নিয়ে বেরিয়ে এসে বলল—দাদাকে কতদিন বাদে দেখলাম! খুব ব্যস্ত শুনি!

আমি গম্ভীর হয়ে বলি—সুহাস কোথায় গেল বৌমা?

—এসে পড়বে এক্ষুণি। বসুন না।

আমি মাথা নেড়ে বললাম—ও আসবে না, আমি জানি। বৌমা তুমি মার কাপড়-চোপড় যা আছে গুছিয়ে দাও। আমি মাকে নিয়ে যাবো।

মা শুনে কেমন ধারা হয়ে গিয়ে বলল—সে কি কথা বলিস! এখন আমি কোথায় যাবো?

আমি চড়া গলায় বললাম—যেতেই হবে। এখানে তোমার গুণের ছেলে তোমাকে ভাঙিয়ে ব্যবসা শুরু করতে চলেছে যে! কত বড় সাহস দেখেছো!

অমনি নিমি ঘর থেকে তেড়ে এসে বলল—বেশী বড় বড় কথা বলবেন না বলে দিচ্ছি। আপনার কীর্তিও অনেক জানি!

দুচার কথায় প্রচণ্ড ঝগড়া লেগে গেল। পাড়ার লোক এসে জুটতে লাগল চারদিকে।

আমি মাকে বললাম—মা, তোমাকে যেতেই হবে। এ নরকে আর নয়।

বোধহয় আমাকে ঝঞ্ঝাট থেকে বাঁচাতেই মা উঠে গিয়ে একটা টিনের তোরঙ্গ গুছিয়ে নিল। আমি মাকে নিয়ে চলে এলাম।

কয়েকদিন মন্দ গেল না। মা রান্না-বান্না করে, আমি কাজে যাই। মধু মল্লিকের সবাই মার দেখাশুনা করে। এমন কি অলকা পর্যন্ত খোঁজ-খবর নিয়ে যায়। কিন্তু এতসব ভদ্রলোক এবং লেখা-পড়া জানা পরিবেশে থাকা মার অভ্যাস নেই। সব সময় তটস্থ

ভাব, মাকে নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় অবশ্য আমার ছিল না, দিনরাত ঘুরি, রাত জেগে ফিচার টাইপ করি।

দিন পনেরো পরে মা একদিন মিনমিন করে বলল—প্রভাস, একবার বরং দমদম থেকে ঘুরে আসি।

গম্ভীর হয়ে বলি—কেন ?

মা ভয় খেয়ে বলে—সুহাস আর নিমি যেমনই হোক ওদের ছেলে-মেয়েগুলো আমাকে ছাড়া থাকতে পারে না।

আমি বললাম—মা, সুহাস আর নিমি তোমার ওপর কেমন নির্যাতন করে বল তো! মারে না কি ?

মা শ্বাস ফেলে বলে—অমানুষের সব দোষ থাকে বাবা। মাকে মারবে সে আর বেশী কথা কি ?

—তবু যেতে চাও ?

—ওদের কাছে যেতে চাইছি নাকি! ঐ যে ছেলেমেয়েগুলো, ওরা যে মাটিতে গড়াগড়ি খেয়ে আমার জন্য কাঁদে।

—কাঁদবে না, অভ্যাস হয়ে যাবে।

মা অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল—তুই একটা বিয়ে কর। তখন এসে পাকাপাকিভাবে তোর কাছে থাকব।

আমি বললাম—বাবার কাছে যাবে মা ? চাও তো বন্দোবস্ত করে দিই!

—যাবো বই কি! যাবোখন। শীতটা আসুক।

বুঝলাম এ জন্মের মতো সুহাসের হাত থেকে মার মুক্তি নেই। সুহাস যেমনই হোক, তার বংশধরেরা মার রক্তের স্রোত নিজের দিকে টেনে নিয়েছে ? আর ফেরানো যাবে না।

মাকে একদিন ফের গিয়ে দমদমের বাড়িতে রেখে এলাম।

এই ঝামেলায় আর জয়দেবের কথা তেমন মনে ছিল না, কাজের চাপও ক্রমশঃ বাড়ছে।

হঠাৎ একদিন সাত সকালে জয়দেব নিজেই এসে হাজির।

মেঘেমেঘে দুরন্বরম। কাল রাত থেকে বৃষ্টি ছাড়েনি। যেমন ভয়ংকর তেজে কাল রাত ন'টায় বৃষ্টি এল প্রায় ঠিক তেমনি তেজে সারা রাত ধরে বৃষ্টি পড়লো। ঘুমের মধ্যেই মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিল, কলকাতা ভেসে যাবে।

একটা গোটা ফ্ল্যাটে সম্পূর্ণ একা থাকতে আমার যে ভয় ভয় করে তা মিথ্যে নয়। শোয়ার আগে বার বার দরজা জানালার ছিটকিনি দেখি, খাটের তলা, আলমারির পেছনে এবং আর যে সব জায়গায় চোর বদমাশ লুকিয়ে থাকতে পারে তা ভাল করে না দেখে শুই না। ভূতের ভয় ছেলেবেলা থেকেই ছিল না, তবে. বড় হওয়ার পর কখনো কখনো কি যেন একটা ভূত ভূত ভয়ের ভাব হয়। বিশেষ করে যেদিন বৃষ্টি নামে। কাল সারা রাতের অঝোর বৃষ্টিতে বার বার জানালার শার্শিতে টোকা পড়েছে বৃষ্টির আঙুলে, দরজা ঠেলেছে উন্মত্ত বাতাস। ঝোড়ো বৃষ্টিতে কলকাতার ট্রামবাস ডুবে গেল বুঝি! শহরটা বোধহয় একতলা সমান জলের তলায় নিস্তব্ধ হয়ে গেল। এমন বাদলা বহুকাল দেখিনি।

ঘুম ভেঙে একবার উঠে দেখি রাত দুটো। শীত-শীত করছিল। বাথরুমে গিয়ে হঠাৎ কেন গা ছমছম করল। একটু শিউরে উঠে প্রায় দৌড়ে এসে বাতি না নিভিয়ে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লাম। বাতি জ্বালানো থাকায় ভয় ভয় ভাবটা কমল বটে, কিন্তু ঘুম আসে না। কোনোখানে মানুষের জেগে থাকার কোনো শব্দ হচ্ছে না। কুকুরের ডাক, বেড়ালের আওয়াজ কিছু নেই। ঘনঘোর মেঘ ডেকে ওঠে কেবল, বৃষ্টির জোর বেড়ে যায়, চারিদিক লণ্ডভণ্ড হতে থাকে। শুয়ে থেকে বুঝতে পারছিলাম, পৃথিবীতে একা হওয়ার মধ্যে কোনো সুখ নেই। একা মানুষ বড় নিস্তেজ, মিয়োনো।

নরম বালিশ বার বার মাথার তাপে গরম হয়ে যাচ্ছে। আমি

বালিশ উল্টে দিচ্ছি বার বার। বর্ষাকালের সোঁদা সোঁদা এক গন্ধ উঠছে বিছানা থেকে। কিছুতেই রাত কাটছে না।

এইভাবে রাত আড়াইটেয় বড় অসহ্য হয়ে উঠে বসলাম। বুকের ভিতরটা ফাঁকা লাগছে। আমার ভীষণ ইচ্ছে করছিল কারো সঙ্গে একটু কথা বলতে, কারো কথা শুনতে। কিন্তু আমার তো তেমন কেউ নেই।

জানালার ধারে এসে দাঁড়ালাম। ব্যালকনির দিকে জানালায় শার্শির পাল্লা আছে, অন্যগুলোয় কাঠের পাল্লা। শার্শিতে চোখ রেখে দেখি ভূতের দেশের মতো অন্ধকার চারদিক। নিচের রাস্তায় পর পর আলোগুলোর মধ্যে দুটো মাত্র জ্বলছে এখনো। সেই আলোয় দেখা গেল, রাস্তায় হাঁটুজল। জলে প্রবল বৃষ্টির টগবগানী। আকাশ একবার দুবার চমকায়, গম্ভীর মেঘধ্বনি হয়। বড় একা লাগে।

আমার পরনে নিতান্তই সংক্ষিপ্ত পোশাক। গায়ে কেবল ব্লাউজ, পরনে সায়া। রাতে এত বেশী গায়ে রাখতে পারি না। ঘরের বাতি জ্বালা রেখে এ পোশাকে জানালায় দাঁড়ানো বিপজ্জনক। কিন্তু ঐ নিশুত রাতে কে আর দেখবে। আর মনটাও বড় অস্থির তখন। ঠান্ডা শার্শিতে গাল চেপে ধরে বিবশার মতো বাইরে তাকিয়ে থেকে থেকে আস্তে আস্তে জগৎ-সংসারের ওপর এক গভীর অভিমান জেগে উঠল। কেবল মনে হতে লাগল—তোমাদের কাছে আমার আদর পাওনা ছিল। কেন তোমরা কেউ কখনো আমাকে ভালবাসলে না? বলো কেন··· ?

কখন কেঁদেছি আপনভোলা হয়ে। কাঁদছি আর কাঁদছি। আর কাকে উদ্দেশ্য করে যেন বিড়বিড় করে বলছি—এবার একদিন বিষ খেয়ে মরব, দেখো।

এ কথা বিশেষ কারো উদ্দেশ্যে বলা নয়। কাকে উদ্দেশ্য করে বলা তা সঠিক আমিও জানি না। তবে এই প্রচন্ড বৃষ্টির রাতে যখন চারদিকের সব নাগরিকতা মুছে গিয়ে অভ্যন্তরের বন্যতা বেরিয়ে আসে, যখন মনে হয় এইসব ঝড় বৃষ্টির মতো কোনো অঘটনের ভিতর দিয়ে আমাকে সৃষ্টি করেছিল কেউ, তখন আর কাউকে নয় কেবল এই জন্মের ওপরেই বড় অভিমান হয়।

একা, বড় একা।

শার্শির কাছ থেকে ঘরের মধ্যে ফিরে আসি। সাজানো ঘর-দোর ফেলে অসীমদা কোন বিদেশে চলে গেছে তার পরিবার নিয়ে। হয়তো ফিরবে, হয়তো কোনোদিনই ফিরবে না। এই যে আলমারি, খাটপালঙ্ক, রেডিওগ্রাম, নষ্ট ফ্রিজ, টেলিফোন, এরা কারো অপেক্ষায় নেই, এরা কারো নয়। তবু মানুষ কত যত্নে এইসব জমিয়ে তোলে। কান্না পাচ্ছিল। টেলিফোনের সামনে বসে বিড় বিড় করে বললাম—কোনো মানুষকে জাগানো দরকার, আমাকে ভূতে পেয়েছে আজ রাতে, আমার মরে যেতে ইচ্ছে করছে, আমি বড় একা।

টেলিফোন তুলে ডায়াল করতে থাকি। কোন বিশেষ নম্বর ধরে নয়, এমনি আবোল-তাবোল যে নম্বর মনে আসছে সেই ঘরে আঙুল দিয়ে ডিস্ক ঘুরিয়ে দিচ্ছিলাম।

প্রথমবার অনেকক্ষণ ধরে রিং হল, কেউ ধরল না। আমার ভয় করছিল শেষ পর্যন্ত কেউ কি ফোন ধরবে না।

তৃতীয়বার রিং হতে দু মিনিট বাদে একটি মেয়ের ঘুম-গলা ভেসে এল—

—আমি অলকা।

—অলকা! কোন অলকা? এটা ফোর সিক্স ডবল থ্রি...

আমি বললাম—শুনুন, রং নাম্বার হয়নি, আমি আপনাকে কয়েকটা কথা বলতে চাই!

অবাক, মেয়েটি বলল—কি কথা?

আমি বললাম—আপনার কে কে আছে? স্বামী?

—আমার বিয়ে হয়নি!

—মা! বাবা? ভাই বোন?

—বাবা আছেন। এক ভাই। কিন্তু কি ব্যাপার বলুন তো। এত রাতে এ সব কি প্রশ্ন?

—আমার বড় একা লাগছে। ভয় করছে। আপনার নাম কি?

ওপাশের মেয়েটি অবশ্যই খুব ভাল স্বভাবের মেয়ে। অন্য

কেউ হলে ফোন রেখে দিত। এ কিন্তু জবাব দিল। বলল—আমার নাম মায়া দাস।

—কি করেন?

—কলেজে পড়াই। কিন্তু আমার এখন খুব টায়ার্ড লাগছে। আপনি কে বলুন তো!

—আমি অলকা। আমি একটা ফ্ল্যাটে একা থাকি। আজ রাতে বড় ঝড় বাদল, আমার ভাল লাগছে না।

—সেই জন্য? আমার ফোন নম্বর আপনি জানলেন কি করে?

—জানি না তো! এখনো জানি না। আন্দাজে ছ'টা নম্বর ডায়াল করেছিলাম, নম্বরগুলো মনেও নেই এখন। আপনি রাগ করলেন?

—না, রাগ নয়। আমাকে এখন অনেক খাতা দেখতে হচ্ছে। ভীষণ টায়ার্ড।

—তাহলে ঘুমোন।

—শুনুন, আপনি আমার চেনা কেউ নন, ফোনে মজা করার জন্য পরিচয় গোপন রেখে···

—না না। সে সব নয়। আমি আসলে চাইছি, কিছু লোক আমার মতোই জেগে থাকুক আজকের রাতে। আমার কেবল মনে হচ্ছে আমি ছাড়া সারা কলকাতায় বুঝি আর কেউ জেগে নেই।

ওপাশে বোধহয় মেয়েটির বাবা জেগে গেছেন। এক গম্ভীর পুরুষের স্বর শুনতে পেলাম—কে রে মায়া? কোনো অ্যাকসিডেন্ট নাকি?

মায়া বোধহয় মাউথপিসে হাত চাপা দিল। কিছুক্ষণ সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না। তারপর মায়া বলল—আপনার নাম ঠিকানা কিছু বলবেন।

—কেন?

—বাবা বলছেন, আপনার কোন বিপদ ঘটে থাকলে আমরা হেল্প করার চেষ্টা করতে পারি।

—অসংখ্য ধন্যবাদ। আমার বিপদ কিছু নেই। শুধু ভয় আছে। ঘুম ভাঙালাম বলে কিছু মনে করবেন না।

—আমার বাবা ডি এস পি। কোনো ভয় করবেন না।

ঠিক এই সময়ে মায়ার বাবা ফোন তুলে নিয়ে বললেন—হ্যালো আপনি কোথা থেকে ফোন করছেন?

—পার্ক সার্কাস। খুব অসহায় গলায় বললাম।

—বাড়িতে একা আছেন?

—হ্যাঁ।

—কেন বাড়ির লোকজন কোথায় গেল?

একটু চুপ করে থেকে বললাম—আমি একাই থাকি।

মায়ার বাবা একটু গলা ঝেড়ে বললেন—ও। বয়স কত?

—বেশী নয়। একুশ বাইশ।

—কি করেন?

—একটা প্রাইভেট কোম্পানীতে চাকরি করি।

—ঠিকানাটা বলুন।

একটু দ্বিধায় পড়ে যাই। নার্ভাসও লাগছে খুব। এতটা নাটক না করলেও হত। ঠিকানা দিলে ডি এস পি সাহেব হয়তো থানায় ফোন করে দেবেন, পুলিশ খোঁজ নিতে আসবে। কত কি হতে পারে!

ঝুঁকি না নিয়ে বললাম—কাকাবাবু, মাপ করবেন। অনেক বিরক্ত করেছি।

উনি বললেন—শুনুন, আমার মনে হচ্ছে আপনি কোন বিপদে পড়েছেন, কিন্তু বলতে সংকোচ করছেন। আমি অ্যাকটিভ পুলিশের লোক, নিঃসঙ্কোচে বলতে পারেন। আপনার প্রোটেকশনের ব্যবস্থা করতে পারি।

ওঁর এই সহৃদয়তা আমার ভাল লাগছিল। কিন্তু কি করব, আমার যে পুলিশের কোনো দরকার নেই! এই বৃষ্টি বাদলার রাতে আমি কেবল মানুষের জেগে-থাকার শব্দ শুনতে চেয়েছিলাম মাত্র। হয়তো এটা ভীষণ ছেলেমানুষী। এইভাবে ফোন করে লোককে উদ্বিগ্ন ও বিরক্ত করা ঠিক হয়নি। তবু আর তো কোনো উপায় ছিল না।

ভদ্রলোক বার বার 'হ্যালো, হ্যালো করছেন সাড়া না পেয়ে। আমার কানের পর্দা ফেটে যাওয়ার যোগাড়। আস্তে করে বলতে

হল—না কাকাবাবু, কোনো বিপদ নয়। কেবল ভয়। এখন ভয়টা কেটে গেছে। তারপর ফোনটা নামিয়ে রাখলাম।

বাকি রাতটা আধো-জাগা আধো-ঘুমের মধ্যে কাটিয়ে দিতে দিতে বার বার ডি এস পি ভদ্রলোকের সাহায্য করা, প্রোটেক্ট করার কথাটা মনে পড়ছিল। আমাকে কেউ রক্ষা করুক, ত্রাণ করুক এ আমার অসহ্য। আমি কি অসহায়, অবলা?

ঠিক এই কারণেই প্রভাসরঞ্জনবাবুকে আমি পছন্দ করতে পারি না। যেমন অপছন্দ আমার সুকুমারকে। এমন কি উপরওয়ালার ভূমিকা নেওয়ার একটা অস্পষ্ট চেষ্টা করেছিল বলেই বোধহয় জয়দেবকেও আমি নিতে পারিনি স্বামী হিসেবে। জয়দেবের অবশ্য আরো অনেকগুলো খাঁকতি ছিল।

সকালেও বৃষ্টি ছাড়েনি! এ বৃষ্টিতে ঝি আসবে না জানি। কাজেই সকালে উঠে ঘরদোর সারতে হল নিজেকেই। এক অসম্ভব একটানা প্রবল বৃষ্টি পড়েছে তো পড়ছেই। আমার ফ্ল্যাট থেকে রাস্তার কোনো গাড়ি ঘোড়ার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। তবে, নিচের হাঁটুজলে কিছু গরীব ঘরের ছেলে চেঁচাচ্ছে আর জল খেলছে। কয়েকবার রিকশার ঘণ্টির শব্দ হল। কাদের ঘর থেকে উনুনের ধোঁয়া আসছে ঘরে।

চালে জলে খিচুড়ি চাপিয়ে এক কাপ কফি নিয়ে জানালার ধারে বসি। আকাশের মেঘ পাতলা হয়ে আসছে। বৃষ্টির তেজ এইমাত্র খানিকটা কমে গেল। ধরবে। অফিসে যাওয়াটা কি আজ ঠিক হবে? না গেলেও ভাল লাগে না। একা ঘরে সারাদিন। কি করি?

বেলা নটায় উঠে স্নান সেরে নিলাম। ভেজা চুল আজ আর শুকোবে না। কিন্তু রাতে ঘুম হয়নি, স্নান না করলে সারাদিন ঘুমঘুম ভাব থাকত। কিন্তু স্নান করেই বুঝলাম, হুট করে ঠাণ্ডা লেগে গেল। গলাটা ভার, চোখে জল আসছে, নাকে সুড়সুড়, তালুটা শুকনো-শুকনো। ছাতা হাতে অফিসে বেরোলাম তবু শেষ পর্যন্ত।

সিঁড়ির নিচেই প্রভাসরঞ্জন দাঁড়িয়ে বাইরের রাস্তার জল দেখছিলেন। আমাকে দেখে হেসে বললেন—যাবেন কি করে? যা জল!

—যেতে হবে যেমন করে হোক।

—ট্রাম বাসও পাবেন না। দুটো একটা যা চলছে তাতে অসম্ভব ভিড়। আমি একটু আগে বেরিয়ে দেখে এসেছি।

একটু ইতস্তত করছিলাম। রাস্তায় বেরিয়ে যদি ফিরে আসতে হয় তো যাওয়াও হল না, জল ভেঙে ঠাণ্ডাও লেগে গেল হয়তো।

প্রভাসরঞ্জন বললেন—খুব জরুরী কাজ নাকি?

—জরুরীই। একটা ফাইল ক্যাবিনেটের চাবি আমার কাছে রয়ে গেছে।

—রেনি ডে-তে কি আর অফিসের কাজকর্ম হবে?

—হবে।

এই বলে রাস্তাঘাট একটু দেখে নিয়ে সত্যিই বেরিয়ে পড়ি। রাস্তায় পা দিতে না দিতেই একটা পাতলা মেঘের আস্তরণ কাটিয়ে রোদ দেখা দিল। কি মিষ্টি রোদ! গোড়ালিডুবু জল ভেঙে, শাড়ি সামলে কষ্টে এগোতে থাকি। ঠাণ্ডা জলে পা দিতেই শরীরে একটা শীতের কাঁপুনি দিচ্ছে। দিক। গোটা দুই ট্যাবলেট খেয়ে নেবো। ট্যাবলেট ক্যাপসুলের যুগে অত ভয়ের কিছু নেই।

ভাগ্য ভাল, ডিপোর কাছ বরাবর যেতে না যেতেই লেডীজ স্পেশাল পেয়ে গেলাম।

অফিসে এসেই বেয়ারাকে দিয়েই গোটা দশেক ট্যাবলেট আনিয়ে দুটো খেয়ে ফেললাম। তারপর চা। শরীরটা খারাপই লাগছে। সর্দি হবে।

গামবুট আর বর্ষাতিতে সেজে সুকুমার আজ বেশ দেরিতে অফিসে এল। ও আবার ম্যানেজমেন্টকে বড় একটা তোয়াক্কা করে না। অফিসে ঢুকেই ধরাচুড়া ছেড়ে সোজা আমার টেবিলের মুখোমুখি একটা চেয়ারে বসে বলল—দুটো সিনেমার টিকিট আছে। যাবে? ইংরিজি ছবি।

আমি ওর বিশাল স্বাস্থ্যের চেহারাটা দেখলাম খানিক। এর আগে ওর সঙ্গে কয়েকবারই সিনেমায় গেছি। তখন সঙ্কোচ ছিল না। সেদিন আমার ফ্ল্যাটে সেই কাণ্ড ঘটানোর পর থেকে ও আর বড় একটা কাছে ঘেঁষেনি এতদিন। লজ্জায় লজ্জায় দূরে দূরে থাকত। আজ আবার মুখোমুখি হল।

বললাম—আজ শরীর ভাল নেই।

—কি হয়েছে?

—সর্দি।

—ওতে কিছু হবে না। চলো, ঠেসে মাংস খেয়ে নেবে। মাংস খেলে সর্দি জব্দ হয়ে যায়।

হঠাৎ মুখ ফসকে বলে ফেললাম—আর সুকুমার জব্দ হবে কিসে?

সুকুমার দু পলক আমাকে দেখে নিয়ে অত্যন্ত নির্লজ্জ গলায় বলল—মাংসে। যদি সেই সঙ্গে হৃদয় পাওয়া যায় তো আরো ভাল।

একবার আক্রান্ত হওয়ার পর আমার সাহস কিছু বেড়েছে। বললাম—এত দাবিদাওয়া কিসের বলো তো! বেশ তো আছি। তুমি তোমার মতো, আমি আমার মতো।

—আমি আমার মতো নেই।

এটা অফিস, এসব কথাও বিপদজ্জনক। তাই মুখ নিচু করে বললাম—এ সব কথা থাক সুকুমার।

—থাক। তবে এ সব কথা আবার উঠবে, মনে রেখো।

আমি ওর দিকে চেয়ে একটু হাসলাম। পুরুষেরা অসম্ভব দখলদার এক জাত।

দুটো সিনেমার লাল টিকিট বের করে সুকুমার আমার সামনেই ছিঁড়ল কুচিকুচি করে। আমার টেবিলের ওপর ছেঁড়া টিকিটের টুকরো কাগজ জড়ো করে রেখে বলল—জানতাম তুমি যেতে চাইবে না। কিন্তু আমারও তো একটা সুযোগ দরকার।

অফিসে আজ কাজকর্মের মন্দা। লোকজন বেশী আসেনি। বেশ বেলা করে দু চারজন এসেছে বটে, তবু বড্ড ফাঁকা ঠেকছে অফিস। নিরিবিলিতে বসে কথা বলতে বাধা নেই। সত্যি বলতে কি, আমার কথা বলতে ইচ্ছেও করছিল।

বললাম—সুযোগ মানে কিন্তু দখল করা নয়। আমি কারো সম্পত্তি হতে পারিনি, কোনোদিন পারবও না।

—তাহলে আমাকেই তোমার সম্পত্তি করে নাও না! চিরকাল তোমার হুকুম মতো চললেই তো হল!

হাসলাম। ছেলেমানুষ।

বললাম—ও রকম নেতানো নির্জীব পুরুষও মেয়েদের পছন্দ নয়।

—তাহলে কি হবে?

—কিছু হবে না।

—কিসের বাধা অলকা? তোমার স্বামীর কথা ভাবছো?

মাথা নেড়ে বললাম—না। তবে সেটাও ভাবা উচিত। এখনো তার সঙ্গে আমার ডিভোর্স হয়নি।

—করে নাও।

বড় করে একটা শ্বাস ফেলে বললাম—সে অনেক ঝামেলা, দরকারও দেখি না। কিছুদিন গেলেই সে নিজেই মামলা করবে। আমি কোর্টে যাবো না, এক্সপার্টি হয়ে ওকে ডিক্রি করে দেবো।

—সেটা অনিশ্চিত ব্যবস্থা অলকা। উনি যদি মামলা না করেন?

—বয়ে গেল।

সুকুমার মাথা নেড়ে বলে—তুমি অতো আলগা থেকো না। কেন নিজেকে নষ্ট করছো? আমি যে শেষ হয়ে যাচ্ছি।

কি থেকে কি হয়ে গেল মনের মধ্যে।

মেঘভাঙা অপরূপ রোদের ঝরণা বয়ে যাচ্ছে চারদিকে। অফিস ঘরে গনগন করছে আলোর আভা। দুদিন মনমরা বৃষ্টির পর কি ভাল এই রোদ্দুর! কাল রাতের সেই একা থাকা ভয়ংকর ছবি মিথ্যে মনে হয়। আবার সেই বাসায় আজকেও আমাকে একা ফিরে যেতে হবে। যদি রাতে বৃষ্টি আসে ফের, তবে আবার ঘুম ভেঙে ভূতে পাওয়া মাথা নিয়ে বসে থাকবে।

হ্যাঁ ঠিক। প্রোটেক্টার না হোক, আমার একজন সঙ্গী চাই। কাউকে না হলে বাঁচব কি করে?

সুকুমার দেখতে বেশ। তাছাড়া বড় সরল, সোজা ছেলে। কখনো ওকে খারাপ লাগেনি। আজ অপরাহ্নের আলোয় অফিস ঘরে বসে মুখোমুখী ওর দিকে চেয়ে হঠাৎ কি হয়ে গেল। ভাবলাম—কি হবে এত বাছবিচার করে! নিজেকে নিয়ে আর কত বেঁচে থাকা!

বললাম—শোন সুকুমার, আমি ডিভোর্স চাই।

—চাও? ও লাফিয়ে ওঠে।

—চাই। আমার স্বামীও চায়! হয়তো ডিভোর্স পেতে কিছু সময় লাগবে।

—তারপর কি করবে অলকা?

—তারপর করতে অনেক দেরি হয়ে যাবে সুকুমার। এক দুরন্ত অধৈর্য অনুভব করে বলি।

—অলকা, যদি আমরা এক্ষুনি বিয়ে করি তাহলে?

আমি ক্ষণকাল চুপ করে থাকি। বুকের মধ্যে নানা ভয়, দ্বিধা, সংস্কার ছায়া ফেলে যায়।

তারপর বলি—কয়েকটা দিন সময় দাও।

—দিলাম। ক'দিন বলো তো!

—দেখি।

একরকম কথা দেওয়াই হয়ে গেল সুকুমারকে! একটু হয়তো কিন্তু রইল, দ্বিধা রইল, তবু ওটুকু কিছু নয়। সে সব দ্বিধা, ভয় ভেঙে সুকুমার ঠিক সাঁতরে আসবে কাছে।

রাতটা মাসীর বাড়িতে গিয়ে কাটালাম। জ্বর এল রাতে। তিনটে দিন বাড়ির বার হওয়া গেল না। অল্প জ্বরেই কত যে ভুল বকলাম ঘোরের মধ্যে।

চার দিনের দিন ফের ফ্ল্যাটে ফিরে এলাম। মাসী আজকাল আর আটকে রাখে না, যেতে চাইলে এক কথায় ছেড়ে দেয়। ঢিলে বল্গা মেয়েকে সকলেরই ভয়।

দোতালার ফ্ল্যাটে ঢুকে দরজা জানালা হাট করে খুলে বন্ধ বাতাস তাড়াই। ধুলোময়লা পরিষ্কার করি। রবিবার। তাড়া নেই!

চায়ের জল চাপিয়ে এলোচুলের জট ছাড়াতে একটু ব্যালকনিতে দাঁড়াই।

কলিং বেল বাজল। এ সময়ে কেউ আসে না। একমাত্র সুকুমার আসতে পারে। তার তর সইছে না।

কাঁপা বুক নিয়ে গিয়ে দরজা খুলেই সাপ দেখে পিছিয়ে আসার অবস্থা। চৌকাঠের ওপারে জয়দেব দাঁড়িয়ে।

কিছুক্ষণ কথা ফোটে না কারো মুখে। জয়দেবের চেহারা রোদে পোড়া, তামাটে, কিছু রোগা হয়েছে। মাথার চুল এত ছোট যেন মনে হয় কদিন আগে ন্যাড়া হয়েছে। পরনে ধুতি আর ক্রীম রঙা সুতীর শার্ট। কিন্তু ধুতিটা এমনভাবে পরেছে যে মনে হয় পাশের ফ্ল্যাট থেকে এল। বাইরে বেরোবার পোশাক নয়।

চৌকাঠের বাইরে থেকে জয়দেব এক পাও ভিতরে আসার চেষ্টা করল না।

দাঁড়িয়ে থেকে বলল—তুমি এখানে থাকো সে খবর সদ্য পেয়েছি।

—কি চাও?

খুব সাধারণ আলাপচারীর গলায় জয়দেব বলল—কিছু চাইনা অলকা। তোমার কাছে ডিভোর্সে মত দিয়ে একটা চিঠি দিয়েছিলাম, তার কোনো উত্তর দাওনি। তোমার কি মত আছে?

একটু গম্ভীর হয়ে বলি—দরজার বাইরে থেকে অত জোরে ও সব কথা বলছো কেন? ভিতরে এসো।

জয়দেব এলো। কোনোদিকে তাকাল না, ঘরের আসবাবপত্র লক্ষ্য করল না। খুবই কুণ্ঠিত পায়ে এসে একটা চেয়ারে বসে বলল—আমি নিচের তলায় প্রভাসবাবুর বাসায় উঠেছি কাল এসে।

প্রভাসের সঙ্গে জয়দেবের চেনা আছে জানতাম। তাই চমকালাম না। দরজা বন্ধ করে এসে জয়দেবের মুখোমুখি বসে বললাম—আমি খুব তাড়াতাড়ি ডিভোর্স চাই।

জয়দেব মুখখানা করুণ করে বলল—তাড়াতাড়ি চাইলেই তো হয় না। কোর্ট থেকে এ সব কেসে বড় দেরি করে। তাড়াতাড়ি চাইলে আরো আগে জানালে না কেন? কবে কেস ফাইল করা যেতো!

আমি মাথা নিচু করে বলি—শোনো, ডিভোর্স পেতে দেরি হোক বা না হোক আমরা তো একটা অ্যাগ্রিমেন্টে আসতে পারি!

—কি অ্যাগ্রিমেন্ট?

—ধরো, আমরা কেউ কাউকে কোনো অবস্থাতেই দাবি করবো না! পরস্পরের কোনো ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাবো না!

—তার জন্য অ্যাগ্রিমেন্ট লাগে না অলকা। জয়দেব বলল—আমরা সেই রকমই আছি।

কথার স্বর শুনেই বোঝা যায়, জয়দেবের মন এখন অনেক গভীর হয়েছে। জীবনে কোনো একটা সত্য বস্তুর সন্ধান না পেলে মানুষ এত গভীর থেকে কথা বলতে পারে না। তাই আমি ওর মুখের দিকে কয়েকবার তাকালাম। ও আমাকে দেখছিল না। চোখ তুলে দেওয়ালের মাঝামাঝি উচ্চতায় চেয়েছিল। সেই অবস্থায় চেয়ে থেকেই বলল—তুমি একটি ছেলেকে পছন্দ কর শুনেছি। তাকে বিয়ে করার জন্যই কি এত তাড়া?

সত্যিকারের অবাক হয়ে বলি—না তো! আমি কাউকেই পছন্দ করি না।

—সুকুমার না কি যেন নাম, শুনছিলাম। তোমার অফিসের!

—ওঃ! বাস্তবিক আমার সুকুমারের মুখটা এখন মনে পড়ল। বললাম—পছন্দ নয়। তবে ঐ এক রকম।

—ভাল।

—তুমি ডিভোর্স চাইছো কেন? বিয়ে করবে? বললাম।

ও অবাক হয়ে তাকিয়ে বলল—বিয়ে আর না। মুক্ত হতে চাইছি, নইলে বড় কষ্ট হয়।

—কষ্ট কিসের?

—ঐ একটা অধিকারবোধ থাকে তো পুরুষের। সেইটে মাঝে মাঝে চাড়া দেয়। ডিভোর্স হয়ে গেলে এক রকম শান্তি।

—ও।

—আচ্ছা—বলে জয়দেব কুণ্ঠিত পায়ে উঠল। বলল—উকিলের চিঠি দেবো। তুমি কি অ্যালিমনি চাও?

—সেটা কি?

—খোরপোষ।

—না, না। চমকে উঠে বলি।

—আচ্ছা তাহলে—

—আচ্ছা। বললাম।

দরজা খুলে জয়দেব চলে গেল।

সিঁড়ি বেয়ে ওর পায়ের শব্দ যখন নামছে তখন আমি ঘরের

মধ্যে চুলের জটে আঙুল ডুবিয়ে বসে আছি। ভাবছি। কত ভাবনা! সে যেন এক আলো-আঁধারের মধ্যে ডুবে বসে থাকা। উঠলাম না, রাঁধলাম না, খেলাম না। শুধু বসে রইলাম।

হঠাৎ এক ভয়ের আঙুল হৃৎপিণ্ডে টোকা মারল। নড়ে উঠল বুকের বাতাস। সচেতন ভীতগ্রস্ততায় টের পাই—আমি কাউকেউ ভালবাসি না। কাউকে নয়। কেবলমাত্র নিজেকে। আমি কোন দিন কাউকে ভালবাসতে পারবও না।

কি করে বেঁচে থাকব আমি?

পৃথিবীতে কত দুর্যোগের বর্ষা নামবে কতবার! কত একা কাটবে দিন! কাউকে ভাল না বেসে আমি থাকব কি করে!

বিকেল কাটল। নিচের তলা থেকে অহংকারী জয়দেব একবারও এল না খোঁজ করতে। সুকুমার টেলিফোনও করল না। বড় অভিমানে ভরে গেল বুক। সারাদিন খাইনি, স্নান করিনি, কে তার খোঁজ রাখে!

সন্ধে হল, রাত গড়িয়ে গেল গভীরের দিকে।

শরীর দুর্বল। মাথা ফাঁকা। মনটায় তদগত একটা আচ্ছন্নতা। ভূতে পেয়েছে আমাকে। উঠে গিয়ে ছারপোকা মারবার অমোঘ ওষুধের শিশিটা হাতে নিয়ে টেবিলে বসলাম। চিরকুটে লিখে রাখলাম—আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়।

লিখে বিছানায় শুয়ে আস্তে শিশির মুখ খুলে ঠোঁটের কাছে এনে পৃথিবীকে বললাম—ভালবাসা ছাড়া কি করে বাঁচি বলো! বাঁচা যায়? ক্ষমা করো।

ঠিক এ সময়ে টেলিফোন বেজে উঠল মৃদু সেতারের মতো। উঠলাম না। শিশিটা উপুড় করে দিলাম গলার মধ্যে।

হায়! ফাঁকা শিশি প্রেমহীন হৃদয়ের মতো চেয়ে রইল আমার শূন্য হৃদয়ের দিকে। এক ফোঁটা বিষও ঢালতে পারল না সে। অমৃতও না।

উঠে টেলিফোনটা যখন ধরছি তখন কেন যেন খুব ইচ্ছে করছিল টেলিফোনে যেন জয়দেবের গলার স্বর শুনতে পাই।

বাসস্টপে কেউ নেই

ঘুমচোখে নিজের ঘর থেকে বেরোবার মুখে পাশের ঘরের পর্দাটা সাবধানে সরিয়ে রবি তার বাবাকে দেখতে পায়। খোলা স্টেটস্‌-ম্যানের আড়াল থেকে ধোঁয়া উঠছে, আর সামনে একটা ক্ষুদে টেবিলের ওপর এক জোড়া পা, পায়ের পাশে একটা গরম কফির কাপ। ঐ স্টেটস্‌ম্যান, পা আর কফির কাপ—ঐ তার বাবা। রবি প্যান্টের পকেটে হাত ভরে রিভলভারটা বের করে আনল। সেটা তুলল, এক চোখ ছোটো করে লক্ষ্যস্থির করল। তারপর টিপল ট্রিগার।

ঠিসুং···ঠিসুং···ঠিসুং···তিনটে বুলেট ছুটে গেল চোখের নিমেষে। স্টেটস্‌ম্যানটা খসে পড়ে যায় প্রথমে, দামী স্প্রিংয়ের ওপর দুর্ধর্ষ নরম ফোম রবারের গদির ওপর ঢলে পড়ে যায় বাবা, গদির ওপর দুলতে থাকে শরীর। বাবা চমৎকার একটা মৃত্যু চিৎকার দেয়—আঃ আ-আ-আ···

রবি হাসে একটু। রিভলভারটা আবার পকেটে ভরে দু পা এগোয়, তার বাবা দেবাশিস শুয়ে থেকেই তার দিকে চেয়ে বলে—শট্! শট্!

রবির ঘুমমাখা কচি মুখে চাপা রহস্যময় হাসি। বলে—নাইস অব ইউ টেলিং দ্যাট।

দেবাশিস উঠে বসে। জ্বলন্ত সিগারেটটা ঠোঁটে নেয়। স্টেটস্‌-ম্যানটা দিয়ে মুখ ঢাকার আগে বলে—প্রসিড টুয়ার্ডস দা বাথরুম ম্যান।

—ইঁয়া। বলে রবি হাই তোলে। ডাকে—দিদি!

অমনি অন্য পাশের ঘরের পর্দা সরিয়ে আধবুড়ী ঝি চাঁপার হাসিমুখ উঁকি দেয়—সোনা!

দুহাত বাড়িয়ে রবি ঘুমন্ত গলায় বলে—কোল।

চাঁপা তাকে কোলে নেয়। এই সকালের প্রথম বাথরুমে

যাওয়াটা বড় অপছন্দ রবির। একটু সময় সে দিদির কোলে উঠে থাকে রোজ সকালে। কাঁধে মাথা রেখে হাই তোলে।

চাঁপা কানে কানে বলে—আজ রবিবার।

—হুঁ।

—ছুটি।

—হুঁয়া।

—সোনাবাবু আজ কোথায় কোথায় যাবে বাবার সঙ্গে?

কচি মুখখানা একরকম সুস্বাদু হাসিতে ভরে যায় রবির। প্রকাণ্ড শার্শিওলা চওড়া জানালার কাছে এসে চাঁপা পর্দা সরিয়ে দেয়। সাততলার ওপর থেকে বিশাল কলকাতার দৃশ্য ছবির মতো জেগে ওঠে। নীচে একটা মস্ত পার্ক। পার্কের মাঝখানে পুকুর। চারধারে বাঁধানো রাস্তায় লোকজন হাঁটছে।

ও ঘরে টেলিফোন বাজে, রিসিভার তুলে নেওয়ার 'কিট' শব্দ হয়। তারপর দেবাশিসের স্বর—হ্যালো।

রবি বলে—ফোন।

চাঁপা বলে—হুঁ।

—কার ফোন বলো তো?

—বাবার বন্ধু কেউ!

—না, মণিমার। রবি বলে!

চাঁপার মুখখানা একটু গম্ভীর হয়ে যায়। বলে—এবার চলো, মুখখানা ধুয়ে নেবে!

রবি হাই তুলে বলে—কাল রাতের গল্পটা শেষ করোনি।

চাঁপা হাসে—বলব। দাঁত মাজতে মাজতে।

ও ঘর থেকে দেবাশিসের হাসির শব্দ আসে। বলে—আজই? ···হুঁ···হুঁ···না, না, রবিবার শুধু রবির দিন। এ দিনটা ওর সঙ্গে কাটাই।···আচ্ছা···

রবি উৎকর্ণ হয়ে শোনে। বলে—ঠিক মণিমা।

——এখন চলো তো। চাঁপা বলে।

বাথরুমে দাঁড়িয়ে পেচ্ছাপ করতে করতে হাই তোলে রবি। চাঁপা তার ছোট্ট ব্রাশে পেস্ট লাগাতে যাচ্ছিল, রবি রাগের স্বরে বলে—না, না পেস্ট না!

—তবে কি দিয়ে মাজবে ?

—তোমার কালো মাজন দিয়ে।

—ও তো ঝাল মাজন ! পেস্ট মিষ্টি।

—না, পেস্ট বিচ্ছিরি। ফেনা হলে আমার বমি পায়।

—বাবা যদি টের পায় আমার মাজন দিয়ে দাঁত মেজেছো তাহলে রাগ করবে কিন্তু।

—টের পাবে কি করে ! চুপ চুপ করে মেজে দাও ! আঙুল দিয়ে কিন্তু। ব্রাশ বিচ্ছিরি।

চাঁপার বুড়ো মুখখানা মায়ার হাসিতে ভরে ওঠে। সে রান্নাঘর থেকে তার সস্তা কালো মাজনের শিশি নিয়ে এসে দাঁত মেজে দিতে থাকে !

রবি ভ্রূ কুঁচকে বলে—গল্পটা বলবে না ?

—হ্যাঁ হ্যাঁ তারপর···কতটা যেন বলেছিলাম সোনাবাবু ?

—তোমার কিছু মনে থাকে না। শিবুচরণ এক রাত্তির বেলা মাছ ধরতে গিয়েছিল নৌকায়। জাল টেনে তুলতেই দেখে মাছের সঙ্গে একটা কেউটে সাপ।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, লালটেমের আলোয় জাল খুলতেই মাছের সঙ্গে একটা কেউটে সাপ বেরিয়ে এল। ছোট্ট নৌকা, চার হাতখানেক হবে। তার এধারে শিবুচরণ হাঁ করে দাঁড়িয়ে, মাঝখানে লালটেম জ্বলছে ওধারে ফণা তুলে কালকেউটে। আর খোলের মধ্যে জ্যান্ত মাছগুলো তখনো দাপাচ্ছে। চারধারে কালিঢালা অন্ধকার নিশুতে নিঃঝুম। মাঝগাঙে শিবুচরণের সে কী বিপদ ! নড়তে চড়তে পারে না, ভয়ে বুদ্ধিভ্রংশ, হাতে পায়ে সাড় নেই।

রবি প্রথম কুলকুচোটা সেরে নিয়েই বলে—জলে ঝাঁপ দিল না কেন ?

চাঁপা একটু থতিয়ে গিয়ে বড় বড় চোখ করে চায়—ঠিক তো সোনাবাবু ! কী বুদ্ধি বাবা তোমার ঐটুকুন মাথায় ! উঃ !

বলে চাঁপা রবির মুখ তোয়ালে দিয়ে মুছিয়ে কোলে তুলে নেয়। মাথাটা কাঁধে চেপে রেখে বলে—সোনাবাবুর মাথার মধ্যে বুদ্ধির বাসা। এমনটি আর দেখিনি।

রবি মুখ টিপে অহংকারের হাসি হেসে মুখ লুকিয়ে বলে—উঃ। তারপর বলো না!

—হ্যাঁ তা শিবুচরণের হাতে পায়ে তো খিল ধরে গেছে তখন। কাঁপুনি উঠছে। ভাবছে এই মলুম, এই গেলুম আর বাপভাই ছানাপোনার মুখগুলো দেখতে পাবো না। কালসাপে খেলে আমাকে গো! কে কোথায় আছো মানুষজন, এসে পরাণটা রাখো। কিন্তু কোথায় কে! শীতে মাঝরাতে মাঝগাঙে জনমনিষ্যি নেই। শিবুচরণ বুঝল যে মানুষজনকে ডাকা বৃথা। কেউ তার ডাক শুনতে পাবে না। তখন ভয়ের চোটে শিবু রামনাম করতে থাকে, কিন্তু সাপটা নড়ে না। শিবুর মনে হল, তাইতো রামনাম তো ভূতের মন্ত্র। তখন সে মা মনসাকে ডাকতে থাকল। তাতে যেন আরো জোর পেয়ে সাপটা এধার ওধার গোটা দুই ছোবল মারল। লালটেমটা মাঝখানে থাকতে রক্ষে! কিন্তু সে আর কতক্ষণ। শিবু বুঝে গেল মা মনসা কুপিত আছেন কোনো কারণে তার ওপর। ডেকে কাজ হবে না। হিতে বিপরীত হয় যদি! তখন শিবুচরণ মনে করল গাঁয়ের পুরুতমশাই বলেন বটে বাপ পিতেমোর আত্মা···সোনাবাবু বোসো।

চাঁপা ডাইনিং রুমে এনে চেয়ার টেবিলে বসায় রবিকে। রবি বিরক্ত হয়ে চাঁপাকে আঁকড়ে ধরে বলে—উঃ! তুমি আগে বোসো, আমি তোমার কোলে বসব।

চাঁপা চারধারে চেয়ে কানে কানে বলে—আমি কি চেয়ারে বসতে পারি? বাবা দেখলে যে রাগ করবে!

—একটুও রাগ করবে না। উঃ বোসো! কথা শোনো না কেন!

—বসছি বসছি। বলে চাঁপা তাকে কোলে নিয়ে বসে। প্লেটে সেঁকা রুটি মাখন, দুধের গেলাস রেখে যায় প্রীতম চাকর। রেখে সে বলে—রবিবাবু, কাল যখন সন্ধ্যেবেলা আমি ঘুমোচ্ছিলাম তখন কে আমার কানে জল ঢেলে পালিয়ে গেল শুনি!

—তুই ঘুমোস সন্ধ্যেবেলা? বাবা রাগ করে না?

—ওঃ ঘুম নয়। চোখ বুজে তোমার জন্য একটা গল্প ভাবছিলাম আর তুমি জল ঢেলে পালিয়ে গেলে। কানের মধ্যে

এখনো জলটা ফচ ফচ করছে। আজ বাবাকে যদি বলে না দিই!

পকেট থেকে গম্ভীর ভাবে রিভলভারটা বের করে রবি তুলেই ট্রিগার টেপে।

ঠিসুং···ঠিসুং···ঠিসুং···আঃ আ আ, বলে প্রীতম টাল খেয়ে পড়ে যেতে যেতে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

দুধের গ্লাসে চুমুক দিয়ে রবি বলে—তারপর বলো।

চাঁপা অসহায় ভাবে বলে—কী যেন বলছিলাম!

—বড্ড ভুলে যাও তুমি।

—বুড়ো হচ্ছি না!

—বুড়ো হলে কি ভুলে যেতে হয়?

চাঁপা তার গালে গালটা ছুঁইয়েই সরিয়ে নেয় মুখ, বলে—বুড়ো পুরুতমশাই বলেন বাপপিতেমোর আত্মারা সব সময়ে আমাদের নাকি চোখে চোখে রাখেন। এমনিতেই কিছু করতে পারেন না, কিন্তু প্রাণ ভয়ে তারা এসে আপদ বিপদের আসান করে দিয়ে যান। শিবুচরণ তখন ডাকতে থাকে—ও মোর বাপপিতেমো, তোমরা কে কোথায় আছো, দ্যাখোসে তোমাদের আদরের শিবের দশাখানা। নিশুত রাতে কে বা জানবে শিবেকে দংশেছে নিঘিন্নে জীব, কে ডাকবে ওঝা-বদ্যি শিবে যে যায়···এইসব বিড়বিড় করে বলছে যখন, তখনই সাপটা হঠাৎ ঠিক মানুষের গলায় বলে—ওহে শিবুচরণ—

ও-ঘর থেকে পর্দাটা সরিয়ে দরজায় দাঁড়ায় দেবাশিস। একটু ভারী গলায় বলে—মানে হারি আপ, হারি আপ—

—গী—মুখ ফিরিয়ে হাসে রবি। চাঁপা জড়োসড়ো হয়ে উঠে দাঁড়ায়, কোলে রবি!

দৃশ্যটা দেখে একটু হাসে দেবাশিস। পর্দাটা ফেলে দেয়। ও ঘর থেকে তার গলা পাওয়া যায়—ড্রেস আপ ম্যান ড্রেস আপ।

—ইঁয়া। উত্তর দেয় রবি। তারপর দুটো টোস্ট দু কামড় করে খেয়ে ফেলে দিয়ে বলে—দিদি, তাড়াতাড়ি করো।

—কিছু খেলে না সোনাবাবু!

—আঃ খেতে ইচ্ছে করছে না যে।

—দুধটুকু তবে দু চুমুক, দাদা আমার!

—ইস: কী যে যন্ত্রণা করো না!

বলে রবি ঢকঢক করে দুধটা খায়। হাতের উল্টো পিঠে মুখ মুছে ছুটে পাশের ঘরে গিয়ে ডাকে—দিদি তাড়াতাড়ি।

দেবাশিস ভিতর দিকের দরজা ভেজিয়ে দিল সাবধানে। রবি ওঘরে পোশাক পরছে। ঘড়িতে আটটা বাজে। তৃণা এখন নিশ্চয়ই ঘুম থেকে উঠেছে। ও একটু দেরীতে ওঠে। ওদের বাড়ীর এখনকার দৃশ্যটা মনশ্চক্ষে দেখে নিল দেবাশিস। তৃণার বর শচীন এখন বাগানে। এমন ফুল-পাগল, গাছ-উন্মাদ লোক কদাচিৎ দেখা যায়। কেবল মাত্র ঐ গাছের জন্য ফুলের জন্য হাজরা রোডের ওপর সাতকাঠার মতো জমি সোনার দাম পেয়েও বেচবে না। ঐ সাতকাঠার কোন দরকারই হয় না ওদের, বাড়ির চারধারে বিস্তর জমি। বাড়ি ছাড়িয়ে রাস্তা ও পাশে ঐ ফালতু জমিটায় তার বাগান। এতক্ষণে সেখানে গাছপালার মধ্যে জমে গেছে শচীন। তৃণার এক ছেলে, এক মেয়ে মনু আর রেবা। মনু টেনিস শিখতে যায় রবিবারে, রেবার নাচগানের ক্লাশ থাকে। আটটা থেকে সোয়া আটটার মধ্যে তৃণার চারধারে চাকর-বাকর ছাড়া কেউ বড় একটা থাকে না। অবশ্য থাকলেও ক্ষতি নেই। সবাই জানে, দেবাশিস আর তৃণার মধ্যে একটা প্লাস চিহ্ন আছে। এমন কি দেবাশিসের বৌ চন্দনা আত্মহত্যা করেছিল না খুন হয়েছিল এ বিষয়ে সকলের সন্দেহ কাটেনি এখনো। পুলিশ অবশ্য কেস দিয়েছিল কোর্টে খুনের দায়ে দেবাশিসকে জড়িয়ে, কিন্তু দুর্বল কেসটা টেকেনি। কিন্তু জনগণের মধ্যে এখনো ধারণা সম্ভবত দেবাশিস আসামী।

ডায়াল করার পর নির্ভুল রিং-এর শব্দ হতে থাকে আর দেবাশিসের একটা দুটো হৃৎস্পন্দন হারিয়ে যায়। শ্বাসের কেমন একটা কষ্ট হতে থাকে।

—হেল্লো। তৃণা বলে।

—দেব।

—বুঝেছি।

—কথা বলার অসুবিধে নেই তো!

—একটু আছে।

—ঘরে কেউ আছে নাকি ?

—হুঁ।

—তাহলে দশ মিনিট পরে ফোন করব।

তৃণা একটু হাসে। বলে—না, না, ভয় নেই এসময়ে কেউ থাকে নাকি! একে রোববার, তার ওপর বাদলা ছেড়ে কেমন শরতের রোদ উঠেছে! কেবল আমিই পড়ে আছি একা, কেউ নেই।

—কী করছিলে ?

—টেলিফোনটা পাশে নিয়ে বসে ছিলাম, হাতে খোলা জীবনানন্দের সাতটি তারার তিমির; কিন্তু একটা কবিতাও পড়া হচ্ছিল না।

দেবাশিস গলাটা সাফ করে নিয়ে বলে—কী করবে আজ ?

—কী আর! বসে থাকব। তুমি ?

—আজকাল রবি ছুটির দিনগুলোয় চাঁপার কাছে থাকতে চায় না।

—বড় হচ্ছে তো, রক্তের টান টের পায়। শত হলেও তুমি বাপ।

—তুমি বেরোচ্ছো না ?

তৃণা একটা শ্বাস ছেড়ে বলে—জানোই তো, চারদিকে লোকনিন্দের কাঁটাবেড়া, একা বেরোলেই শচীন এমন একরকম কুটিল চোখে তাকায়! আজকাল বুড়ো বয়সে বড্ড সাসপিসিয়াস হয়েছে। ছেলেমেয়েরাও পছন্দ করে না। তাই আটকে থাকি ঘরে।

—দূর! ওটা কোন কথা হল নাকি ?

—তবে কথাটা কি রকম হলে মশাইয়ের পছন্দ ?

—আমি বলি, তুমিও বেরিয়ে পড়ো, আমিও বেরিয়ে পড়ি।

—তারপর ?

—কোথাও মীট করব।

তৃণা একটু চুপ করে থেকে বলে—দেব, রবি কিন্তু বড় হচ্ছে।

—কী করব ?

—সাবধান হওয়া ভাল। যা করো ছেলেকে সাক্ষী রেখে করো না।

—তিনু, তুমি কিন্তু এতটা গেরস্ত মেয়ে ছিলে না, দিন দিন কী হয়ে যাচ্ছো ?

—বয়স হচ্ছে।

—ওসব আমি বুঝি না। গত সাতদিন তোমার সঙ্গে দেখা হয়নি।

—মিথ্যুক।

—কী বলছ?

—বলছি তুমি মিথ্যুক। তৃণা হাসে।

—কেন?

—পরশুদিনও তুমি সন্ধ্যের পর গাড়ী পার্ক করে রেখেছিলে রাস্তায়, সেখান থেকে আমার শোয়ার ঘরের জানালা দেখা যায়।

বাঁ হাতে বুক চেপে ধরে দেবাশিস, শ্বাসকষ্ট। হৃৎস্পন্দন হারিয়ে যায় একটা···দুটো···গভীর একটা শ্বাস টানে সে। বুকে বাতাসের তুফান টেনে নেয়।

দেবাশিস আস্তে করে বলে—কী করে বুঝলে যে আমি।

—তোমাকে যে আমি সবচেয়ে বেশী টের পাই।

—গাড়ির নাম্বার প্লেট দেখেছো।

—না। আবছা গাড়িটা দেখেছি। আর দেখেছি ড্রাইভিং সীটে একটা সিগারেট আর দুটো চোখ জ্বলছে।

—যাঃ।

—আমি জানি দেব, সে তুমি ছাড়া আর কেউ নয়।

দেবাশিস দাঁত টিপে চোখ বুজে লজ্জাটাকে চেপে ধরে মনের মধ্যে। গলার স্বর কেমন অন্য মানুষের মতো হয়ে যায়, সে বলে —তুমি ছাড়া আর তো কেউ জানে না।

—জানবে কী করে! তৃণা হাসে—তোমাকে যে না চেনে সে সে কী করে জানবে রাস্তায় কার গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। কে বসে আছে ড্রাইভিং সীটে একা ভূতের মতো! আমি ছাড়া এত মাথা-ব্যথা আর কার?

—তুমি অনেকক্ষণ বড় জানালাটার কাছে দাঁড়িয়ে ছিলে, পিছনে ঘরের আলো, তাই তোমার মুখ দেখতে পাইনি। যদি জানতাম যে তুমি আমাকে দেখতে পাচ্ছো!

—তাহলে কী করতে?

—তাহলে তক্ষুনি রাস্তায় নেমে ছক্করবাজি নাচ নেচে নিতাম।

—দেব, বয়স বাড়ছে।

দেবাশিস তৎক্ষণাৎ বলে—পাগলামিও।

—বুঝলাম। কিন্তু কেন? ওরকম কাঙালের মতো আমার বাড়ির পাশে বসে থাকবার মতো কী আছে? নতুন তো নয়।

দেবাশিস ঠিক উত্তরটা খুঁজে পায় না। রক্ত কলরোল তোলে। বুকে আছড়ে পড়ে বন্ধ জলোচ্ছ্বাস। সে বলে, তিনু, আমি বড় কাঙাল।

তৃণা একটা শ্বাস ফেলে। কিছু বলে না।

দেবাশিস বলে—শুনছো?

—কী?

আমি বড় কাঙাল।

—কাঙাল কী না জানি না তবে বাঙাল বটে।

—তার মানে?

—বাঙাল মানে বোকা। বুঝেছো?

—তাই বা কেন?

—রবি কোথায়? তোমার এসব পাগলামির কথা তার কানে যাচ্ছে না তো?

—কানে গেলেই কী। ও বাচ্চা ছেলে, বুঝবে না।

তৃণা একটা মৃদু হাসি হেসে বলে—তুমি বাচ্চাদের কিছু জানো না। ওরা আজকাল পাকা বিচ্ছু হয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া বাচ্চারা কিন্তু সব টের পায়।

দেবাশিস একটু হতাশার গলায় বলে—শোনো, রবির জন্য চিন্তার কিছু নেই। যদি টের পায় তো পাক। আগে বলো, তোমার সঙ্গে দেখা হবে কি না।

তৃণা মৃদুস্বরে বলে—কোথায়?

—তুমি যেখানে বলবে।

—আমার লজ্জা করে। তোমার সঙ্গে যে তোমার ছেলে থাকবে!

—ও তোমায় চেনে নাকি! এসব নতুন ডেভেলাপমেন্ট তোমার কবে থেকে মনে হচ্ছে।

—রবি বড় হচ্ছে তাই ভয় পাই। বুঝতে শিখছে।

—ভয় পেয়ো না। গাড়ি নিয়ে বেরোচ্ছি। ঘন্টা খানেক চিড়িয়াখানা আর রেস্টুরেন্টে কাটাবো। দুপুরে আমার বোনের বাড়িতে খাওয়ার নিমন্ত্রণ। অবশ্য একা রবিরই নিমন্ত্রণ, ওদের বাড়িতে যে আমি খুব জনপ্রিয় নই তা তো জানোই। রবিকে সেখানে পেঁাছে দিয়ে আমি ফ্রী।

—তার মানে এগারোটা কী বারোটা হবে বেলা। আমি কি তোমার মতো স্বাধীন দেব? দুপুরে সকলের খাওয়ার সময়ে বাইরে থাকলে লোকে বলবে কী?

—তাহলে চিড়িয়াখানা বা রেস্টুরেন্টে এসো।

—তাহলে রবিকে চোখ এড়ানো যাবে না।

—উঃ! তুমি যে কী গোলমাল পাকাও না।

তৃণা হেসে বলে—আচ্ছা, না হয় দুপুরের প্রোগ্রামই থাকল। কোথায় দেখা হবে?

—তুমি ফাঁড়ির কাছে বাসস্টপে থেকো।

দেবাশিস চোখের কোণ দিয়ে দেখে রবি এসে দাঁড়িয়েছে পর্দা সরিয়ে দরজার চৌকাঠে। স্ট্রেচলনের একটা হাল্কা নীল রঙের প্যান্ট আর দুধ-সাদা একটা টি-শার্ট পরনে, বুকের কাছে বাঁ ধারে মনোগ্রাম করা ওর নামের আদ্য অক্ষর। মাথায় থোপা থোপা চুলের ঘুরলি। একটু হাসি ছিল মুখে। সেটা আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাচ্ছে এখন।

—তাহলে? দেবাশিস ফোনে বলে।

—আচ্ছা ছাড়লাম।

—সো লং।

ফোনটা রেখে দেয় সে।

হাসিটা আর রবির মুখে নেই, মিলিয়ে গেছে, চেয়ে আছে বাবার দিকে, চোখে চোখ পড়তেই মুখটা সরিয়ে নিল।

দেবাশিস ছেলের দিকে চেয়ে থাকে। বুকের মধ্যে ঝড় থেমেছে, ঢেউ কমে এল, শুধু অবসাদ। টেনশনের পর এমনটা হয়, মুখে একটু সহজ হাসি ফুটিয়ে তোলা এখন বেশ শক্ত, টানাপোড়েন এখনো তো শেষ হয়নি। তৃণার সঙ্গে দুপুরে দেখা হবে, ফাঁড়ির কাছের বাসস্টপে। তার স্নায়ুর ভিতরে এখনো একটা তৃষ্ণার্ত উচাটন

ভাব। দেখা হবে, পিপাসা বাড়বে, তবু এক সমুদ্রের তফাৎ থেকে যাবে সারা জীবন তৃণার সঙ্গে তার।

রবি মুখ তুলতে দেবাশিস ক্লিষ্ট একরকম হাসি হাসে। রবি কি সব বোঝে! বুকের মধ্যে একটা ভয় আচমকা হৃদ্‌যন্ত্রকে চেপে ধরে তার।

চতুর ভঙ্গিতে দেবাশিস এক পা এগিয়ে হাত বাড়িয়ে বলে—দিস ইজ দেবাশিস দাশগুপ্ত!

বাড়ানো হাতখানা রবি ধরে শেকহ্যাণ্ড করতে করতে বলে—দিস ইজ নবীন দাশগুপ্ত প্লীজড টু মীট ইউ।

রবির পিছনে চাঁপা দাঁড়িয়ে শাড়ি পরেছে চুল আঁচড়েছে। দেবাশিসের চোখ পড়তেই চোখ নামিয়ে ভারী নরম সুরে বলে—বাবা আমি কি সোনাবাবুর সঙ্গে যাবো?

দেবাশিস অবাক হয়ে বলে—কোথায়?

চাঁপা লাজুক গলায় বলে—সোনাবাবু ছাড়ছে না, কেবল সঙ্গে যেতে বলছে!

রবি করুণ মুখভাব করে বলে—দিদি যাবে বাবা?

দেবাশিস একটু ক্ষীণ হাসি হাসে, বলে—তোমার ইচ্ছে হলে যাবে কিন্তু খাবে কোথায়! ওর তো নেমন্তন্ন নেই।

চাঁপার মুখ একটা হাসির ছটায় আলো হয়ে যায়, বলে—আমি কিছু খাবো না, সকালে পান্তা খেয়ে নিয়েছি, সোনাবাবুর সঙ্গে সঙ্গে থাকব, সেই আমার খাওয়া।

দেবাশিস অন্যমনস্কভাবে মাথা নাড়ে, গাড়ির চাবিটা আঙুলে ঘোরাতে ঘোরাতে দরজা খুলে লিফটের দিকে এগোয়।

প্রেম একরকম, পাপ আর একরকম, কোনটা প্রেম, কোনটা পাপ তা বোঝা যদিও মুশকিল, তবু কতকগুলো লক্ষণ তৃণা জেনে গেছে। মনে মনে যখন সে দেবাশিসের কথা ভাবে তখন তার শচীনের দিকে তাকাতে লজ্জা করে, ছেলেমেয়ের দিকে চাইতে পারে না আর

বুকের মধ্যে একরকম তীব্র শুষ্ক বাতাস বয়, গলা শুকোয়, জিভ শুকোয়, বিনা কারণে চারিদিকে চোরাচোখে তাকিয়ে দেখে। নিজের ছায়াটাকেও কেমন ভয়-ভয় করে।

বাথরুম থেকে স্নান সেরে বেরোতে গিয়েই তৃণা ভারী চমকে ওঠে। কিছু না, বাইরের বেসিনে শচীন খুবই নিবিষ্টভাবে তার বাগানের মাটিমাখা হাত ধুচ্ছে। বেঁটেখাটো মানুষ, বছর বিয়াল্লিশ বয়স, বেশ শক্তসমর্থ চেহারা, চোখে মুখে একটা কঠোর পুরুষালী সৌন্দর্য আছে। শচীন তার দিকে তাকিয়েও দেখেনি, তবু তৃণা বাথরুমের দরজার পাল্লাটা ধরে নিজেকে সামলে নিল। খোলা শরীরের ওপর কেবল শাড়িটা কোনো রকমে জড়ানো। কেমন লজ্জা হল তার, তাড়াতাড়ি ডানদিকের আঁচল টেনে শরীরের উদোম অংশটুকু ঢেকে নিয়ে মুখ ফিরিয়ে দ্রুত ঘরে চলে এল।

ঘরটা তার একার, সম্পূর্ণ একার। একধারে মস্ত খাট, বইয়ের সেলফ খাটের নাগালের মধ্যেই, অন্যধারে ড্রেসিং টেবিল, একটা ওয়ার্ডরোব, একটা আলমারি, সবই দামী আসবাব, মস্ত বড় বড় দুটো জানালা দিয়ে সকালের শারদীয় রোদ এসে মেঝে ভাসিয়ে দিচ্ছে, উজ্জ্বলতা প্রখর। সাধারণ সায়া ব্লাউজ পরে নিল সে, শাড়িটা ঠিক করে পরল, ওয়ার্ডরোব খুলে বাইরে বেরোনোর পোষাকী শাড়ি আর ম্যাচ করা ব্লাউজ বের করে পেতে রাখল বিছানায়। দূর থেকে একটু ঘাড় ফিরিয়ে দেখে সেগুলো, তারপর আয়নার সামনে গিয়ে বসে। তার চেহারা ছিপছিপে, ফর্সা, মুখশ্রী হয়তো ভালই, কিন্তু সবচেয়ে মারাত্মক তার মুখের সজীবতা! চোখ কথা কয়, চোখ হাসে, নাকের পাটা কেঁপে ওঠে অল্প আবেগে। ঠোঁট ভারী, গাল ভারী, সব মিলিয়ে তার বয়স সত্যিকারের তুলনায় অনেক কম দেখায়। আবার বয়সের ঢলে তার কোথাও যে কোনো খাঁকতি নেই সেটাও বোঝা যায়। নিজেকে ভালবাসে তৃণা, ভালবাসার মতো বলেই। মাঝে মাঝে সে নিজের প্রেমে পড়ে যায়।

পাশের ঘরে শচীনের সাড়া পাওয়া যায়! সুরহীন একরকম গুনগুন শব্দ করে শচীন। গান নয়, অনেকটা গানের মতো।

শচীনের ঐ এক মুদ্রাদোষ। ঐ সুরহীন গুনগুন শব্দ কি ওর একাকিত্বের?

যদি তাই হয়, তবু ঐ একাকিত্বের জন্য তৃণা দায়ী নয়। দেবাশিসও নয়। একদা শচীনই ছিল তৃণার সর্বস্ব। কিন্তু শচীনের কে ছিল তৃণা? তৃণা তাই ঐ স্বরটা শোনে উৎকর্ণ হয়ে। দু ঘরের মাঝখানের দরজা রাতে বন্ধ থাকে, দিনে মস্ত ভারী সাটিনের পর্দা ঝুলে থাকে। শচীন অবশ্য বেশীক্ষণ ঘরে থাকে না, যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ ঐ পর্দা থাকে অনড় হয়ে। কেউ কারো ঘরে যায় না। এ বাড়ির আর এক কোণে থাকে ছেলেমেয়েরা। তাদের সঙ্গেও হুটহাট দেখা হয় না। হলেও কথাবার্তা হয় বড্ড কম। একমাত্র খাওয়ার সময়ে তৃণা সামনে থাকে। সেও এক নীরব শোক-সভার মতো। সবাই চুপচাপ খেয়ে যায়। তৃণার চোখে জল আসে, কিন্তু তাতে লাভ কি? চোখের জলের মতো শক্তিশালী অস্ত্র যখন ব্যর্থ হয় তখন মানুষের আর কিছু নেই। সে তখন থাকে না। যেমন তৃণা এ বাড়িতে নেই, এ সংসারে নেই। মৃত্যুর পর বাঁধানো ফটো যেমন ঘরের দেয়ালে সেপ তেমনি। তাই তৃণা দায়ী নয়।

তৃণা ঘাড়ে গলায় পাউডারের নরম পাফ ছুঁইয়ে দেয়। সিঁদুর দেয়। সামান্য ক্রীম দু হাতের তেলোয় মেখে মুখে ঘষে। এখন আর কিছু করার নেই। সারাদিন তার করার কিছু থাকেও না বড় একটা। যে লোকটা রান্না করে সে একশ টাকা মাইনে পায়। তার অর্থ, লোকটাকে শেখানোর কিছু নেই। যে সব চাকর বা ঝি ঘরদোর গুছিয়ে রাখে তারাও নিজেদের কাজ বোঝে। তৃণা শুধু ঘুরে ঘুরে একটু তদারক করে। কখনো নিজের হাতে কিছু রাঁধে। সে কারো মুখে তেমন রোচে না, তৃণাও রান্নাবান্না ভুলে গেছে। শুধু কবে কী কী রান্না হবে সেটা বলে দিয়ে আসে। তাই হয়। কেবল নিজের ঘরটাতে সে নিজে বইপত্র গোছায়, বিছানায় ঢাকনা দেয়, ওয়ার্ডরোব সাজায়, ড্রেসিং টেবিলে রূপটানের জিনিস মনের মতো করে রাখে। কাগজ ভিজিয়ে তা দিয়ে আয়না মোছে। এ ঘরে কেউ বড় একটা আসে না। এ তার নিজের ঘর, বড্ড ফাঁকা বড্ড বড়। রাস্তার দিকে একটা ব্যালকনি আছে সেখানে একা ভূতের

মতন কখনো দাঁড়ায়। কবিতার বই, পত্র-পত্রিকা গল্প-উপন্যাস আর ছবি আঁকার জলরঙ, মোটা কাগজ, তুলি—এইসবই তার সারা-দিনের সঙ্গী। ইদানীং সে কবিতা লেখে, দু একটা কাগজে পাঠায়। সে সব কবিতা দুঃখভারাক্রান্ত, নিঃসঙ্গতাবোধ, মন্থর, ব্যক্তিগত, হা-হুতাশে ভরা ভাবপ্রবণতা—এখনো ছাপা হয়নি। এক আধটা কবিতা ছাপা হলে মন্দ লাগত না তার। যে সব ছবি সে এঁকেছে তার অধিকাংশই প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি। নারকোল গাছ, চাঁদ আর নদীতে নৌকো—এ ছবি আঁকা সবচেয়ে সোজা। তারপরই পাহাড়ের দৃশ্য। তৃণা আঁকতে তেমন শেখেনি, তুলি রঙের ব্যবহারও জানে না। ছবি জ্যাবড়া হয়ে যায়, তবু আঁকে। ভাবে একটা এগজিবিশন করবে নাকি একাডেমী বা বিড়লা মিউজিয়ামে। করে লাভ নেই অবশ্য, কেউ পাত্তা দেবে না। ছবি আঁকার মাথা মুণ্ডুই সে জানে না। তৃণা কলেজে ভাল ক্যারাম খেলতো। বাড়িতে, বিশাল দুটো বোর্ড আছে। একা একা মাঝেমধ্যে গুটি সাজিয়ে টুকটাক স্ট্রাইকার টোকা দিয়ে গুটি ফেলে সে। কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বী নেই বলে খেলার কোন টেনশন থাকে না, ক্লান্তি লাগে। নিজের প্রতিপক্ষ হয়ে একবার কালো, আবার উল্টোদিকে গিয়ে নিজের হয়ে সাদা গুটি ফেলে কতক্ষণ পারা যায়?

শচীন একটানা গুনগুন শব্দে কথাহীন সুরহীন একটা গান গেয়ে যাচ্ছে পাশের ঘরে। বনেদী বড়লোক তাই নিজের হাতে প্রায় কিছুই করতে হয়নি তাকে, বাবাই করে গিয়েছিলেন। বাবার বিশাল সম্পত্তি চার ভাই ভাগ করে নিয়েও বড়লোকই আছে। বাড়িটা শচীনের ভাগে পড়েছে। সিমেন্টের কারবার নিয়েছে বড় ভাই, ছোটো দু ভাই নিয়েছে একজন ওষুধের দোকান অন্যজন ভাল কয়েকটা শেয়ার। শচীনরা চার ভাই-ই শিক্ষিত। সে নিজে ইঞ্জিনীয়ার, ভাল চাকরী করে বড় ফার্মে। একবার নিজের পয়সায় অন্যবার কোম্পানীর খরচায় বিলেত ঘুরে এসেছে! পৃথিবীর সব দেশেও গেছে সে, চীন আর রাশিয়া ছাড়া। এমন মানুষ আর এমন ঘর পেলে কোন মেয়ে না বর্তে যায়! শক্তসমর্থ এবং কিছুটা নিরাশক্ত শচীন ভালবাসে ফুল, সুন্দর রঙ, ভালবাসে চিন্তাভাবনা, মানুষের প্রতি তার আগ্রহ আছে। তবু এইসব ছুটির দিনে বা

অবসরে সে যখন বাগান করে, মন্থরভাবে নিজের ঘরে জার্নাল নাড়াচাড়া করে, যখন গুনগুন করে তখন তাকে বড় নিষ্কর্মা মনে হয়।

ছুটির দিনে তাই তৃণারও অসহ্য লাগে। একা একরকম আর জন থাকা সত্ত্বেও একা আর একরকম।

বড় অদ্ভুত বাড়ি। সারাদিনেও একটা কিছু পড়ে না, ভাঙে না, দুধ উথলে পড়ে না, ডাল ধরে যায় না। সুশৃঙ্খলভাবে সব চলে! তৃণাকে কোনো প্রয়োজনই হয় না কোথাও। একটা অ্যালসেশিয়ান আর একটা বুলডগ বক্সার কুকুর আছে। সে দুটোরও কোনো ডাকখোঁজ নেই। কেবল শচীনের বুড়ো কাকাতুয়াটা কথা বলে পাকা পাকা। কিন্তু সে হচ্ছে শেখানো বুলি, প্রাণ নেই। অর্থ না বুঝে পাখি বলে—তৃণা, কাছে এসো …তৃণা কাছে এসো…

পাখিটা বুড়ো হয়েছে। একদিন মরে যাবে। যখন তৃণাকে কাছে ডাকার কেউ থাকবে না।

না, থাকবে। দেবাশিস। ও একটা পাগল। এমনভাবে ডাকে যে দেশসুদ্ধ, সমাজসুদ্ধ লোক জেনে যায়। শচীন জানে, ছেলেমেয়েরাও জেনে গেছে। তৃণার বুকের ভিতরটা সব সময় কাঁপে। কখনো নিষিদ্ধ সম্পর্কের উত্তেজনায়। কখনো ভয়ে। শচীন কিংবা ছেলেমেয়েরা তাকে বেশ্যার অধিক মনে করে না। আর দেবাশিস? সেও কি তাকে নষ্ট মেয়েমানুষ ছাড়া আর কিছু ভাবে?

কাকাতুয়াটা ডাকছে, কাছে গিয়ে একটু আদর করতে ইচ্ছে করে পাখিটাকে। মস্ত দাঁড়টা ঝোলানো আছে শচীনের ঘরের বারান্দায়। যেতে হলে ও ঘর দিয়ে যেতে হবে। শচীন না থাকলে যাওয়া যেত। কিন্তু ওঘর থেকে সমানে সুরহীন গুন গুন শব্দটা আসছে। শচীনের চোখের সামনে নিজেকে নিয়ে গেলেই তার নষ্ট মেয়েমানুষ বলে মনে হয় নিজেকে। এ বড় জ্বালা। ভদ্রলোক বলেই শচীন তাকে কিছু বলে না আজকাল। মাস ছয়েক আগে ধৈর্যহারা হয়ে একদিন চড়চাপড় আর ছড়ির ঘা দিয়েছিল কয়েকটা। তারপর থেকেই হয়তো অনুতাপ এসে থাকবে। কিন্তু

তৃণা ওকে জানাবে কি করে যে ওর হাতের সেই মার বড় সুখের স্মৃতি হয়ে আছে তৃণার কাছে আজও। কারণ, তার বিবেক ও হৃদয় একটা শাস্তি সবসময়ে প্রত্যাশা করে।

তৃণা তার পড়ার টেবিলের কাছে গিয়ে উপুড় করা বইটা তুলে পড়তে বসল। কবিতার বই, বহুবার পড়া, মুখস্থ হয়ে গেছে। তবে খোলা সনেটটার দিকে চেয়ে থাকে। কিন্তু মন দিতে পারে না, বইটা রেখে প্যাড আর কলম টেনে নেয়। কলম খুলে ঝুঁকে পড়ে, ধৈর্যহীন চঞ্চলতায় কলম উদ্যত করে নাড়ে। কিন্তু লিখতে পারে না। কয়েকটা রোগা লম্বা লোকের চেহারা এঁকে ফেলে। তারপর সারা কাগজটা জুড়ে হিজিবিজি আঁকতে আর লিখতে থাকে। কাগজটা নষ্ট করে দলা পাকিয়ে ফেলে দেয়। আবার হিজিবিজি করে পরের কাগজটাতে।

কাকাতুয়াটা শচীনকে ডাকছে—শচীন, চোর এসেছে···শচীন, চোর এসেছে···

শচীনের ঘর এখন নিস্তব্ধ। কেউ নেই। তৃণা উঠে শচীনের ঘরে উঁকি দেয়। গোছানো ঘর। বাপের আমলের বাড়িটা শচীন আবার নতুন করে একটু ভেঙে গড়ে নিয়েছে। নতুন করে তৈরী করার জন্যই ডাক পড়েছিল দেবাশিসের! সিভিল ড্রাফ্‌টসম্যান আর ইন্টিরিয়র ডেকরেটর 'ইনডেক্‌'-এর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর। ম্যানেজিং ডাইরেক্টর কথাটা বড্ড ভারী, ইনডেক এমন কিছু বড় কোম্পানী নয়। কলকাতায় ওরকম কোম্পানী শতাধিক আছে। তবু ইনডেক-এর কিছু সুনাম আছে। ইন্টিরিওর ডেকরেশন ছাড়াও ওরা ছোটোখাটো কনস্ট্রাকশন কিংবা রিনোভেশন করে। বাড়ির প্ল্যান করে দেয়। এত কিছু একসঙ্গে করে বলেই কাজ পায়। দেবাশিস দাশগুপ্ত এক সময়ে আর্টিস্ট ছিল। কমার্শিয়াল লাইনে চমৎকার নাম করেছিল সে। কিন্তু উচ্চাশা বলবতী হওয়ায় সে কিছুদিন সিনেমার পরিচালনায় হাত লাগাল। সবশেষে ইন্টিরিয়র ডেকরেশনে এসে মন লাগাতে পারল। আর্টিস্ট ছিল বলে, এবং রং ও ডিজাইনের নিজস্ব চোখ আছে বলে, আর পূর্বতন গুডউইলের জন্যও ওর দাঁড়াতে দেরি হয়নি। এখন চৌরঙ্গীতে অফিস করেছে। একজন সিভিল ইঞ্জিনীয়ার, দুজন

ড্রাফট্‌সম্যান এবং আরো কয়েকজনকে মাইনে দিয়ে রেখেছে, একটি মেয়ে রিসেপশনিস্ট আছে। নিজস্ব চেম্বারটা এয়ারকণ্ডিশন করা, নিজের কেনা ফ্ল্যাটে থাকে। একটা মরিস অক্সফোর্ড গাড়ি হাঁকড়ায়।

কিন্তু এ হচ্ছে আজকের দেবাশিস, পুরানো দেবাশিসকে এর মধ্যে খুঁজে পাওয়া ভার।

এ বাড়ি রিনোভেট করতে দেবাশিস যেদিন এল, বাইরে গাড়িটা দাঁড় করিয়ে চতুর পায়ে শচীনের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে দেখছিল বাড়িটা। চোখে উগ্র স্পৃহা, চলাফেরায় কেজো লোকের তাড়া। শচীন বাড়িটা ঘুরে দেখাচ্ছিল। কোথায় দেয়াল ভেঙে ব্যালকনি হবে, কোথায় মেঝের টালি পালটাতে হবে। কোথায় নতুন ঘর তুলতে হবে, আর কেমনভাবে সাজাতে হবে, পুরোনো বাড়িটাকে আধুনিক করে তুলতে। শচীনের সঙ্গেই এই লম্বাপানা সুগঠন লোকটাকে অহংকারী তৃণা খুব হেলাভরে এক-আধপলক দেখেছে, লক্ষ্য করেনি। শচীনই তাকে ডাকে, তৃণা, তোমার যে কী সব প্ল্যান আছে তা দাশগুপ্তকে সব বুঝিয়ে দাও···

চায়ের টেবিলে ওরা তখন বসেছে। মুখোমুখি দেবাশিস। তৃণা তার দিকে একপলক তাকিয়েই মুখ নীচু করে প্যাডে একটা স্টাডি রুমের ছবি এঁকে দেখাতে যাচ্ছিল, দেবাশিস একটু ভোম্বলের মতো তাকিয়ে থেকে বলে—তৃণা না?

তৃণা চমকে উঠেছিল। তাকিয়ে একটু কষ্টে চিনতে পেরেছিল দেবাশিসকে। ছেলেবেলার কথা, চিনতে তো কষ্ট হবেই।

শচীন বলে—চেনেন নাকি?

দেবাশিস বড় চোখে চেয়ে বলে—চেনা কঠিন বটে, তৃণার তো এতকাল বেঁচে থাকার কথাই নয়। যা ভুগত, ভেবেছিলাম মরে-টরে গেছে বুঝি এতদিনে।

—বটে! বলে শচীন হাসে।

—বটেই তো! দেবাশিস অবাক হয়ে বলে—আমাদের মফঃস্বল শহরে পাশাপাশি বাস ছিল। ওর সব কিছু আমি জানি। ছেলেবেলায় দেখতুম, ও হয় বিছানায় পড়ে আছে, নাহলে বড়জোর বারান্দা কি উঠোন পর্যন্ত এসে হাঁ করে অন্য খেলুড়িদের খেলা

দেখছে। কখনো আমাশা, কখনো টাইফয়েড, কখনো নিউমোনিয়ায় যায়-যায় হয়ে যেত, আবার বেঁচেও থাকত টিক-টিক করে। আমরা যখন ও শহর ছেড়ে চলে আসি তখন ও বোধহয় ম্যালেরিয়ায় ভুগছে। আমার মা প্রায়ই দুঃখ করে বলত মদনবাবুর মেজ মেয়েটা বাঁচলে হয়।

তৃণা ভারী লজ্জা পেয়েছিল। সত্যিই সে ভুগত। বলল—আহা, সে তো ছেলেবেলায়।

—তারপর তো আর তোমাকে দেখিনি। আমাকে চিনতে পারছো তো!

—পারছি!

—বলো তো কে!

—রাজেন জ্যাঠার ছেলে।

দেবাশিস হঠাৎ হাহা করে হেসে বলে—রাজেন জ্যাঠা আবার কি! আমার বাবাকে ঐ নামে কেউ চিনতই না। হাড়কেপ্পন ছিল বলে বাবার নাম সবাই দিয়েছিল কেপ্পন দাশগুপ্ত। সেটা সংক্ষেপ হয়ে হয়ে লোকে বলত কেপুবাবু। আমাদেরও ছেলেবেলায় কেউ কোন বাড়ির ছেলে জিজ্ঞেস করলে বলতুম—আমি কেপুবাবুর ছেলে।

তৃণার সবটাই মনে আছে। যারা রোগে ভোগে তাদের স্মৃতিশক্তি প্রখর হয়। কেপুবাবুর ছেলে দেবাশিসকে সবাই চিনত ডানপিটে বলে। অমন হারামজাদা পাজি ছেলে বড় একটা দেখা যায় না। যত ছেলেবেলার কথা বলে উল্লেখ করেছিল দেবাশিস তত ছেলেমানুষ ছিল না। তখন রোগে-ভোগা তৃণার বয়স বছর তের দেবাশিসের উনিশ কুড়ি। পাড়ার সব মেয়েকেই চিঠি দিত দেবাশিস, একমাত্র রোগজীর্ণ তৃণাকে তেমন গুরুত্ব দেয়নি বলে চিঠি লেখেনি। বহুকাল পরে সেই উপেক্ষিত মেয়েটিকে পরিপূর্ণ ঘরসংসারের চালচিত্রের মধ্যে দেখে তার বিস্ময় আর শেষ হয় না।

বলল—মেয়েদের মুখ আমার ভীষণ মনে থাকে। নইলে তোমাকে চেনবার কথা নয়। বেঁচে আছো, তাই বিশ্বাস হতে চায় না। শচীনবাবুর ভাগ্যেই বোধহয় বেঁচে আছো। ম্যারেজেস

আর মেড ইন্ হেভেন। তুমি না বেঁচে থাকলে শচীনবাবুকে আজও ব্যাচেলার থাকতে হত।

ঘটনাটা এরকম নিরীহভাবেই শুরু হয়েছিল। ইনডেক তাদের বাড়িটা ভেঙে মেরামত করছে, সাজিয়ে দিচ্ছে, ব্যালকনি বানাচ্ছে, জানালা বসাচ্ছে—সেইসব তদারক করতে সপ্তাহে এক-আধবার আসত দেবাশিস। ভারী ব্যস্ত ভাবসাব, চটপটে কেজো মানুষের মতো বিদ্যুৎগতিতে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় চলে যেত। গম্ভীর, পদমর্যাদা সম্বন্ধে সচেতন দেবাশিস কোনোদিকে তাকাত না। দেখাশোনা শেষ করে কোনোদিন তৃণাকে ডেকে বলত—চলি। কোনোদিন বা দূরত্বসূচক হাল্কা গলায় বলত চা খাওয়াবে নাকি কাদম্বিনী?

ও নামটা সে নিয়েছিল রবি ঠাকুরের 'জীবিত ও মৃত' গল্প থেকে। 'কাদম্বিনী মরিয়া প্রমাণ করিল যে সে মরে নাই।' একদিন লাইনটা উদ্ধৃত করে দেবাশিস বলেছিল—তুমি হচ্ছ সেই মানুষ, মরোনি প্রমাণ করার জন্যই বেঁচে আছো, কিন্তু কি জানি, বিশ্বাস হতে চায় না।

উল্টে তৃণা এলিয়েটের লাইন বলেছে—আই অ্যাম ল্যাজারাস, কাম ফ্রম দি ডেড্, কাম্ টু টেল্ ইউ অল্, আই শ্যাল টেল্ ইউ অল···

শচীন সবসময় বাড়ি থাকে না। রেবা আর মনু বড়লোকের ছেলেমেয়ে যেমন হয় তেমনি নিজেদের ব্যাপার নিয়ে ব্যস্ত থাকে। তৃণা সারাদিন একা। সে ক্যারাম খেলতে পারে, টেবিল-টেনিস খেলতে পারে, একটু আধটু ছবি আঁকে, কবিতা লেখে। কিন্তু কোনোটাই তার সঙ্গী নয়! এবং কবিতার বই খুলে বসলে একরকম দূরের অবগাহন হয় তার। দেবাশিস নামকরা আর্টিস্ট, দুটো ফ্লপ ছবির পরিচালক, বাংলাদেশে বুদ্ধিজীবী মহলে তার গভীর যোগাযোগ। তৃণার সেইটেই অবাক লাগত। ঐ ফাজিল, মেয়েবাজ, এঁচোড়েপাকা ছেলেটির মধ্যে এসব এল কোত্থেকে।

কখনো চা বা কফি খেতে বসে দেবাশিস বলত—তৃণা তোমার সত্যিই কিছু বলার আছে?

তৃণা অবাক হয়ে বলেছে—কী বলার থাকবে?

—ঐ যে বলো, আই শ্যাল টেল ইউ অল।

—যাঃ, ও তো কোটেশন।

—মানুষ যখন কিছু উদ্ধৃত করে তখন তার সাবকনশাসে একটা উদ্দেশ্য থাকে।

—আমার কিছু নেই।

দেবাশিস গম্ভীর হয়ে কি যেন ভাবত।

রেবার জন্মদিনে সেবার দেবাশিসকে সস্ত্রীক নেমন্তন্ন করেছিল তৃণা। দেবাশিসের বৌ এল তার সঙ্গে। মানানসই বৌ। ভাল গড়ন, লম্বাটে চেহারা। রং কালো, মুখশ্রী খারাপ নয়। কিন্তু সারাক্ষণ কেবল টাকা আর গয়না আর গাড়ি আর বাড়ির গল্প করল। বুদ্ধি কম, নইলে বোঝা উচিত ছিল, যে বাড়িতে বসে বড়লোকী গল্প করছে সে বাড়ি তাদের তিনগুণ ধনী। হঠাৎ যারা বড়লোক হয় তারা টাকা দিয়ে কী করবে বুঝতে পারে না, হা-ঘরের মতো বাজার ঘুরে রাজ্যের জিনিস কিনে ঘরে জঙ্গল বানায়, বনেদী বড়লোকেরা ওরকমভাবে টাকা ছিটোয় না, গরম দেখায় না। দেবাশিসের বৌ চন্দনা টাকায় অন্ধ হয়ে চোখের সামনে নিজেকে ছাড়া আর কাউকে দেখতে পাচ্ছিল না। মুখে বেড়ালের মতো একটা আহ্লাদী ভাব, চোখে সম্মোহন, বার বার স্বামীকে ধমক দিচ্ছিল। অনেক অতিথি ছিল বাড়িতে। ওদের সঙ্গে বেশিক্ষণ সময় কাটাতে পারেনি তৃণা। অল্প যেটুকু সময় কাটিয়েছিল তাতে বড় লজ্জা করেছিল। দেবাশিসের বৌ বস্তুজগৎ ছাড়া আর নিজের সুখদুঃখ ছাড়া কোনো কিছুর খবর রাখে না।

এসব বছর-দুই আগেকার ঘটনা। বাড়ি রিনোভেট করা সদ্য শেষ হয়েছে তখন। নতুন হয়ে ওঠা বাড়ি ঝলমল করছে। তৃণা নিজের ঘরটা বেশী সাজায়নি। বেশী সাজানো ঘর তার পছন্দ নয়। তাতে তার মনের ধূসরতা নষ্ট হয়ে যায়। একটা সাদাসিধে নরম রঙ, আর আলো-হাওয়ার ঘরই তার ভাল লাগে। ভাল লাগে বিষণ্ণতা, একা থাকা, কবিতা।

দেবাশিস বলেছিল—তৃণা, ইনডেক তোমার কিছু করতে পারল না, একটা ব্যালকনি ছাড়া।

—আমার জন্য ইনডেকের কিছু করার নেই যে,আমি ডেকরেশন ভালবাসি না।

—জানি। তুমি ক্লায়েণ্ট হিসাবে যাচ্ছেতাই।

তৃণা হেসেছিল একটু।

বিপজ্জনক দেবাশিস দাশগুপ্ত বলল—কিন্তু মেয়ে হিসেবে ইউনিক। ঠিক বয়সটিতে ঠিক সময়ে তোমার সঙ্গে দেখা হলে বড় ভাল হত।

তৃণা ভয় পেয়ে বলে—ইস্!

দুঃখের মুখ করে দেবাশিস বলে—আমার বৌকে তো দেখেছো!

—দেখলাম।

—কেমন?

—সুন্দর।

—সুন্দর কিনা তা কে জিজ্ঞেস করেছে?

—তবে?

স্বভাবের কথা বলছি।

—বাঃ! তা কী করে বলব! একবার তো মোটে দেখেছি, বেশী কথাবার্তা হয়নি। তবে স্বভাব খারাপ নয় তো।

—ও টাকা আর স্ট্যাটাস ছাড়া কিছু বোঝে না, কোন অনুভূতি নেই।

—তাতে কী! সব মেয়েই ওরকম।

—তুমি তো নও?

তৃণা বিষণ্ণ হয়ে বলেছে—আমার কথা ছেড়ে দাও, বহুদিন রোগে ভুগে আমি একটু অ্যাবনরমাল। আমি যে বেশি ভাবি, বেশি চুপ করে অন্যমনস্ক থাকি, কবিতা লিখি—এসব আমার অস্বাভাবিক মন থেকে তৈরী হয়েছে। এ বাড়ির কেউ আমাকে তাই পছন্দ করে না। ছেলেমেয়েরা পর্যন্ত ইন্টেলেকচুয়াল মা বলে ক্ষ্যাপায়।

—হবে।

—শোনো, নিজের বৌয়ের নিন্দে বাইরে কোরো না। ওটা রুচির পরিচয় নয়। যেমনটি পেয়েছো তেমনটির সঙ্গেই মানিয়ে চলো। তুমি বড় ছটফটে, চঞ্চল, বহু মেয়েকে চিঠি দিতে। অত মন তুলে নাও কী করে? তোমার যাকে-তাকে হুট করে ভাল লাগে,

আবার হুট করে অপছন্দ হয়ে যায়। মনটা কোথাও একটু স্থির না করলে সারা জীবন ছুটে বেরাতে হবে।

দেবাশিস মৃদু হেসে বলে—তুমি এত কথা জানলে কি করে। আমি তো এখনো তেমন করে বৌয়ের নিন্দে তোমার কাছে করিইনি। কী একটা বলতে শুরু করেছিলাম তুমি আগ বাড়িয়ে এককাঁড়ি কথা বললে।

ভারী লজ্জা পেয়ে গেল তৃণা। আসলে তার মন বড় বেশী কল্পনাপ্রবণ, একটু কিছু ঘটলেই তার পিছনে একটা বিশাল কার্য-কারণ ভেবে নেওয়া তার স্বভাব। একবার আলমারী আর বাক্সের এক থোকা চাবি হারিয়ে ফেলেছিল সে, তার আগের দিন বাড়ির একটা দোখনো চাকর বিদেয় হয়েছে। চাবিটা চেনা জায়গায় খুঁজে না পেয়েই তৃণা ভাবতে বসল, এ নিশ্চয়ই সেই চাকরটার কাজ। জিনিসপত্র কিছু হাতাতে না পেরে চাবিটা নিয়ে পালিয়েছে। এরপর গাঁয়ের লোক জুটিয়ে একদিন ফাঁক বুঝে হাজির হবে। তৃণাকে মেরে রেখে ডাকাতি করে নিয়ে যাবে। কাল্পনিক ব্যাপারটাকে এতদূর গুরুত্ব দিয়ে সে প্রচার করেছিল যে শচীন বাধ্য হয়ে থানা-পুলিশ করে! চাকরটার গাঁয়ে পর্যন্ত পুলিশকে সজাগ করা হয়। কিন্তু তিনদিনের মাথায় বাথরুমে সাবানের খোপে চাবিটা তৃণাই খুঁজে পায়।

তার মন ঐরকমই, দেবাশিসকে সে প্রায় অকারণে বৌয়ের ব্যাপারে দায়ী করেছে, দেবাশিস তার প্রেমে পড়ে গেছে গোছের চাপা একটা আশঙ্কাও প্রকাশ করে ফেলেছে। লজ্জা পেয়ে সে বলে—আমার কেমন যেন মনে হয় তোমাকে। সাধারণ জীবনে তুমি খুশী নও।

দেবাশিস শ্বাস ফেলে বলেছে—তা ঠিকই। তবে খুব ভয়ের কিছু নেই।

যাই বলুক, ব্যাপারটা অত নিরাপদ ছিল না। এটা বোঝা যেতই, দেবাশিস তার বৌকে ভালবাসে না। অন্য দিকে তৃণাকে ভালবাসে না শচীন। কিংবা তৃণার কল্পনাপ্রবণ মন যেন সেইটাই ভেবে নেয়। মিথ্যে নয় যে, তৃণার একথা ভাবতে ভালই লাগত যে শচীন তাকে ভালবাসে না, রেবা ভালবাসে না, মনু ভালবাসে না।

সংসারে কেউ তাকে ভালবাসে না। সে একা, সে বড় দুঃখী। তার এই দুঃখের কোনো ভিত্তি থাক বা না থাক, একথা ভাবতে তার ভাল লাগত। এই দুঃখই তাকে সবচেয়ে বড় রোমান্টিক সুখটা দিত। দুঃখের চিন্তা বা চিন্তার দুঃখ কারো কারো কাছে বড় সুস্বাদু।

দেবাশিস সেই রন্ধ্রপথের সন্ধান পেয়েছিল। এ বাড়ির অনেক ফাটা ভাঙা দুর্বল স্থান সে যেমন খুঁজে বের করে মেরামত করে ঢেকে সাজিয়ে দিয়ে গেছে, তেমনি তৃণার সঠিক দুর্বলতাটুকু জেনে নিল সে, অনায়াসে। কিন্তু সারিয়ে দিয়ে গেল না, বাড়িয়ে দিয়ে গেল।

তৃণার মন এমনই একটা কিছু চেয়েছিল। কোনো অঘটন, একটু পতন, একটু পাপ সামান্য অপরাধবোধ উজ্জ্বলতম রঙের মতো স্পষ্ট করে দেয় জীবনকে। তার সেই দুর্বলতা দেবাশিস ফুলের মতো চয়ন করে নিজের বাটনহোলে সাজাল লাল গোলাপের মতো। গোলাপটা লাল কেন? তৃণা ভেবে দেখেছে। লোকলজ্জার রাঙা আভায় তা লাল! কিছু পাপ কালো, কিছু পাপ রাঙা।

রাঙা শাড়িটা পরে নিল তৃণা। সাজল। ঘড়িতে এখনো বেশি বাজেনি, সময় আছে। থাকগে। তৃণা একটু ঘুরবে। তারপর বাসস্টপে গিয়ে দাঁড়াবে।

পেট্রল পাম্পে গাড়িটা দাঁড় করিয়ে নেমে দেবাশিস আড়মোড়া ভেঙে হাই তুলল। হাই তুলতে তুলতেই বলল—বিশ লিটার। বলে পকেট থেকে ক্রেডিট কার্ডটা বের করে দিল।

রবি নেমে আইসক্রীমের স্টলটার কাছে চলে গিয়েছিল। সেখান থেকে চেঁচিয়ে বলে—বাবা, বন্ধ যে!

—কী আর করা যাবে।

রব বুটের শব্দ তুলে ছুটে আসে—আজ কেন বন্ধ?

—একটু পরে খোলে। চলো, তোমাকে ক্যান্ডি কিনে দেবো!

গাড়ির ভিতর থেকে চাঁপা ডেকে বলে—সোনাবাবু, তোমার জন্য আমি তো খাবার এনেছি, বাইরের জিনিস তবে কেন খাবে?

রবি তার বাবার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ছোটো চোখে বাবাকে একটু দেখল। প্যান্ট শার্ট পরা দীর্ঘকায় বাবা, গলায় একটা সিল্কের ছাপা সাদা-কালো স্কার্ফ। একটু অন্যমনস্ক হয়ে বাবা জুতোর আগাটা তুলছে নামাচ্ছে, পকেটে হাত, ভ্রূ কোঁচকানো।

রবি ডান পা বাড়িয়ে, ডান হাত মুঠো করে তুলে মুখ আড়াল করে দাঁড়ায়। তারপর বাঁ হাত বাড়িয়ে বক্সিংয়ের স্ট্যান্স তৈরী করে এগিয়ে এসে বাঁ হাতটা বাবার পেটে চালিয়ে দিয়ে শব্দ করে—হোয়্যাম্!

দেবাশিষ কোলকুঁজো হয়ে সরে যায়। তারপর সেও ফিরে দাঁড়ায়। অবিকল রবির মতো স্ট্যান্স নিয়ে এগিয়ে ভুয়ো ঘুঁষি মারে তার মুখে, রবি চট্ করে মুখটা সরিয়ে নিয়ে ঘুরে এগিয়ে আসে। নিঃশব্দে দুজন দুজনের দিকে চোখ রেখে চক্কর খায়, ঘুঁষি চালায়। চাঁপা গাড়ি থেকে মুখ বের করে স্মিত চোখে চেয়ে থাকে। পেট্রল ভরতে ভরতে পাম্পের অ্যাটেনডেন্ট খুব হাসে।

দেবাশিস পেটে একটা ঘুঁষি খেয়ে উবু হয়ে বসে পড়ে। সামনে তেজী বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে রবি রেফারির মতো গুণতে থাকে ওয়ান···টু···থ্রি···নাইন আউট! বলে শূন্যে আঙুল তোলে রবি।

দেবাশিস উঠে দাঁড়ায়। হাত বাড়িয়ে বলে কংগ্র্যাচুলেশনস ফর জাস্ট বিয়িং দা নিউ হেভীওয়েট চ্যাম্পিয়ন অব দা ওয়ার্ল্ড।

থ্যাংকস্। রবি হাতটা ধরে ঝাঁকিয়ে দেয়। মৃদু হাসে। তারপর আস্তে করে বলে—মে আই পুট থ্রু এ টেলিফোন্ কল?

—টু হুম?

—মাই ফ্রেন্ড রঞ্জন।

—গো এহেড।

দ্বিধাহীন গটমটে পায়ে রবি কাচের দরজা ঠেলে গিয়ে অফিস

ঘরে ঢোকে। ফোন তুলে নেয় চালাক চতুর ভঙ্গিতে। দেবাশিস কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ায়। শুনতে পায় রবি বলছে—হেল্লো, ইজ রঞ্জন অ্যারাউন্ড?…ইয়েস, রঞ্জন, দিস ইজ রবি—আউট ফর ফান…ফার্স্ট টু জু, দেন টু মণিমা অ্যাট মানিকতলা…ইয়েস। ওঃ নো, নট মহেশতলা, মানিকতলা…এম ফর…এম ফর…

দরজার কাছ থেকে দেবাশিস প্রম্পট করে—মীরাট।

চোখের কোণ দিয়ে দেবাশিসকে একবার দেখে নিয়ে মাথা নাড়ে রবি। ফোনে বলে—এম ফর মাদার। এ ফর—

—এলাহাবাদ। বলে দেবাশিস।

—এলাহাবাদ। রবি প্রতিধ্বনি করে—অ্যান্ড এন ফর নিউ দিল্লী, আই ফর ইণ্ডিয়া।

দেবাশিস আস্তে সরে আসে। গাড়ির দরজা খুলে ভেতরে বসে! অন্যমনস্কভাবে একটা সিগারেট ধরায়। কথাটা কানে বিঁধে থাকে। এম. ফর মাদার।

রবি যখন গাড়িতে এসে উঠল দেবাশিস একটু গম্ভীর। গাড়ি ছেড়ে চালাতে চালাতে বলে—তুমি ওভাবে স্পেলিং করছিলে কেন? ফোনে স্পেলিং করতে জায়গার নাম বলাই সুবিধে। মাদার কি কোনো জায়গা?

রবি একটু শিশু হাসি হাসে। বলে—জায়গাই তো?

—জায়গা? মাদার আবার কি রকম জায়গা?

—যেমন মাদারল্যান্ড!

দেবাশিস হাসে। তারপর শ্বাস ছেড়ে বলে—কিন্তু তুমি তো শুধু মাদার বললে, ল্যান্ড তো বলোনি।

লজ্জায় দু হাতে চোখ ঢেকে একটু হাসে রবি! বলে—ভুল হয়েছিল।

গভীর একটা শ্বাস ফেলে দেবাশিস। রবি এখনো ভোলেনি, শুধু চেপে আছে। ওর ভিতরে হয়তো কষ্ট হয় মায়ের জন্য। কে জানে!

রবি সীটের ওপর হাঁটু মুড়ে বসেছে, মুখে আঙুল, দুলছে সীটের ওপর। চাঁপা সতর্ক গলায় বলে—পড়ে যাবে সোনাবাবু।

—তোমার কেবল ভয়। বলে রবি ইচ্ছামতো দোল খায়, বলে —বাবা, আমি পিছনের সীটে বসব, দিদির কাছে?

—যাও। দেবাশিস অন্যমনস্কভাবে বলে।

চাঁপা হাত বাড়িয়ে সীটের ওপর দিয়ে পিছনে টেনে নেয় রবিকে।

সারাক্ষণ এরকমই করে রবি। একবার পিছনে যায়, একবার সামনে আসে। দুষ্টু হয়েছে খুব! কিন্তু দেবাশিস ওকে বকে না। মায়া হয়। ওর কি বড় মায়ের কথা মনে পড়ে?

দেবাশিস চন্দনাকে পছন্দ করে বিয়ে করেছিল। একটা সময় অনেক মেয়ের সঙ্গে ভাব ছিল তার। কাকে বিয়ে করবে তার কিছু ঠিক ছিল না। চন্দনা ছিল সেসব মেয়েদের মধ্যে সবচেয়ে দুঃসাহসী আর কৌশলী। কুমারী অবস্থায় সে গর্ভে দেবাশিসের সন্তান নেয়। সেই অবস্থায় তাকে ফেলতে পারার সাধ্য দেবাশিসের হয়নি। চন্দনা সন্তান নষ্ট করতে দেয়নি। বলেছে—তুমি যদি বিয়ে না করো না করবে, ও আসুক কুমারী মায়ের কোলে।

সেটাই ছিল ওর কৌশল। দেবাশিস দু'মাসের গর্ভবতী চন্দনাকে বিয়ে করে আনল। যথাসময়ে রবি হ'ল। ওর চার বছর বয়স পর্যন্ত বেঁচে ছিল চন্দনা।

বড় রাগী ছিল, ভেবেচিন্তে কিছু করত না।

তৃণার সঙ্গে দেবাশিসের সম্পর্কটা তখনো তৈরী হয়নি। তৃণা মাঝে-মধ্যে তাকে ডাকত ছবি আঁকার সুলুকসন্ধান জানতে। ওটা তখন তার বাই। জলরঙা ছবি আঁকতে গিয়ে তুলির জ্যাবড়া দাগ আর অসহিষ্ণু টান দিয়ে হয়রান হত। দেবাশিস তাকে তুলি চালাতে শিখিয়েছিলে। দুটো রঙের মাঝখানে কি ভাবে একটা রঙের সঙ্গে আর একটাকে মেলাতে হয় তার কৌশল অভ্যাস করাত। কিন্তু তাতে সময়টা নিত বড্ড বেশি। ব্যস্ত দেবাশিস তার অর্থকরী সময়টা যে নষ্ট করছে তা খেয়াল করত না। বড় ভাল লাগত।

তৃণা দেখতে খুব সুন্দর তা তো নয়, উপরন্তু বিবাহিতা, দুটি বড় বড় সন্তানের মা, এমন মেয়ের প্রতি আকর্ষণবোধ বড় অদ্ভূত দেবাশিসের পক্ষে। সে তো মেয়ে কিছু কম দেখেনি। তৃণার প্রতি এই দুর্বলতার তবে কারণ কি?

কারণ একটাই, কৈশোরকাল। সেই বয়সটার যাবতীয় স্মৃতিই বড় মারাত্মক। তৃণার মধ্যে আর কিছু না থাক, ছিল সেই স্মৃতির সৌরভ তাকে ঘিরে। রোগা দুঃখী সেই কিশোরী মেয়েটাকে সে কবে ভুলে গিয়েছিল। দুরন্ত সময় তাকে নতুন করে ফিরিয়ে এনেছে তার কাছে। আর একটা কারণ চন্দনা নিজে।

তৃণার সুখের ঘর কেন ভাঙতে যাবে দেবাশিস? সে ভাল লোক ছিল না কোনোদিনই। তবু তার তো রুচি ছিল। সুযোগ পেলে সে যে-কোনো মেয়েকেই উপভোগ করে, সন্দেহ নেই। কিন্তু পাগল হয় না তো কারো জন্য! আর তৃণা পাগল-করা মেয়েও নয়। যদিও তৃণার বয়স গড়িয়ে যায়নি, তবু তো ছেলেমেয়ের মা, গিন্নিবান্নি! এখন কি আর চোখে রঙ ছুঁড়ে দেয়ালা করে কেউ? ছবি-আঁকার ছলে তারা পরস্পরের দীর্ঘ-শ্বাস শুনেছিল। এক-জনের ছিল শচীন, অন্যজনের ছিল চন্দনা। তবু এও ঠিক, পৃথিবীতে কেউ কারো নয়।

দেবাশিস একটা জীবন যদি মেয়েবাজি না করত তবে তার চরিত্রে রাশ টানার অভ্যাস হত। কিংবা যদি চন্দনা হত মনের মত বৌ, তবে রাশ টানতে পারত চন্দনাই।

তা হল না। চন্দনা তাকে ঘরে টিকতে দিত না। কেবলই বলত—কোথায় ছবি আঁকা হচ্ছে, সব আমি জানি। তুমি মরো।

তখন সুন্দর ফ্ল্যাটটায় বাস করে তারা। লিফ্‌টে ওঠে নামে। গ্যারেজে গাড়ি। রবি তখন অজস্র কথা বলে। সংসারটা সবে জমে উঠেছে।

একদিন ছুটির সকালে চন্দনা দেরি করে ঘুম থেকে উঠল। রবি ঘুমন্ত মাকে জ্বালাচ্ছিল খুব। উঠেই ঘা কতক দিল রবির পিঠে। যখন মারত তখন বড় নির্মমভাবে মারত, মায়া করত না, আবার একটু পরেই থামলে আদর করত। চন্দনার মাথায় একটু ছিট তো ছিলই।

সেদিন সকাল থেকেই চন্দনা বিগড়ে গেল।

দেবাশিস রোজকার মতো বসেছিল তার বাইরের ঘরে। সামনে খোলা স্টেটস্‌ম্যান, টুলের ওপর রাখা পা, পায়ের পাশে কফির কাপ।

চন্দনা এসে স্টেটস্‌ম্যানটা কেড়ে নিল হাত থেকে। বলল—কী ভেবেছো তুমি ?

—কী ভাববো। ক্লান্ত দেবাশিস জবাব দেয়।

—কত লোক অন্যায় করে ধরা পড়ে। তুমি কেন পড়ো না ?

দেবাশিসের মনে পড়ে, সে সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাইটা হাত বাড়িয়ে নিয়েছিল। মনে মনে প্রার্থনা করেছিল—হে ঈশ্বর, চন্দনা কেন বেঁচে আছে ? মুখে বলেছিল—চুপ করো।

চন্দনা চুপ করল না। অসম্ভব রেগে গেল। উল্টোপাল্টা বকতে লাগল দেবাশিসকে। গালাগাল দিল অজস্র। অবশেষে কাঁদল এবং কাঁদতে কাঁদতেই অসংলগ্ন বকতে লাগল একা—তুমি আমার বাবাকে ঠকিয়েছো—আমার ছেলেকে ঠকিয়েছো—তুমি আমাকে লুকিয়ে টাকা জমাও—

এসব কথা বাস্তব সত্য নয়। কোনো মানেও হয় না। ডাক্তার ডাকা হল। ডাক্তার মত দিল—অজস্র মাথাধরার বড়ি, ঘুমের পিল, তার ওপর নিজের নির্ধারিত অসুখের জন্য নিজস্ব প্রেসক্রিপশনে খাওয়া ওষুধ, দুশ্চিন্তা উদ্বেগ—সব মিলেমিশে একটা নার্ভাস ব্রেকডাউন হয়েছে।

সেই মানসিক ভারসাম্যহীনতা আর স্নায়ুর বিকার থেকে কোনোদিনই সুস্থ হতে পারেনি চন্দনা। একদিন মরল। সাততলা থেকে সোজা লাফিয়ে পড়ল। তখন খুব ভোর। দেবাশিস আর রবি তখনো ওঠেনি।

দেবাশিস অবশ্য ছাড়া পেয়ে গেল কোর্ট থেকে। কিন্তু বেঁচে চন্দনা যতটা না ছিল, মরে তার চেয়ে ঢের বেশী ফিরে এল জীবনে। তাকে ভুলতেই তখন তৃণার পিপাসা ইচ্ছে করে খুঁচিয়ে তোলে দেবাশিস। যা অবৈধ তার মতো মাদক আর কি আছে !

—বাবা ! রবি ডাকে।

—উঁ। দেবাশিস অন্যমনস্ক উত্তর দেয়।

—চিড়িয়াখানায় আমরা কেন যাচ্ছি ?

—যাবে না ?

—অনেকবার গেছি তো। ভাল লাগে না।

বিস্মিত দেবাশিস প্রশ্ন করে—তবে কোথায় যাবে ?

রবি লজ্জার সঙ্গে বলে—বেড়াতে ইচ্ছে করছে না।

—তবে?

—মণিমার কাছে চলো।

—ও! দেবাশিস গাড়ী ধীর করে একটু হাসে। তারপর মাথাটা ঝাঁকিয়ে বলে—ঠিকই তো! সব ছুটির দিনে চিড়িয়াখানা কি আর ভাল লাগে!

—ফিরে যাই চলো।

দেবাশিস মাথা নেড়ে বলে—পার্ক স্ট্রীটের কোন্ রেস্টুরেণ্টে কী যেন খাবে বলেছিলে। খাবে না?

রবি তার চালাক হাসিটা হেসে বলে—পিপিং।

দেবাশিস বুঝদারের মতো মাথা নেড়ে বলে—যাবে না?

—যাবো। বুড়োদা, নিনকু, পল্টু, বাপি, ঝুমু আর নানির জন্য নিয়ে যাবো। ওদের বলেছিলাম এই রবিবারে পিপিঙের খাবার খাওয়াবো।

—হ্যাঁ?

—হ্যাঁ। রবি হাসে।

স্নিগ্ধ চোখে তার দিকে চেয়ে থাকে দেবাশিস। গাড়ি ঘুরিয়ে নেয়।

—বাবা।

—উঁ।

—মণিমা আমাকে খুব ভালবাসে।

—জানি তো।

—বুড়োদা, নিনকু, পলটু সবাই।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ খুব ভালবাসে। গেলে ছাড়তেই চায় না। বলে—তুই আমাদের কাছে থাক।

—ও।

—আমি কেন ওদের কাছেই থাকি না বাবা? মণিমা সকলের চেয়ে আমাকে বেশী ভালবাসে।

দেবাশিস সামান্য গম্ভীর হয়ে যায়। প্রথমটায় কথা বলতে পারে না। অনেকক্ষণ রবি নিঃশব্দে বাবার মুখখানা চেয়ে

দেখে। মুখ দেখে বোধ হয় বুঝতে পারে, বাবা খুশী হয় নি।

পিছন থেকে চাঁপা বলে—তুমি বড়িতে না থাকলে আমরা কার কাছে থাকবো সোনাবাবু? বাবার যে তোমাকে ছাড়া ভীষণ মন খারাপ হয়।

—অল্প ক'দিন থাকবো। রবি উত্তর দেয়।

—তারপর চলে আসবে? চাঁপা প্রশ্ন করে।

—হ্যাঁ। আমিও তো বাবাকে ছেড়ে থাকতে পারি না।

ময়দানের ভিতর দিয়ে গাড়ি উড়িয়ে দেয় দেবাশিস। এম ফর মাদার--কথাটা ভুলতে পারে না সে। তার ফ্ল্যাটবাড়িতে চন্দনার কোন ফটো নেই। ইচ্ছে করেই চন্দনার সব ফটো সে তার লকারে চাবি দিয়ে রেখেছে, যাতে রবির চোখে না পড়ে। এই বয়সে মাতৃহীনের মায়ের কথা বেশী মনে পড়া কষ্টকর। চন্দনার শাড়ি পোশাক রূপটানের সব জিনিসপত্র, তার হাতের লেখা কাগজ কিংবা যত চিহ্ন ছিল সবই সরিয়ে দিয়েছে দেবাশিস, শাড়িগুলি বিলিয়ে দিয়েছে একে ওকে। মানিকতলার বোন ফুলিকে কয়েকটা দামী শাড়ি দিয়েছিল, ও নিতে চায়নি তবু জোর করে দিয়েছিল দেবাশিস—পড়ে থেকে নষ্ট হবে, তুই পর।

একদিন মনের ভুলে ফুলি একটা জয়পুরী ছাপওলা সিল্কের শাড়ি পরেছিল রবির সামনে। রবি হাঁ করে কিছুক্ষণ দেখল শাড়িটা, তারপর মুখখানায় হাসি-কান্না মেশানো একরকম অদ্ভুত ভাব করে বলল—মণিমা, আমার মায়ের ঠিক এরকম একটা শাড়ি ছিল।

শিশুদের মনের খবর রাখা খুবই শক্ত। ওদের স্মৃতি কত দূরগামী, কত ছবির মতো স্পষ্ট ও নিখুঁত তা বুঝতে পেরে একরকম অদ্ভুত যন্ত্রণা পেয়েছিল দেবাশিস। পারতপক্ষে সে তার মায়ের কথা বলে না। জানে, সে মায়ের কথা বললে তার বাবা খুশি হয় না। এতটা বুদ্ধি ঐ শিশুমাথায়!

বুকের ভিতরটা চল্‌কে ওঠে দেবাশিসের। ছেলের প্রতি হঠাৎ ভালোবাসায় ছট্‌ফট্ করে। পার্ক স্ট্রীটের একটা বড় রেস্টুরেন্টের সামনে গাড়ি থামিয়ে রবিকে নিয়ে নামে। রেস্টুরেন্টে

বসে মেনুটা রবির দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে—তোমার যা ইচ্ছে হয় অর্ডার দাও। যা খুশি।

বলে ছেলের দিকে চেয়ে থাকে।

রবি অবাক হয়ে বাবার দিকে চায়। মিট্‌মিটে চোখে বাবার মুখখানা দেখে বলে—আমার তো খিদে নেই।

দেবাশিস হতাশ হয়ে বলে—সে কী?

রবি মাথা নেড়ে বলে—দিদি সকালে কত খাইয়েছে! বলতে বলতে গেঞ্জিটা ওপর দিকে তুলে পেটটা দেখিয়ে বলে—পেট দ্যাখো কেমন ভর্তি।

দিনের মধ্যে একশবার রবির গায়ে হাত দিয়ে দেখত চন্দনা, টেম্পারেচার আছে কিনা! রবির গায়ে হাত দিয়ে আবার নিজের গা দেখত, কখনো বা দেবাশিসকে ডেকে বলত—দেখি তোমার গা, রবির চেয়ে ঠান্ডা না গরম।

সব মায়েরই এই বাতিক থাকে। তার নিজের মায়েরও ছিল। আরও, দিনে একশবার রবিকে খাওয়ানোর জন্য মাথা কুটত চন্দনা, খাইয়ে পেট দেখত। খেতে না চাইলে অনুনয়-বিনয়, খোশামোদ, তারপর কিলচড় কষাত। বলত—না খেয়ে একদিন শেষ হয়ে যাবি। আমি মরলে আর কেউ তোর খাওয়া নিয়ে ভাববে ভেবেছিস?

খাওয়ার ব্যাপার হলেই ছোট্ট রবি মাকে পেট দেখাত।

গেঞ্জিটা নামিয়ে করুণ চোখে চেয়ে রবি বলে—খাবো না বাবা।

দেবাশিস একটা শ্বাস ফেলে বলে—আচ্ছা।

—বাবা।

—উঁ।

—মণিমা তো মুর্গী খায় না।

—দেবাশিস খেয়াল করল। বলল—তাই তো! কিন্তু অর্ডার দিয়ে দিলাম যে।

—মণিমার জন্য কী দেবে?

—তুমিই বলো।

—সন্দেশ আর দৈ, হ্যাঁ বাবা?

—আচ্ছা।

রবি খুশি হয়ে হাসল। দেবাশিস রবির কথা শোনে। রবি যা চায় তাই দেয়। রবির যা ইচ্ছে তাই হয়। চন্দনার সময়ে তা হত না। রবি কিছু বায়না ধরলেই ক্ষেপে যেত চন্দনা। বকত! মারত। তবু সারাদিন চন্দনার পায়ে পায়ে ঘুরত রবি। বকা খেত, মার সহ্য করত, তবু আঁটালির মতো লেগেও থাকত।

ঐ রাগী আহাম্মক মেয়েটার মধ্যে আকর্ষণীয় বস্তু কি ছিল? ভেবেই পায় না দেবাশিস। যে অবস্থায় চন্দনার বিয়ে হয়েছিল তাতে তার বাপের বাড়ির দিকের কেউ খুশী হয়নি। চন্দনার বাবা তাকে প্রচণ্ড মারধোর করে বেঁধে রেখেছিলেন, মা কাঁদতে কাঁদতে হিস্টিরিয়ায় আক্রান্ত হন। সেই গোলমাল হাঙ্গামার ভিতর থেকে চন্দনাকে খুব শালীনতার সঙ্গে বিয়ে করে নিয়ে আসা সম্ভব ছিল না। দেবাশিস কয়েকজন বন্ধুবান্ধব নিয়ে একদিন ওদের বাড়ি চড়াও হয়। পাড়ার ছেলেদের আগে থাকতেই মোটা পুজোর চাঁদা দেওয়া ছিল। দেবাশিস চন্দনার বাবাকে শাসিয়ে এল—ফের যদি ওর গায়ে হাত তুলবেন তো মুস্কিল আছে।

চন্দনার বাবা ভয় পেয়ে গেলেন। আজকাল ভদ্রলোক মানেই ভেড়ুয়া। এরপর থেকে চন্দনার ওপর অত্যাচার কমে গেল বটে, কিন্তু বাড়ির লোক তার সঙ্গে কথা বলত না। দেবাশিস তখন মানিকতলার বোনের বাড়িতে আলাদা একটা ঘর ভাড়া নিয়ে থাকে। একজন গর্ভবতী মেয়েকে বিয়ে করে বাড়িতে তোলা ভগ্নীপতি ভাল চোখে দেখেনি। বোনও রাজি ছিল না। চন্দনা প্রায়ই টেলিফোন করে বলত—বেশি কিছু তো চাইনি, কালীঘাটে নিয়ে গিয়ে সিঁথিতে একটু সিঁদুর ছুঁইয়ে দাও। তাহলেই হবে।

দেবাশিস বলত—তা হবে না। সেটা তো পরাজয় মেনে নেওয়া। আমি তোমাকে ফুল ফ্লেজেড বিয়ে করে নিজের বাসায় তুলব।

তাই করেছিল সে। পাগলের মতো ঘুরে যাদবপুরে বাসা ঠিক করে ফেলল। হাতে টাকার অভাব ছিল না। প্রচুর গয়না শাড়ি দিয়ে সাজিয়ে বিয়েবাড়ি ভাড়া করে পুরুত ডেকে বিয়ে করল। চন্দনার এক দাদা সম্প্রদান করে যান।

চন্দনার মতো একটা অপদার্থ মেয়ের জন্য অত পরিশ্রম আর হাঙ্গামা কেন করেছিল দেবাশিস, তা ভাবলে অবাক লাগে। বিয়ের অল্প কিছু পরেই চন্দনার তাগাদায় অভিজাত পাড়ায় অনেক টাকা দিয়ে পূর্ব-দক্ষিণ খোলা ফ্ল্যাট কিনল। এই বিপুল উদ্যোগ বৃথা গেছে। বিয়ের অল্প কিছু পরেই দেবাশিস বুঝতে পারে, বিয়ে কোনো স্বর্গীয় বিধি নয়। চন্দনা তার বৌ হওয়ার উপযুক্তই নয়। এত অগভীর মন, এত রাগ, অধৈর্য, এমন অর্থকেন্দ্রিক মন-সম্পন্ন মেয়ের সঙ্গে কী করে থাকবে সে। নিজে চরিত্রহীন হলেও তার কিছু শিল্পীসুলভ নিস্পৃহতা আছে, সামান্য কিছু ব্যবসায়িক সততা, কর্মনিষ্ঠা। তার মনে হত সারাদিন কাজের পর পুরুষ যখন বাসায় ফেরে তখন দগ্ধদিনে ছায়ার মতো স্ত্রী তাকে আশ্রয় দেয়। স্ত্রী হচ্ছে বিশ্রামের জায়গা।

দেবাশিস প্রায়দিনই বাসায় ফিরে চন্দনাকে দেখতে পেত না। হয় মার্কেটিং, নয় সিনেমা-থিয়েটার, নয়তো বাপের বাড়ি চলে যেত চন্দনা। বিয়ের পর বাপের বাড়ির সঙ্গে তার সম্পর্ক কীভাবে যেন নিদারুণ ভাল হয়ে গিয়েছিল।

ঐ সময়ে নিঃসঙ্গ তৃণা এক নিভৃত জলস্রোতে নৌকোর মতো তার কাছাকাছি এসে গেল। উতরোল স্রোত। কিন্তু নিশ্চিত। দেবাশিস কোনোদিনই কারো প্রেমে পড়েনি এতকাল। এবার পড়ল। এক অসহনীয় অবস্থায়। অসম্ভব এক প্রেম।

রবি এখন ঐ তার মুখোমুখি বসে আছে। কী চোখে রবি চন্দনাকে দেখেছিল তা ওকে ডেকে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করে। ঐ রাগী অপদার্থ, অগভীর মাকে কেন অত ভালবাসত রবি? রবির কাছে তা জেনে নিতে ইচ্ছা হয়! জানতে ইচ্ছা করে, কোনোভাবে না কোনোভাবে ভালবাসার কোনো উপায় ছিল কিনা!

বেয়ারা মস্ত একটা বাদামী কাগজের প্যাকেটে মোড়া বাক্স নিয়ে এল-ট্রেতে। সঙ্গে বিল। দাম আর টিপস্ মিটিয়ে উঠে পড়ে দেবাশিস। ঘড়ি দেখল। এখনো অনেক সময় আছে। চিড়িয়াখানার সময়টা বেঁচে গেল।

পোশাক যতই পরুক, আর যতই সাজুক, তৃণার মুখের দুঃখী ভাবটা কখনো যায় না। একটা অপরাধবোধে মাথা মুখখানায় করুণ হাসিহীন, শুকনো ভাব ফুটে থাকেই। চোখে ভীরু চঞ্চল ভাব!

বেরোবার মুখে দেখল, হুড়মুড় করে সাইকেল নিয়ে গেট দিয়ে ঢুকে এল মনু। চমৎকার লালরঙা স্পোর্টস সাইকেল। মনুর চেহারা বেশ বড়সড়। পরনে সাদা শর্টস্, সাদা গেঞ্জি, কাঁধে একটা টার্কিশ তোয়ালে, পায়ে কেড্স আর মোজা। হাত পায়ের গড়ন সুন্দর, বুকের পাটা বড়। হাতে টেনিস র‍্যাকেট। মাটিতে পা ঠেকিয়ে সাইকেলটা গাড়িবারান্দার তলায় দাঁড় করাল। চোখ তুলে মৌন মুখে মাকে দেখল একবার।

ভারী পাল্লার কাচের দরজার সঙ্গে সিঁটিয়ে যাচ্ছিল তৃণা। বুকের ভিতরটা কেমন চমকে ওঠে। ছেলের চোখে চোখ পড়তেই, হাত পায়ে সাড় থাকে না। মনু আজকাল কদাচিৎ কথা বলে। দিনের পর দিন একনাগাড়ে উপেক্ষা করে যায়।

কাচের দরজার কাছ থেকে একটুও নড়তে পারল না তৃণা। মনু সাইকেলে বসে থেকেই সাইকেলে ঠেস দেওয়ার কাঠিটা পা দিয়ে নামাল। সাইকেলটা দাঁড় করিয়ে লঘু পায়ে নেমে সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল। তৃণার দিকে এক পলক দেখল আবার। চোদ্দবছরের ছেলের আন্দাজে মনুকে বড় দেখায়। চেহারাটা তো বড়ই, চোখের দৃষ্টিতেও পাকা গাম্ভীর্য, এটা বোধহয় ওর বাপের ধারা। বয়সের আন্দাজে ওর বাপও গম্ভীর, বয়স্কজনোচিত হাবভাব।

সামনেই মস্তো কয়েরের পাপোষ পাতা। মনু তার কেড্সটা ঘষে নিচ্ছিল, দরজার চৌকাঠে হাত রেখে। ওর শরীরের স্বেদগন্ধ, রোদের গন্ধ তৃণার নাকে এল। সে যে এই বড়সড় সুন্দর চৌখস ছেলেটির মা তা কে বিশ্বাস করবে! চেহারায় অমিল, স্বভাব

অমিল, তার ওপর মনু আজকাল ডাক খোঁজ করেই না। কতকাল 'মা' ডাক শোনেনি তৃণা।

তাকে কাচের দরজায় অমন সিঁটিয়ে থাকতে দেখে মনু আবার একবার তাকাল। ভ্রূ কোঁচকাল। মনে মনে বোধহয় কী একটু শুঁকে নিল বাতাসে। হঠাৎ চূড়ান্ত তরল গলায় বলল—চ্যানেল নাম্বার সিক্স! না?

তৃণা ভারী চমকে ওঠে। সত্যি কথা। সে যে সেণ্টটা আনিয়েছে তা চ্যানেল নাম্বার সিক্স। কিন্তু এত ঘাবড়ে গিয়েছিল তৃণা যে উত্তর দিতে পারল না। কেবল বিশাল দুটি চক্ষু মেলে তাকিয়ে থাকল ছেলের দিকে ভূতগ্রস্তের মতো। কারণ, ছেলের চোখে চোখ রাখতে আজকাল তার মেরুদণ্ড ভেঙে নুয়ে যায়।

মনু অবশ্য তার প্রতিক্রিয়া দেখার জন্য অপেক্ষা করে না। চটপটে পায়ে ভিতরবাগে চলে যায়, লবি পেরিয়ে সিঁড়ির দিকে। ও এখন ঠাণ্ডা জলে স্নান করবে, পোশাক পরবে, তারপর বেরোবে কোথাও।

ওর চলে যাওয়ার রাস্তার দিকে অপলক চেয়ে থাকে তৃণা। তক্ষুনি বেরোতে পারে না। আস্তে আস্তে ঘুরে আসে। অনেকখানি মেঝে পেরিয়ে সিঁড়ি ভেঙে উঠে আসে দোতলায়। একটু বিশ্রাম করে যাবে।

মনু আর রেবার ঘর বাড়ির দক্ষিণ প্রান্তে। মাঝখানে হল, হলে দাঁড়িয়ে দক্ষিণ দিকের ঘর থেকে সে মৃদু একটা শিসের শব্দ শোনে। এক পা এক পা করে এগোয় দক্ষিণের দিকে। এদিকে সে আজকাল একদম আসে না। এলে ছেলেমেয়েরা বিরক্ত হয়, ভ্রূ কোঁচকায়, সামনে থেকে সরে যেতে চেণ্টা করে। এবাড়িতে সে এক পক্ষ, আর ছেলে মেয়ে বাপ মিলে আর এক পক্ষ। মাঝখানে অদৃশ্য কুরুক্ষেত্রে বিচিত্র সব চোখের বাণ ছোটাছুটি করে, আর মৌনতার অস্ত্র নিক্ষিপ্ত হয় পরস্পরের দিকে।

মনুর ঘরে মনু আছে। দরজা আধখোলা, পর্দা ঝুলছে। অন্যপাশে রেবার ঘর। ঘরটা নিস্তব্ধ, তৃণা দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে কান পেতে শোনে। না, ভিতরে কোনো শব্দ নেই। খুব দুঃসাহসে ভর করে সে কাঁপা, ঠাণ্ডা, দুর্বল হাতে পর্দা সরিয়ে

ভিতরে পা দেয়। ফাঁকা ঘর। একধারে বইয়ের র‍্যাক, পড়ার টেবিল, ওয়ার্ডরোব, আলমারী, মাঝখানে দামী চেয়ার কয়েকটা। নীচু সেণ্টার টেবিলে তাজা ফুল রাখা।

ঘরভর্তি মৃদু ধূপকাঠির সৌরভ। রেবার বয়স বারো, কিন্তু সে একজন প্রাপ্তবয়স্কা মহিলার মতোই থাকে। তৃণা ফোম রবারের গদিওলা বিছানাটায় একটু বসে। বুকজোড়া ভয়। পড়ার টেবিলের ওপর স্ট্যাণ্ডে রেবার ছবি। পাতলা গড়নের ধারাল চেহারা। নাক খানা পাতলা ফিনফিনে, উদ্ধত। টানা চোখ। গাল ভাঙা, কিন্তু সব মিলিয়ে একটা তীক্ষ্ন বুদ্ধির ছাপ আছে। সে তুলনায় মনুর চেহারাটা একটু ভোঁতা, রেবার মতো বুদ্ধি মনু রাখে না। রেবা মডার্ন স্কুলের ফার্স্ট গার্ল। সম্ভবত হায়ার সেকেণ্ডারিতে স্ট্যাণ্ড করবে। মনু অত তীক্ষ্ন নয়, সে কেবল টেনিস কিংবা অন্য কোন খেলায় ভারতের এক নম্বর হতে চায়। হাসিখুশি আহ্লাদি ছেলে, মনটা সাদা। সেই কারণেই বোধহয় কখনো সখনো মনু এক আধটা কথা মার সঙ্গে বলে ফেলে।

কিন্তু রেবার গাম্ভীর্য একদম নীরেট আর আপোসহীন। যেমন তার তীক্ষ্ন বুদ্ধি তেমনই তার উপেক্ষার ভঙ্গি। যতরকমভাবে অপমান এবং উপেক্ষা করা যায় ততরকমই করে রেবা। মার প্রতি মেয়ের এমন আক্রোশ কদাচিৎ কোনো মেয়ের মধ্যে দেখা যায়। মনুকে যতটা ভয় করে তৃণা, কিংবা শচীনকে, তার শতগুণ ভয় তার রেবাকে। মেয়েদের চোখ আর মন সব দেখে, সব ভাবে। ফ্রক-পরা রোগা মেয়েটাকে তৃণা তার জীবনের সবচেয়ে ভয়াবহ মানুষ বলে জানে।

ঘরে ধূপকাঠির গন্ধ, স্নো ক্রীম ফাউন্ডেশনের গন্ধ, ঘর-সুগন্ধির মৃদু সুবাস। দেয়ালের রঙ হাল্কা নীল, আর সবুজ। বিপরীত দেওয়ালগুলি একরঙা। নানারকম আলোর ফিটিংস লাগানো, জানালা দরজায় পর্দা, পেলমেটে কেষ্টনগরের পুতুল সারি সারি সাজানো। বুককেসের ওপর একটা রেডিও, টেপরেকর্ডার, একধারে রেকর্ডপ্লেয়ার আর রাশীকৃত রেকর্ডের অ্যালবাম। সমস্ত বাড়িটাই দেবাশিস সাজিয়েছিল। আসবাবপত্রগুলি সবই সাপ্লাই দিয়েছিল তার কোম্পানি।

ফটো-স্ট্যাণ্ডে রেবার ছবিটার দিকে ভীত চোখে চেয়েছিল তৃণা। তার মনে হচ্ছিল, সে রেবার মুখোমুখি বসে আছে। রেবা তাকে দেখছে। ফটোতে রেবার সুন্দর হাসিটা যেন আস্তে আস্তে পাল্টে শ্লেষ আর ঘৃণার হাসি হয়ে যাচ্ছে।

তৃণার বুক কেঁপে কান্নার গন্ধ মেখে একটা শ্বাস বেরিয়ে আসে। দূরে বৃষ্টি হলে যেমন জলের গন্ধ আনে বাতাস তেমনি কান্নাটা ঘনিয়ে উঠছে। গন্ধ পায় তৃণা। কিন্তু বৃথা। কত তো কেঁদেছে তৃণা, কেউ পাত্তা দেয় নি।

তৃণা বহুকাল এই বাড়ির এদিকে আসেনি। রেবার ঘরে ঢোকেনি। এখন একা চোরের মতো ঢুকে তার বড় ভাল লাগছিল। বারো বছর বয়সে মেয়েরা মায়ের বন্ধু হয়ে ওঠে। এই বয়ঃসন্ধির সময়ে কত গোপন মেয়েলি তথ্যের লেনদেন হয় মা আর মেয়ের মধ্যে, এই বয়সেই বন্ধুত্ব হয়ে যায় পাকা। মেয়ে আর মেয়ে থাকে না, সখী হয়ে ওঠে।

কিন্তু হায়, রেবার সঙ্গে তৃণার কোনোদিনই আর সখিত্ব হবে না। ভীতু তৃণাকে মানসিক ভারসাম্যের শেষ সীমা পর্যন্ত ঠেলে দেবে রেবা। বুদ্ধিমতী এবং নিষ্ঠুর ঐ মেয়েটা।

তৃণা উঠল, রেবা গানের স্কুলে গেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরবে, কিন্তু নিঃশব্দে ফিরবে না। ওর ছটফটে দৌড়-পায়ের আওয়াজ অনেক দূর থেকেই পাওয়া যায়। তাই সাহস করে তৃণা উঠে ঘুরে ঘুরে ওর ঘরটা দেখে। বুককেস খুলে বই হাতড়ায়। ওয়ার্ডরোবের ভিতর ওর হরেক রকম ফ্রক, ঘাগরা, প্যারালেলস আর শাড়িতে হাত বুলিয়ে দেয়। বিছানার ওপর একটা নাইটি পড়ে আছে। ভীষণ পাতলা একটা বিদেশী কাপড়ের তৈরী। সেটা গুছিয়ে ভাঁজ করে রেখে দেয়। বেডকভারটা টান করে একটু। পড়ার টেবিলটা সাজানো আছে। তবু একটু নেড়েচেড়ে রেখে দেয়, খুঁজতে খুঁজতে কয়েকটা ড্রইং খাতা পায় তৃণা, তাতে জলরঙা সব ছবি আঁকা। বুকের ভিতরটা ধুপধুপ করে ওঠে। রেবা কি ছবি আঁকে?

বুককেসের মাথায় রঙের বাক্স আর তুলির বাণ্ডিল খুঁজে পায় তৃণা। হ্যাঁ, সন্দেহ নেই, রেবা ছবি আঁকে। দরজার পাশে একটা নীচু শেলফে তবলা ডুগি, হারমোনিয়ম, তানপুরা সব সাজানো।

হারমোনিয়মের বাক্সের ওপর একটা কবিতার বইও পেয়ে যায় সে। বুকে একটা আনন্দ সদ্যোজাত পাখির ছানার মতো শব্দ করে। রেবা কি কবিতা পড়ে?

আবার গিয়ে বুককেসটা খোলে তৃণা! বইগুলো ঠিকমতো সাজিয়ে রাখা নেই তাই অসুবিধে হয়। তবু একটু খুঁজতেই তার মধ্যে কিছু কবিতার বই খুঁজে পায় তৃণা। অবাক হয়ে উল্টেপাল্টে বইগুলো দেখে, সময়ের জ্ঞান হারিয়ে যায়।

অন্যমনস্কতাবশত সে পায়ের শব্দটা শুনতে পায়নি, যখন শুনল তখন বড্ড দেরি হয়ে গেছে।

পর্দা সরিয়ে রেবা ঘরে ঢুকেই দাঁড়িয়ে পড়ল। রোগা তীক্ষ্ণ মুখখানা হঠাৎ সন্দিগ্ধ আর কুটিল হয়ে উঠল। ভ্রূ কোঁচকানো, রেবা তার দিকে একপলক চাইল, তারপর চোখ ফিরিয়ে পা নেড়ে চটিদুটো ঘরের কোণে ছুঁড়ে দিল। ঘূর্ণিঝড়ের মতো ঘুরে গিয়ে দাঁড়াল আয়নার সামনে। একপলক সে তাকিয়েছিল তৃণার দিকে, তাতে চোখে একটু বুঝি বিস্ময়, আর একটু ঘৃণা। বাদবাকি ব্যবহারটা উপেক্ষার।

পরনে একটা কমলারঙের হালফ্যাশনের ফ্রক। রোগা হলেও রেবা বেশ লম্বা। গায়ে মাংস লাগলে একদিন ফিগারটা ভালই দেখাবে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মুখের একটা ব্রণ টিপল। আঙুল দিয়ে ঘষল জায়গাটা।

বলল—কি বলতে এসেছো?

একটু চমকে উঠল তৃণা। এ ঘরে সে যে অনধিকারী তা মনে পড়ল। বিপদ যা ঘটবার তা ঘটে গেছে, সে তো আর পালাতে পারে না এখন। আস্তে করে বলল—তোর আজ তাড়াতাড়ি হয়ে গেল যে!

অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে রেবা উত্তর দেয়—এ সময়েই ছুটি হয়। তাড়াতাড়ি আবার কী?

বলে আয়নায় মুখ দেখতে থাকে। আয়নার ভিতর দিয়েই বোধহয় তৃণাকে এক-আধ পলক দেখে নিল। কিন্তু তৃণার সেদিকে তাকাতে সাহসই হল না। অপরাধীর মতো মুখ নীচু রেখে বলে—তুই কি ছবি আঁকিস রেবু?

রেবা একটু অবাক হয় বোধহয়। বলে—হ্যাঁ আঁকি।

—জানতাম না তো!

—ক্লাসে আমাদের ড্রইং শেখায়। এ সবাই জানে।

—কবিতা পড়িস?

—পড়ি।

তৃণা একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে।

রেবা একটু ঝাঁজ দিয়ে বলে—আর কী বলবে?

—কিছু না।

—আমার এখন অনেক কাজ আছে। পোশাক ছাড়ব। তুমি যাও।

—যাচ্ছি। তৃণা উঠে দাঁড়ায়। কোনো বয়সের মেয়েই মায়ের সামনে পোশাক ছাড়তে লজ্জা পায় না। তবু তৃণা সঙ্কোচে উঠে দাঁড়াল। এই ঘরে তার উপস্থিতির কোনো জরুরী অজুহাত খুঁজে না পেয়ে দুর্বল গলায় বলে—তুই নতুন কী রেকর্ড কিনলি দেখতে এসেছিলাম।

রেবা উত্তর দিল না। আয়নায় মুখ দেখতে থাকল!

তৃণা একটু শুকনো গলায় বলে—ওয়ার্ডরোবে শাড়ি দেখছিলাম। পরিস না কি?

—ইচ্ছে হলে পরি। তুমি যাও!

—যাচ্ছি। আমার তো অনেক শাড়ি। তুই নিবি?

—না।

—কেন?

—আমার অনেক আছে। দরকার হলে বাপি আরো কিনে দেবে।

তৃণা শ্বাস ছেড়ে আপন মনে ভ্রূ কুঁচকে মাথা নাড়ে। এ সত্য তার জানা। প্রয়োজন হলে শচীন রেবাকে বাজারসুদ্ধু শাড়ি কিনে এনে দেবে। রেবা নিজে গিয়েও কিনে আনতে পারে বাজার ঘুরে, পছন্দ মতো। তবু বাঙালী ঘরের রেওয়াজ, বয়স হলে মেয়েরা মায়ের শাড়ি পরে। সেটা শাড়ির অভাবের জন্য নয়। নিজের শাড়ি পরিয়ে মা মেয়েকে দেখে। মুখ টিপে মনে মনে হাসে। মায়েরা ঐ ভাবেই আবার জন্মায় মেয়ের মধ্যে! কিন্তু রেবার তা দরকার নেই।

মুখশোষ টের পায় তৃণা। হাতে পায়ে শীত, মাথা গরম, শ্বাস গরম। দু-পা হেঁটে যায় দরজার দিকে। একটু দাঁড়ায়। ফিরে তাকায় একবার। তার ভ্রু কোঁচকানো, চোখে বিশুদ্ধ কান্না। ঐ গুয়ের গ্যাংলা মেয়েটা কত সহজে তার মা-পনা ঘুচিয়ে দেয়।

এ বাড়িতে দুটো ভাগ আছে। একদিকে তৃণা একা, অন্যদিকে শচীন, মনু আর রেবা! সিন্ডিকেট ঘরগুলোর মাঝখানে যোজন-যোজন ব্যবধান পড়ে থাকে সারাদিন। তার পক্ষে কেউ নয়। তবু ওর মধ্যে কি মনু একটু মায়ের টান টের পায়? অনেকদিন ভেবেছে তৃণা। ঠিক বুঝতে পারে না। ন'মাসে ছ'মাসে এক-আধবার মা বলে ডেকে ফেলে মনু। হয়তো কোনো কথা বলে ফেলে। খেতে বসে হয়তো এটা-ওটা চায়। তাড়াতাড়ি এগিয়ে দেয় তৃণা। মনু কখনো কিছু বললে বাধ্য মেয়ের মতো তাই করে, তাই দেয়। কিন্তু বুকে এত কাঙালপনা নিয়েও তৃণা জানে, মনুর আসলে টান নেই। ও সোজা সরল ছেলে, দিনরাত খেলার কথা ভাবে, মাকে নিরন্তর ঘৃণা করার কথা মনে রাখতে পারে না। অন্যমনস্কতাবশত ভুলে যায়। একটু আগে কেমন স্মিতমুখে বলেছিল—চ্যানেল সিল্ক না?

রেবার কখনো ভুল হয় না। নিরন্তর বুকে সাপের মতো পুষে রাখে উপেক্ষা আর ঘেন্না। কখনো তা থেকে অন্যমনস্ক হয় না রেবা। বয়স মোটে বারো বছর, এখনো ঋতুমতী নয় বোধহয়, তবু কেমন সব গোপন করে রেখেছে মায়ের কাছে। কেমন স্বাধীন, ডাকাবুকো।

তৃণা যাই যাই করেও খানিক দাঁড়ায়, বলে—আমার লকারে গাদা গয়না পড়ে আছে। পাঠিয়ে দেবোখন, পরিস।

—কে চেয়েছে?

—চাইতে হবে কেন? ও তো তোর পাওনা!

—আমি গয়না পরি না। তার ওপর সোনার গয়না! মাগো! বলে ঠোঁট মুখের একটা উৎকট ভঙ্গি করে রেবা।

তৃণা হ্যাংলার মতো হাসে। বলে—তা অবিশ্যি ঠিক। সলিড সোনার গয়না তোদের বয়সীরা আজকাল কেউ পরে না। বরং ভেঙে নতুন করে গড়িয়ে নিস।

—আমি পরব না। তুমি পরো।

—তুই তো একরত্তি মেয়ে, ঐ রোগা শরীরে আর কখানা গয়নাই বা ধরবে! আমার অনেক আছে। তোকে দিয়েও থাকবে। তোরই তো সব।

—তোমার কিছুই আমার নয়। না পরলে বিলিয়ে দিও।

—কেন, পরবি না কেন?

—ইচ্ছে। শাড়ি গয়নার কথা শুনলে আমার মাথা ধরে। তুমি এখন যাও।

ভুল অস্ত্র। কিন্তু এ ঠিক তৃণার দিক থেকে লোভ দেখানো নয়! কিছুক্ষণ রেবার ঘরে থাকার জন্য এ হচ্ছে এলোপাথাড়ি কথা কওয়া, নইলে সে জানে, রেবার কিছু অভাব নেই। এখনকার মেয়েরা শাড়ি গয়নার নামে ঢলে পড়ে না।

রেবা খাটের অন্যধারে বসে পা দোলায়। পায়ের আঙুলের রুপোর চুটকিতে ঝুনঝুন শব্দ হয় একটু। খুব অবহেলায় অনায়াস ভঙ্গি। তৃণার বারো বছর বয়সটা কেটেছে বিছানায়। ঐ সময়ে এত সতেজ, প্রাপ্তবয়স্কতার ভাবভঙ্গি তার ছিল না। ঐ বয়সে ছিল কত ভয়, সংশয়, কত আত্ম-অবিশ্বাস! তবু তৃণা মনে মনে একরকম খুশীই হয়। মেয়েটা তার মতো হবে বোধ হচ্ছে। ছবি আঁকে, কবিতা পড়ে, শাড়ি গয়নার দিকে মন নেই।

ও ঘরের বাথরুম থেকে মনুর সুরহীন হিন্দী গান শোনা যায়। তার সঙ্গে জলের প্রবল শব্দ। সেই জলের শব্দে তেষ্টা পায় তৃণার। আসলে বুকটা কাঠ হয়েই ছিল। জলের কথা খেয়াল হচ্ছিল না তার।

ভিখিরির মতো তৃণা বলে—একটু জল খাওয়াবি রেবু।

রেবা ভীষণ বিরক্ত হয়। তার রোগা, তিরতিরে বুদ্ধির মুখ-খানার কোন মুখোশ নেই। সহজেই রাগ, বিরক্তি, অভিমান বোঝা যায়। ভ্রূ, নাক, চোখ কুঁচকে উঠল। তবু পড়ার টেবিলের কাছে গিয়ে দেয়ালে পিয়ানো রিডের মতো একটা সুইচ টিপে ধরল।

ঠিন ঠিন করে গোটা দুই সুরেলা আওয়াজ হল ভিতরে। অমনি ঝি দুর্গার মা এসে দাঁড়ায় দরজায়, নীরবে।

রেবা বলে—এক গ্লাস জল।

এরকমই হওয়ার কথা। রেবা নিজের হাতে জল গড়িয়ে দেবে না, এ কি জানত না তৃণা?

দুর্গার মা হলঘরের কুলার থেকে ঠাণ্ডা জল এনে দিল। ট্রের ওপর স্বচ্ছ কাট-গ্লাসের পাত্র, ওপরে একটা কাঁচের ঢাকনা। জলটা হীরের মত জ্বলছে। তৃণা সবটুকু খেয়ে নিল।

রেবা বলে—এবার হয়েছে? এখন যাও। আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে।

তৃণা ভাল মেয়ের মতো বলে—এই খাড়া দুপুরে আবার বেরোবি নাকি?

—বেরোলেই বা!

—কোথায় যাবি?

—কাজ আছে।

—তুই যে কবিতার বইগুলো কিনেছিস ওগুলোর সব আমার নেই। এক আধখানা দিস তো, পড়ব।

রেবা উত্তর দিল না। ওয়াড্রোব থেকে পছন্দমতো পোশাক বের করতে লাগল। একটা লুঙ্গি আর কামিজ বের করে সাজাল বিছানার ওপর। বিশুদ্ধ সিল্কের হালকা জামরঙের লুঙ্গি। সোনালি সিল্কের ওপর ছুঁচের কাজ করা কামিজ।

—বাঃ ভারী সুন্দর তো!

—কী সুন্দর? ঝামরে ওঠে রেবা।

—পোশাকটা। কবে করালি?

রেবা তার পাতলা ধারাল মুখখানা তুলে তৃণাকে এক পলকের কিছু বেশি লক্ষ করল। তৃণা চোখ সরিয়ে নেয়।

রেবা বলে—তুমি যেখানে যাচ্ছো যাও।

তৃণা হ্যাংলার মত তবু বলে—বড্ড রোদ উঠেছে আজ। ছাতা নিবি না?

—সে আমি বুঝব।

—রেবু, আমার শরীরটা বড্ড খারাপ লাগছে।

—ঘরে গিয়ে শুয়ে থাকো।

—তুই অমন করছিস কেন?

রেবা উত্তর না দিয়ে তার ঘরের লাগোয়া বাথরুমে চলে গেল। সশব্দে দরজা বন্ধ করল।

ফাঁকা ঘরে একা তৃণা দাঁড়িয়ে থাকে। সত্যিই তার শরীর খারাপ লাগছিল। খুব খারাপ, যেন বা গা ভরে জ্বর এসেছে। চোখে জ্বালা, হাত পা কিছুই যেন তার বশে নেই। আর মাথার মধ্যে চিন্তার রাজ্যে একটা বিশৃঙ্খলা টের পায় সে। পূর্বাপর কোনো কথাই সাজিয়ে ভাবতে পারে না।

শরীরটা কাঁপছিল, খুব ধীর পায়ে বেরিয়ে আসে তৃণা। হল-ঘরে হাল্কা অন্ধকার। ঠাণ্ডা। একটু দাঁড়ায়, তারপর অবশ হয়ে দেওয়ালের গায়ে লাগানো নরম কোচটায় বসে পড়ে। কোচের পাশে মস্ত রঙীন কাঠের বাক্সে লাগানো পাতাবাহারের গাছের পাতা তার গাল স্পর্শ করে।

ঝিম মেরে একটুক্ষণ বসে থাকে তৃণা। কতকাল সে তার শরীরের কোনো খোঁজ রাখে না, ভিতরে ভিতরে কী অসুখ তৈরী হয়েছে কে জানে! মাথাটা ঠিক রাখতে পারছে না সে। স্খলিত হয়ে যাচ্ছে স্মৃতি, পারম্পর্যহীন সব এলোমেলো কথা ভেসে আসছে মনে। ঘুমিয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে খুব।

একটা তীব্র শিসের শব্দে সে মুখ তোলে। গায়ে ব্যানলনের দুধসাদা গেঞ্জি, পরনে পাতিলেবুর রঙের স্ট্রেচলনের বেলবটম পরা মনু নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ির দিকে চলে যাচ্ছিল। এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে ডান হাতের ব্রেসলেটে ঢিলা করে পরা ঘড়িটা দেখল। সময়টা বিশ্বাস হল না বুঝি। ঘড়িটা কানের কাছে তুলে শব্দ শুনলে। তারপর তৃণাকে লক্ষ্য না করেই আবার চলে যাচ্ছিল সিঁড়ির দিকে।

পাতাবাহারের আড়াল থেকে মনুর সুন্দর চেহারাটা দেখে তৃণা। এই বয়সেই মনু মোটর চালায়, টেনিস খেলে, বিদেশী নাচ শেখে। তৃণার জগৎ থেকে অনেক দূরে ওর বসবাস। বড়সড় স্বাস্থ্যবান ঐ ছেলেটা যে তার গর্ভজ সন্তান তা তৃণার বিশ্বাস হয় না। বিশ্বাস হলেও এক এক সময়ে বড় ভয় করে, এক এক সময়ে অহংকার হয়। কিন্তু এও সত্যি কথা, মনুর জগতে তৃণা বলে কেউ নেই।

সিঁড়ির মাথায় চলে গিয়েছিল মনু। এক্ষুনি নেমে যাবে।

তৃণার গলায় একটুও জোর ফুটল না। ক্ষীণ কণ্ঠে ডাকল—মনু!

ডাকটা মনুর শোনার কথা নয়। মস্ত হলঘরটার অন্য প্রান্তে চলে গেছে সে। তার ওপর শিসে একটা গরম হিন্দী টিউন তুলছে। তা ছাড়া যৌবন বয়েসের চিন্তা আছে, আর আছে ঘরের বাইরে জগতের আনন্দময় ডাক। মায়ের ক্ষীণকণ্ঠ তার শোনার কথা নয়। তবু দ্রুত দু ধাপ সিঁড়ি চঞ্চল পায়ে নেমে গিয়েও দাঁড়াল সে! একটু এপাশ ওপাশ তাকাল। হয়তো ক্ষীণ সন্দেহ হয়ে থাকবে যে কেউ ডেকেছে।

পাতাবাহারের আড়ালে মুখখানা ঢেকে তৃণা তেমনি ক্ষীণ গলায় বলে—মনু, আমি এখানে।

এবার মনু শুনতে পায়। ফিরে তাকায়। মুখে একটু ভ্যাবলা অবাক ভাব। শরীরটা যত বড়ই হোক, ওর বয়সে এখনো ছেলেরা মায়ের আঁচলধরা থাকে।

মনু তাকে দূর থেকে দেখল। রাঙা শাড়ি পরেছে তৃণা, মেখেছে দামী বিদেশী সুগন্ধ, আর নানা রূপটান। নষ্ট মেয়ের সাজ। একটু আগে বাড়িতে ঢোকার সময়ে তাই কি ঠাট্টা করে মনু বলেছিল-- চ্যানেল নাম্বার সিক্স, না? নষ্টামিটা কি তৃণার শরীরে খুব অস্পষ্ট হয়ে আছে?

মনু সিঁড়ির দুধাপ উঠে আসে। হলঘরটা লম্বা পদক্ষেপে পার হয়ে সামনে দাঁড়ায়। মুখে একটা গা-জ্বালানো ঠাট্টার হাসি। হাল্কা গলায় বলে—আরে! তুমি তো বেরিয়ে গেলে দেখলাম!

তৃণা তৃষিত মুখখানা তুলে ওকে দেখে। কী বিরাট, কী প্রকাণ্ড সব মানুষ এরা।

মাথা নেড়ে তৃণা বলে—যাইনি।

—যাওনি তো দেখতেই পাচ্ছি। কী ব্যাপার?

—তুই কোথায় যাচ্ছিস?

—বেরোচ্ছি।

আমার শরীরটা বড্ড খারাপ লাগছে।

শুনে মনুর মুখে খুব সামান্য, হাল্কা জলের মতো একটু উদ্বেগ।

মনুর মুখখানা অবিকল তৃণার মতো। মাতৃমুখী ছেলে। ওর চোখে একটা মেয়েলি নম্রতা আছে। এই সবই তৃণার চিহ্ন। মনুর মুখে চোখে তৃণার চিহ্ন ছড়ানো আছে। অনেকদিন বাদে একটু লক্ষ্য করে তৃণা খুব গভীর একটা শ্বাস ফেলে।

মনু একটু ঝুঁকে তাকে দেখে নিয়ে বলে—খুব সেজেছো দেখছি! তবু তোমাকে খুব পেল্ দেখাচ্ছে। চোখও লাল। ঘরে গিয়ে শুয়ে থাকো।

—আমাকে একটু ধরে নিয়ে যাবি ?

—এসো। বলে মনু সঙ্গে সঙ্গে হাত বাড়ায়।

ভারী অবাক মানে তৃণা, ও কি তাকে ছোঁবে? ঘেন্না করবে না ওর? তৃণা সঙ্কুচিত হয়ে বলে—তোর দেরি হচ্ছে না তো!

—হচ্ছে তো কি? এসো, তোমাকে পেঁছে দিয়ে যাই ঘরে।

তৃণা উঠতে যাচ্ছিল। কিন্তু হঠাৎ তাকে চমকে স্তম্ভিত করে দিয়ে মনু তাকে এক ঝটকায় পাঁজাকোলে তুলে নিয়ে চেঁচিয়ে হেসে বলে—আরে! তুমি তো ভীষণ হাল্কা!

তৃণার মাথা ঘুরে যায়, দম বন্ধ হয়ে আসে। সে ককিয়ে কান্না গলায় বলে—ছেড়ে দে, ওরে!

—তুমি কি ভাবছ তোমাকে নিতে পারব না ?

—ফেলে দিবি! ক্ষীণ কণ্ঠে বলে তৃণা।

—দূর! আমি ওয়েটলিফটার, জানো না? তুমি তো মশার মতো হাল্কা। বলে দুহাতে তৃণার শরীরটা ওপরে নীচে একবার দুলিয়ে দেখায় মনু। তৃণা তখন ছেলের শরীরের সুঘ্রাণটি পায়। মৃদু সাবান পাউডার, আর জামাকাপড় ওয়াড্রোবের পোকা তাড়ানো ওষুধের গন্ধ। এসব ভেদ করে মনুর গায়ের রক্তমাংসের একটা গন্ধ, একটা স্পন্দন পায় না কি সে?

অনায়াসে মনু হলঘরটা পার হয়ে যায় তৃণাকে পাঁজাকোলে করে। তৃণা ভয়ে ভয়ে চোখ বুজে ছিল, মুঠো হাতে খামচে ধরে ছিল মনুর গেঞ্জির বুকের কাছটা।

নরম বিছানায় মনু তৃণাকে ঝুপ করে নামিয়ে দিয়ে হাসে—দেখলে তো?

তৃণা একটু ক্ষীণ হেসে বলে—নিজের শরীরে অত নজর দিস না নিজের নজর সবচেয়ে বেশি লাগে।

—সবাই আমাকে নজর দেয়। বন্ধুরা আমাকে স্যামসন বলে ডাকে!

—বালাই ষাট।

মনু ঠাট্টার হাল্কা এবং বোকাহাসি হাসে। বলে—চলি?

—কোথায় যাবি?

—যাওয়ার অনেক জায়গা আছে।

মনু মাথা ঝাঁকায়। দরজার কাছ থেকে একবার সাহেবী কায়দায় হাতটা তোলে। চলে যায়।

মনুর শরীরের সুঘ্রাণ এখনো ভরে আছে তৃণার শ্বাসপ্রশ্বাসে। ছোটো থেকেই মনু মোটাসোটা ভারী ছেলে, টেনে ওকে কোলে তুলতে কষ্ট হত। তখন থেকে সবাই ছেলেটাকে নজর দেয়। এখন দেখনসই চেহারা হচ্ছে। পাঁচজনে তাকাবেই তো। ভাবতে এক রকম ভালই লাগে তৃণার। দুঃখ এই যে, ছেলে তার হয়েও তার নয়। একটু বুঝি বা কখনো মনের ভুলে মাকে মা বলে মনে করে। তারপরই আবার আলগা দেয়। দূরের লোক হয়ে যায় সব। তৃণা ভয়ে সিঁটিয়ে যায়। কত রকম যে ভয় তার! সে চুপ করে শুয়ে মনুর কথা ভাবতে থাকে।

শচীন কোথায় গিয়েছিল, এইমাত্র ফিরে এল। পাশের ঘর থেকে তার সুরহীন গুনগুন ধ্বনি আসে। হলঘরে ঘড়িতে ঘণ্টা বাজছে। ঘরের মধ্যে শুয়ে থেকে সেই ঘণ্টাধ্বনি শোনে তৃণা। শুনতে শুনতে হঠাৎ চমকে উঠে বলল, এগারোটা না?

বুকের মধ্যে ধুপ ধুপ করে। উত্তেজনায় নয়। হঠাৎ উঠে বসায় বুকে একটা চাপ লেগেছে। বাসস্টপটা খুব দূরে নয়। দেবাশিস এসে অপেক্ষা করবে। নিজের মানুষ-জনের কাছে বড্ড পুরোনো হয়ে গেছে তৃণা, পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে গেলে এমন কাউকে চাই যার কাছে প্রতিদিন তৃণার জন্ম হয়।

সে উঠল। শরীর ভাল নেই। মন ভাল নেই। এই ভরদুপুরে সে যদি বেরিয়ে যায়, অনেকক্ষণ ফিরে না আসে তবু কারো কোনো উদ্বেগ থাকবে না। কেউ একফোঁটা চিন্তা করবে না তৃণার জন্য।

হলঘর থেকে রেবার উচ্চকিত স্বর পাওয়া গেল—বাপি।

শচীন গম্ভীর স্বরে জবাব দেয়—হুঁ!

—আমি বেরোচ্ছি।

—আচ্ছা।

শচীন তার দাঁড়ে সব পাখিকে শেকল পরাতে পেরেছে। এ সংসারে তৃণার মত পরাজিত কেউ না। শচীন একই সঙ্গে ছেলে-মেয়ের মা ও বাবা, ওরা কোথায় যায় কী করে তা তৃণার জানা নেই। যেমন, আজ দুপুরে কে কে বাড়িতে খাবে, বা কার বাইরে নিমন্ত্রণ আছে, তা সে জানে না। কেউ বলে না কিছু। যা বলে তা শচীনকে। একা, অভিমানে তৃণার ঠোঁট ফোলে, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সে তার কোঁচকানো শাড়িটা ঠিকঠাক করে নেয়, বেরোবে।

বেরোবার মুখে সে হলঘর পেরোতে গিয়ে দেখে শচীন টবের গাছগুলি ঝুঁকে দেখছে। তৃণার দিকে পিছন ফেরানো। চল্লিশের কিছু ওপরে ওর বয়স, স্বাস্থ্য ভাল। তবু ওর দাঁড়ানোর ভঙ্গির মধ্যে একজন বৃদ্ধের ভাবভঙ্গি লক্ষ্য করা যায়। কিছু ধীরস্থির, চিন্তামগ্ন বিবেচকের মতো দেখতে, পাকা সংসারী ছাপ চেহারায়।

তৃণা নিঃশব্দে বেরিয়ে এসেছিল। শচীনের টের পাওয়ার কথা নয়। তবু শচীন টের পেল। হঠাৎ ঝুঁকে কী একটা তুলে নিয়ে ফিরে সোজা তার দিকে তাকাল। হাতে একটা ছোট্ট রুমাল। তৃণার।

শচীন জিজ্ঞেস করে—এটা তোমার?

খুব সূক্ষ্ম কাপড় আর লেস দিয়ে তৈরী রুমালটা তারই। সোফায় বসে থাকার সময়ে পড়ে গিয়ে থাকবে।

তৃণা মাথা নাড়ল।

—এখানে গাছের গোড়ায় পড়ে ছিল। বলে শচীন রুমালটা সোফার ওপর আলতোভাবে রেখে দিয়ে আবার গাছ দেখতে লাগল। জাপান থেকে বেঁটে গাছ আনাচ্ছে, শুনেছে তৃণা। সে গাছ কাচের বাক্সে হলঘরে রাখা হবে। বোধহয় সে ব্যাপারেই কোন প্ল্যান করছে।

রুমালটা তুলে নিতে গিয়ে তৃণাকে শচীনের খুব কাছে চলে যেতে হল। তার শ্বাস-প্রশ্বাস গায়ের গন্ধ ও উত্তাপের পরিমণ্ডলটির ভিতরেই বোধহয় চলে যেতে হল তাকে। তৃণা নিজের শরীরে বিদ্যুৎ তরঙ্গ টের পায়। অবশ্য শচীন খুবই অন্যমনস্ক। সে মোটে লক্ষ্যই করল না তাকে!

তৃণা রুমালটা তুলে নিল! চলে যাচ্ছিল সিঁড়ির দিকে। হঠাৎ দাঁড়াল, তার কিছু হারাবার ভয় নেই, কিছু পাওয়ার আশাও নেই তাহলে রেবা আর মনুর পর এ লোকটাকে একটু পরীক্ষা করে দেখলে কেমন হয়? কিছুদিন আগে শচীন তাকে মেরেছিল। জীবনে ঐ একবারই বোধহয় পদস্খলন হয়ে থাকবে লোকটার। তা ছাড়া আর কখনো তৃণার জন্য বোধহয় কোনো আবেগ বোধ করে নি। শচীনের ঐ মারটা একটা সুখস্মৃতির মতো কেন যে!

তৃণা আচমকা বলে—আমি যাচ্ছি!

শচীন শুনতে পেল না।

তৃণা মরীয়া হয়ে বলে—শুনছো!

অন্যমনস্ক শচীন দীর্ঘ উত্তর দেয়—উঁ···উঁ!

তারপর ধীরে ফিরে তাকায়। সম্পূর্ণ অন্য বিষয়ে লগ্ন চোখ!

—আমি একটু বেরোচ্ছি। তৃণা হাঁফধরা গলায় বলে।

শচীন বড় অবাক হয় বুঝি! বিস্ফারিত চোখে তার রাঙা পোশাকপরা চেহারাটা দেখে। অনেকক্ষণ পরে বলে—ওঃ!

শচীনের উত্তেজনা কম, রাগ কম। কিন্তু একরকমের কঠিন কর্তব্যনিষ্ঠার বর্ম পরে থাকে। স্ত্রী বিপথগামিনী বলে তার মনে নিশ্চয়ই কিছু প্রতিক্রিয়া হয় কিন্তু তা প্রকাশ করা তার রেওয়াজ নয়, এমন কি তৃণাকে সে তাড়িয়ে দিতে পারলেও দেয়নি, চমৎকার সুখ-সুবিধের মধ্যে রেখে দিয়েছে। লোকলজ্জাকেও গায়ে মাখে না। এ কেমনতর লোক? এমন হতে পারে, তৃণাকে ভালবাসে না, কখনো বাসে নি। কিন্তু ভালবাসুক চাই না বাসুক, পুরুষের অধিকারবোধও কি থাকতে নেই? কিংবা আত্মসম্মানবোধ? তৃণার শরীর ভাল নয়, মাথার ভিতরটাও আজ গোলমেলে। নইলে সে এমন কান্ড করতে সাহসই পেত না। সে তো জানে, শচীনের

তাকে নিয়ে কিছুমাত্র মাথাব্যথা নেই। সে কোথায় যায় বা না যায় তার খোঁজ কখনো রাখে না।

তৃণা খুব অসম্ভব একটা চেষ্টায় শচীনের ওপর নিজের চোখ রেখে তাকিয়ে রইল। শচীন খুব গম্ভীর। অন্যমনস্কতা কেটে গেছে। একটু চিন্তিত দেখাচ্ছে মাত্র।

শচীন মাথাটা নেড়ে বলল—যাবে যাও। বলার কী?

এই উত্তরই আশা করেছিল তৃণা। কিন্তু আজ তার একটা মরীয়া ভাব এসেছে। কেবলই মনে হয়েছে টান বাঁধা উদ্বেগ ও শঙ্কায় ভরা এইসব সম্পর্কের ভিতরের সত্যটা তার জেনে নেওয়া দরকার। যেন আর খুব বেশী সময় নেই।

তাই তৃণা বলে—এ ছাড়া তোমার আর কিছু বলার নেই?

শচীন অবাক হয়ে বলে—কি থাকবে? এখন বলা-কওয়ার স্টেজ পার হয়ে গেছে।

তৃণা তার শুকনো ঠোঁট বিশুষ্ক দাঁতে চেপে ধরল। মুখে জল নেই, পাপোষের মতো খসখসে লাগছে জিভটা। কিন্তু আশ্চর্য যে বহুদিন পরে শচীনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তার বুক কাঁপছে না ভয়ও হচ্ছে না তেমন।

তৃণা বলে—আমি যদি একেবারে চলে যাই তাহলেও কিছু বলার নেই?

—বলার অনেক কিছু মনে হয়। কিন্তু বলতে ইচ্ছে করে না।

—কেন?

—বলা মানে কাউকে শোনানো, আমার তো শোনানোর কেউ নেই।

তৃণা চুপ করে থাকে। কান্না আসে, কিন্তু কাঁদে না। তার কান্নার মূল্যই বা কী?

শচীন টেবিল থেকে জলের জগটা তুলে নিয়ে আলগা করে একটু জল খেল। তারপর তৃণার দিকে তাকিয়ে তেমনি চিন্তিত গলায় বলে—তুমি কি একেবারেই যাচ্ছো?

তৃণা কিছু বলল না। দুঃসাহসভরে তাকিয়ে থাকল।

শচীন বলে—এ সিদ্ধান্তটা আরো আগেই নিতে পারতে।

—তাহলে কী হত?

—তাহলে অন্তত উদ্বেগ আর মানসিক কষ্ট হত না। দেবাশিস বাবুও নিশ্চিন্ত হতে পারতেন।

তৃণা অধৈর্য হয়ে বলে—আমি সে-যাওয়ার কথা বলিনি।

—তবে ?

—আমার মনে হচ্ছে আমি আর বেশিদিন বাঁচব না।

—ও। শচীন একটু চুপ করে থাকে। তারপর, যেন বুঝেছে, এমনভাবে মাথা নাড়ল। বলল—তাও মনে হওয়া সম্ভব। বহুকাল ধরেই তোমার নার্ভের ওপর চাপ যাচ্ছে। তার ওপর আছে নিজেকে ক্রমাগত অপরাধী ভেবে যাওয়ার হীনমন্যতা! এ অবস্থায় মরতে অনেকেই চাইবে।

—তুমি কি সিমপ্যাথি দেখাচ্ছ ?

—না। কিন্তু তোমাকে সাহসী হতে বলছি। চোরের মতো বেঁচে আছো কেন ? যা করেছো তা আরো সাহস আর স্পষ্টতার সঙ্গে করা উচিত ছিল ?

—কী বলতে চাও তা আরো স্পষ্ট করে বলো।

শচীন তার দিকে ক্ষণকাল চেয়ে রইল, যেন ঠিক বিশ্বাস করতে পারছে না তৃণার এই ব্যবহার। তারপর বলে—এ ঘরটা কথা বলার ঠিক জায়গা নয়। এসো।

বলে শচীন হলঘরের সামনের দিকের ঘরটায় ঢোকে। এই ঘরে পাতা রয়েছে সবুজ রঙের পিঙপঙ টেবিল, ক্যারাম, দাবা, দেয়ালে সাজানো টেনিস আর ব্যাডমিণ্টনের র‍্যাকেট। কাঠের ফ্রেমে গলফ্ কীট। একাধারে জুতোর র‍্যাক্, দেয়াল আলমারিতে সাজানো কয়েকটা বন্দুক, কয়েকটা ভাল সোফা দেয়ালের সঙ্গে পাতা রয়েছে।

তৃণার ঠিক বিশ্বাস হচ্ছিল না যে, শচীন তার সঙ্গে কথা বলার জন্যে একটুও আগ্রহ দেখাবে। ঘটনাটা যেন স্বপ্নের মধ্যে ঘটেছে। কিন্তু এও জানে তৃণা, কথা বলে এ সমস্যার কোনো সুরাহা হওয়ার নয়!

ঘরটা একটু আবছাওয়া। শচীন ঢুকে তৃণার ঘরে ঢোকার জন্য অপেক্ষা করল। তারপর দরজাটা বন্ধ করে দিল। পিঙপঙ খেলার জন্য এ ঘরে কয়েকটা খুব বেশী পাওয়ারের আলো লাগানো আছে। শচীন আলো জ্বালে। চোখ ধাঁধানো আলো।

তৃণার মাথার মধ্যে একটা বিকারের ভাব। বন্ধ ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়েই তার মনে হয়, এ ঘরে একটা মিলনাত্মক নাটক করার জন্যই শচীন তাকে ডেকে এনেছে। শেষমেশ জড়িয়ে টড়িয়ে ধরবে না তো! না, না, তাহলে সহ্য করতে পারবে না। বড় বিতৃষ্ণা হবে তাহলে।

শচীন পিঙপঙ টেবিলের ওপাশে একটা চেয়ার টেনে বসল, টেবিলের ওপরে সাবধানে নিজের হাত দু'খানায় ভর রেখে তৃণার দিকে চেয়ে বলল—এবার বলো।

—তৃণা ভ্রূ কুঁচকে বলে—আমি কী বলব?

—বলাটা তুমিই শুরু করেছো।

তৃণা একটু থমকে থাকে। সময় চলে যাচ্ছে। ফাঁড়ির কাছের বাসস্টপে দেবাশিস তার গাড়ি নিয়ে এসে বসে থাকবে। সেটা ভাবতেই তার শরীরে অসুস্থতাকে ভাসিয়ে দিয়ে একটা জোয়ার আসে তীব্র, তীক্ষ্ম আনন্দের। শচীনের দিকে তাকিয়ে তার এ লোকটার সঙ্গ করতে অনিচ্ছা হতে থাকে।

তৃণা শ্বাস ফেলে বলে—আমি বোধহয় বেশিদিন বাঁচব না।

—সেটা হঠাৎ আজ বলছ কেন?

—আজ বলছি, আজই মনে হচ্ছে বলে!

শচীন মাথা নেড়ে ধীর স্বরে বলে—যদি মনে হয় তাহলে তার জন্যে আমরা কী করতে পারি?

তৃণা অধৈর্যের গলায় বলে—আমি কিছু করতে বলিনি।

—তবে?

তৃণা একটু ভাবে। ঠিকঠাক কথা মনে পড়ে না। হঠাৎ বলে —আমি এ বাড়িতে কিরকমভাবে আছি তা কি তুমি জানো?

শচীন চুপ করে চেয়ে রইল খানিক। তৃণার আজকের সাহসটা বোধহয় তারিফ করল মনে মনে। তারপর বলল—বাইরে থেকে কেমন আছো তা জানি। কিন্তু মনের ভিতরে কেমন আছো তা কি করে জানব? প্রত্যেক মানুষই দুটো মানুষ।

—সে কেমন?

—বাইরেরটা আচার আচরণ করে, সহবৎ রক্ষা করে, হাসে বা কাঁদে, ভালবাসে বা ঘেন্না করে। আর ভিতরের মানুষটা এক

পাগল। বাইরের জনের সঙ্গে তার মিলমিশ নেই, বনিবনা নেই, একটা আপস-রফা হয়তো আছে। সেই ভিতরের মানুষটাকে জেনুইন অন্তর্যামী ছাড়া কেউ জানতে পারে না।

—আমি তত্ত্বকথা শুনতে চাই না।

শচীনকে খুব শান্ত ও নিরুদ্বেগ দেখাচ্ছে। এ মানুষটার এই শান্তভাবটা তৃণা কখনো ভাল মনে নিতে পারে না। শচীন শান্ত মুখে বলে—তত্ত্বকথা মানেই তো আর পুঁথিপত্রের কথা নয়। জীবন থেকেই তত্ত্ব কিংবা দর্শন আসে। আমি তো স্পষ্ট করেই বলছি যে, তোমার জন্য আমরা কিছু আর করতে পারি না।

—তা জানি। আমি তবু একটা কথা জানতে চাই। তোমার চোখে এখন আমি কী রকম?

শচীন হাসল না। তবু একটু দুর্বোধ্য কৌতুক চিকমিক করে গেল তার চোখে। বলল—অ্যাপারেণ্টলি তুমি তো এখনো বেশ সুন্দরীই। ফিগার ভাল, ছেলেমেয়ের মা বলে বোঝা যায় না।

তৃণা রেগে লাল হয়ে গেল। বলল—সে কথা জিজ্ঞেস করিনি।

—তবে?

—আমি জানতে চাইছি, তুমি আমাকে কী চোখে দেখ!

—ও বলে শচীন তেমনি চুপ করে চেয়ে থাকে তার দিকে। চোখে কোনো ভাষা নেই, নীরব কৌতুক ছাড়া। বলে—তোমাকে আসলে আমি দেখিই না। অনেক চেষ্টা করে তবে এই না-দেখার অভ্যাস করেছি।

তৃণার এ সবই জানা। তবু বলল—এই যেমন এখন দেখছ! এখন কোনো প্রতিক্রিয়া হচ্ছে না?

—হচ্ছে।

—সেটা কেমন?

রাস্তার ভিখিরিদের আমরা লক্ষ্য করি না। আবার তাদের মধ্যে কেউ যখন সাহসী হয়ে, কিংবা মরীয়া হয়ে কাছে এসে তাদের দুঃখের কথা বলে তখন তাকে দেখি, মায়া হয়, করুণা বোধ করি। এও ঠিক তেমনি, তোমার জন্য মায়া এবং করুণা হচ্ছে। আবার যখন ভিখিরিটা দঙ্গলে মিশে যাবে, তখন আবার তাকে লক্ষ্য করব

না। আমরা কেউ কাউকে কনস্ট্যান্ট মনে রাখতে পারি না, সে যত ভালবাসার বা ঘেন্নার লোক হোক না কেন। কখনো মনে রাখি আবার ভুলে যাই, ফের মনে করি—এমনিভাবেই সম্পর্ক রাখি। মানুষ দুভাবে থাকে।

—সে কেমন?

—এক, কেবলমাত্র শারীরিকভাবে থাকে। দুই, মানুষের মনের মধ্যে থাকে। আমার কাছে, তুমি কেবল শারীরিকভাবে আছ, আমার মনের মধ্যে নেই।

তৃণা ভ্রূ কোঁচকায়। বিরক্তিতে নয়, যখন সে খুব অসহায় হয়ে পড়ে তখন ভ্রূ কোঁচকানো তার স্বভাব।

তৃণা শ্বাস ফেলে বলে—এটা সত্যি কথা নয়।

—তাহলে কোনটা সত্যি কথা? তুমি কি আমার মনের মধ্যে আছো?

তৃণা মাথা নেড়ে বলে—আমি সে কথা বলিনি। আমি জানতে চাই আমাকে—আমার প্রতি তোমার প্রতিক্রিয়া কী?

শচীন মাথাটা নামিয়ে সবুজ টেবিলের ওপর তার দুহাতের আঙুল দেখল। তারপর মুখ না তুলেই বলল—আমি খুব সিমপ্যাথেটিক! তোমার সমস্যাটা আমি বুঝি, তাই তোমাকে সাহসী হতে বলেছিলাম।

—আমাকে চলে যেতে বলছো?

শচীন মাথা নেড়ে বলল—না, তুমি এ বাড়িতে থেকেও যা খুশি করতে পারো। তাতে আমাদের যে কিছু আসে যায় না তা তো তুমি বোঝোই, কিন্তু তোমার তাতে আসে যায়। তুমি কেবলই পাপবোধে কষ্ট পাচ্ছো, আমরা তোমাকে নিয়ে নানা জল্পনা করছি বলে সন্দেহ করছ। হয়তো একথাও ভাবো যে, দেবাশিসবাবুর স্ত্রী তোমার জন্যই আত্মহত্যা করেন। এসব তোমার ভিতরে ক্ষয় ধরাচ্ছে। আমি তোমাকে চলে যেতে বলছি না, কিন্তু গেলে তোমার দিক থেকেই ভাল হবে।

—আমি থাকি বা যাই, তাতে কি তোমাদের কিছু যায় আসে না?

—না। আর যদি মরে যাই?

—সেটা স্বতন্ত্র কথা! অন্য মানুষকে মরতে দেখলে আমাদের নিজেদের মৃত্যুর কথা মনে পড়ে, তাই মন খারাপ হয়ে যায়। কিন্তু মরবে কেন?

—আমি ইচ্ছে করে মরব, এমন কথা বলিনি। কিন্তু মনে হয়, আমি আর বেশিদিন বাঁচবও না।

—তাহলে সেটা দুঃখের ব্যাপার হবে। যাতে মরতে না হয় এমন কিছু করাই ভাল। শরীর খারাপ হয়ে থাকলে ডাক্তার দেখাও।

তৃণা ঘুরে দরজার দিকে এগোয়। ছিটকিনি খুলতে হাত বাড়িয়ে বলে—দেখবো। কিন্তু দয়া করে মনে কোরো না যে, আমি তোমার বা তোমাদের করুণা পাওয়ার জন্য মরার কথা বলে ছিলাম।

শচীন চেয়ার ঠেলে উঠল। কথা বলল না।

তৃণা আর একবার ফিরে তাকাল না। দরজা খুলে সে বেরিয়ে এল হলঘরে। তারপর সিঁড়ি ভেঙে বাগানের রাস্তা ধরে চলে আসে ফুটপাথে। খুব জোরে হাঁটতে থাকে।

আপন মনেই বিড়বিড় করে কথা বলছিল তৃণা—যাবে না কেন? আমি তো তোমাদের কেউ না।

কোনো লক্ষ্য স্থির ছিল না বলে তৃণা ভুল রাস্তায় এসে পড়ল। ঘড়িতে খুব বেশি সময় নেই। দেবাশিস আসবে। ফাঁড়ির কাছের বাসস্টপে তাদের দেখা হবে। দেখা হলেই পৃথিবীর মরা রঙে উজ্জ্বলতা ফুটে উঠবে।

তৃণা ঠিক করে ফেলল, আজ সে দেবাশিসকে বলবে, বরাবরের মতো চলে যাবে তৃণা, ওর কাছে।

সামনেই একটা থেমে থাকা মোটর সাইকেল স্টার্ট দিচ্ছে অল্প-বয়সী একটা ছেলে। স্টার্টারে লাথি মারছে লাফিয়ে উঠে। স্টার্ট নিচ্ছে না গাড়িটা দু-একবার গরগর করে থেমে যাচ্ছে। নিস্তব্ধ রাস্তায় শব্দটা ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি হয়ে মস্ত বড় হয়ে যাচ্ছে। সেই শব্দটায় যেন তৃণা সম্বিৎ ফিরে পেল। সে চারধারে তাকিয়ে দেখল এ তার রাস্তা নয়। ফাঁড়ি আরো উত্তরে।

সে ঘুরে হাঁটতে থাকে। পিছনে মোটরসাইকেলটা স্টার্ট নেয়।

ভয়ঙ্কর একটা শব্দ তুলে মুখ ঘুরিয়ে তেড়ে আসে। ফুটপাথে উঠে যায় তৃণা। মোটর সাইকেলটা ঝোড়ো শব্দ তুলে তাকে পেরিয়ে চলে যায়।

গাড়ির শব্দ পেয়েই ফুলি হাঁপাতে হাঁপাতে নেমে আসে। অল্প বয়সেই ফুলি বড় মোটা হয়ে গেছে। একদল ছেলেপুলের মা। তবু বোধহয় সন্তানের তেষ্টা ওর মেটেনি। রবির জন্য একবুক ভালবাসা বয়ে বেড়ায়।

ফুলির আদর সোহাগ সবই সেকেলে ধাঁচের। রবি গাড়ি থেকে নামতে না নামতেই ফুলি হাত বাড়িয়ে রাস্তাতেই ওকে বুকে টেনে নেয়। মৃদু সুখের ঘুনঘুনে শব্দ করতে করতে বলে—ধন আমার মানিক আমার গোপাল আমার···বলে মুখে বুকে মুখ ডুবিয়ে দেয়। রবি প্রথমটায় লজ্জা পায়। হাত-পা দিয়ে আদর ঠেকায়। কিন্তু তারও দুর্বলতা আছে! সারা সপ্তাহ ধরে সে এই অদ্ভুত গ্রাম্য আদরটুকুর জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতেই দেখা যায়, রবি দুহাতে আঁকড়ে ধরেছে তার মণিমাকে, কাঁধে মাথা রেখেছে। বলছে—রোজ রাতে আমি তোমাকে স্বপ্ন দেখি মণিমা।

ফুলির বুকে বোধহয় এই কথায় একটা ঢেউ উঠে নতুন করে। সেই ঘুনঘুনে আদরের শব্দটা করতে করতে পিষে ফেলে রবিকে। আর রবি এবার নির্লজ্জের মতো আদর খায়।

ফুলির ছেলেপুলেরা সাড়া পেয়ে হৈ-হৈ করে এসে ঘিরে ধরে রবিকে। রবি ওদের কাছে একটা বিরাট বিস্ময়! সে সাহেবদের মতো চমৎকার ইংরাজী বলে, অদ্ভুত সব দামী পোশাক পরে, নিখুঁত সহবৎ মেনে চলে! ফুলির ছেলেমেয়েরা এসব দেখে ভারী মজা পায়।

ফুলি তার ছেলেমেয়েদের মধ্যে রবিকে ছেড়ে দিয়ে মুগ্ধচোখে একটু চেয়ে রইল, আপন মনেই বলল—রোগা হয়ে গেছে।

চাঁপা হটবক্স ফ্লাস্ক আর দৈ-মিষ্টির ভাঁড় নামিয়ে রাখতে রাখতে বলে—কিছু খেতে চায় না!

ফুলি মাথা নেড়ে বলে—খাবে কি? ওর ভিতরটা যে খাক হয়ে যায়। সে আমি বুঝি।

ফুলিদের আলাদা বসবার ঘর নেই। ঢুকতেই একটা লম্বাটে ঘর দালানের মতো আছে, সেখানে কয়েকখানা চেয়ার পাতা। ফুলির বর শিশির বি এন-আর-এ চাকরি করে। বয়স বেশি নয়, কিন্তু ভারী প্রাচীনপন্থী। বছর বছর ছেলেপুলে হয় বলে দেবাশিস ওকে একবার বলেছিল—ভায়া বৌটাকে তো মেরে ফেলবে, ছেলেপুলে গুলোও মানুষ হবে না।

শিশির একটু ঘাড় তেড়া করে বলল—তা কী করব বলুন?

তখন দেবাশিস বলে—কন্ট্রাসেপটিভ ব্যবহার করো না কেন?

শুনে বড় রেগে গিয়েছিল শিশির, বলল—কেন, আমি কি নষ্ট মেয়েমানুষের কাছে যাচ্ছি নাকি যে ওসব ব্যবহার করব?

এই হচ্ছে শিশির। আধুনিক জগতের কোনো খোঁজই সে রাখে না, তার ধারণা চাঁদে মানুষ যাওয়ার ঘটনাটা স্রেফ কারসাজি আর পাবলিসিটি। আজও সে বিশ্বাস করে না যে চাঁদে মানুষ গেছে। কথা উঠলেই বিজ্ঞের মতো একটা 'হুঃ' দিয়ে অন্য কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে! দেবাশিসকে সে একেবারেই সহ্য করতে পারে না। দেবাশিসের অর্থকরী সাফল্যকে সে হয়তো ঈর্ষা করে, কিংবা তার আধুনিক ফ্যাশান দুরস্ত হাবভাব, চালাক চতুর কথাবার্তা অপছন্দ করে।

দেবাশিস ঘরদালানের চেয়ারে বসল একটু। ভিতরের ঘরে রবিকে ঘিরে ধরে পিসতুতো ভাইবোন হল্লা করছে। মুর্গ মুসল্লমের প্যাকেট হটবক্স বের করা হয়েছে বোধহয়। তাই দেখে চেঁচাচ্ছে ফুলির আনন্দিত ছেলেমেয়েরা। বাথরুমের দিক থেকে গামছা-পরা শিশির বের হয়ে এল। দেবাশিসকে দেখে একটু হাসল। বলল—কী খবর? হাসিটা তেমন খুলল না।

—এই তো, চলে যাচ্ছে।

—রবিকে এনেছেন ?

—হ্যাঁ, আওয়াজ পাচ্ছো না ?

শিশির এবার সত্যিকারের হাসি হাসল। দেবাশিসকে যতই অপছন্দ করুক শিশির, রবির তারও ভয়ঙ্কর টান আছে। রবি এলে সে রসগোল্লা কিনে আনে, টফি আনে, খেলনা। ডাকে রবিরাজ বলে।

ফুলি এক কাপ চা হাতে এল। শিশিরকে দেখে ঘোমটা দিল মাথায়। ওর চালচলনে এখনই কেমন গিন্নি-বান্নির ঠাট ঠমক পাকা হয়ে গেছে। একগাল পান মুখে।

চা-টা একটা ছোট্ট টুলে দেবাশিসের সামনে রেখে হাঁসফাঁস করতে করতে বলে—সুজি করেছি, খাবে ?

—না।

পানের পিক ফেলতে বাথরুমে মুখ বাড়িয়ে আবার ফিরে এল ফুলি। চাঁপার দিকে চেয়ে বলল—তুই দিনমান থাকবি তো চাঁপা, না কি দাদার সঙ্গে চলে যাবি ? আমি একাহাতে আজকের দিনটা সামলাতে পারি না। ক্ষুদে ডাকাতরা সারা বাড়ি তছনছ করে, তার ওপর আজ আবার ওদের বাপ শনিঠাকুরটি বাড়িতে আছেন। আমি বলি বরং তুই থেকে যা।

চাঁপা ঘাড় নাড়ল! বলে—সোনাবাবুর কাছছাড়া হতে ভাল লাগে না।

মুখটা খুশীতে ভরে ওঠে ফুলির, বলে—আহা রোগা হয়ে গেছে।

দেবাশিস ভদ্রতাবশত চায়ে চুমুক দেয়! আসলে ফুলির বাসার চা সে খেতে পারে না। চায়ের সুঘ্রাণ নেই, আছে কেবল লিকার আর গুচ্ছের দুধ-চিনি। দুধ বেশি পড়ে গেছে ফলে চা সাদা দেখাচ্ছে। ছেলেবেলায় বেশি দুধের চাকে তারা বলত সাহেব চা। সাহেবদের রং ফর্সা বলেই বোধহয় উপমাটা দিয়ে থাকবে।

—ফুলি, এ যে সাহেব চা! দেবাশিস বলে।

ফুলি প্রথমটায় বুঝতে পারে না। তারপর বুঝে লজ্জা পেয়ে বলে—তোমার তো, আবার সব সাহেবী ব্যাপার—পাতলা লিকার অল্প দুধ-চিনি ওসব কি আর মনে থাকে! আমাদের বাঙালী

বাড়িতে যেমনটি হয়ে তেমনটি করে দিয়েছি। আবার করে দিই।

—থাকগে। খারাপ লাগছে না। দেবাশিস বলে।

ফুলি সামনে মোড়া পেতে বসল। গায়ে মোটা মোটা গয়না, আঁচলে চাবি সব মিলিয়ে ওর নড়াচড়ায় এক ঝনৎকার শব্দ হয়। জোরে শ্বাস ফেলে, শ্বাসের সঙ্গে একটা শারীরিক কষ্টে ওঃ বা আঃ শব্দ করে। সম্ভবত কোনো মেয়েলী রোগ আছে। শরীরের নানা আধি-ব্যাধির কথা বলে। কিন্তু বসে শুয়ে থাকে না কখনো। সারাদিন কাজকর্ম করছে স্টীম-রোলারের মতো।

বসে ফুলি বলল—দাদা, এবার রবির ব্যাপারে একটা কিছু ঠিক করো।

—কী ঠিক করব ?

—ওকে আর তোমার ফাঁকা ভুতুড়ে ফ্ল্যাটে রেখে লাভ কী ? সারাদিন ওর মনের মধ্যে নানা ভয়-ভীতি খোঁড়ে। দেখছো না, কেমন রোগা হয়ে যাচ্ছে ! খাওয়ায় অরুচি, সারাদিন নাকি মুখ গোমড়া করে থাকে। সঙ্গী-সাথীও নেই।

—সব সয়ে যাবে।

—সইছে কোথায় ! প্রায় সময়েই আমার কাছে এসে মায়ের কথা বলে। দুপুরে ঘুম পাড়িয়ে রাখি, ঘুমের মধ্যে দেখি খুব চমকে চমকে ওঠে। এ সব ভাল লক্ষণ নয়। মুখে কিছু বলে না, লজ্জায়। কিন্তু ভিতরে ভিতরে কাঁদে।

দেবাশিস একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেল। চায়ের কাপটা রেখে দিয়ে বলল—আমি তো ও যা চায় দিই।

—আহা ! বাচ্চাদের কাছে সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে মা আর সঙ্গী। তা ও পায় কোথায় ! আমি বলি, আমার কাছে থাক। মণিমা-মণিমা করে কেমন অস্থির হয় দেখনি ?

দেবাশিস একটু হেসে বলে—তোরই তো অনেক ক'জন, তার ওপর আবার রবি এসে জুটলে—

ফুলি ধমকে ওঠে—ও সব অলক্ষুনে কথা বলো না ! ছেলে মেয়ে আবার বেশি হয় নাকি ?

দেবাশিস হাসে, বলে—তোর তা'হলে এখনো ছেলেমেয়ের সাধ মেটেনি ?

ফুলি কড়া গলায় বলে—না। মিটবেও না। আমি বাপু ছেলেপুলে কখনো বাড়তি দেখি না। যত হবে তত চাইব। মা হয়েছি কিসের জন্য ?

যদিও এটা কোনো যুক্তি নয়, তবু এর প্রতিবাদও হয় না। কারণ এ যুক্তির চেয়ে অনেক জোরালো জিনিস। এ হচ্ছে বিশ্বাস। শিশিরের সঙ্গে থেকেই বোধহয় এইসব গ্রাম্যতা ওর মনে পাকা-পোক্ত হয়ে গিয়ে থাকবে। বিশ্বাসের বিরুদ্ধে যুক্তির লড়াই বোকামি তাই দেবাশিস একটু চুপ করে থাকে। একটা সিগারেট ধরায়। বলে—দেখি।

—দেখবে আবার কী! রবিকে আমার কাছে দিয়ে দাও। তোমার পায়ে পড়ি।

—ওখান থেকে ওর ইস্কুলটা কাছে হয়, তাছাড়া একভাবে থেকে থেকে সেট হয়ে গেছে, এখন তোর এখানে এসে থাকলে দেখবি ওর মন বসছে না।

—কী কথা! এ বাড়ীতে এলে ও কখনো যেতে চায় দেখেছো ?

—সে এক-দু'দিনের জন্য, পাকাপাকিভাবে থাকতে হলেই গোলমাল করবে।

—সে আমি বুঝব! তুমি বাপু ছেলেকে সাহেব করার জন্য উঠে-পড়ে লেগেছো। আজকাল আমার সঙ্গেও ইংরিজি বলে ফেলে, কথায় কথায় 'সরি' আর 'থ্যাঙ্ক ইউ' বলে।

শিশির গামছা ছেড়ে লুঙ্গি পরেছে। ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলল—আসলে গরীবের বাড়ীতে রাখতে দাদার ভয়। এখানে সব খারাপ সহবৎ শিখবে। খানা-পিনাও তেমন সায়েন্টিফিক হবে না।

দেবাশিস মনের মধ্যে এসব কথাই ভাবে। এখানে দঙ্গলের মধ্যে পড়ে রবি তার আচার আচরণ ভুলে যাবে, স্মার্টনেস হারাবে। চীৎকার করতে শিখবে, খারাপ কথা বলতে শিখবে। এবং হয়তো বা দেবাশিসকে একটু একটু করে বিস্মৃত হবে।

দেবাশিস মৃদু গলায় বলে—না, সে সব নয়। আসলে ও আছে বলেই ফ্ল্যাটটায় ফিরতে ইচ্ছে করে।

ফুলি বলে - তুমি আর কতক্ষণের জন্যই বা ফেরো। রাতটুকু কেটে গেলেই তো আবার টো-টো কোম্পানি। ও যে একা সেই একা !

দেবাশিস একটা শ্বাস ফেলে বলে—ভেবে দেখি।

—দাদা, আমি রবিকে বুক দিয়ে আগলে রাখব। একটুও চিন্তা কোরো না।

—সে আমি জানি। তবু একটু ভেবে দেখতে দে।

—ভাবতে ভাবতেই ওকে শেষ করে ফেলো না। এখানে থাকলে ও সব ভুলে থাকতে পারবে। ফাঁকা ঘরে থাকে বলেই ওর সব মনে পড়ে। আমার কাছে কত কথা এসে বলে !

দেবাশিস ফুলির দিকে একটু অবিশ্বাসের চোখে চেয়ে দেখছিল। ছেলেপুলের কী অপরিসীম সাধ ওর। গর্ভযন্ত্রণার কথা ভাবে না, ঝামেলার কথা ভাবে না। দুবার ওর পেটের ছেলে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল বলে আজও দুঃখ করে। এই অভাব, দারিদ্র্য দুঃসময়—এগুলো ওর কাছে ব্যর্থ হয়ে গেছে। দুটি বা তিনটি সন্তানের সরকারী বিজ্ঞপ্তি ও কখনো বোধহয় চোখ তুলে দেখে না। শুনলে বলে—ওসব শোনাও পাপ।

দেবাশিস একটু হেসে বলে—পারিসও তুই।

ভিখিরির মতো ফুলি বলে—রবিকে দেবে দাদা ?

দেবাশিস মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলে—আজ উঠি রে।

সে উঠে দাঁড়ায়। চাঁপা দৌড়ে গিয়ে রবিকে বলে—সোনাবাবু এসো ! বাবা চলে যাচ্ছে। দেখা করে যাও।

কিন্তু রবি সহজে আসে না। দেবাশিস সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে। চাঁপা রবিকে হাত ধরে নিয়ে আসে। দেবাশিস দেখতে পায়, ইতিমধ্যেই রবির চুল ঝাঁকরা হয়ে গেছে। ব্যানলনের গেঞ্জি বুক পর্যন্ত গুটিয়ে তোলা। মুখে চোখে একটা আনন্দের বিভ্রান্তি। দেবাশিসের দিকে চেয়েই রবি দূর থেকেই চেঁচিয়ে বলল—বাবা তুমি যাও।

দেবাশিস ক্লিষ্ট একটু হাসে। বলে—আচ্ছা।

ফুলি সিঁড়ি পর্যন্ত আসে। কয়েক ধাপ নামে দেবাশিসের সঙ্গে। গলা নীচু করে বলে—শোনো দাদা।

দেবাশিস অন্যমনস্ক ভাবে বলে—উঁ।

—রবি তোমার কাছে থাকলে ক্ষতি হবে। ও বড় দুঃখী ছেলে। তুমি কেন বুঝতে পারছো না?

দেবাশিস হাসল। মড়ার মুখের মতো হাসি। তারপর ফুলিকে পিছনে ফেলে নেমে এল রাস্তায়।

গাড়ীর দরজা খুলতে খুলতে একটা কণ্ঠস্বর শুনে হঠাৎ ওপরে তাকাল। চমকে উঠল ভীষণ। দোতলার রেলিঙের ওপর দিয়ে আধখানা মুখ বাড়িয়ে ঝুঁকে আছে রবি। আশেপাশে পিসতুতো ভাইবোনেরা। খুব উত্তেজিতভাবে কী যেন দেখছে দূরে। হাত তুলে আঙুল দিয়ে পরস্পরকে দেখাচ্ছে। হয়তো কাটা ঘুড়ি। কিংবা হেলিকপ্টার।

দেবাশিসের বুকের ভিতরটায় প্রবল একটা ঝাঁকুনি লাগে। গাড়ি হঠাৎ ব্রেক কষলে যেমন হয়।

—রবি! বলে একটা চীৎকার দেয় সে।

মস্ত ভুল হয়ে গেল চীৎকারটা দিয়ে। এমন অবস্থায় কাউকে ডাকতে নেই। রবির মা সাততলা ফ্ল্যাট থেকে লাফিয়ে পড়ে মারা যায়।

শরীরের আধখানা বাইরে ঝুলন্ত অবস্থায় রবি ডাকটা শুনতে পেয়ে চমকে উঠল। দুলে উঠল শিশু শরীর। শূন্যে হাত বাড়িয়ে একটা অবলম্বনের জন্য অসহায়-ভাবে হাত মুঠো করল। টাল-মাটাল ভয়ংকর কয়েকটি মুহূর্তের সন্ধি সময়। দেবাশিসের প্রায় সংজ্ঞাহীন শরীরটা টাল খেয়ে গাড়ির গায়ে ধাক্কা খায়। চোখ বুজে ফেলে সে। দাঁতে দাঁত চাপে।

রবি সামলে গেল। ওর ভাইবোনেরা ওকে ধরেছে। টেনে নামিয়ে নিচ্ছে রেলিং থেকে। ফুলি এসে দাঁড়িয়েছে পিছনে।

দেবাশিস অবিশ্বাসভরে চেয়ে থাকে। রবি রেলিঙের ফাঁক দিয়ে বাবার দিকে চেয়ে হাসে। তারপর হঠাৎ প্যান্টের পকেট থেকে রিভলভার বের করে আনে। বাপের দিকে তাক করে গুলি ছুঁড়তে থাকে—ঠিসুং···ঠিসুং···

দেবাশিস একবার ভাবল ফিরে যাবে ফুলির বাসায়। তারপর

ভাবল—থাক। ওরও তো ছেলেমেয়ে আছে। কেউ তো পড়ে মরেনি কখনো।

রবির দিকে চেয়ে দেবাশিস একটু হাসে। তার বুকে কোথায় যেন রবির খেলনা রিভলভারের মিথ্যে গুলি এসে লাগে। সে গাড়ির খোলা দরজা দিয়ে কোনোক্রমে হুইলের পিছনে বসে পড়ে। তারপর গভীরভাবে কয়েকটা শ্বাস নেয়।

গাড়ী ছাড়ে। কিন্তু উইণ্ডস্ক্রীন জুড়ে কেবলই দোতলার রেলিং থেকে ঝুঁকে-থাকা রবির চেহারাটাকে দেখতে পায়। চমকে চমকে ওঠে। দাঁতে দাঁত চাপে। হুইলে তার মুঠো করা হাত প্রবল চাপে সাদা হয়ে যায়। পদে পদে ভুলভাবে গাড়ি চালাতে থাকে সে!…রবির মা চন্দনা লাফিয়ে পড়েছিল সাততলা থেকে, কথাটা ভুলতে পারে না।

রবিও কি কিছু ভোলেনি? সব মনে রেখেছে।

তৃণার সঙ্গে দেখা হবে। ফাঁড়ির কাছের বাসস্টপে। দেবাশিস খুব সাবধানে গাড়ি চালাতে থাকে।

দুপুরের ফাঁকা রাস্তায় তৃণা একটু বেশী তাড়াতাড়ি হাঁটছিল। পিছনে কে যেন আসছে। ফিরে দেখল। কেউ না! কিন্তু বার-বার মনে হচ্ছে, পিছনে কে আসছে। কে যেন চুপি চুপি আসছে। কার চোখ তীব্র ভাবে, গোয়েন্দার মতো নজর করছে তাকে। কেউ নয়। তবু তৃণা প্রাণপণে হাঁটে। বড় রাস্তায় তুখোর রোদ। দোকান বাজার বন্ধ। রাস্তা ফাঁকা ফাঁকা, তৃণা কি আজ খুন হবে? গোপন থেকে কোন আততায়ী কেবলই আসে তৃণার দিকে?

তৃণা চারধারে তাকায়। কেউ নয়। উল্টোবাগে চলে এসেছে অনেকখানি। বাসস্টপটা এখনো বেশ দূরে। তৃণা বেশী হাঁটতে পারে না। হাঁটা জিনিষটা বড্ড ক্লান্তিকর। রিক্সাতেও সে কখনো

ওঠে না। বড্ড মায়া হয়। দুপুরের পীচ-গলা রাস্তায়, এই চাবুক রোদে রোগা মানুষগুলো রিক্সা টানে, তাতে সওয়ার হতে একদম ভাল লাগে না তার।

ল্যান্সডাউনের মোড়ে পেট্রল-পাম্পের কাছ ঘেঁষে একটা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে। ট্যাক্সিওলা হাঁটু তুলে বসে ছোট্ট একটা বই পড়ছে। সম্ভবতঃ রেসের বই, কিংবা গীতাও হতে পারে। একা ট্যাক্সিতে তৃণা ওঠে না। ভয় করে। কিন্তু শরীরটা কেমন যেন কাঁপছে। ভয় করছে। উৎকণ্ঠা।

সাহস করে দু'পা এগোলো তৃণা।

—ভাই, ট্যাক্সি কি যাবে?

—যাবে। ট্যাক্সিওলা গম্ভীরভাবে বলে।

ট্যাক্সিটা দক্ষিণদিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে। তৃণা উঠতেই ট্যাক্সিটা ঐ দিকেই চলতে থাকে, তৃণা কিছু বলেনি। তখন সে সুস্পষ্ট এবং পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিল, রেবার ঘরে সে বসে আছে, আর রেবা, হৃদয়হীনা রেবা, তার দিকে স্বচ্ছ শীতল চোখে তাকিয়ে আছে, পরমুহূর্তেই সে তার ছেলেকে দেখতে পায়। মোটাসোটা স্বাস্থ্যবান মনু তাকে কোলে করে ঘরে পেঁাছে দিচ্ছে। কি সুন্দর মনুর গায়ের গন্ধটুকু। আবার দেখে শচীন পিংপং টেবিলের ওপাশে বসে আছে, বলছে—তোমাকে আজকাল আমি লক্ষ্য করি না···

ভ্রূ কোঁচকায় তৃণা। তার সংসারে সে আজকাল আর নেই। কেউ তাকে লক্ষ্য করে না। এ কেমন? সে ও-বাড়ির কারো মা, কারো গৃহকর্ত্রী। তার অতবড় পতন, ঐ কলঙ্ক, পরকীয়া ভালবাসা, এসব ওদের একেবারেই কেন উত্তেজিত ও দুঃখিত করে না? কেন ওদের শান্তি ও স্বাভাবিকতা অক্ষুণ্ণ আছে? এ কি শচীনের ষড়যন্ত্র: শচীন কি ওদের শিখিয়ে রেখেছে—ওর দিকে তাকিও না, কথা বোলো না, ওকে উপেক্ষা কর। এর চেয়ে বড় শাস্তি আর নেই!

ট্যাক্সিওলা আয়না দিয়ে তাকে দেখছিল। ছোটো আয়না, তাতে শুধু মধ্যবয়স্ক ও জোয়ান চেহারার ট্যাক্সিওলার ক্রূর চোখ দুটো দেখা যায়। ফট্ করে চোখ পড়তেই চমকে উঠলো তৃণা!

আতঙ্কিত একটা শব্দ উঠে এসেছিল গলায়। অস্ফুট শব্দটা মুখে হাতচাপা দিয়ে আটকালো। বলল—থামুন।

—এইখানে নামবেন? বলে ট্যাক্সিওলা গাড়ি আস্তে করল।

—এইখানেই। বলে তৃণা অবাক হয়ে দেখে, সে দেশপ্রিয় পার্কের কাছে এসেছে, এদিকে তার আসার কথা নয়। সে যাবে বালিগঞ্জ ফাঁড়ির কাছে বাসস্টপে। বার বার সে কেন তবে সে-জায়গা থেকে দূরে সরে যাচ্ছে অন্যমনস্কতায়, বিভ্রমে? তৃণা আস্তে করে বলল—এটা কোন জায়গা। দেশপ্রিয় পার্ক?

হ্যাঁ, এখানেই নামবেন? বলে মধ্যবয়স্ক জোয়ান লোকটা তার দিকে পরিপূর্ণ ঘাড় ঘুরিয়ে তাকায়। লোকটার মুখে ঘাম, অশিক্ষার ছাপ! বন্যজন্তুর মতো একটা কামস্পৃহা লক্ষ্য করে তৃণা। বুকটা একটু কেঁপে ওঠে। গাড়ীর দরজার হাতলটা কিছুতেই খুলতে পারছিল না তৃণা। খুব তাড়াহুড়ো করছিল। একবার মনে হল, লোকটা কোন কৌশলে দরজাটা আটকে দেয়নি তো! যাতে তৃণা খুলতে না পারে। লোকটাই হঠাৎ তার প্রকাণ্ড ঘেমো হাতটা বাড়িয়ে তৃণার হাতটা ঠেলে লকটা খুলে দিল।

তৃণা নেমে যাচ্ছিল! খুব তাড়া। লোকটা পিছন থেকে খুব একটা ব্যঙ্গের গলায় বলল—ভাড়াটা কে দেবে?

তাড়াতাড়িতে আর ভয়ে কত ভুল হয়। তৃণা ব্যাগ খুলে ভাড়া দিয়ে দিল! লজ্জায় কান-মুখ ঝাঁ ঝাঁ করছে।

ট্যাক্সিওলার চোখের সামনে থেকে তাড়াতাড়ি পালানোর জন্যই তৃণা এলোপাথারি খানিক হাঁটল উদভ্রান্তের মতো, চলে এল, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ পর্যন্ত। কিছুতেই তার মনে পড়ছিল না এখান থেকে কোন রুটের বাস ফাঁড়ি পর্যন্ত যায়! মনটা বড় অশান্ত, বুকের মধ্যে কেবলই একটা পাখা ঝটপটানোর শব্দ, কাকাতুয়াটা ডাকছে···তৃণা···তৃণা···তৃণা···

আজ দুপুরের কলকাতাকে নিঝুমপুর নাম দেওয়া যায়। কেউ কোথাও নেই। ফাঁকা হু হু, মন কেমন করা রাস্তা, রোদ গড়াচ্ছে, তৃণা ফাঁড়ির কাছে বাসস্টপে যাবে, কিন্তু সে বড় অনেক দূর রাস্তা বলে মনে হয়। সে বড় অফুরান পথ। কোনোদিনই বুঝি পাওয়া যাবে না। বেলা একটা বেজে গেছে। তৃণার গায়ের চ্যানেল

নাম্বার সিল্কের গন্ধটা অল্প অল্প করে উবে যাচ্ছে হাওয়ায়, বাতাসে চুল এলোমেলো।

রাসবিহারী অ্যাভিনিউয়ের ফুটপাথে দাঁড়িয়ে দাঁতে ঠোঁট কামড়ে একটু ভাবল তৃণা। কি করে যাবে! সেই বারোটায় যাওয়ার কথা ছিল। দাঁড়িয়ে ভাবতে ভাবতেই আবার অস্বস্তি বোধ করে পিছু ফিরে চাইল তৃণা। কে তার পিছনে আসছে? কে তাকে লক্ষ্য করছে নিবিষ্টভাবে?

আতঙ্কিত তৃণা হটাৎ দেখল, একটা বিয়াল্লিশ নম্বর বাস মোড় নিচ্ছে, মনে পড়ল, এই বাসটা ফাঁড়ি হয়ে যায়। চলন্ত বাসটার সামনে দিয়ে হরিণ-দৌড়ে রাস্তা পার হয়ে গেল তৃণা। বিপন্নার মতো চীৎকার করে বলল—বেঁধে ভাই, বেঁধে···

প্রাইভেট বাস, যেখানে সেখানে থামে। এটাও থামল। তৃণা ভর্তি বাসটায় একটু কষ্ট করে উঠে পড়ে।

দেবাশিস যে উন্নতি করেছে তা এমনি নয়। কতগুলো অদ্ভুত গুণ আছে তার। একটা হল ধৈর্য। তৃণা বাস থেকে নামতে নামতেই দেখল, বাসস্টপে দেবাশিসের গাড়ি থেমে আছে। আর সামনের জানালা দিয়ে অবিরল সিগারেটের ধোঁয়া বেরিয়ে যাচ্ছে।

ক্লান্ত তৃণা হাতের তেলোয় চেপে চুল ঠিক করতে করতে এগিয়ে গেল। খুব ফ্যাকাসে একটু হাসল!

দেবাশিস কিন্তু গম্ভীর। দরজাটা খুলে দিয়ে বলল—উঠে পড়ো।

তৃণা ঝুপ করে সীটে বসে বলল—অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছো। আজ আমার বড় দেরী হয়ে গেল।

দেবাশিস মাথা নেড়ে বলল—ঠিক উল্টো।

—মানে?

—দেরীটা আমারই হয়েছে! তুমি আসার দু'মিনিট আগে আমি এলাম। মনে মনে ভেবে রেখেছিলাম, তুমি এসে ফিরে গেছ। আমিও চলে যাবো যাবো করছিলাম, হঠাৎ দেখি তুমি বাস থেকে নামলে। তোমার দেরী হল কেন?

তৃণা একটু শ্বাস ফেলে চোখ বুজে বলে—ঠিক বেরোবার মুখে কতগুলো ইনসিডেণ্ট হয়ে গেল। রবির ঘরে গিয়েছিলাম, ও

ছিল না। হঠাৎ এসে বিশ্রী ব্যবহার করল। আর শচীনবাবুর সঙ্গেও একটু কথা কাটাকাটি, সেই থেকে মনটা এমন বিচ্ছিরি, আর অন্যমনস্ক, রাস্তা ভুল করে অনেকদূর চলে গিয়েছিলাম। তোমার দেরী হল কেন?

দেবাশিস গাড়ি চালাতে চালাতে বলল—তোমার সঙ্গে মিল আছে। ফুলির বাসায় রবিকে পৌঁছে দিয়ে বেরোবার সময়ে দেখি দোতলার রেলিং ধরে রবি···উঃ! মনশ্চক্ষে দৃশ্যটা দেখে একবার শিউরে ওঠে দেবাশিস। তারপর আস্তে করে বলে, রবিকে ফুলি কেড়ে রাখতে চাইছে। রবিও আর আমার সঙ্গ তেমন পছন্দ করে না!

তৃণা চুপ করে থাকে। একটা গভীর শ্বাস চাপতে গিয়ে বুকের ভিতরটা কুয়োর মতো গভীর গর্ত হয়ে যায়। অনেকক্ষণ বাদে সে বলল—কি ঠিক করলে, রবিকে ওখানেই রাখবে?

—রাখতে চাইনি। তবু রয়েই গেল বোধহয়। ওকে রেখে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে ভীষণ অন্যমনস্ক ছিলাম। দুটো ট্র্যাফিক সিগন্যাল ভায়োলেট করেছি, পুলিশ নাম্বার নিয়েছে। পার্ক সার্কাসে একটা বুড়ো লোককে ধাক্কাও দিয়েছি, তবে সে মরেনি। কিছুক্ষণ ঐরকম র‍্যাশ ড্রাইভ করে দেখলাম, আর গাড়ি চালানো উচিত হবে না। আস্তে আস্তে গাড়িটা নিয়ে অফিসে গেলাম। বন্ধ অফিস খুলে অনেকক্ষণ ফাঁকা ঘরে বসে রইলাম। ঠিক নরমাল ছিলাম না! সময়ের জ্ঞান হারিয়ে যাচ্ছিল। রবি কেন আমাকে আর তেমন পছন্দ করে না বলো তো! আমি তো ওকে সব দিই। তবু কেন? বুঝলে তৃণা, আজ ফাঁকা অফিস ঘরে বসে আমার মতো কেজো মানুষেরও চোখে জল এল।

—আস্তে চালাও, তুমি বড় অন্যমনস্ক। গাড়ি টাল খাচ্ছে।

দেবাশিস সামলে গেল! গাড়ি চালাতে চালাতে বলে—অফিসে বসেই একটা ডিসিশন নিলাম। তারপর একটা ট্যাক্সি ডেকে চলে গেলাম ফুলির বাড়িতে! তখন গাড়ি চালানোর মতো মনের অবস্থা নয়। গিয়ে বললাম—ফুলি আজ থেকেই রবি তোর কাছে থাকল। ফুলির সে কি আনন্দ! ঐ মোটা শরীর নিয়েও লাফ ঝাঁপ দৌড়োদৌড়ি লাগিয়ে দিল। রবি ঘুমোচ্ছিল, আমি আর ওকে ডাকিনি।

ঘুমন্ত কপালে একটা চুমু রেখে চলে এসেছি! ছেলেটা বুঝি পর হয়ে গেল। যাকগে।

তৃণা কাঁদছিল। নীরবে একটু ফোঁপানির শব্দ হচ্ছিল কেবল। দেবাশিস হাত বাড়িয়ে তাকে ছুঁয়ে বলল—কেঁদো না। সব কিছু কি একসঙ্গে পাওয়া যায়?

তৃণা মুখ না তুলে কান্নায় যতিচিহ্ন দিয়ে দিয়ে বলে—আমিও চলে এসেছি। চিরকালের মতো, আর ফিরব না।

দেবাশিস একটু গম্ভীর হল। শান্ত গলায় বলে—ভালই করেছো। শচীন কিছু বলল না?

—অনেক কথা বলল। তত্ত্বকথা। আমাকে সাহসের সঙ্গে তোমার কাছে চলে আসতে উপদেশ দিল।

দেবাশিস একটু ভ্রূ কুঁচকে বিষয়টা ভেবে দেখে। তারপর বলে —শচীন ভেবেছে ও আমাকে চান্স দিচ্ছে। আই অ্যাম রেডি ফর দি ক্যাচ তৃণা। শচীন ইজ আউট।

তৃণা ঝুঁকে বসে কাঁদতে লাগল।

দেবাশিস কাঁদতে দিল তৃণাকে। একবার কেবল বলল— তোমার খিদে পায়নি তৃণা? আমার কিন্তু পেয়েছে।

তৃণা সে কথার উত্তর দিল না। কেবল নেতিবাচক মাথা নাড়ল।

কান্নাটা বড়ই বিরক্তিকর। একটা মেয়ে সামনের সীটে উপুর হয়ে বসে কাঁদছে—এ একটা সীন। গাড়ির কাঁচ দিয়ে বাইরে থেকেই দেখা যায়। অনেকে দেখছেও। দেবাশিস একটু অস্বস্তি বোধ করছিল। বাড়িতে আজ রান্না হয়নি। ইচ্ছে ছিল রেস্টু-রেন্টে খেয়ে নেবে। কিন্তু তৃণার এই বেসামাল অবস্থায় রেস্টুরেন্টে যাওয়া সম্ভব নয়। বাড়িতেই যেতে হয়। আজ সকাল পর্যন্ত কী তীব্র পিপাসা ছিল তৃণার জন্য। এখনো কি নেই? কিন্তু কেবলই রবির কথা মনে পড়ছে, রবিকে ফুলির কাছে রেখে এল দেবাশিস। বদলে কি তৃণাকে পেল চিরকালের মতো? দুজনকে দুদিকের পাল্লায় বসিয়ে দেখবে নাকি কোনদিকটা ভারী?

কিছুতেই কিন্তু ভাবা যাচ্ছে না যে তৃণা চলে এসেছে চিরকালের মতো। হাতের নাগালে বসে আছে। একই ফ্ল্যাটে

এরপর থেকে তারা থাকবে। দেবাশিস ভেবেছিল, এ এক অসম্ভব প্রেম। দুটো নৌকা, স্রোত আরো কি কি যেন।

তৃণা বাথরুমে স্নান করছে। দেবাশিস বাইরের ঘরে বসে অপেক্ষা করে। বিকেল চারটে বাজে মোটে। প্রীতম একবার চা দিয়ে গেছে। তারপর দোকানে গেছে খাবার আনতে। তৃণা এলে তারা খাবে।

দেবাশিস সিগারেট ধরিয়ে তার ফ্ল্যাটের বিশাল জানালার ধারে এসে দাঁড়ায়। বহু নীচে ফুটপাথ। এই সেই খুনী জানালা। অত নীচে কী করে, কোন সাহসে লাফিয়ে পড়েছিল চন্দনা? হাত পা হঠাৎ নিসপিসিয়ে ওঠে তার।

ভাল করে পর্দা সরিয়ে পাল্লা খুলে ঝুঁকে দেখল দেবাশিস। ঝিম ঝিম করে ওঠে মাথা। অবলম্বনহীন শূন্যতা তাকে দুহাত বাড়িয়ে আকর্ষণ করে, এসো এসো। সাততলার ওপর সারাদিন, সব ঋতুতেই প্রচণ্ড হাওয়া খেলা করে, কী বাতাস। মার মার করে ছুটে আসছে ঠাণ্ডা, বুক জড়ানো বাতাস। তবু অত হাওয়াতেও দেবাশিসের মুখে ঘাম ফুটে ওঠে। কত নীচে ফুটপাথ! কী তীব্র আকর্ষণ অধঃপাতের! সবসময়েই, অবিরল পৃথিবী তার বুকের কাছে সবাইকে টানছে। যখন জানালার চৌকাঠের অবলম্বন জীবনে শেষবারের মত ছেড়ে দিয়েছিল চন্দনা, ফুটপাথ স্পর্শ করবার আগে এই যে অবলম্বনহীন দীর্ঘ শূন্যতা বেয়ে নেমে গিয়েছিল তার শরীর, এই শূন্যতাটুকু কিভাবে অতিক্রম করেছিল ও? বাঁচতে ইচ্ছে করেনি ফের? পোকার মত মানুষ হাঁটছে, গাড়ি যাচ্ছে, একটা দুটো গাছ, কালো মিশমিশে রাস্তা। কী ভয়ঙ্কর! মুখের সিগারেটটা বাতাসে পুড়ে গেল দ্রুত। শেষ অংশটা ছুঁড়ে দিল দেবাশিস। বাতাসে খানিকটা ভেসে গেল, তারপর অনেক অনেকক্ষণ ধরে পড়তে লাগল নীচে···নীচে···নীচে।

বাথরুমের দরজা খোলার শব্দ। তৃণা বেরিয়ে এল।

দেবাশিস শরীরটা তুলে আনল ভিতরে। বাতাস লেগে চোখে জল এসে গেছে।

তৃণার কান্না আর বিষণ্ণতা স্নানের পর ধুয়ে গেছে। কিছুটা গম্ভীর দেখাচ্ছে তাকে। শোওয়ার ঘরে দুটো একা খাট, বিছানা

পাতা। তার পাশে একটা পর্দা ঘেরা সাজঘার ঘর। জানালার পাশেই লম্বা আয়না লাগানো সাজবার টেবিল। তৃণা সেখানে গিয়ে বসল। চন্দনা এখানে বসে সাজত।

তৃণা নিজেকে আয়নায় দেখল। কিন্তু তেমন দেখবার নেই। একটু সামান্য সাজগোজ করল। চুলটা ফেরাল। কোনোদিনই সে খুব একটা সাজে না।

আয়নায় দেবাশিসের ছায়া পড়ল। পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে। মুখে একটু হাসি। চুলগুলো খুব এলোমেলো।

বলল—কেমন লাগছে তৃণা?

তৃণা বিষণ্ন হেসে বলল—ভালই।

—আজ থেকে···বলে চুপ করে দেবাশিস। কী বলবে?

তৃণা কথাটা পূরণ করে নিল মনে মনে। লজ্জায় মাথা নোয়াল। বলল—তুমি যাও দেব। স্নান করে ফিরো এসো।

দেবাশিস আঙুলে ধরা সিগারেটটা তুলে দেখাল, বলল—যাচ্ছি। সিগারেটটা শেষ করে নিই।

—অন্ততঃ ও ঘরে যাও। পুরুষের সামনে আমি সাজতে পারি না।

—ও। বলে দেবাশিস পর্দার ওপারে গেল। ওখান থেকেই বলল—শোনো তৃণা, তোমার যা যা দরকার প্রীতমকে দিয়ে আনিয়ে নাও। আজ রোববার, দোকান অবশ্য সবই বন্ধ।

—কী আনবো? আমার কিছু দরকার নেই।

—এক কাপড়ে তো বেরিয়ে এসেছো।

—চন্দনার শাড়ি টাড়ি কিছু নেই?

—না। সব বিলিয়ে দিয়েছি।

—কেন দিলে?

—রবির জন্য। ওসব থাকলেই তো ওর মায়ের কথা মনে পড়ত।

তৃণা বেশ ছিল এতক্ষণ। হঠাৎ একথায় বুকে একটা ধাক্কা খেল। তবু হেসে বলে—তবু কি মনে পড়ে না?

—পড়ে। সেটা চেপে রাখে। আমার ফ্ল্যাটটা কিন্তু আমি সাজাইনি, চন্দনা সাজিয়েছিল। সেইভাবেই সব আছে। এক একবার ভাবতাম সাজানোর প্যাটার্ন পাল্টে দিই। কিন্তু সময়

পাইনি, এত কাজ। সেই সাজানো ঘরে চন্দনার কথা ওর মনে তো পড়বেই। এবার তুমি সাজাও।

—দূর বোকা। মনে পড়া কি ওভাবে হয়। তুমি জানো না।

দেবাশিস একটা শ্বাস ফেলে বলল—আর রবির জন্যে আমার ভাবনা নেই। ফুলির বাড়ির দঙ্গলে মিশে গেলে আর কিছু ওর মনে থাকবে না।

—সিগারেটটা শেষ হয়েছে?

—হয়েছে।

—এবার যাও। আমার এখন খুব খিদে পাচ্ছে।

—তোমার কি কি দরকার বললে না?

—অনেক কিছুই দরকার। কিছু তো আনিনি। সে পরে হলেও চলবে।

—লজ্জা কোবো না। এ তো আর পরের বাড়ি নয়। তোমার নিজের।

তৃণা একটু শ্বাস ফেলে বলল—তাই বুঝি?

—নয়?

তৃণা একটু হেসে বলে—এত সহজে কি নিজের হয়? অনেক সময় লাগবে। আমাকে একটু সময় দিও, তাড়া দিও না।

দেবাশিস একটু উষ্মাভরে পর্দার ওপাশ থেকে বলে—কেন? সময় লাগবে কেন?

—লাগবে না! গাছ উপড়ে দেখো তার শিকড়ের সবটা কি একেবারে উঠে আসে? কতো শিকড়বাকড়ের ছেঁড়া সুতো কিছু কিছু মাটির মধ্যে থেকে যায়।

—তৃণা।

—উ!

—গাছ তো একটানে ওপড়ানো হয়নি। দীর্ঘকাল ধরে তার শিকড়ের মাটি ক্ষয় হয়ে ছিল না কি!

—আবার বলছি, তুমি বোকা।

—কেন?

—উপমা দিয়ে কি সব বোঝানো যায়? গাছের সঙ্গে মানুষের কিছু তফাৎ আছেই।

পর্দা সরিয়ে উত্তেজিত দেবাশিস এ ঘরে চলে এল হঠাৎ। মেঝেতে তৃণার কাছে বসে ঊর্ধ্বমুখ হয়ে বলল –তৃণা, আমি বড় কাঙাল।

—জানি তো।

—আজ আমার কেউ নেই।

তৃণা তাকিয়ে রইল।

দেবাশিস বলল—আর আমাকে এখন ওসব ভয়ের কথা বোলো না। তোমারও যদি ছেঁড়া শেকড় অন্য জায়গায় থেকে থাকে তবে আমার কি হবে? আজ থেকে রবিও পর হয়ে গেল।

তৃণা স্নিগ্ধস্বরে বললে—রবির জন্য তোমার বুকের ভিতরটা কেমন করে দেব, তা বোঝো না!

—ভীষণ বুঝি।

—ওটুকু কি আমার হতে নেই?

দেবাশিস চুপ করে গেল। জোব্বা জামার পকেট থেকে ফের সিগারেটের প্যাকেট বের করে আনল। ধরাল। তারপর মাথা নেড়ে বলল—বুঝেছি।

তৃণা তেমনি স্নিগ্ধস্বরে বলল—আমরা তো আর ঠিক সকলের মতো হতে পারি না।

দেবাশিস বলল—তাও ঠিক। তবে আমরা কিরকম হবো তৃণা?

—খুব সুখী হবো না। একটু কি যেন থেকে যাবে দুজনের মধ্যে!

—তুমি কী ভীষণ স্পষ্ট কথা বলছ আজ তৃণা!

—আজই বলে নেওয়া ভাল।

—কেন? আজই কেন?

তৃণা চোখ মুছে হাসিমুখে বলে—আজ সপ্তাহের ছুটির দিন। তোমার সময় আছে। কাল থেকেই তো তুমি আবার ব্যস্ত মানুষ। তোমার কি আর সময় হবে?

—তুমি কথাটা ঘোরালে তৃণা।

—তুমি বাথরুমে যাও। আমার খিদে পেয়েছে।

দেবাশিস তবু বসে রইল। চুপচাপ। অনেকক্ষণ বাদে মুখ তুলে বলে তৃণা—বলো।

—মানুষকে তার সব সম্পর্ক থেকে ছিঁড়ে আনা যায় না। একজনকে ভাল না বাসলেই যে তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেল এমন নয়। আবার কাউকে ভালবাসলেই যে নতুন সম্পর্ক গড়ে উঠল এও নয়। তবে ভালবাসা দিয়ে আমরা কী করব?

তৃণা কপালটা টিপে ধরে বলল—ও, আবার সেই তত্ত্বকথা! জানো না মেয়েরা তত্ত্বকথা ভালবাসে না। মাথা ধরেছে, তুমি তাড়াতাড়ি স্নান সেরে এসো।

টেবিলে খাবার সাজিয়ে দিয়েছে প্রীতম। বড় রেস্টুরেন্টের দামী সব খাবার। প্রীতমের মুখে খুব একটা হাসি নেই। কেবল বিনয় আছে।

দেবাশিস যখন খাওয়ার টেবিলের ধারে এসে বসল তখনও তৃণা নিজের কপাল টিপে বসে আছে, বলল—তোমার চাকরকে পাঠিয়ে একটা মাথা ধরার বড়ি আনিয়ে দাও।

দেবাশিস মৃদুস্বরে বলে—ও তোমার চাকর। অবশ্য পাঠানোর দরকার নেই। মাথাধরার বড়িটড়ি আছে বোধহয়। খুঁজতে হবে।

—খিদে চেপে রাখলে, বা কাঁদলে আমার মাথা ধরে।

দেবাশিস চোখ তুলে ইঙ্গিতে প্রীতমকে সরিয়ে দিল। তারপর হাত বাড়িয়ে তৃণার একখানা হাত ধরে বলল—তুমি প্রস্তুত হয়ে আসোনি জানি। হুট করে চলে এসেছো। তাই কাঁদছো। আমি মনে মনে প্রস্তুত ছিলাম তোমার জন্য।

তৃণা হেসে বলে—খুব প্রস্তুত! একখানা শাড়িও যদি কিনে রাখতে। কাল আমাকে বাসি কাপড়ে সকালবেলাটা কাটাতে হবে, যতক্ষণ শাড়ি কেনা না হয়।

—একটা দিন সময় দাও! প্লীজ। কাল থেকে সব ঠিক হয়ে যাবে। আজ দোকান বন্ধ।

তৃণা মাথা নেড়ে বলল—সময়! সময়! দাঁড়াও, সময় নিয়ে কি একটা কবিতার লাইন মনে আসছে—

এল না। মাথাটা ফেটে যাচ্ছে যন্ত্রণায়!

দেবাশিস বলে—খেয়ে একটু রেস্ট নাও। শোওয়ার ঘরের পর্দাগুলো টেনে দিচ্ছি, ঘর অন্ধকার করে শুয়ে থাকো একটু।

—তুমি কোথায় যাবে?

—কোথাও না। তোমার কাছেই বসে থাকব। বক বক করব।
তৃণা সস্নেহে হাসল।

পাঁচটা প্রায় বাজে। সাততলা ফ্ল্যাটের শার্শির গায়ে অত্যন্ত উজ্জ্বল সোনালী রোদ এসে পড়েছে। এখনো অনেক বেলা আছে। অন্ধকার হতে এখনও অনেক বাকি। পর্দায় ঢাকা শোওয়ার ঘরে শুয়ে আছে তৃণা। গায়ে খয়েরী পর্দার আলোর আভা। দুটো বড়ি খাওয়ার পর আস্তে আস্তে মাথাধরাটা সেরে যাচ্ছে। সারাদিনের ক্লান্তিতে ভেঙে আসছে শরীর। তবু কি ঘুম আসে! দেবাশিস অনেকক্ষণ মাথা টিপে দিল। ঝিম্ মেরে শুয়ে ছিল তৃণা, ঘুমের ভান করে। সে ঘুমিয়েছে মনে করে দেবাশিস উঠে গেছে পা টিপে টিপে।

ঘরটা ঠিক অন্ধকার হয়নি। আবার আলোও নেই। সাততলার ওপর খুবই নিরাপদ আশ্রয়। একা শুয়ে আছে তৃণা। মাথা ধরা সেরে গেছে। নরম বিছানায় এলিয়ে আছে ক্লান্ত শরীর। এ একরকমের আলস্য। সুন্দর আলসনী। কিন্তু ঘুম হবে না। আরো কতকাল ঘুম হবে না তৃণার।

সে চোখ চেয়ে দেখল ছাদের মসৃণ রঙ, চৌকো দেয়াল। দেওয়ালে রহস্যময় আলো। চেয়ে থাকতে সেই সুরসুরির মতো একটা অনুভব। কে যেন দেখছে। খুব নিবিষ্টভাবে দেখছে তাকে।

চমকে উঠল তৃণা। মাথাটা একবার তুলে চারদিকে তাকাল। আবার মাথাটা বালিশে রেখে চোখ বোজে! কিন্তু অবিরল তার ঐ অনুভূতি হয়, কে যেন দেখছে। ভীষণ দেখছে। চন্দনার ভূত? নাকি তার মনেরই প্রক্ষেপ? সে নিজেই হয়ত। ভাবতে ভাবতে মুখটা আস্তে ফেরাল তৃণা। চোখটা আপনা থেকেই খুলে গেল। আর ভীষণভাবে চীৎকার করে উঠে বসে সে—কে? কে?

খাওয়ার ঘরের দিকটার দরজার পর্দার ওপাশে যে দাঁড়িয়ে ছিল সে পর্দাটা আস্তে সরিয়ে মুখ বাড়াল ভিতরে! ভার গলায় বলে—আমি প্রীতম।

তৃণা অবিশ্বাসের সঙ্গে চেয়ে থেকে বলে—কী চাও?

চাকরটা একটু ভয়ের হাসি হেসে বলে—সাহেব বলে গেলেন

আপনি ঘুম থেকে উঠলে খবর দিতে, উনি একটু কোথায় বেরোলেন। এক্ষুনি আসবেন।

—কোথায় গেছেন?

—বলে যাননি। গাড়ি নিয়ে গেলেন দেখেছি।

—ও।

তৃণার বুকের ভিতরটা এখনো ঠক্ ঠক্ করছে। শ্লথ আঁচল টেনে নিয়ে সে উঠল। বলল—দাঁড়াও। তোমাদের ঘরটরগুলো আমাকে একটু দেখিয়ে দাও। চিনে রাখি।

চাকরটা উত্তর করল না, খুশীও হয়নি। তবু এক রকম বিরক্তি বা ঘেন্না চেপে রাখা মুখ করে দাঁড়িয়ে রইল। ও হয়তো ভাবছে, সাহেব রাস্তার মেয়েছেলে ধরে এনেছে, রাখবে। দেবাশিস তো ওকে বলেনি যে তৃণা আসলে কে! বললেও বুঝবে না। এমন অবস্থার দুটি মানুষের ভিতরকার প্রেমের সত্য কে কবে বুঝেছে! সবাই একটা কিছু ধরে নেয়।

শোওয়ার ঘর দুটো। একটা খাওয়ার ঘর। একটা বসবার। অনেকটা জায়গা নিয়ে খোলামেলা ফ্ল্যাট। দ্বিতীয় শোয়ার ঘরটা রবির। সেখানে অনেক খেলনা, ট্রয়াইকেল, ছবির বই, ছোট্ট ওয়ার্ডরোব। এই ঘরটায় একটু বেশীক্ষণ থাকল তৃণা। চাকরটাকে বলল—এককাপ কফি করে আনো।

ফোনটা বাজছে বসবার ঘরে। বাজছেই। চাকরটা রান্নাঘরে। ওখান থেকে শুনতে পাবে না। তৃণা ইতঃস্তত করছিল, ফোনটা কি সে ধরবে? পরমুহূর্তেই ভাবল অমূলক ভয়। এ বাড়ীতে তাকে যদি থাকতেই হয় তবে এসব দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলাই উচিত। সে উঠে এল বসবার ঘরে। ফোন হাতে নিয়ে অলস গলায় বলে—হ্যালো।

একটা কচি গলা শোনা গেল—বাপি? ওঃ···থেমে গেল স্বরটা। তারপর নম্বরটা বলে জিজ্ঞেস করল—এটা কি ঐ নম্বর?

তৃণা বুঝে নিল, রবি। ফোনের গায়ে লেখা নম্বরটা তৃণারও তো মুখস্ত। বলল—কে বলছ?

—তুমি কে? বলে কচি গলাটা অপেক্ষা করল। হঠাৎ ভয়ার্ত গলায় বলল—মা?

তৃণা এ প্রশ্নের কি উত্তর দেবে ভেবে পেল না। ফোনটা কানে

চেপে দাঁড়িয়ে রইল। রবি ফোন করছে। যদি তৃণা রং নাম্বার বলে ফোন ছেড়ে দেয় তো রবি আবার ফোন করবে, শুধু আজ নয়, কালও করবে। হয়তো প্রায়ই বাবার সঙ্গে দরকার পড়বে তার, তৃণা কোথায় পালাবে? পালাবেই বা কেন? তবু প্রথম ধাক্কাটা সামলানোর জন্য একটু সময় দরকার। সে চোখ বুজে বলল—রং নাম্বার।

ফোন রেখে দিল। ভেবে পেল না, রবি কেন মা কিনা জিজ্ঞেস করল।

প্রীতম কফি করে এনেছে। সেই সময়েই ফোনটা আবার বাজে। প্রীতম তার দিকে তাকায়। তৃণা ঘাড় হেলিয়ে বলে—রবি ফোন করছে। ওকে আমার কথা বোলো না।

প্রীতম ফোন তুলে নিয়ে বলে—হ্যালো। রবিবাবু?

—...

—না তো। ফোন বাজেনি।

—...

—সাহেব বাইরে গেছেন।

...

—না। আমি একা। তুমি আর আসবে না?

—...

—চাঁপাদি আসবে না? আচ্ছা বলে দেবো। তোমার সব জিনিস কাল পাঠিয়ে দেবো।

—আচ্ছা তুমি আসবে না কেন?

—...

—এলে বলব। ছাড়ছি।

ফোন রেখে প্রীতম একবার আড়চোখে তৃণার দিকে চেয়ে বাইরে চলে গেল।

সাড়ে পাঁচটা। দরজায় কলিং বেল বেজে উঠল।

তৃণা ভেবেছিল দেবাশিস এসেছে। তাই তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে দরজা খুলেই অপ্রস্তুত। দেবাশিস নয়। টেরিলিন পরা দিব্যি ঝকমকে একজন যুবা পুরুষ। সেও একটু অপ্রস্তুত। বলল—দেবাশিস নেই?

—না। বেরিয়েছে।

—ও। বলে খুব কৌতূহলভরে চেয়ে দেখল তৃণাকে।

তৃণা কি ওকে বসতে বলবে?

লোকটা নিজেই বলে—রবি নেই?

—না।

লোকটার চোখে স্পষ্টই একটা প্রশ্ন—আপনি কে? কিন্তু লোকটা সে প্রশ্ন করে না, ভদ্রতায় বাঁধে। তাই বলল—আমি রবির মামা।

—ও? আসুন।

—বসে আর কি হবে! কেউ নেই যখন। বলতে বলতেও যুবকটি কিন্তু ঘরে আসে। একটু ইতঃস্তত করে বসে। একটা শ্বাস ফেলে হাতে হাত ঘষে বলে—আপনি ওর রিলেটিভ বোধ হয়?

তৃণা মৃদু হেসে বলে—হ্যাঁ।

—চন্দনা আমার দিদি ছিল।

তৃণা তার এলো চুলের জট আঙুলে ছাড়াতে ছাড়াতে বলে—বুঝেছি বুঝেছি। বসুন ও এসে পড়বে।

যুবকটি ঘড়ি দেখে বলে—একটু বসতে পারি। আমি ভাবলাম—বলে একটু কথা সাজিয়ে নিয়ে বলে—আসলে কাল আমাদের ম্যারেজ অ্যানিভার্সারি। বলছিলাম কি দেবাশিসদা তো যাবেনই, সেইসঙ্গে আপনিও···যদিও ঠিক আচমকা এভাবে—

তৃণার ছেলেটির জন্য মায়া হয়। বুঝতে পারছে না, বুঝতে চাইছে। বলল—কফি খান। ও এসে পড়বে।

ছেলেটি প্রচণ্ড কৌতূহল নিয়ে তাকে দেখতে থাকে! চোখে চোখ পড়তেই সরিয়ে নেয়। কিন্তু দেখে। তৃণা কফি বানাতে বলবার ছল করে উঠে এল। রান্নাঘরে প্রীতমকে খবর দিয়ে শোয়ার ঘরে গিয়ে বসে রইল চুপচাপ। শুনল ওঘরে প্রীতমের সঙ্গে কথা বলছে লোকটা! চাপা স্বর। এরকমই হবে এর পর থেকে। তৃণার জায়গাটা স্থির হতে অনেক সময় লাগবে। অনেক সময়। তৃণা শুষ্কমুখে বসে থাকে। চুলের জট ছাড়ায় অন্যমনে।

দেবাশিসের ফিরতে ছ'টা বেজে গেল। তখনো ছেলেটা বসে

আছে সামনের ঘরে। আর দেবাশিসের হাতে কয়েকটা শাড়ির প্যাকেট, রজনীগন্ধার ডাঁটি, কসমেটিক্সের বাক্স, খাবারের বাক্স। চন্দনার ভাই সে সব দেখে অবাক। পর্দার ফাঁক দিয়ে দৃশ্যটা দেখল তৃণা।

না, দেবাশিস খুব একটা ঘাবড়াল না। চালাক লোকেরা এরকম বিপদে পড়লে খুব গম্ভীর হয়ে যায়। দেবাশিসও হল। দু চারটি কী কথা হল ওদের। ছেলেটা চলে গেল।

দেবাশিস বেশ হাঁক ছেড়ে ডাকল—তৃণা।

তৃণা ঘরের মাঝখানটায় না গিয়ে পর্দা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বলে—কি?

দেবাশিস একগাল হাসি হেসে বলল—সব এনেছি।

—কোত্থেকে?

—তোমাকে ঘুম পাড়াতে পাড়াতে হঠাৎ মনে পড়ল যাদবপুরে যখন থাকতাম তখন দেখেছি ঐ অঞ্চলে রবিবারে দোকান খোলা থাকে। গাড়ি নিয়ে চলে গেলাম, দেখ তো সব।

সব দেখে তৃণা হেসে কুটিপাটি। বলল—কী এনেছো এসব?

—কেন?

—এ রংচঙে শাড়ি আমি পরি নাকি?

—পরো না?

—এসব তো রেবা পরে। আর অত কসমেটিক্স! হায় রে আমি কবে আবার ওসব আলট্রা মডার্ন লিপস্টিক মাখি, কিংবা কাজল!

দেবাশিস হেসে বলে—এবার মেখো। বুড়ি সাজা তোমার কবে ঘুচবে বলো তো?

—মেয়ে বড় হয়েছে দেব, কদিন পরেই প্রেম করবে। এখনই করছে কিনা কে জানে!

দেবাশিস হেসে বলে—বাঙালী মেয়েদের ঐ হচ্ছে রোগ। তুমি সাজবে না কেন তৃণা?

তৃণা শুধু হাসল। স্নিগ্ধ হাসি। বলল—রবি ফোন করেছিল।

দেবাশিসের মুখের হাসিটা মরে গেল, বলল—কী বলল?

—আমি ধরেছিলাম। রং নাম্বার বলে ছেড়ে দিয়েছি। পরে আবার ফোন করেছিল, তখন প্রীতম ধরে।

দেবাশিস একটু ভেবে বলল—থাকগে।

উঠে পোশাক পাল্টে এল দেবাশিস। চা খেল ফের।

ডাকল—তৃণা।

—উঁ!

—কিভাবে শুরু করা যায় বলো তো!

—কী? কিসের কথা বলছো?

—বুঝতে পারছো না?

—না তো।

—তোমার আর আমার এই জীবনটা।

—শুরু আবার করবে কিভাবে?

—ধরো বিয়ে হ'লে পুরুতের মন্ত্র, ফুলশয্যা-টয্যা দিয়ে একটা শুরু করা যায়। রেজিস্ট্রি করলে তারও সরকারী মন্ত্র আছে। আমরা কি দিয়ে শুরু করব?

তৃণা লজ্জা পেয়ে বলে—ওসব বোলো না। কানে লাগে। আমরা কিছু শুরু করলাম, নাকি শেষ করে এলাম?

—তোমার কি তাই মনে হয়? তার উত্তরে বলা যায় যে একটা শেষ না করলে অন্যটা শুরু করা যায় না তৃণা।

—ফের তত্ত্বকথা!

—তুমি যে শুরুটাকে শেষ বলছ!

—শোনো দেব, আমি কিছু শেষ করে আসিনি। শুরুর কথাও ভাবিনি। আমি বাড়িতে ভূতের তাড়া খেয়ে বেরিয়ে এসেছি। আমি কি করছি আমি নিজেও জানি না। মাথার ভিতরটায় বড় গণ্ডগোল। আজ আমি কিছু ভাবতে পারছি না। শুধু একটা জিনিস জানি।

—কী তৃণা? আগ্রহে দেবাশিস ঝুঁকে বসে।

—তোমাকে আমার ভীষণ দরকার এ সময়ে। আর কিছু না।

—তৃণা, তবে আমরা সেই আদিমভাবে শুরু করবো! যখন কোন অনুষ্ঠান ছিল না, কেবল শরীর ছিল!

—ছিঃ। ওভাবে বলো না।

দেবাশিস হেলান দিয়ে বসে বলে—ছেলেবেলায় আমি ছিলাম বদমাস। মেয়েদের হাতে চিঠি গুঁজে দিতাম। বসন্তবাবুর

বাড়ির ছাদে প্রত্যেকদিন ঘুড়ি গোঁত্তা মেরে নামিয়ে দিতাম তাতে লেখা থাকত আই লাভ ইউ। বসন্তবাবুর মেয়ে রাণীকে উদ্দেশ্য করে। তখন শুরু করার কোনো প্রবলেম ছিল না। ভাবতে শিখিনি, রচনা করতে শিখিনি, সাজাতে শিখিনি, ঐ ভাবেই শুরু করতাম। চন্দনার সঙ্গেও হুট করে শুরু। প্রথমে শরীর, তারপর ভালবাসার চেষ্টা, দেন ফ্রাস্টেশন অ্যান্ড দি এন্ড, তোমাকে নিয়ে তো সেভাবে শুরু করা যায় না। আজ আমার মস্ত প্রবলেম।

—আজকের দিনটা অত ভেবো না। মাথা ঠান্ডা করো।

দেবাশিস শ্বাস ছেড়ে বলে—আজকের দিনটা অদ্ভুত। বুঝলে? আজ রবিকে পার্মানেন্টলি ওর পিসির বাড়িতে দিয়ে এলাম। আর তারপরই শুনলাম তুমি চলে আসছ। শচীন কিছু বলল না?

—কী বলবে?

—অধিকার ছেড়ে দিল এক কথায়? তুমিই বা কী বলে এলে? তৃণা ভ্রূ কুঁচকে বলে—কী বলব? আমি কিছু বলে আসিনি। দেবাশিস চমকে উঠে বলে—বলে আসো নি?

—না। আমি প্রায়ই যেমন বেরোই তেমনি বেরিয়ে এসেছি।

—আমার কাছে এসেছো সে কথা কেউ জানে না?

—না।

—কাউকে বলো নি?

—না।

—বোকা।

—কেন?

—তুমি না ফিরলে ওরা তো থানা পুলিশ করবে। হাসপাতালে খোঁজ নেবে।

—নেবে! বলছো?

—নেবে না?

—আমার তো মনে হয় না। ওরা কি জানে যে আমি আছি?

—তুমি। বোকা তৃণা। বলে আসলেই হত। শচীনবাবু কি তোমাকে কামড়াত?

—তা নয়। ওরা আমাকে নিয়ে বহুকাল ভাবে না। আজ একটু ভাবুক।

দেবাশিস মাথা নেড়ে বলে—তা হয় না।

বলেই উঠে গেল দেবাশিস। ডায়াল করতে লাগল। তৃণা ওর কাছে গিয়ে বলল ফোন কোরো না। কিছুক্ষণের জন্য আমাকে নিরুদ্দেশ থাকতে দাও। ওরা ভাবুক।

—তা হয় না। মাথা নাড়ল দেবাশিস। ফোন কানে তুলে শুনে বলল—এনগেজড।

তৃণা একটা নিশ্চিন্তের শ্বাস ফেলল।

দেবাশিস ঘুরে বলল—আমি যা করব তা পাকাপাকি। কোনো অনিশ্চয়তা থাকবে না, দ্বিধা থাকবে না।

পৌনে সাতটা বাজেনি তখনো। বাজছে প্রায়। সাততলার ঘরের শার্শি দিয়ে দেখা যায়, কলকাতার ওপরকার আকাশটা মস্ত বড়। আকাশে তারা ফুটছে। শহরটা অনেকদূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে, আলোয় তিলোত্তমা।

বসবার ঘরটা অন্ধকার। কিংবা ঠিক অন্ধকার নয়। একটা রঙীন কাচের ঢাকনার ভিতরে শূন্য শক্তির আলো জ্বলছে। জানালার পর্দা সরানো। বাইরে চাঁদ। ঘরের ভিতরে জ্যোৎস্নার চৌকো চাঁপা রঙের আলো পড়ে আছে। আর ঝড়ের মতো বাতাস।

দেবাশিস একা ভূতের মতো বসে আছে। তার পরনে বাইরে যাওয়ার পোশাক। সামনে দুটো ঠ্যাঙ ছড়ানো, সোফার কাঁধে হেলানো মাথা। ছাদের দিকে মুখ। দুটো হাত অসহায় ভাবে পড়ে আছে। সে তৃণার কথা ভাবছে। জলস্রোত উল্টোপাল্টা, পালে পাগলা বাতাস, তবু বিপরীতগামী দুটি নৌকো একটা অন্যটার সঙ্গে জুড়ে গেল। বাঃ। বেশ।

তৃণা ওঘরে সাজছে। তারা বেড়াতে যাবে। তৃণা যেতে চায়নি। শরীরটা আজ ভাল নেই। দেবাশিস বলেছে—বেড়ালে মনটা একটু হাল্কা হয়। তোমার তো শেকড়ের প্রবলেম আছে।

তৃণা বেড়াতে ভালবাসে না। তার প্রিয় অভ্যাস ঘরের কোণে একা থাকা। ছবি আঁকবে, কবিতা লিখবে, বই পড়বে, গান শুনবে। কেউ কথা-টথা বলতে এলে বিরক্ত হয়। রোগে ভুগে ভুগে ছেলেবেলা থেকে ওর ঐ অভ্যাস হয়ে গেছে।

ফোনটা বাজছে। দেবাশিস হাত বাড়িয়ে ফোনটা তুলে নিল।

—হ্যালো।

মহিলাকণ্ঠে কে বলল—দেবাশিস দাশগুপ্ত আছেন ?

—বলছি।

—ওঃ। দাদা···

ফুলি। ফুলির গলা টেলিফোনে কেমন অদ্ভুত শোনাচ্ছে। ভীষণ ভয় খেয়ে গেল দেবাশিস। শরীরটা ঝিম ঝিম করে উঠল বিদ্যুৎ স্পর্শে। রবির কোনো কিছু হয়নি তো !

—ফুলি ! কী হয়েছে ?

—তুমি ফিরেছো ! বাঁচা গেল। রবি সেই থেকে বাবা-বাবা করছে। দুবার ফোন করেছিল।

—কী হয়েছে ?

—কিছু না। কী হবে ? অত ভেবো না তো। রবি আছে আমার কাছে আর আমি অনেক ছেলেপুলের মা।

দেবাশিস বিরক্ত হয়ে বলে—কী ব্যাপার বলবি তো !

—রবি তোমার সঙ্গে কথা বলতে চায়। বলছে বাবা কেন দেরী করছে ফিরতে !

—মন খারাপ নাকি !

—না না। দস্যিপনা করছে সব সময়ে। বেশ আছে।

—ওকে ফোনটা দে।

একটু পরেই রবির গলা শোনা গেল—বাবা।

—বলো। ভারী স্নিগ্ধ হয়ে গেল দেবাশিসের গলা।

—আমরা বেড়াচ্ছি।

—কোথায় ?

—ট্যাক্সি করে বেরিয়েছি। এখন আছি শ্যামবাজারে।

—সঙ্গে কে আছে ?

—মণিমা, পিসেমশাই, নিনকু···

—এনজয় ম্যান।

—বাবা, আমার বই, জামা প্যাণ্ট খেলনা, সব কবে পাঠাবে?

—কাল প্রীতম দিয়ে আসবে।

—এখান থেকেই স্কুলে যাবো তো?

—যেও।

—আর দিদি আমার কাছেই থাকবে তো বাবা? দিদি গল্প না বললে আমার খাওয়া হয় না। মণিমা বলেছে চাঁপা থাকুক।

—থাকুক।

—তুমি রাগ করোনি তো বাবা?

—রাগ? না রাগ করব কেন?

—আমি যে মণিমার কাছে চলে এলাম!

—তা বলে রাগ করব কেন?

—তুমি যে আমাকে ছাড়া থাকতে পারো না।

দেবাশিস একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে—পারি বাবা। পারতে তো হবেই।

—নিনকু বলছিল—তোর বাবা তোকে ছাড়া একা ভয় পাবে দেখিস। আমাদের বাড়িতে কি ভূত আছে বাবা?

—ভূত? কে তোমাকে ভূতের কথা শেখাচ্ছে? ভূত টুত আবার কি?

—বাপি বলছিল।

—কি বলছিল?

রবি বোধ হয় একটু লজ্জা পায়। একটু থেমে বলে—বাবা মানুষ মরে গেলে তো ভূত হয়। তাই—

—তাই কি?

—বাপি বলেছে। আমি না।

—কি বলেছে?

—বলেছে, মা মরে গিয়ে নাকি ভূত হয়ে আছে ও বাড়িতে।

—ওসব বাজে কথা রবি। ওসব বিশ্বাস করতে নেই।

—বুড়োদাও বলেছে—ও বাড়িতে আর যাসনে রবি। গেলে তোর মা ঠিক তোর ঘাড় মটকে দেবে। ভূতেরা নাকি যাদের ভালবাসে তাদের মেরে নিজের কাছে নিয়ে যায়।

—ছিঃ রবি। এসব কথা শিখলে তোমাকে আমি ওখান থেকে নিয়ে আসবো।

—দিদিও আমাকে কত ভূতের গল্প বলে।

—আমি চাঁপাকে বারণ করে দেবো। ওসব গল্প শুনো না।

—আচ্ছা। কিন্তু বাবা—

—বলো। দেবাশিসের গলাটা গম্ভীর।

—আমি যখন আফটারনুনে ফোন করেছিলাম তখন—

—তখন কি?

—আমার মনে হয়েছিল আমাদের বাড়িতে মা ফোন ধরেছে।

—কি যা তা বলছ?

—না না, ওটা রং নাম্বার ছিল। কিন্তু যে লেডি ফোনটা ধরেছিলেন তার গলা শুনে আমি খুব ভয় পেয়েছিলাম। মনে হয়েছিল মার ভূত ঠিক ফোন ধরেছে।

—এ রকম ভাবতে নেই। আর ভেবো না!

—বাবা কাল আমি ইস্কুলে যাবো না।

—কেন?

—আমি তো স্কুল-ড্রেস আনিনি, বই খাতাও নয়।

দেবাশিস একটু ভেবে বলল—ঠিক আছে। পরশু থেকে যেও। স্কুলে চিঠি লিখে দেবো বাস এবার ওখানে যাবে।

—কাল তাহলে ছুটি বাবা?

—ছুটি।

—কাল তাহলে কোথায় বেড়াতে যাবো বলো তো!

—কোথায়?

রবি ফোনে হাসল। কী স্নিগ্ধ কৌতুকের হাসি। বলল—মণিমা বলেছে কাল আমরা ফ্ল্যাটে বেড়াতে যাবো।

দেবাশিস উদ্বিগ্ন হয়ে বলে—এখানে! এখানে কাল এসে কী করবে? আমি তো থাকব না।

—মণিমা বলছে কাল নিজে আমাকে নিয়ে যাবে, আমার সব জিনিস গুছিয়ে আনবে আর আমাদের ফ্ল্যাটটা সাজিয়ে দিয়ে আসবে।

—না, না তার দরকার নেই।

—যাবো না?

—দরকার কি রবি ? আমিই পাঠিয়ে দেবো।

-- দাঁড়াও তাহলে মণিমাকে বলি।

ফোনের মাউথপীসে হাতচাপা দিয়ে রবি ফুলির সঙ্গে পরামর্শ করছে দৃশ্যটা স্পষ্টই দেখতে পায় দেবাশিস। খুবই উদ্বিগ্ন বোধ করে। আর সেটুকু সময়ের মধ্যেই সে ভেবে দেখল তার মহিলা ভাগ্য ভাল নয়, প্রথমবার বিয়ে করেছিল চন্দনাকে। পেটে বাচ্চা সমেত। দ্বিতীয়বার যাকে আনছে তারও বড় বড় ছেলেমেয়ে, স্বামী, সংসার সব থেকে ছিঁড়ে আনতে হবে। কোনবারই তার সহজ সরল বিয়ে হল না। যেন চুপি চুপি পাপ কাজ সারছে।

রবি বলল—হ্যালো ?

—বলো।

– আমরা কাল যাবো না!

—আচ্ছা।

—রবিবারে যাবো!

দেবাশিস হেসে বলে—রবিবারে আমিই যাবো।

—তাহলে ?

—তাহলে কি রবি ?

—আমি আমাদের ফ্ল্যাটে বেড়াতে যাবো কবে ?

—আসবে। বেড়াতে আসবে কেন, এ তো তোমার নিজেরই ফ্ল্যাট। যখন খুশী আসতে পারবে। তবে এ সপ্তাহে নয়।

—কাল তাহলে আমরা ট্যাক্সিতে করে দক্ষিণেশ্বরে যাবো।

—যেও।

—ছাড়ছি বাবা। গুডনাইট।

—নাইট।

ফোন রেখে দিল দেবাশিস! ভ্রূ কোঁচকালো। মুখটায় চিন্তার রেখা।

অন্ধকার ঘরে, পাশের ঘর থেকে আলো এসে লম্বা হয়ে পড়েছে। সেই আলো পিছনে নিয়ে ছায়ামূর্তির মতো নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছে তৃণা।

দেবাশিস অস্ফুট একটা যন্ত্রণার শব্দ করল। যন্ত্রণাটা কোথায় তা বুঝতে পারছিল না।

বলল—রেডি তৃণা ?

—হুঁ। কিন্তু আমার শরীরটা ভাল নেই !

—কি হয়েছে ?

—কি করে বলব ! আজ বড্ড টায়ার্ড।

—গাড়িতে তো বসেই থাকবে। খোলা হাওয়ায় দেখো, ভাল লাগবে।

—তোমার ফ্ল্যাটে খোলা বাতাসের অভাব নেই।

—না, না। চলো প্লীজ। এই ফ্ল্যাটটায় আমার একদম ভাল লাগে না।

—কেন, বেশ সুন্দর তো ?

—কি জানি কেন। বেশীক্ষণ ভাল লাগে না।

তৃণা একটু হাসির শব্দ করে বলে, আমারও কি খারাপ লাগবে দেব ?

—না। তোমার লাগবে না। আমার তো কতকগুলো রিফ্লেক্স আছে। সবই তো তুমি জানো। দেয়ার আর বিটার মেমোরিজ, লোনলিনেস···সব মিলিয়ে একটা সাফোকেসনের মতো হয় মাঝে মাঝে। রবিটারও হত।

—রবি ফোনে তোমাকে ভূতের কথা কী বলছিল দেব ?

—ছেলেমানুষ তো। কে যেন ভয় দেখিয়েছে ওর মা নাকি ভূত হয়ে আছে এখানে।

তৃণা একটু স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর হঠাৎ বলল—যখন দুপুরের পরে ফোন করেছিল তখন রবি আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল—তুমি কে ? মা ?

—তুমি কি বললে ?

—কি বলব ! মিথ্যে করে বললাম—রং নাম্বার।

—ঠিকই করেছো !

—ও কি ভেবেছিল ওর মায়ের ভূত কথা বলছে ?

শব্দ করে হাসল দেবাশিস। বলল—হ্যাঁ। আচ্ছা পাগল আমার ছেলেটা।

—শোনো।

—কি ?

—আর একটু পরে বেরোও। আমি একটু বসি। হঠাৎ মাথাটা কেমন ঝিম্‌ করে উঠল।

দেবাশিস এগিয়ে তৃণার হাত ধরে এনে সোফায় বসায় যত্ন করে। নিজে তার পাশে বসে। হাতখানা ধরে থেকে বলে—তোমার নাড়ি বেশ দুর্বল।

তৃণা ঘাড় এলিয়ে রেখে বলল—আজকের দিনটা কেমন যেন ভাল নয়। বিশ্রী দিন।

উদ্বেগে দেবাশিস ঝুঁকে বলে—কেন তৃণা?

দেবাশিসের কাছে আসা মুখখানা হাত তুলে আটকায় তৃণা। বলে—এক একটা দিন আসে সকাল থেকেই কেবল সব কাজ ভুল হতে থাকে। যেন ভূতে পায় মানুষটাকে।

—কিরকম?

—দেখ না, কোনো দিনই তো আজকাল রেবার বা মনুর ঘরে যাই না। আজ যেন ভূতে পেল। গেলাম। রেবা হঠাৎ এসে পড়ল, চোরের মতো ধরা পড়ে গেলাম; কি রকম বিশ্রী ব্যবহার যে করল ও!

—তুমি রেবাকে বড্ড ভালবাসো তৃণা।

—ভীষণ ভালবাসি। সেইজন্যেই তো আমার বুক ভেঙে দেয়।

—সাতটা কিন্তু বেজে গেছে তৃণা।

—দাঁড়াও না। আজ কি একটা সাধারণ দিন! সকাল থেকেই সব অনিয়ম চলছে। অদ্ভুত দিনটি আজ। ঘড়ি টড়ি দেখো না।

—দেখব না। বলো।

—তারপর মনু। ওকে বলেছিলাম, ঘরে পৌঁছে দে, শরীরটা ভাল না। তো ছেলে আমাকে জাপটে কোলে তুলে নিল। এমনিতে কথাও বলে না। তবে কেন আজ···? তারপর শচীনবাবু। সেও আজ অন্যরকম। রুমাল কুড়িয়ে নিল···অনেক কথা বলল···

—শোনো তৃণা, শচীনকে ফোনটা কিন্তু করা হয়নি।

—পরে কোরো।

—এতক্ষণে নিশ্চয়ই ওরা তোমার খোঁজ করছে। ওদের কেন অযথা ভাবতে দিচ্ছ?

—ভাবুক। একটু ভাবুক। কোনোদিন তো ভাবে না।

—না তৃণা। তুমি ভুল করছ! যা করছ তা আরো বলিষ্ঠ-ভাবে করো। চুরি তো করোনি।

তৃণা দেবাশিসের হাতটা ধরে বলল—আঃ! তোমার কেবল ভয়। শোনো না।

দেবাশিস শ্বাস ছেড়ে বলল—বলো।

—ঘর থেকে বেরিয়ে এসেই আমাকে আজ ভূতে পেল।

—সে কি রকম?

—ভুল রাস্তায় চলে গেলাম। ঠিক যেন নিশি-পাওয়া মানুষের মতো। একটা ছেলে মোটরসাইকেল চালিয়ে গেল, সেই শব্দে চেতনা হয়। তারপরও ফের ভুল। একটা ট্যাক্সিওলা নিয়ে গেল দেশপ্রিয় পার্কে। তাকে ডিরেকশন দিতে মনে ছিল না, রাস্তাটাও খেয়াল করিনি। তাই মনে হচ্ছে, আজকের দিনটা খুব অদ্ভুত।

—কী বলতে চাও তৃণা?

তৃণা অন্ধকারেই মুখ ফেরাল তার দিকে। বলল—এক একটা দিন আসে, ভুল দিয়ে শুরু হয়। ভুলে শেষ হয়। ভুতুড়ে দিন।

—না তৃণা, ভুল দিয়ে শেষ হচ্ছে না। তুমি বড্ড সেকেলে।

—না দেব। শোনো, আমি শুধু একটাই ঠিক কাজ করেছি আজ।

—কি?

—শচীনকে বলে আসিনি।

—বলে আসা উচিত ছিল। এটাই ভুল করেছো।

তৃণা মাথা নেড়ে বলে—না। বলে আসলেই ভুল করতাম।

দেবাশিস অধৈর্যের গলায় বলে—আমি এক্ষুনি ফের শচীনকে ফোন করছি।

বলেই বাধা না মেনে উঠে গেল দেবাশিস। ফোনের ওপর ঝুঁকে পড়ে অল্প আলোয় ঠাহর করে করে আস্তে আস্তে ডায়াল ঘোরাতে থাকে।

ফোনটা কানে তুলে অপেক্ষা করছে। তৃণা উঠে এল কাছে। ফোনটা নিয়ে নিল হাত থেকে। রেখে দিতে যাচ্ছিল, শুনল ওপাশ থেকে একটা মেয়ের স্বর বলে উঠল—হ্যালো।

রেবা বোধ হয়। তৃণা তাই ফোনটা কানে লাগায়।

ওপাশে চঞ্চল ও ধৈর্যহীন গলায় রেবা বলছে—কে? হ্যালো কে?

উত্তর দিতে সাহস হল না তৃণার। কেবল খানিকক্ষণ শুনল।

রেবা চেঁচিয়ে তার বাবাকে ডাকছে—বাপি, দেখ, ফোনটা বাজল, কেউ সাড়া দিচ্ছে না এখন।

পরমুহূর্তেই শচীনের গলা—হ্যালো।

তৃণা মাউথপীসে হাত চাপা দিয়ে রাখল।

শচীন রেবাকে ডেকে বলল—ঘোস্ট কল। আজকাল টেলিফোনে যত গোলমাল।

বলেই আবার, শেষবারের মতো বলল—হ্যালো! কে?

কেউ না। আমি কেউ না। একথা মনে মনে বলে তৃণা।

দেবাশিস কানের কাছে মুখ নামিয়ে নরম গলায় বলে—তৃণা বলতে পারলে না?

শচীন ফোন রেখে দিল।

তৃণা মাথা নেড়ে বলল—না। আজকের দিনটা থাক। দিনটা ভাল নয় দেব।

—খুব ভাল দিন তৃণা।

—না দেব, আজ কোনো ডিসিশন নেওয়া ঠিক হবে না।

—তাহলে কি করবে তৃণা?

—তাহলে···

তৃণা ভ্রূ কুঁচকে ভাবতে থাকে। অনেকক্ষণ ধরে ভাবে।

দেবাশিস অপেক্ষা করে উগ্র আগ্রহে।

গাড়ি থামল। গাড়ি চলে গেল।

নিজের বাড়ির সামনে একা দাঁড়িয়ে তৃণা। বুকে একটা খাঁ খাঁ আকাশ। সেই আকাশে নানা ভয়ের শকুন উড়ছে।

রাত আটটা বেজে গেছে। তবু তেমন রাত হয়নি। এখনো

স্বচ্ছন্দে বাড়িতে ঢোকা যায়। কেউ ফিরেও তাকাবে না সে জন্য। দেবাশিসের গাড়িটা গড়িয়াহাটা রোডের মুখে গিয়ে বাঁ ধারে মোড় নিল।

তৃণা বাড়ির গেট দিয়ে ধীর পায়ে ঢোকে। মস্ত আলো জ্বলছে বাইরে। ছোট বাগানটার গাছপালার ওপর আলো পড়ছে। হাওয়া দিচ্ছে। চাঁদ উঠছে। ফুলের গন্ধ মুঠো মুঠো ছড়াচ্ছে বাতাস।

আজকের দিনটা দেবাশিসের কাছে ভিক্ষে নিল তৃণা। আজ দিনটা ভাল নয়। এই ভুতুড়ে দিনে এতবড় সাহসের কাজ করতে তার ইচ্ছে করল না। আজকের দিনটি কেটে গেলে এরপর যে কোনোদিন সে চলে যাবে। কেন থাকবে এখানে? কেন থাকবে!

আস্তে ধীরে সে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এল। বাঁ ধারের ঘরটায় টেবিল-টেনিস খেলছে রেবা আর তার এক মাদ্রাজী মেয়ে-বন্ধু সরস্বতী। ছোটাছুটি করছে। হাসছে। কেউ তাকে দেখল না।

শচীনের কাকাতুয়াটা চেঁচিয়ে বলল—চোর এসেছে। চোর এসেছে। শচীন! শচীন!

তৃণা ধীরে তার ঘরে এসে দাঁড়ায়। আলো জ্বালে না। চুপ করে বিছানায় বসে থাকে কিছুক্ষণ, এবং বসে থাকতে থাকতেই টের পায়, বুকে আকাশ, আকাশে শকুন।

মনটা ভাল থাকলে এই নিয়ে একটা কবিতা লিখত সে।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল তৃণা। অলক্ষ্যে এবং নিজের অজান্তে চাকর এসে ডাকল—মা, খাবেন না? সবাই বসে আছে।

তৃণা উঠল। চাকরের মুখের মা ডাকটা কানে বাজতে থাকে।

বাথরুম সেরে এসে খাওয়ার টেবিলে চলে গেল সে। রাতের খাওয়ার সময়টা সে প্রায়ই থাকে। নিয়ম। না থাকলেও ক্ষতি নেই, তবু নিয়ম।

খাওয়ার টেবিলে আজ সবাই হাসি খুশী।

শচীন ছেলেমেয়েদের কাছে গল্প বলছে। কথামৃতের গল্প। সবাই শুনছে। এসব গল্পের মধ্যে অবশ্য তৃণাকে ওরা রাখে না। টেবিলের একধারে তৃণা চুপ করে বসে থাকে। টেবিলে সাজানো খাবার। যে যার প্লেটে তুলে নিয়ে খায়!

শচীন গল্পের শেষে বলল—জাপানের চালানটা এলে দেখাব। বামন গাছের এমন একটা বাগান করব।

—আমাদের স্কুলে ইকেবানা শেখায়। রেবা বলে।

মনু বলল— সে আবার কি?

—ফুলদানী সাজানো। খুব মজার। জাপানীরা স্বর্গ, মানুষ আর পৃথিবী এই প্যাটার্নে সাজায়। অদ্ভুত।

মনু বলে—জাপানীরা খুব প্রগ্রেসিভ। না বাবা?

—প্রগ্রেসিভ। শচীন বলে—তাছাড়া ওদের মতো মাথা কারো নেই। দোষের মধ্যে বড্ড সেন্টিমেন্টাল, একটুতেই সুইসাইড করে।

—হারিকিরি। রেবা বলে।

—হারিকিরি নয়। মনু বলে—হারাকিরি।

এইরকম সব কথা।

রান্নার লোকটা নিঃশব্দে ঘরের একধারে দাঁড়িয়েছিল। রোজই থাকে। চমৎকার রাঁধে সে। কোনো ভুল হয় না।

আজ হঠাৎ চাইনীজ চপ সুয়ের এক চামচ মুখে তুলেই রেবা চেঁচিয়ে বলে—চিত্ত আজ এটাতে নুন দাওনি।

চিত্ত শশব্যস্তে বলে—দিয়েছিলাম তো।

—দাওনি। রেবা জোর গলায় বলে।

মনু একটু মুখে দিয়ে—দিয়েছে। তবে কম হয়েছে।

শচীন বললে—টেস্ট কিন্তু দারুণ।

রেবা বিরক্ত হয়ে তার বাবার দিকে নুনের কৌটো এগিয়ে দেয়। কী ভেবে নিজেই নুন ছড়িয়ে দেয়। মনুর প্লেটেও দেয়।

তারপরই হঠাৎ তৃণার দিকে ফিরে বলে—মা তোমাকে···ওঃ তুমি তো এখনো খাওয়া শুরুই করোনি।

তৃণা ঠিক বিশ্বাস করতে পারে না। কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারে না যে রেবা তাকে মা বলে ডাকছে। গত একবছর একবারও ডাকেনি। তার কানমুখ ঝাঁ ঝাঁ করতে থাকে রক্তের জোয়ারে। বুক ভেসে যায় হৃদয় স্ফারিত হয়। বহুকাল বাদে স্তনের ভিতরে যেন ঠেলে আসে দুধ। অস্থির তৃণা চেয়ারের হাতল চেপে ধরে। আনন্দ! আনন্দ! এত আনন্দ সে বুঝি জীবনে একবারও আর ভোগ করেনি।

কেউ তার অবস্থা লক্ষ্য করছে না। ভাগ্যিস শচীন ওদের বিদেশের একটা অভিজ্ঞতার গল্প করছে। ওরা কি জানে তৃণার ভিতরে একটা ট্যাপ কে যেন খুলে দিয়েছে! অবিরল নির্ঝরিণী বয়ে চলেছে তার শরীর দিয়ে। সেই স্রোত তার চারধারে সব কিছুকেই অবগাহন করাচ্ছে। শব্দটা কান পেতে শোনে তৃণা, স্রোতের শব্দ।

পরদিন সকালে কবিতার খাতা নিয়ে বসল।

আজও দেবাশিস আসবে। বিকেলবেলায়। বাসস্টপে।

সারা বাড়িতে আজ চন্দনার ভূত ঘুরে বেড়াচ্ছে!

দেবাশিস একটা সিগারেট খেল অনেকক্ষণ। আবার উঠল। জানালাটা দিয়ে ঝুঁকে পড়ল রাস্তার ওপর। বহু নীচে ফুটপাথ! মাঝখানে নিরালম্ব শূন্যতা! চন্দনা কি করে অত সাহস পেল?

দেবাশিস তো পারে না। চাঁদের আলোয় ভেসে যাচ্ছে কলকাতা। ঘর সাজাবে বলে, ফুলশয্যা বলে ফুল এনেছিল সে। এখন এই নিশুত রাতে সেই ফুল গন্ধ ছড়াচ্ছে। কী গভীর সুগন্ধ! সুগন্ধটা টেনে রাখে তাকে।

দেবাশিস প্রেতের মতো একা এসে বসে সোফায়। মাথার চুল মুঠো করে ধরে! রবি নেই। রবি এখন মণিমার বুক ঘেঁষে অঘোরে ঘুমোচ্ছে!

একবার রবির ঘরে এল দেবাশিস। রোজ রাতেই আসে। ছোট ছোট শ্বাস ফেলে রবি ঘুমোয়। চেয়ে দেখে। পাশ ফিরিয়ে দিয়ে যায়। আজ রবির ছোট্ট বিছানাটা ফাঁকা পড়ে আছে।

আজকের দিনটা ভাল নয়। তৃণা বলেছিল। সত্যিই। আজকের দিনটা কেমন যেন! হাতের মুঠো থেকে পয়সা হারিয়ে গেলে শিশু যেমন অবাক হয় তেমনি লাগছিল দেবাশিসের।

রবি নেই! তৃণা নেই।

ভালই। এ একরকমের ভালই।

প্রেতের মতো ভয়ঙ্কর শুকনো একটা হাসি হাসল দেবাশিস।

বুকের এখনো যেন রবির খেলনা পিস্তলের মিথ্যে গুলি বিঁধে আছে। বড় যন্ত্রণা।

অস্ফুট শব্দ করল দেবাশিস; যন্ত্রণাটার অর্থ বুঝতে পারল না।

কালই ইনডেক-এর একট মস্ত কন্ট্রাক্ট শুরু হচ্ছে আসানসোলে। সকালের গাড়িতেই চলে যেতে হবে।

দেবাশিস শুল। ঘুম আসছে ভারী ক্লান্তির মতো। ঘুমচোখে মনে পড়ল, ভুল করে কাল বিকেলে বাসস্টপে আসতে বলেছে তৃণাকে। এসে ফিরে যাবে।

ফোন করবে? থাকগে। আজ একটা ভুলের দিন গেল। আজ আর ভুলগুলোকে ঠিক করার চেষ্টা করবে না। থাক। ভুলের দিনটা কেটে যাক।

ভুল সত্য

দিগিন বসে আছেন ইজিচেয়ারে। সামনে উঁচু টুলের ওপর পা দুখানা তোলা। দুপায়ের পাতার ফাঁক দিয়ে শরৎকালীন পরিষ্কার আকাশে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যাচ্ছে। কাঞ্চনজঙ্ঘার কোলে একটু মেঘ। দিগিন দুপায়ের ফাঁক দিয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘার দিকে একটু বিরক্তির সঙ্গে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর বাঁ হাতের কাছে ছোট টেবিলের ওপর একটা দামী ট্রানজিস্টার রেডিও। রেডিওর সামনে চায়ের খালি কাপ, কাপের পাশে মাদ্রাজী চুরুটের বাক্স দেশলাই। কাঞ্চনজঙ্ঘা থেকে রোদের ঠিকরে আসা আলো চোখে কট কট করে লাগে। পায়ের পাতা জড়ো করো কাঞ্চনজঙ্ঘাকে ঢেকে দেন তিনি।

একটু আগে খবর হচ্ছিল রেডিওতে। তিনি খবরটায় মনঃসংযোগ করার চেষ্টা করছিলেন। সংবাদ-পাঠক বলে যাচ্ছিল, গতকাল ভারত ও সোভিয়েট রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রীর একটি জরুরী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়, উভয় পক্ষই একটি করে গোল দেওয়ায় খেলাটি অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়। আজ আবার বৈঠক বসবে। ইত্যাদি। দিগিন তখন থেকেই নিজের ওপর এবং কাঞ্চনজঙ্ঘার ওপর একটু বিরক্ত হয়ে আছেন। রেডিওটা বন্ধ করে দিলেন। অমনি নিচের তলা থেকে সরোজিনীর গান ভেসে আসে—এ প্রকাণ্ড জগতের মাঝে যত মিষ্টি যেথা আছে, সব দিলাম মা তোমার ভোগে, রোগ সারা মা, রোগ সারা···সরোজিনী, দিগিনের বোন। এ সব গান সরোজিনী নিজেই বানায়, সুর দেয় আর গায়। সরোজিনীর স্বামী আজ বছর দুই বিছানায় শোয়া। তার রাজ্যের অসুখ, মাঝে মাঝে ওঠা-হাঁটা করে, আবার বিছানা নেয় দুদিন পর। সরোজিনী একটু পাগলী আছে। রামপ্রসাদী সুরে সারাদিনই গান গায়। ওর স্বামী হরিপদ মাঝে মধ্যে বিরক্ত হয়ে ধমকায়, চড়-চাপড়ও দেয়। কিন্তু তাতে সরোজিনীর কিছু পরিবর্তন হয় না।

দিগিন উভয়পক্ষের একটি করে গোল দেওয়ার রহস্যটা চোখ

বুজে মনে মনে ভেদ করার চেষ্টা করছিলেন। কাল রাতে ভালই ঘুম হয়েছে তাঁর। মাঝরাতে একবার ঘুম ভেঙেছিল কুকুরের কান্না শুনে। মোদকের নেশায় ঘুম, সহজে ভাঙার নয়, তবু ভেঙেছিল। উঠে বাথরুম সেরে আবার শুতে যাওয়ার আগে কয়েক মিনিট বারান্দায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। কাঠের খুঁটির ওপর টংগী ঘর। বারান্দা থেকে অনেকদূর দেখা যায়। খুব বেশী গাছপালা থাকায় কুকুরটাকে দেখা গেল না। আকাশে মস্ত চাঁদ উঠেছে কৃষ্ণপক্ষের। মাঝরাতে এইসব চাঁদ-ফাঁদ দেখলে কুকুর-বিড়াল কাঁদবেই। এই সময়টায় ওদের বোধহয় পূর্বজন্মের কথা মনে পড়ে। আবার শুলে শেষ রাতে তেমন ভাল ঘুম হবে না মনে করে দিগিন একটা ঘুমের বড়ি খানিকটা বীয়ার দিয়ে গিলে ফেলেন। বীয়ারের বোতলটা খুলে ফেলেছেন—তাই কী আর করেন, পুরো বোতলটাই সাফ করে শুয়ে পড়েন আবার। ঘুমের বড়িটা বেশ কড়া ধাতের, তার ওপর বীয়ার থাকায় কী একটা গোলমাল হয়ে গেল শরীরের মধ্যে। আজ সকাল পর্যন্ত মাঝে মধ্যে সেই গোলমালটা টের পাচ্ছেন, 'কান' শুনতে 'ধান' শুনছেন। ভারত আর সোভিয়েট রাশিয়ার মধ্যে তো ফুটবল খেলা হয় নি যে গোল হবে।

কাঠের সিঁড়িতে ঝোড়ো বেগে পায়ের শব্দ তুলে কে উঠে আসছে। শানু। শানু ছাড়া কারো এত তাড়া থাকে না। দিগিন ভারী বিরক্ত বোধ করে চোখ বুজে ঘুমের ভান করলেন। চুরুটটা জ্বলে জ্বলে ছোট হয়ে এসেছে, আঙুলে তাপ লাগছে।

শানু ঘরে ঢুকেই ডাকে—ছোটকাকা।

দিগিন উত্তর দেন না।

শানু কাছে আসে, ইজিচেয়ারের ওপর ঝুঁকে বলে—ও কাকা।

দিগিন চুরুটটা মুখে তুলে চোখ না খুলেই বলেন—হুঁ।

—ঘুমোচ্ছ?

—শরীরটা ভাল নেই।

—কেন?

—সোপস্টোনের সেই ডিপোজিটটা ভুটান গভর্নমেণ্ট আমাদের ইজারা দিতে রাজী হয়েছে, কিন্তু অনেক টাকা চাইছে।

—কত ?

—পরিষ্কার করে কিছু বলে নি। শান্তি আজ আবার যাবে কথাবার্তা বলতে।

দিগিন চোখ খোলেন না। বলেন—খামোখা।

—এত খরচা করলাম, এখন পিছিয়ে যাবো ?

—গেলেই ভাল। নইলে আরো টাকা ক্ষতি হবে। মোট কত খরচ হয়েছে ?

—হিসেব তো এখনো শেষ করি নি। খরচ তো এখনো হচ্ছে। তবে হাজার ত্রিশেক বেরিয়ে গেছে।

—আরো যাবে।

—লস্ হবে বলছ ?

—হবে।

—কেন ?

—ডিপোজিট কতটা আছে পরীক্ষা করিয়েছ ?

—করিয়েছি।

—কী বলে সার্ভেয়াররা ?

—কিছু বলতে পারছে না, ওপরের দিকের পাথরের কোয়ালিটি ভাল নয়। নিচের দিকে ভাল জিনিস থাকতে পারে। ঠিক কতটা ডিপোজিট আছে বলতে পারল না, বলা নাকি সম্ভব নয়।

—হুঁ। দিগিন বলেন।

—কী করব ?

—যা বলবার তা তো বহুকাল আগেই বলে দিয়েছি। এখনো অল্প ক্ষতির ওপর ছেড়ে দাও।

—কিন্তু কলকাতায় যে নমুনা পাঠিয়েছিলাম তাতে অনেক ভাল খন্দের ইন্টারেস্ট দেখিয়েছে। দরও ভালই পাবো।

দিগিন চোখ খুললেন। পায়ের পাতা সরে গেছে, কাঞ্চনজঙ্ঘার গা থেকে ঠিকরে আসা রোদ আবার চোখে কটাশ করে লাগে। চোখটা বুজে ফেলে বলেন—যা ভাল বোঝ করো।

শানু অধৈর্য হয়ে কাঠের পাটাতনে জুতো ঠুকে বলে—তুমি একদম এডভাইস দিচ্ছ না। গত দু'বছর চারটে লোককে দৈনিক চুক্তিতে লাগিয়ে রেখেছি। তারা দিনরাত খুঁজে খুঁজে বহু

কষ্টে শেষ পর্যন্ত যাও বা ডিপোজিটটা খুঁজে পেল তাও এখন যদি কাজে লাগাতে না পারি তাহলে আমার মনের অবস্থাটা কী হয় একবার ভেবে দেখেছ? কত টাকা জলে যাবে।

—সোপস্টোন তো আর হীরে-জহরত নয়। ওর পিছনে দু'বছর অত টাকা ঢালা বোকামী হয়েছে। আগেই তোমার ভেবে দেখা উচিত ছিল।

শানু রেগে গিয়ে বলে—কিন্তু ভুটান গভর্নমেন্ট অত টাকা চাইবে কেন? ডিপোজিটটার খোঁজও তো ওরা রাখে না, আমরা খুঁজে পেয়েছি। সুতরাং রাইট তো আমাদের। ওদের উচিত নমিনাল একটা টাকা নিয়ে খনিটা ছেড়ে দেওয়া।

দিগিন হাসলেন। বললেন—তা তো দেবেই না, বরং ওরা তোমাদের হটিয়ে নিজেরাই সোপস্টোনটা তুলে ব্যবসা করবে।

—কিন্তু আমরা যে ওটা খুঁজতে বিস্তর টাকা ঢাললাম, সেটা কে দেবে? ওরা দেবে?

—খোঁজার সময়ে তো ওদের পরামর্শ নাও নি। ঘরের টাকা ঢেলে বরং ওদের জায়গাটা দেখিয়ে দিয়েছ। ওরা দেবে কেন?

—কিন্তু দেওয়া তো উচিত।

—ওদের সেটা বোঝাও গিয়ে।

শানু চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে, তারপর একটা শ্বাস ফেলে বলে—আমি লাভ চাইছি না। খরচটাও যদি উঠে আসত।

—উঠবে না। বরং আরো টাকা বেরিয়ে যাবে। কোথায় কোন জয়ন্তীয়ায় নদীর ধারে একটা সোপস্টোনের টুকরো খুঁজে পেয়ে কে একজন এসে তোমাকে খবর দিল, আর সঙ্গে সঙ্গে গুপ্তধন পাওয়ার মতো নেচে উঠলে। দুনিয়ায় যদি এত সহজেই সব পাওয়া যেত!

কাঠের মেঝেয় শানু পায়চারি করতে থাকে। দিগিন চোখ দুটো অল্প একটু খুলে ভাইপোকে দেখেন। বংশটাতেই পাগলের বীজ আছে। জয়ন্তীয়ায় নদীর ধারে সোপস্টোনটা খুঁজে পেয়েছিল শান্তি পাল নামে একজন ভবঘুরে। সে কেমন করে শানুকে বশ করে বুঝিয়েছিল—কাছে-পিঠেই সোপস্টোনের মস্ত কোনো খনি আছে। শানুও নিশ্চিত হয়ে লোকটাকে খোঁজার কাজে লাগায়।

লোকটা দিনে বারো টাকা নিত, সঙ্গে আরো তিনজন হা-ঘরেকে জুটিয়ে নিল, তারা পেত দিনে আট টাকা। এ ছাড়া ছিল আনুষঙ্গিক খরচ-খরচা, ত্রিশ হাজারের বেশীই বেরিয়ে গেছে। পায়ের পাতায় আবার কাঞ্চনজঙ্ঘা ঢাকা দেন দিগিন। চোখ বোজেন এবং উভয় পক্ষের একটি করে গোল দেওয়ার বিষয়টা ভাবতে থাকেন।

শানু আবার সামনে এসে দাঁড়ায়। ধৈর্যহীন, চঞ্চল, ক্ষুব্ধ।

—ছোটকাকা।

—হুঁ।

—অনেক লস হয়ে গেল।

—বুঝতে তো পারছি।

—বুঝতে পেরে চুপচাপ বসে আছ কী করে।

—কী করব ?

—কিছু একটা করা তো দরকার।

—দু'বছর ধরে চারটে লোকের কর্মসংস্থান করেছ—এতো ভালই। তোমার লাভ যদি লবডংকাও হয়, তবু ঐ চারটি লোকের অনেক আশীর্বাদ তোমার পক্ষে জমা হয়েছে। সেইটাই স্যাটিসফ্যাকশন।

শানু কোমরে হাত দিয়ে,ঋজু দাঁড়িয়ে তার অকৃতদার, বিচক্ষণ এবং দার্শনিক কাকাটিকে ভ্রূ কুঁচকে দেখে বলে—তুমি একদম ফিলজফার হয়ে যাচ্ছ।

—যাচ্ছি না! গেছি। বলে আর একটা সরু মাদ্রাজী চুরুট সযত্নে ধরিয়ে নেন দিগিন। সোয়া আটটা বাজে, এক্ষুনি তাঁর তৃতীয় কাপ চা আসবে। ত্রিশ টাকা কিলোর চা, গন্ধে ঘর মাৎ হয়ে যায়। সম্ভাব্য চায়ের কথা ভাবতে তিনি স্ফুর্তিযুক্ত হয়ে বলেন—যা গেছে। ছেড়ে দাও। ঐটাই শেষ পর্যন্ত টিকবে।

—যে টাকাটা লস হল তাতে তোমারও শেয়ার আছে, ভুলে যেও না।

—ভুলি নি বলেই তো বলছি। আরো যা লস্ হবে তাতেও আমার শেয়ার থাকবে। বিপদে পণ্ডিতরা অর্ধেক ত্যাগ করেন।

শানু একটা বড় শ্বাস ছেড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

সে যেতে না যেতেই পুন্নি চা নিয়ে আসে।

—ছোটমামা।

—হুঁ।

—চা।

—হুঁ।

ঠক্ করে চা টেবিলে রেখে পুন্নি বলে—কারা যেন আসছে আজকে আবার।

দিগিন অবাক হয়ে বলেন—কারা?

—কী জানি! পুন্নি ঠোঁট উল্টে বলে—শুনছি কারা যেন আসবে।

—কত কে আসে। দিগিন দার্শনিকের মতো বলেন—কার কথা বলছিস?

—তুমি বুঝি জানো না? কে এক ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের বাবা আসবে, সবাই বলছে।

—ও। বলে দিগিন সুগন্ধী চায়ে চুমুক দেন। আগুন গরম চা। গরম ছাড়া খেতে পারেন না দিগিন। দোতলায় উঠতে উঠতে ঠাণ্ডা মেরে যায় বলে দোতলায় পাশের ঘরেই চায়ের সরঞ্জাম রাখেন দিগিন। পুন্নি ঠিক সময়ে আসে, নিঃশব্দে চা করে দিয়ে যায়। ওর হাতে চামচ নাড়ার বা কেটলির হাতলের কোনো শব্দ হয় না। ভারী লক্ষ্মী মেয়ে।

—তা কী করবে? পুন্নি জিজ্ঞেস করে।

—কী করব? এলে আসবে।

—আমি সামনে যাবো না।

—সামনে যাওয়ার জন্য যাবি কেন? চা-টা দিয়ে আসবি। কিছু জিজ্ঞেস করলে জবাবটা দিবি। তার বেশি কিছু করতে হবে না।

—আমি সামনেই যাবো না।

—কেন?

—আমার ভাল লাগে না।

—ও। বলে দিগিন হাত বাড়িয়ে রেডিওটা চালিয়ে দেন। লোকগীতি হচ্ছে। লোকগীতি মানেই দমের খেলা। দিগিন রেডিও বন্ধ করে দেন। পায়ের পাতার ওপাশে কাঞ্চনজঙ্ঘা মেঘে ঢাকা পড়েছে।

—ছোটমামা।

—হুঁ।

—আমি যা বলেছি শুনেছ তো।

—শুনলাম।

—আমি সামনে যাবো না।

—আচ্ছা।

—আচ্ছা বললে হবে না। তখন মা চেঁচাবে, বাবা বকবে, বড়মামা আর মেজমামা তম্বি করবে, তা হবে না। আমি তোমাকে বলে রাখলাম, তোমাকে সামলাতে হবে সব দিক।

দিগিন 'হুঁ' দেন।

—ঠিক তো? পুন্নি সন্দেহে জিজ্ঞেস করে।

—হুঁ।

—কী করবে?

—তোর বদলে দকুলীকে দেখিয়ে দেবো।

—টের পাবে না?

—টের পাবে কেন? এতো বড় সংসারে কত মেয়ে, কারটা দেখে যাচ্ছে তার ঠিক কী? দকুলীও তো আমাদের ভাগনীই। তোর চিন্তা নেই।

পুন্নি মুখ বেঁকায়। বলে—আহা।

দিগিন বলেন—কী হল?

পুন্নি শ্বাস ফেলে বলে—দকুলী ঠিক ধরা পড়ে যাবে।

—ধরা পড়ার কী? চুরি করছে নাকি। তুই বিকেলের দিকটায় বরং বাড়িতে থাকিস না।

পুন্নি উত্তর না দিয়ে জোরে পা ফেলে হেঁটে যায়।

বহুকাল আগে দিগিন একবার একটা কাণ্ড করেছিলেন। কয়েকজন ডাকসাইটে মাতালকে নেমন্তন্ন করেছিলেন সেবার। তার আগের দিন একটা প্রকান্ড তরমুজ কিনে এনে তার একদিকে ফুটো করে সব শাঁস বের করে ফেলেন, তারপর সেটাতে ধেনো, হুইস্কি, ব্র্যান্ডি, রাম, জিন ইত্যাদি ভরে ফুটোটা বন্ধ করে দেন। একটা ছোট ভাইপোকে ডেকে এনে ঘরের একধারে তাকে বসিয়ে অন্য ধারে নিজে বসেন। তরমুজটাকে একবার ভাইপোর দিকে গড়িয়ে দেন,

ভাইপো আবার তাঁর দিকে গাড়িয়ে দেয়। এইভাবে ঘণ্টাখানেক গড়াগড়ি খেয়ে তরমুজটা কী মারাত্মক অ্যাটম বোম্ তৈরী করে রেখেছিল পেটের মধ্যে, তার কোনো ধারণা ছিল না দিগিনের। পরেরদিন বন্ধুরা এসে পৌছুনোর আগেই তিনি জিনিসটা একটু গেলাসে ঢেলে চাখতে গিয়ে সেই যে দুনিয়ার বার হয়ে গেলেন, ফিরে আসতে পরদিন সকাল। বন্ধুরা যথাসময়ে এসেছিল। কিন্তু মাতাল হলেও তারা মৃত্যুশীল এবং সকলেরই কিছু প্রাণের মায়া কম নয়। দিগিনের অবস্থা দেখে ঐ তরমুজের ধারে কাছেও তারা ঘেঁষে নি। দিগিনের আজও মনে পড়ে সেই মারাত্মক নেশার পর শরীরের মধ্যে যে গোলমাল হয়ে গিয়েছিল, কাল রাতে বীয়ার দিয়ে ঘুমের বড়ি খাওয়াতেও তেমনি কিছু গোলমাল হয়ে গেছে। তবে জীবনটাকে নানা এক্সপেরিমেণ্টের মধ্যে দিয়ে নিয়ে যাওয়াটাই আদতে জীবন। আলো যেমন প্রতিহত না হলে আলো বলে মনে হয় না, জীবনটাও কি তাই নয়?

ব্রিটিশ আমলের শেষদিকে দিগিন যখন ভাগ্যান্বেষণে এই শিলিগুড়িতে আসেন তখন শিলিগুড়ি ছিল ছোট গঞ্জ শহর। এক মাত্র স্টেশনটাই ছিল রমরমা। দার্জিলিংয়ের যাত্রীরা ব্রডগেজ থেকে নেমে ন্যারোগেজের খেলনা গাড়িতে ওঠার আগে এখানে ব্রেকফাস্ট সারত। যাত্রীদের মধ্যে তখন অধিকাংশ দাপুটে লালমুখো সাহেব। এ ছাড়া শহরটা ছিল ঘুমন্ত, জনবিরল। তখনই এখানে কিছু ঠিকাদারীর কাজ পেলেন দিগিন, কাঠের কারবারে নামলেন, কমলালেবু আর চায়ের ব্যবসাতেও হাত দিয়েছিলেন। সেই সময়ে কাঠের টংগী ঘর সমেত হাকিমপাড়ার এই জমিটা তাঁর হাতে আসে। একা থাকতেন, রান্নাবান্নার একটা লোক ছিল। দিব্যি জমে গেলেন এইখানে। তখন থেকেই বারান্দায় বা ঘরে বসে টেবিলে ঠ্যাং তুলে মেঘহীন দিনে নিজের পায়ের পাতার ফাঁক দিয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা তাঁর অভ্যাস। আর একা-বোকা থেকে থেকেই তাঁর নানা নেশার পত্তন হয়। পচাই দিয়ে শুরু, গাঁজা, গুলি, মোদক কিছুই বাদ রাখেন নি। এখনো তাঁর নেশার কিছু ঠিক নেই। যখন যেটা ইচ্ছে হয় খান। বাঁধা-ধরা জীবন ভাল লাগে না।

দেশ-ভাগের পর হুড়মুড় করে বড় দুই ভাই, তাদের বৌ, দুই বোন, স্বামী, বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে বিশাল এক দঙ্গল এসে পড়ল। একাকীত্বটা চলে গেল দেশছাড়া হয়ে। টংগী ঘরটার আশেপাশে আরো দু'খানা বাড়ি উঠল। অবশ্য একান্নবর্তিতা তাঁদের ভাঙে নি। বড় পাকশালে সকলের রান্না হয়। বড়দা উকিল, মেজ জনের ওষুধের স্টেশনারী, বড় ভগ্নীপতি কয়লার ব্যবসা করে, ছোট ভগ্নীপতি অসুখে ভোগে বলে শালাদের ঘাড়ে পড়ে আছে। চাকরি তাকে করতেও দেওয়া হয় না।

সকালে সেবক রোডের মোড়ে কাঞ্চনের সঙ্গে দেখা। কাঞ্চনকুমার লালোয়ানি। মোটরসাইকেলটা থামিয়ে দিগিন ডাকলেন—কাঞ্চন।

কাঞ্চন তার ভোকসওয়াগান থামিয়ে পান খেতে নেমেছিল মোড়ের দোকানটায়। পরনে খুব দামী একটা বিলিতি সিন্থেটিক ফেব্রিকের লাল গেঞ্জি, সাদা প্যারালেল ছাঁটের প্যান্ট, পায়ে চপ্পল, চোখে বড় মাপের রোদ-চশমা! জুলপী চুল সব হালফ্যাশনের। পিছু ফিরে দিগিনকে দেখেই দুখিলি পান তাড়াহুড়ো করে মুখে পুরে এগিয়ে আসে।

—আরে দিগিনদাদা।

—যাচ্ছিস কোথায়?

—কাল রাতে জোর ধস্ নেমেছে তিনধারিয়ার কাছে। বাবাজী তো খার্শাংয়ে আট্কা পড়ে আছেন। আজ সুবায় ফিরবার কথা। যাচ্ছি ধসের সাইটে, যদি পায়দল এপারে আসতে পারে তো নিয়ে আসবো।

দিগিন বলল—ধস্? কৈ আমি তো শুনি নি।

—শুনবেন কী করে? আজকাল তো ঘরের বাইরে আসেনই না। দুনিয়ায় কত কিছু হয়ে যাচ্ছে। বুড়ো হয়ে গেলেন নাকি?

সাজগোজ যাই করুক কাঞ্চনের বয়স পঁয়তাল্লিশ পেরিয়েছে। হিলকার্ট রোডে একটা প্রকাণ্ড কাপড়ের দোকান দিয়েছে সম্প্রতি। আর আছে মদের দোকান, মোটর পার্টসের বিশাল প্রতিষ্ঠান। এক সময়ে ওর মোটর পার্টসের কারবারে কিছু টাকা লগ্নী করেছিলেন

দিগিন। কিন্তু সংসারের চাপে, দুঃসময়ে টাকাটা তুলে নিতে হয়েছিল। রাখতে পারলে আজ ভাল আয় হত।

দিগিন বলেন—বের হয়ে হবে কী? কাজ কারবার কিছু নেই।

—কাজ নিই কে বলে? অনেক কাজ পড়ে আছে। আসেন না একদিন গরীবের বাড়িতে। ডিস্‌কাস্‌ করা যাবে।

দিগিন লক্ষ্য করেন, কাঞ্চনের জুলপীর চুলে কলপ দেওয়া। কয়েকটা সাদা দেখা যেত আগে, এখন নেই। দিগিন বলেন—আসব'খন। শানুটার জন্য বড় চিন্তা হয়। সোপস্টোনের পিছনে বহুত গচ্চা দিয়েছে।

কাঞ্চন হাসে, বলে—শানুর মাথায় পোকা। সোপস্টোনের কারবার কিছু প্রফিটেবল হলে শিলিগুড়ির মার্চেন্ট আর ঠিকাদাররা বসে আছে কেন? আমি তো আগেই জানি, টাকা জলে যাচ্ছে। দেখা হলে আমি তো বলি শানুকে, শানু রেগে যায়।

ঝকঝকে সবুজ ভোকসওয়াগনটার দিকে চেয়ে দিগিন বলেন—বেশ আছিস কাঞ্চন।

—হাঁ দাদা, ভাল আছি। তবে ভাল আর থাকা যাবে না।

—ও কথা সবাই বলে।

—জোর কম্পিটিশন। এখন সকলের হাতে টাকা, বাজার স্যাচুরেটেড।

গিমিক। দিগিন জানেন। গত সাতাশ বছরে শিলিগুড়ির বাতাসে টাকা কম ওড়ে নি। তাঁর চোখের সামনেই শিলিগুড়ি উত্তর বাংলার সবচেয়ে বড় ব্যবসাকেন্দ্র হয়ে উঠল, কিন্তু তাঁদের পরিবার পুরনো ঠিকাদারীর ব্যবসা ছাড়া আর কিছু ধরতে পারল না। বড়দা অবশ্য ব্যবসাতে নেই, ওকালতী করে তার একরকম চলে যায়। মেজ জন পুরনো বাজারে একটা স্টেশনারী দোকান দিয়ে বসে আছে বহুকাল। তেমন কিছু লাভ হয় না। শানু আর দু'জন ভাইপোকে নিজের ঠিকাদারীতে নামাতে পেরেছেন দিগিন। ওরা যত লোভী তত চালাক নয়। রাতারাতি বড়লোক হওয়ার আশায় ওরা বিচিত্র সব কারবারে নাক গলাতে যায়। চোট হয়ে অবশ্য ফিরে আসে। দিগিনের অবশ্য এখন আর তাতে কিছু যায় আসে না। আটান্ন বছর বয়স, কিছু থোক টাকা আছে—চলে

যাবে। কিন্তু ভাইপোদের জন্য একরকম দুশ্চিন্তা রয়েই গেল। কাঞ্চনকে তাই একটু ভাল করে দেখে নেন দিগিন। ছোকরা বেশ দাঁড়িয়েছে।

দিগিন বলেন—শানুটাকে ব্যবসাতে নামিয়ে নিবি কাঞ্চন?

কাঞ্চন জর্দা-পানের পিক ফেলে বলে—শানু নামবে না।

দিগিন সেটা জানেন। একটু শ্বাস ফেলে মোটরসাইকেলের স্টার্টারে একটা লাথি মেরে বলেন—তোর সঙ্গে একদিন বসব।

—আচ্ছা।

কাঞ্চন তার ভোকসওয়াগনে উঠল। দিগিন হিলকার্ট রোড ধরে ব্যাঙ্কে এলেন।

সোমবার। বড্ড ভিড়। চেকটা জমা দিয়ে এজেণ্টের ঘরে ঢুকে গেলেন। এজেন্ট ভটচায বুড়ো হয়ে এসেছেন। মাস দুয়ের মধ্যেই রিটায়ার করে চলে যাবেন। ভটচাযের বুড়োটে ভাবটা অবশ্য বয়সের জন্য নয়। দিগিনেরও ঐরকমই বয়স। ভটচায বুড়িয়ে গেছেন পেটের অসুখে আর হাঁপানীতে। শিলিগুড়ির ওয়েদারকে গালাগাল দেওয়া হচ্ছে তাঁর সবচেয়ে প্রিয় বিষয়।

—কী খবর দিগিনবাবু?

কাঞ্চনের সাফল্যের ছবিটা চোখের সামনে জ্বলছে, দিগিন তাই বিষণ্ণ গলায় বলেন—এই তো।

ভটচায দিগিনের অন্যমনস্কতা লক্ষ্য করলেন। কিন্তু বেশী কথার মধ্যে গেলেন না। তিনজন লোক ঘরে বসে আছে, কর্মচারীরা ব্যস্ত হয়ে আসছে কাগজপত্র সই করাতে। ব্যস্ত ভটচায বললেন—এবার পুজোয় চলে যাচ্ছি, বুঝলেন?

—হুঁ।

—আপনাদের শিলিগুড়ি ছাড়ছি শেষ পর্যন্ত।

বলে ভটচায ব্যস্ত রইলেন কিছুক্ষণ। মিনিট কুড়ি পর একটু ফাঁক পেলেন। সিগারেটের প্যাকেটটা বাড়িয়ে দিয়ে বললেন—একটা খান। চুরুট খেয়ে বুক তো পুড়িয়ে ফেলেছেন।

দিগিন মাথা নাড়লেন। নিজের সরু মাদ্রাজী চুরুট ছাড়া অন্য কিছু তেমন ভাল লাগে না। ফসফসে ধোঁয়ায় ভারী বিরক্তি আসে।

ভটচায বলেন—নেশাটেশা করেন বটে, কিন্তু চেহারাটা এখনো কিন্তু ঠিক রেখেছেন। এখানকার জল-হাওয়ায় কী করে ফিট্ থাকেন মশাই।

—ফিট্ থাকি নেশা করি বলেই।

—সব নেশাখোরই ও কথা বলে।

—মাইরি। মদ শরীরের সব জীবাণু নষ্ট করে দেয়।

—কিন্তু মদটা তো থাকে পেটে।

—হ্যাঁ। লিভারের বারোটা বাজায় আস্তে আস্তে। তবে মদ খেলে মদের এফেক্ট ছাড়া অন্য কোনো রোগ বড় একটা হয় না।

ভটচায একটু আগ্রহ দেখিয়ে বলেন—সত্যি?

দিগিন চুরুটা আরামে টেনে হেসে বলেন—কোনো মাতালের ছোট খাটো অসুখ দেখেছেন কখনো? জেনুইন মাতালের ওসব হয় না। মদ খুব বড় জীবাণুনাশক।

—দূর।

—মদে ভিজিয়ে রাখলে কোনো জিনিস সহজে নষ্ট হয় না জানেন? তাই ওষুধে অ্যালকোহল থাকে প্রিজারভার হিসেবে।

ভটচায চিন্তিত মুখে বলেন—তা বটে।

—তবেই দেখুন। স্টমাকটাকে মদে ডুবিয়ে রাখলে তার প্রিজারভেশনের ক্ষমতা বাড়ে কিনা।

—আফিং খেলে পেটের রোগ সারে শুনেছি।

—তাও খেতে পারেন। তবে ও হচ্ছে ঝিমুনী নেশা।

—না না, নেশার জন্য নয়। ওষুধ হিসেবে।

দিগিন মৃদু হেসে বলে—অ্যালকোহল আরো ভাল। আজ রাতে আসুন আমার ওখানে, একটা মজার জিনিস খাওয়াবো। দেশী জিনিস, সঙ্গে একটা পাতার রস মিশিয়ে দেবো। দেখবেন, কাল সকালে কেমন ফাইন হাগা হয়।

দিগিনকে সঠিক বিশ্বাস করতে পারেন না ভটচায। সন্দেহের চোখে চেয়ে থাকেন। বলেন—আমাকে গিনিপিগ বানিয়ে কোনো এক্সপেরিমেণ্ট করবেন না তো?

—গিনিপিগ। বলে হা হা করে হাসেন দিগিন। মাথা নেড়ে বলেন—আরে না না।

ঘরে আবার লোকজন ঢুকে পড়ে। ভটচায ব্যস্ত হয়ে পড়েন। দিগিন আপন মনে হাত দুখানা টিপে-টুপে পরীক্ষা করে দেখেন। হাওয়াই শার্টের হাতা গুটিয়ে বাইসেপটা টেপেন একটু। না, আটান্নতেও তার মাংসপেশী বেশ শক্ত আছে। ঝুলে যায় নি। বুড়ো বয়সটা একটা ধারণা মাত্র। অত্যাচার এই বয়সেও তিনি কিছু কম করেন না। তবু শরীরটা টান-টান, হাঁটা-চলা-পরিশ্রম কোনো যুবকের চেয়ে কিছু কম পারেন না।

ভটচায এবার একটু ফাঁক পেয়ে বলেন—শেষ পর্যন্ত আমাকে বুড়ো বয়সে নেশাভাঙ্ ধরাবেন না তো মশাই।

দিগিন ভটচাযের সন্দেহকুটিল মুখখানা একটুক্ষণ দেখে নিয়ে বলেন—জীবনের একটা দিক একেবারে না জানা থাকা কি ভাল? নেশার চোখে দুনিয়াটা কেমন দেখায় তা দেখে রাখা ভাল। নইলে যখন ওপরে যাবেন, যখন যম জিজ্ঞেস করবে, বাপু হে, দুনিয়াটায় কি কি রকম সব অভিজ্ঞতা হল—তখন তো ব্যাংকিং ছাড়া আর কিছু বলার থাকবে না।

ভটচায মুখখানা স্মিতহাসিতে ভরিয়ে তুলে বলেন বয়সকালে রোজগারপাতির সময়টায় নেশাভাঙের পয়সা একরকম জোটানো যায়। আমার তো তা নয়। এই তো পারমানেণ্টলি বসে যাচ্ছি, রিটায়ারের পর নেশার পয়সা যোগাবে কে?

—ভূতে, নেশারু লোকের ও ঠিক জুটে যায়।

—না মশাই, আমার ওসব দরকার নেই।

—আচ্ছা, না হয় নেশা নাই করলেন, একদিন একটু চাখলেই কি আর নেশা হয়ে যায়? নেশা করারও একটা প্রসেস আছে। চলে আসবেন আজকে, অন্তত একদিনের জন্য আপনার পেটের গোলমাল মেরামত করে দেবো। ঐ সঙ্গে রাতের খাওয়াটাও সেরে যাবেন, নেমন্তন্ন রইল।

বলে দিগিন ওঠেন।

—আচ্ছা যাবো, ভটচায হাসলেন।

ক্যাশ থেকে টাকা নিয়ে দিগিন আবার মোটরসাইকেলে ওঠেন।

আজকাল আর তার একাউণ্টে টাকা বড় একটা জমা পড়ে না। বরং প্রতিমাসেই চার-পাঁচটা উইথড্রয়াল হয় কমপক্ষে, তাঁর নিজস্ব সংসার নয়, দাদারাও রোজগেরে, তবু কি কারণে যেন সংসারের খরচের সিংহ ভাগ তাঁকেই দিয়ে আসতে হচ্ছে বরাবর।

মোটরসাইকেলটা নিয়ে ইতস্তত একটু ঘুরে বেড়ান তিনি, এম-ই-এস-এর একটা কনস্ট্রাকশন চলছে বাগডোগরায়, ভাবলেন, সাইটটা দেখে আসবেন। কিন্তু মহানন্দা ব্রীজ পেরিয়েই তাঁর দীর্ঘ রাস্তাটা ভেবে ক্লান্তি লাগল। থাকগে, ঠিকাদারীটা যখন শানুই দেখছে তখন আর তাঁর মাথা ঘামানোর কী আছে। সারাটা জীবন তো এই কর্মই করলেন।

বাইকটা ঘুরিয়ে নিলেন, শিলিগুড়ি যদিও তাঁর হাতের তেলোটার মতোই চেনা, তবু মাঝে তিনি কোথাও যাওয়ার জায়গা খুঁজে পান না। ভালও লাগে না। তাই খানিকক্ষণ এলোমেলো বাইকটা চালান দিগিন, শিলিগুড়ির শতকরা পঁচাত্তর ভাগ লোকই তাঁর চেনা। বাইক থামিয়ে দু-চারজনের সঙ্গে কথা বলেন, কয়েকটা চেনা জায়গায় উঁকি দিয়ে ফেরেন, কয়েকটা দোকান থেকে টুকটাক কেনাকাটা করে নিলেন। তবু সময় ফুরোলো না। বেলা এগারোটাই পেরোতে চায় না সহজে। শরৎকালটা তাঁর সবচেয়ে প্রিয় ঋতু। সেবক রোড ধরে একটু এগোলে মহানন্দার অববাহিকায় উপত্যকার মতো বিশাল নিচু মাঠ আর বালিয়াড়ি দেখা যায়। বাইক থামিয়ে চেয়ে রইলেন সেই দিকে। মুঠোভর একটা মেঘ সকাল থেকে চেষ্টা করে করে এতক্ষণে কাঞ্চনজঙ্ঘাকে ঢেকে ফেলেছে। উজ্জ্বল রোদে তিনধারিয়ার বিন্দু বিন্দু বাড়িঘর নজরে আসে।

বহুকাল শালুগাড়ার বাকসিদ্ধাইয়ের কাছে যাওয়া হয় না। রেডিও স্টেশন পেরিয়ে খানিকদূর এগিয়ে বড় রাস্তা ছেড়ে ঢালুতে নামিয়ে বাইকটা রাখেন দিগিন। তারপর সরু পথ ধরে বাঁ ধারে নেমে যান। বড় রাস্তায় এক আধটা মিলিটারী জীপ দাঁড়িয়ে আছে। তার মানে বাকসিদ্ধাইয়ের কাছে মিলিটারীর লোক এসেছে। ভিড় অবশ্য সারাদিনই থাকে।

আধমাইলটাক হেঁটে গাছপালায় আচ্ছন্ন শান্ত জায়গায় পেঁছে

যান তিনি! অনেককাল আসা হয় নি। অবাক হয়ে দেখেন, এদের বাড়ি-ঘরের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। সচ্ছলতার চিহ্নগুলি দেখলেই বোঝা যায়। কেবলমাত্র লোকের ভবিষ্যৎ বলে দিয়ে উইদাউট ক্যাপিট্যালে বেশ দাঁড়িয়েছে এরা।

বাইরে খোলা একটা ঘর। আনাড়ি মিস্ত্রীর তৈরি দুচারখানা বেঞ্চি পাতা। মিলিটারী, মেয়েছেলে, বুড়ো, বাচ্চা, জনা পঁচিশ লোক বসে আছে। অল্পবয়সী বাকসিদ্ধাই মেয়েটি হাতে সেই পুরনো একটা শিবলিঙ্গের মতো পাথরের দিকে চেয়ে কথা বলছে। দিগিনের কানে এরকম একটু সংলাপ ভেসে আসে—

মহিলাকণ্ঠ—সে কেমন দেখতে?

বাকসিদ্ধাই—রোগা, ফর্সা, চোখে চশমা।

মহিলাকণ্ঠ—আমার ছেলের সঙ্গে মানায়?

বাকসিদ্ধাই—মানায়।

—জাত?

—স্বঘর।

মহিলাকণ্ঠ স্বনিশ্বাসে বলে, বিয়েটা হবে?

—হবে।

দিগিন ঘরটায় না ঢুকে এগিয়ে যান। উত্তর দিকে বাঁশঝাড়ে আচ্ছন্ন ছায়ায় ঢাকা পথে কতকগুলো বাচ্চা ছেলে খেলছে। উত্তর-প্রান্তে ক্ষেত। উদাস মাঠ, তার ওপাশে কালো মেঘের মতো হিমালয় ঘনিয়ে উঠেছে উত্তরের আকাশে। গত সাতাশ বছর ধরে দেখছেন দিগিন। দাঁড়িয়ে একটা মাদ্রাজী চুরুট শেষ করেন তিনি।

আবার যখন এসে খোলা ঘরখানায় উঁকি দিলেন তখন ভিড় অনেক পাতলা হয়েছে। অবাঙালী কাঠখোট্টা এক মিলিটারী সওয়াল জবাব করছে। তার ঘর থেকে চিঠি এসেছে, ছেলের অসুখ। সিদ্ধাই মাথা নেড়ে জানায়, সেরে যাবে। চিনিপড়া নিয়ে যায় যেন।

পিছনের একটা বেঞ্চে একা বসে দিগিন চুরুট টানেন। সিদ্ধাই তাঁকে চেনে। একবার মুখ তুলে দেখে হাসল।

ভিড় পাতলা হলে সিদ্ধাই মুখ তুলে বলে—ভাল তো?

দিগিন মাথা নেড়ে জানালেন—না।

—কী হয়েছে?

—আমার ভাইপো—বলতে গিয়ে ক্লান্তি বোধ করে থেমে যান দিগিন। এসব প্রশ্নের কোনো মানে নেই। সোপস্টোন চুলোয় যাক, পুন্নির বিয়ে নিয়েও প্রশ্ন করার প্রবৃত্তি হয় না তাঁর।

চুরুটটা মুখ থেকে নামিয়ে দিগিন চোখ বুজে বলেন—মা, আমার মরণ কবে?

সিদ্ধাই হাতের পাথরটার দিকে ভ্রূ কুঁচকে চেয়ে থাকে অনেকক্ষণ। তারপর বলে—সে দেরি আছে।

—কত দেরি?

—অনেক দেরি, তবে একটা ডাঙর মেয়েছেলে ক্ষতি করবে।

—ডাঙর মেয়েছেলে? সে কে?

—ফর্সা, লম্বা মেয়েছেলে একজন, পাহাড়ী মেয়েছেলে।

দিগিন হাসেন, ময়নার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের কথা কে না জানে। ময়না এক সময়ে বিখ্যাত ছিল। সবাই তার চেহারাটা জানে। দিগিন একটু শ্বাস ফেলে বলেন—কীরকম ক্ষতি?

—পয়সাকড়ি আর নাম-যশের ক্ষতি।

—বিষ-টিষ খাওয়াবে না তো?

সিদ্ধাই ইতস্তত করে বলেন—সাবধানে থাকবেন; তবে আপনার এখনো অনেক আয়ু আছে।

দিগিনের ক্লান্তি লাগে। একটা পাঁচটাকার নোট এগিয়ে দেন। সিদ্ধাইয়ের বুড়ো বাপ বসে আছে পিছনে, টাকাটা সে নেয়। বলে—আর কিছু জানবেন না?

—না। আটান্ন বছর বয়সে আর কী জানবার আছে, আমার তো কোনো ভবিষ্যৎ নেই!

বুড়ে মাথা নাড়ে।

সিদ্ধাই মেয়েটি তার কমনীয় মুখশ্রী তুলে বলে—শরীরে একরকম জ্বালা রোগ হবে। জল পড়ে দেবো, নিয়ে যাবেন।

দিগিন অন্যমনস্কভাবে মাথা নাড়েন। জ্বালা রোগ হওয়ার বাধা কি? যত অ্যালকোহল রক্তে জমা হয়েছে তাতে অনেক কিছু হতে পারে।

দুপুরে খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। পুন্নি এসে যখন ডেকে তুলল তখন সাড়ে তিনটে। চারটের আগে তিনি ওঠেন না বড় একটা, ঘড়িটা দেখে বিরক্ত হলেন। বললেন—কী রে?

—ওঠো, তোমার চা হয়ে গেছে।

—চা, তার এত তাড়া কী?

—বাঃ, আজ কে সব আসবে বিকেলে। বেলা পর্যন্ত ঘুমোলে চলবে কী করে।

দিগিন হাসলেন। ত্রিশ টাকা কিলোর চায়ের গন্ধে ঘর ম ম করে! বলেন—যার আসবার আসবে। তোর অত মাথাব্যথার কী? আমি তো দক্‌লীকে বলে রেখেছি, সে রাজীও হয়েছে।

পুন্নি বলে—ঠিক আছে।

কিন্তু পুন্নির মুখে রাগ।

দিগিন কিছু বলেন না, পুন্নিই গজগজ করে-·রোজ সং সেজে অচেনা মানুষের সামনে গিয়ে বসা কার ভাল লাগে।

—তোকে বসতে কেউ বলেছে?

—না বসলে তোমাদের প্রেস্টিজ থাকবে নাকি?

—ও। তা সেই কথা ভেবেই বুঝি হুড়োহুড়ি লাগিয়ে দিয়েছিস?

—হুড়োহুড়ি আবার কী! পুন্নি ভ্রূ কুঁচকে বিরক্তির সঙ্গে বলে—চা-টা খেয়ে নাও, ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

পুন্নি চলে গেলে উত্তরমুখো ইজিচেয়ারটায় আবার বসেন দিগিন। টুলের ওপর পা তুলে দেন। হিমালয় সারাদিন লুকোচুরি খেলে এই শরৎকালে। বরফে ঢাকা দূরের পাহাড়গুলি ঢেকে গেছে কুয়াশার মতো ভাপে। দেখা যায় শুধু নীল পাহাড়ের সারি। দিগিন দেখেন, দেখতে কখনো ক্লান্তি লাগে না। অবসরপ্রাপ্তের মতো বসে থেকে সময় বইয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন তিনি। কিন্তু সময় ঠিক হিমালয়ের মতো পাথর হয়ে জমে আছে। এভাবে কর্মহীন এবং অবসরপ্রাপ্ত হওয়ার কথা তাঁর নয়। বয়স মাত্র আটান্ন, শরীরটাও যথেষ্ট মজবুত; তবু মনে মনে এক্করকম কর্মত্যাগ এবং বৈরাগ্য এসে গেছে।

শিলিগুড়িতে যখন তিনি প্রথম এসেছিলেন তখন এটা ছিল

গঞ্জ মতো জায়গা। বাগরাকোটে কয়লাখনির সন্ধান, সিকিমের কমলালেবুর চালান, কাঠের ব্যবসা, চা-বাগানের মালিকানা কোনো চেষ্টাই তাঁর কম ছিল না। অবশেষে বংশগত পাগলামীর খেয়াল-বশে একবার মধ্যপ্রদেশও চলে যান হীরের সন্ধান পেয়ে। সে ভীষণ কষ্ট গেছে। তাঁবুতে থাকতেন, খাদ্যাখাদ্যের বিচার ছিল না, হাতখানেক দাড়ি-গোঁফ গজিয়ে গেল, তবু হীরের নেশায় পাগল ছিলেন কিছুকাল। হীরে পান নি তা নয়। ছোট ছোট কমদামী কয়েকটা পেয়েছিলেন, তাতে খরচটা কোনোক্রমে উঠেছিল হয়তো। কিন্তু সবচেয়ে ক্ষতি হয়ে গেল শরীরের। জন্ডিস ধরল, মাস ছয়েক সেই রোগে শয্যাশায়ী রইলেন প্রায়। লিভারটা সেই থেকে খারাপ হয়ে গেল। ডাক্তাররা তাঁর নেশাভাঙ একদম বারণ করে দিলেন। কিছুকাল সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়েওছিলেন। কিন্তু তারপর একদিন মনে হল—একা মানুষ, শরীর বাঁচিয়ে রেখে কী হবে! বয়সের সঙ্গে সঙ্গে গভীর একাকীত্ব একটা কালো কম্বলের মতো যেন চেপে ধরে। লিভারটা জখম আছে আজও—তবু দিগিন কিছু মানেন না।

ঘুম স্টেশনের স্টেশনমাস্টার ছিলেন হরেন বোস। সে লোকটা বড় ভালবাসতেন দিগিনকে। প্রায়ই বলতেন—বিয়ে না করে এক-রকম ভালই আছ হে দিগিন, কিন্তু চল্লিশের পর ভুগবে। সাহেবরা চল্লিশ পর্যন্ত একা থাকে, ফুর্তি লোটে, ফুর্তির অভাবও ওদেশে নেই, কিন্তু চল্লিশের পর ঠিক টুক করে বিয়েটি করে ফেলে। কারণ মানুষ ঐ বয়স থেকেই লোনলি হতে শুরু করে।

অক্টোবর বা নভেম্বরের শীতে ঘুম একটা সৃষ্টিছাড়া জায়গা। দিগিন কার্যব্যাপদেশে পাহাড় লাইনে গিয়ে ঘুমে একটা দুটো দিন কাটাতেন। চারধারে জন-মনিষ্যি নেই, পাতলা বরফের আস্তরণ পড়ত কোনো কোনো বছর শীতকালে। ওয়েটিংরুমে আগুন জেবলে বোতল নিয়ে বসতেন দুজনে। কথা হত।

হরেন বোস একদিন তাঁর শালীর সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব দেন। মুশকিল হল হরেন বোসের বৌ ছিল নেপালী। যখন প্রথম ব্যাচেলার হরেন বোস ঘুমে আসেন তখন বয়স-টয়স কম। নেপালী ঝি ঘরের কাজকর্ম করত। দীর্ঘ শীতকালে, একাকীত্বে যখন মানুষকে কর্মনাশা ভূতে পায়, তেমনি একটা দুর্বল সময়ে তিনি

সেই মেয়েটিকে উপভোগ করেন। মেয়েটা অরাজী ছিল না। কিন্তু তারপর তার বাড়ির লোকজন এসে হরেনকে ধরে, বিয়ে করতে হবে। করতে হল। গোটা দুই ছেলেমেয়েও হল তাদের। সেই বৌয়ের একটা বোন ছিল। মনাস্টারীতে যাওয়ার রাস্তাটা হিলকার্ট রোডের যে জায়গা থেকে শুরু হয়েছে সেই মোড়ে একটা খুপরীতে পারিবারিক সব্জীর দোকানে বসত মেয়েটি। পনেরো-ষোলোর বেশী বয়স নয়—দীনদরিদ্র পোশাক পরে দু'গালে রক্তিমাভা আর সুন্দর মুখশ্রী নিয়ে বসে থাকত। সামনে সবুজ স্কোয়াস, বাঁধা-কপি, বীন, শুঁটি, ফুলকপি সাজানো। তার মাঝখানে তাকে বেশ দেখাত। সেই দোকানের সামনে ছোকরা নেপালী কয়েকজন গ্যাঁদা ফুল পায়ের আঘাতে শূন্যে তুলে তুলে চুঙ্গি খেলত খুব। মেয়েটি সব বুঝে হাসত। হরেন বোস প্রস্তাব দিয়ে বলেন—আত্মীয় যখন হয়ে গেছে তখন ফেলতে পারি না। ওদের সম্প্রদায়ে উপযুক্ত ছেলে বড় কম, বিয়ে যদি করেও তো রোজগার করাবে। বিয়ে না দিলে নষ্ট হয়ে যাবে। পয়সার লালচ তো বড় কম নয়। দোকানে বসে থাকে বলে লোকে নীচু নজরে দেখে, কু-প্রস্তাব দেয়, পয়সা দেখায়। তোমারও উদ্যোগ করে বিয়ে দেওয়ার কেউ নেই। মেয়েটা কাঁচ আছে, শিখিয়ে পড়িয়ে নিতে পারবে।

দিগিন রাজী হলেন।

সেই মেয়েটিই ময়না।

দিগিন সেবার পুজোর পর এক ভোররাতে টাইগার হিলে গেলেন সূর্যোদয় দেখতে। বহুবার দেখেছেন, তবু গেলেন। সঙ্গে ময়না ছিল। টাইগার হিলে ওঠবার একটা খাড়া এবং শর্টকাট রাস্তা আছে। সেটা দিগিন চিনতেন না, ময়না চিনত। সেই রাস্তা ধরে উঠতে দিগিনের হাঁপ ধরে যায়। মাঝে মাঝে বসেন, ময়নার সঙ্গে কথা বলেন, মাতৃভাষার মতো নেপালী ভাষা বলতে পারেন দিগিন, ময়না জানে ভাল বাংলা কথা। কথাবার্তার কোনো অসুবিধে হয় নি। আকাশে তখন ময়ূরকণ্ঠী রং ধরেছে। পাল্টে যাচ্ছে রং। শেষরাতে সূর্য ওঠার অনেক আগেই আকাশের ঐ বর্ণালী দেখা যায়। কিন্তু সে সৌন্দর্য বড় একটা খেয়াল না করে দিগিন বলেন—থাকতে পারবে তো আমার সঙ্গে?

দিগিনের বয়স তখন বত্রিশ, ময়নার মেরে-কেটে ষোলো, রাজী হওয়ার কথা নয়। কিন্তু ঘুমের শীতের দেশে নিরন্তর দারিদ্র্য আর স্থবিরতা ভেঙে বেরিয়ে আসার প্রবল ইচ্ছে তখন মেয়েটির। সে বলল—যদি আমাকে কলকাতা শহর দেখাবে বলো, তাহলে থাকব।

—থাকা মানে কী জানো তো?

মেয়েটি চেয়ে থাকল।

দিগিন অবশ্য ব্যাখ্যা করলেন না। তিনি জানতেন, বিয়ে করার কোনো পদ্ধতি না মানলে ক্ষতি নেই। যে-কোনো রকম একটু অনুষ্ঠান করলেই চলবে। এবং সেটাই নিরাপদ। তাঁর সন্দেহ ছিল, এই নিতান্ত অশিক্ষিত অভিজ্ঞতাহীন মেয়েটির সঙ্গে তাঁদের বংশগত যেটুকু আভিজাত্য আছে তা শেষ পর্যন্ত মিলবে কিনা। দিগিনের একটা সুবিধে, তিনিও লেখাপড়া বিশেষ করেন নি। ক্লাস এইট পর্যন্ত উঠে বাড়ি থেকে পালিয়েছিলেন। পড়াশুনো সেইখানেই শেষ হয়। অতঃপর ব্যাপক জীবনযাপন থেকেই তিনি তাঁর স্বাভাবিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি ভেবে দেখেছিলেন, মেয়েটির কাছ থেকে একমাত্র শরীর আর কিছু সেবা তিনি পেতে পারেন। তার বেশী কিছু দেওয়ার সাধ্য মেয়েটির নেই।

দিগিন টাইগার হিলে ওঠার মাঝপথে মেয়েটিকে সেই গভীর শীতার্ত পরিবেশে একটি চুমু খান। বলেন—তোমাকে কলকাতা দেখাবো।

সেই যে টাইগার হিল থেকে সূর্যোদয় দেখতে গেলেন, সেখান থেকে আর ঘুমে ফিরে এলেন না দিগিন। এক ছোকরার জীপে ফিরলেন দার্জিলিং। সেখান থেকে আবার জীপ ভাড়া করে ময়নাকে নিয়ে টানা নেমে এলেন শিলিগুড়িতে। বত্রিশ বছর বয়সে বিয়ের ঝামেলায় যেতে তাঁর ভরসা হল না। ময়নার বয়স তখন নিতান্ত কম। তাকে যা-তা বুঝিয়েছিলেন। ময়না তখন ঘুম ছাড়ার জন্য ব্যগ্র। তা ছাড়া সে জানত যে এই লোকটাই তার হবু স্বামী, তাই আপত্তি করে নি।

টংগী ঘরটায় ময়নাকে নিয়ে থাকার বিপদ ছিল। আস্তানাটা সবাই চেনে, হরেন বোস মেয়েটির আত্মীয়স্বজন সেখানে যে-কোন সময়ে

হাজির হতে পারে। পুলিশ লেলিয়ে দিতে পারে। তবু দিগিন ময়নাকে নিয়ে উঠলেন সেখানেই।

তিনদিন পর হরেন বোস হাজির হলেন এসে।

—কী খবর ভায়া?

—ভালই।

—ময়না?

—আছে।

হরেন বোস মাথা নেড়ে বললেন—জানতাম। বলে একটু শ্বাস ছাড়লেন।

ময়নাকে অবশ্য তখন চেনার-উপায় নেই। নেপালী পোশাক ছেড়ে সে তখন চমৎকার সব ছাপা শাড়ি পরে। সাবান দিয়ে স্নানের পর গা ঝকঝকে পরিষ্কার। সিঁথেয় সিঁদুর, একবেণীতে বাঁধা চুল, খুশীতে ফেটে পড়ছে। হরেন বোস দেখে খুশী হলেন। বললেন—ভয় নেই, ওর পরিবার থেকে ঝামেলা হবে না, তবে কাজটা পাকা করলেই পারতে।

দিগিন বত্রিশ বছরে মাথা তখন কম পাকান নি। বলেন—তা হয় না। আপনার মতো বাঁধা পড়ে যেতে আমি রাজী নই।

—কিন্তু বদনাম? সিকিউরিটি?

—ওসব ছাড়ুন! ওর পরিবারকে আমি হাজার টাকা দিচ্ছি কন্যাপক্ষ হিসেবে।

—ময়না এরকম সম্পর্ক মানবে?

—মানবে আবার কি। মেনে তো নিয়েছে।

—না, মানে নি। বয়স কম বলে বুঝতে পারছে না যে তুমি ওকে রেখেছ মাত্র, বিয়ে করো নি। বয়স হলে বুঝবে।

—ও একরকম বিয়েই, কালীবাড়িতে নিয়ে গিয়ে মায়ের পায়ের সিঁদুর ছুঁইয়ে দিয়েছি।

বিচক্ষণ হরেন বোস গম্ভীরভাবে বললেন—ঠিক আছে। বিয়ে তো আসলে পরস্পরকে স্বামী বা স্ত্রী বলে স্বীকার করা। ও হলেই হল। টাকাটা দিয়ে এসো।

—দিয়ে দিচ্ছি।

বলে দিগিন নগদ হাজার টাকা দিয়ে দিয়েছিলেন।

হরেন বোস মুখটা গম্ভীর করে রাখলেও মনে মনে খুশিই হয়েছিলেন দিগিনের বিচক্ষণতায়, অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে দিগিনের সিকিমী 'রাম'-এর বোতল খালি করলেন। 'বললেন—তাহলে টাইগার হিল থেকেই তোমার অধঃপতন শুরু হল ?

দিগিন হাসলেন, উত্তর দিলেন না।

হরেন বোস বললেন—হঠাৎ এরকম ধারা করতে গেলে কেন ?

দিগিন একটু ভেবে বলেন—আসলে কী জানেন দাদা, যখন টাইগার হিলে উঠছিলাম তখনো ঠিক করি নি যে, মেয়েটাকে নিয়ে পালাবো। ভেবেছিলাম আমার বাউণ্ডুলে জীবন, দায়দায়িত্ব নেই, মেয়েটাকে পাকাপাকি বিয়েই করে ফেলি। কিন্তু টাইগার হিলেই গোলমালটা হয়ে গেল, একদম শেষ চড়াইটা বেয়ে যখন পাহাড়ের ছাদে চড়েছি, তখন দেখি সামনে অন্ধকারের এক মহাসমুদ্র। নিচে গভীর উপত্যকায় যেন কত হাজার বছরের অন্ধকার জমেছে। বাঁদিকে উত্তরে ব্রোঞ্জের মতো কাঞ্চনজঙ্ঘার আবছা চেহারা, পাশে পাশে সব ব্রোঞ্জের পাহাড়। এ তো কতবার দেখেছি, নতুন কিছু নয়। সূর্য উঠবার আগেই প্রথম সূর্যের আলো এভারেস্টের ডগা ছুঁতেই যেন আগুন জ্বলে গেল বরফে, আশেপাশে আবছায়ায় বিস্তর লোক দাঁড়িয়ে দেখছে। ঐ রকম খোলা জায়গায়, ঐ অন্ধকারের গভীর বিশাল অন্ধকারের সমুদ্র আর পাহাড়-টাহাড় দেখে মনে হল, জগতে বাঁধা পড়ার মতো বোকামী আর নেই। যার একটা শেকড় গজায় সে বাকী দুনিয়া থেকে উৎখাত হয়ে যায়। টাইগার হিলে সানরাইজ দেখতে দেখতেই ঠিক করলাম যে হাওয়া বাতাসের মতো একটা সম্পর্ক থাকাই ভাল।

হরেন বোস মাথা নেড়ে বললেন—বুঝেছি। তারপর অনেকক্ষণ চুপচাপ নেশা করে বললেন—আমি তোমার চেয়ে অনেক বোকা।

দিগিন উত্তর দিলেন না।

হরেন বোস ময়নার ভেজে আনা ফুলুরীতে কামড় বসিয়ে বললেন—তুমি সুখী হবে।

ময়না ঘরে আসতে জিজ্ঞেস করলেন—কেমন লাগছে রে ? রামরও ?

ময়না লজ্জার হাসি হাসে। মাথা নামায়।

হরেন বোস সস্নেহে একটু চেয়ে থেকে বলেন—মেয়েটা ভাল, দেখো দিগিন।

—চিন্তা করবেন না, সব ঠিক আছে।

কিন্তু তবু সব ঠিক থাকে নি।

বছর দুই বাদে সমস্যা দেখা দিতে থাকে। বুদ্ধিমান দিগিন তার বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক রাখতেন না। তবে দু'চারখানা চিঠিপত্র বছরে দিতে হত, দায়ে দফায় টাকা-পয়সা পাঠিয়েছেন, কিন্তু ময়নার খবর তিনি কখনো দেন নি। তখন প্রাচীনপন্থী মা বাপ বেঁচে, পুরনো প্রথাও মরে যায় নি পরিবারে। ভেবেছিলেন ব্যাপারটা চেপে রাখতে পারবেন।

কিন্তু দেশভাগের পর পরই চিঠি এল, বাড়ির সবাই চলে আসছে। তাদের থাকার বন্দোবস্ত যেন করা হয়। দিগিন মুশকিলে পড়লেন। ময়না খুব বোকা ছিল না, দু বছরে তার বয়স আর অভিজ্ঞতাও বেড়েছে। দিগিনের সঙ্গে তার সম্পর্কটাও ছিল অদ্ভুত। দিগিন ময়নাকে বিয়ে করা বৌ বলে কখনো মনে করেন নি। তাই মনে মনে নিজেকে ব্যাচেলার ভেবে যেমন খুশী নিজস্ব জীবন যাপন করতেন। পাহাড়ে ডুয়ার্সের জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতেন ব্যবসার ধান্দায়। ঘরে একটা মেয়েছেলে আছে—সে ঝি বা রক্ষিতা, এর বেশী কিছু ভাবতেন না, ময়না সেটা বুঝতে পারত। উপায় নেই বলে মেনে নিত দিগিনকে। ঝগড়াঝাটি কিছু করত না তা নয়, তবে করেও লাভ ছিল না।

বাড়ির লোক আসছে, বহুকাল বাদে তাদের সঙ্গে দেখা হবে। মা-বাপ তখনো বেঁচে আছেন। দিগিন তাই গুরুং বস্তিতে ময়নার জন্য ভাল ঘর ভাড়া করলেন। খুব বেশী বোঝাতে হল না ময়নাকে। দু'এক কথাতে সে রাজী হয়ে গেল। ময়নাকে গুরুংদের বস্তিতে পাঠিয়ে ঘরদোর সাফ করলেন দিগিন। তাঁর কিছু মনে হল না, কোনো অভাব টের পেলেন না।

অবশ্য সম্পর্কটা ছিঁড়েও ফেললেন না। বাড়ির লোকজনকে এড়িয়ে রোজই যেতেন ময়নার কাছে। মাসোহারা তো দিতেনই, সব খরচ বহন করতেন ময়নার। ময়নাও অখুশী ছিল না। বাড়ির

লোক ব্যাপারটা টের পেলেও কেউ উচ্চবাচ্য করে নি। বয়সের ছেলের রোজগার যদি ভাল হয় তো তার দু একটা স্বভাবদোষ মানতে কারো আপত্তি হয় না। ছেলে হল সোনার আংটি, বাঁকা হলেও দাম কমে না।

সেই ময়না এখনও দিগিনেরই আছে, তবে পুরোটা নয়। দিগিনের আটান্ন হলে ময়নার না হোক বিয়াল্লিশ বছর বয়স তো হলই। গুরুং বস্তি ছেড়ে বর্ধমান রোডে ছোট একটু বাড়িতে উঠে গেছে ময়না। বাড়ি করে দিয়েছেন নিজেই। ময়না যৌবন-কালটা বড় চঞ্চলতা করেছে। গুরুং বস্তিতে উঠে যাওয়ার পর থেকেই সে দিগিনকে পছন্দ করতে পারত না। বার দুই পালিয়েও গেছে একটা অপদার্থ জাত-ভাইয়ের সঙ্গে। পোষায় নি বলে ফিরে এসেছে। লটঘট করেছিল নির্মল সিংয়ের ছোটছেলে অবতার সিংয়ের সঙ্গে। দিগিন শাসন করেছেন, বিয়ে করা বৌ নয় বলে ক্ষমাও করে দিয়েছেন।

ছেলেমেয়ে হয় নি, বাঁজা ময়না এখনো নিঃসঙ্গ পড়ে থাকে ছোট বাড়িটায়। ঘুম থেকে তার এক ভাইঝি আসে, কিছুদিন থেকে যায়। হরেন বোস রিটায়ার করে বাড়ি করেছিলেন দার্জিলিঙে। কিছুদিন আগে মারা গেছেন। তার বৌ বা ছেলেপুলেরাও আসে মাঝে মাঝে, ময়নাও যায়। কিন্তু তবু ময়না একা। বড় একা।

পুন্নিকে দেখতে এলেন একজন। রিকশা থেকে বুড়ো মানুষটি যখন নামছিলেন তখনই তাঁর ফর্সা টুকটুকে নাদুসনুদুস চেহারাটা দেখে সকলের ভাল লেগে গেল। পুন্নির বাপ আবেগে দিগিনকে বলে ফেললেন—দেখেন, যেন ঠিক পাকনা শসা।

তা পাকা শসার মতোই চেহারা বটে। মুখে অবশ্য হাসি নেই। গম্ভীর হয়ে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের বাপ এসে বসলেন। চারধারে একটু চেয়ে দেখলেন। কথা কম হলেও বেরসিক নন। জলখাবারের প্লেটটা আসতে দেখে বললেন—সেই লৌকিকতা।

—না না, কিছু নয়। বলে পুন্নির বাপ—একটু মিষ্টিমুখ আর কি।

—রক্তে চিনি একশ কুড়ি। আপনার মেয়ের মুখশ্রী যদি মিষ্টি হয় তাহলেই হবে, আলাদা মিষ্টির দরকার নেই।

ভারী ম্লান হয়ে গেল পুন্নির বাপ। পুন্নির মুখশ্রী তেমন মিষ্টি নয়, সবাই জানে। তবু পুন্নিকে আনা হল। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের বাপ অবশ্য পুন্নির দিকে একপলকের বেশী চেয়ে দেখলেন না। চিনি ছাড়া চা তৈরী করে দিতে হয়েছিল নতুন করে, সেইটে চুমুক দিতে দিতে বললেন—যেতে পারো মা। তোমার গার্জিয়ানদের সঙ্গে কথা বলি বরং।

পুন্নি চলে যেতেই দিগিনের উকিল দাদা জিজ্ঞেস করেন—কেমন দেখলেন? চলবে?

ভদ্রলোক হাসলেন। বললেন—রং তো কালই, মুখশ্রী ঐ চলনসৈ।

পুন্নির বাবা বলতে গেল—কিন্তু কাজকর্ম—

ভদ্রলোক হাত তুলে বলেন—ও তো সবাই জানে। ঘরের কাজ-কর্ম তো আর জজিয়তি ব্যারিস্টারি নয়।

দিগিনের দিকে চাইলেন ভদ্রলোক। বললেন—কী দেবেন আপনারা?

—যা চান। দিগিন গম্ভীর হয়ে বলেন।

—চাওয়ার কী। আপনাদের বাজেটটা না জেনে বলি কী করে?

—যা সবাই দেয়। আলমারি, ড্রেসিং টেবিল, ফার্নিচার, খাট, গয়না, ছেলের আংটি, ঘড়ি।

—হুঁ। বলে গম্ভীরভাবে আবার চা খেলেন, বললেন—আলমারি তো গোদরেজের?

—তাই হবে।

—গয়না?

—চোদ্দ-পনেরো ভরি।

—ঘড়িটা?

—রোলেক্স।

ভদ্রলোক শ্বাস ফেললেন। তারপর বলেন—আমি কি পাবো?

—মানে?

—ছেলে আর ছেলের বৌ তো এসব পাবে। আমার পাওনা কী?

—কী চান?

—নগদ!

—বলুন কত?

—আমি বলব না। শুনব!

তখন সবাই পীড়াপীড়ি করতে থাকে ভদ্রলোককে কিছু একটা বলার জন্য। ভদ্রলোক কেবলই হাত জোড় করে বলেন—আমি কিছু বলব না, আরো চার জায়গায় মেয়ে দেখেছি। সকলেরই টাকার অংক পেয়েছি। সব লিখে জামসেদপুরে জানাব আমার স্ত্রীকে। তিনি সব বিচার করে যেখানে মত দেন সেখানেই হবে। আমি দূত মাত্র, আপনারা সবাই বরং পাশের ঘর থেকে টাকার ব্যাপারটা পরামর্শ করে ঠিক করে আসুন।

বোঝা গেল, লোকটা স্বাভাবিকভাবেই একজন ডিকটেটার। সব জায়গায় কর্তৃত্ব করার ক্ষমতা রাখে। দিগিনের দাদারা আর দুই ভগ্নিপতি পাশের ঘরে চলে গেলেন সঙ্গে সঙ্গে। বড়দা ডেকে গেলেন—দিগিন।

দিগিন গেলেন না। মাদ্রাজী চুরুট ধরিয়ে ঠায় বসে রইলেন লোকটার দিকে চেয়ে।

একটু পরে ওঁরা ফিরে এলে বড়দা বললেন—আমরা দুই হাজার নগদ দেবো।

—দুই! ভদ্রলোক নির্বিকারভাবে উচ্চারণ করেন।

দিগিন লোকটার দিকে চেয়ে রইলেন মাদ্রাজী চুরুটের ধোঁয়ার ভিতর দিয়ে।

তারপর হঠাৎ বললেন—দশ।

—অ্যাঁ। ভদ্রলোক তাকালেন।

—দশ হাজার দেবো। নগদ।

ভদ্রলোক হাঁ করে চেয়ে থাকেন। বাক্যহারা দুই দাদা আর দুই ভগ্নীপতি সন্দেহের চোখে দেখেন। কিছু বুঝতে পারেন না।

ভদ্রলোক একটা শ্বাস ফেলে বলেন—আচ্ছা।

—আচ্ছা নয়, দশ হাজার দেবো। বিয়ের পাকা কথা দয়া করে আজই বলে যান। নইলে আমরা অন্য পাত্র দেখি।

ভদ্রলোক ইতস্তত করতে থাকেন। দিগিন গিনিপিগ দেখার মতো করে কৌতূহলী চোখে ভদ্রলোককে দেখেন। মানুষ-গিনিপিগের মধ্যে কোন্ কথায় বা কোন্ অবস্থায় কীরকম প্রতিক্রিয়া হয় সেটা লক্ষ্য করা দিগিনের এক প্রিয় অভ্যাস।

ভদ্রলোকের নির্লিপ্ত ভাবটা ঝরে যায়। ফর্সা মুখখানায় একটু লাল আভা ফুটে ওঠে।

দিগিন মৃদুস্বরে বলেন—আমার বড় আদরের ভাগ্নী। মনে মনে বহুদিনের ইচ্ছে ওর একটা ভাল বিয়ে দিই। কাজেই পুন্নির জন্য আমি আলাদা খরচ করব। আপনি চিন্তা করবেন না।

—কিন্তু আমার স্ত্রীর সঙ্গে একটু পরামর্শ—কথাটা শেষ করতে পারেন না ভদ্রলোক।

দিগিন বলেন—সে আপনার ইচ্ছে। কিন্তু আমরা দেরি করতে পারব না। আমার দাদাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ চাকরির ছেলে পছন্দ নইলে একটি ব্রিলিয়াণ্ট এঞ্জিনীয়র ছেলে আমার হাতেই ছিল। আপনি যদি আজ স্পষ্ট মতামত না দেন তাহলে আমরা তো দেরি করতে পারি না।

ভদ্রলোকের কঠিন ব্যক্তিত্বের এবং কর্তৃত্বের ভাবটা খসে গেছে, লাল মুখখানা রুমালে ঘষে আর একটু লাল করে তুললেন। আধ-খাওয়া জলের গ্লাসটায় একবার চুমুক দিলেন।

তারপর বললেন—আলমারিটা গোদরেজের তো?

—নিশ্চয়ই।

—সোনা যদি আর একটু বাড়াতেন।

দিগিন চুরুট মুখে নিয়ে বলেন—পনেরো ভরি তো দেওয়াই হচ্ছে আমাদের ফ্যামিলি থেকে। আমি নিজে একটা পাঁচ ভরির নেকলেস দেবো। আর প্রত্যেকটা এক ভরি ওজনের ছ গাছা চুড়ি।

—আমার ছেলে কী পাবে? এতো মেয়ের কথা হল, ভালই—

—একটা স্কুটার দেবো, একটা ফ্রীজ।

ভদ্রলোক ঠিক বিশ্বাস করতে পারেন না। দিগিনের দিকে সন্দেহের চোখে তাকান আবার অবিশ্বাসও করতে পারেন না। দিগিন শিলিগুড়ির নামজাদা লোকদের একজন। তার প্রভাব-প্রতিপত্তি ও কথার দাম আছে। কিন্তু এত লোভানী কেন, মেয়ের

কোনো গুপ্ত খুঁত আছে কিনা এই নিয়েই বোধহয় দ্বিধায় পড়েন ভদ্রলোক।

সেটা দিগিন আন্দাজ করে বলেন—আমাদের মেয়ে যা পাচ্ছেন তেমন স্বভাবের মেয়ে পাওয়া যায় না। আপনি পাড়া-প্রতিবেশীর কাছে খোঁজ নিতে পারেন।

—না, না, তার কী দরকার?

—খোঁজ নেওয়া ভাল, সন্দেহের দরকার কী?

বড়দা ভ্রূ কুঁচকে দিগিনের চুরুটের ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন মুখখানা দেখছিলেন। তিনি স্বভাবতই বিরক্ত। তাঁর বড় দুই মেয়ের বিয়েতে দিগিন এত খরচ করেন নি। মেজদাও খুশী নন। পুন্নির বাপ একটু ঘাবড়ে গিয়ে তাড়াতাড়ি দিগিনের একটা চুরুট ধরিয়ে নিয়ে বলে—তাহলে পাকা কথা আজই হয়ে যাক। বলে সমর্থনের জন্য চারদিকে তাকাল। তাঁর দুই সম্বন্ধী শ্বাস ফেলেন।

বড়দা বললেন—সব তো শুনলেন। সন্তুষ্ট তো?

ভদ্রলোক মাথা নেড়ে বলেন—মন্দ কী?

—তাহলে? দিগেন জিজ্ঞেস করেন।

ভদ্রলোক একটু করুণ সুরে বলেন—ছেলে একবার নিজের চোখে দেখবে না?

কেউ কিছু বলার আগেই দিগিন দৃঢ়স্বরে বলেন—না। আমাদের পরিবারে পাত্রকে মেয়ে দেখানোর নিয়ম নেই।

কথাটা ডাহা মিথ্যে। সবাই দিগিনের দিকে চেয়ে থাকেন। এই ঘরে যে সব ঘটনা ঘটছে তার কর্তৃত্ব নিশ্চিত ভাবে এখন দিগিনের হাতে। তাই কেউ কিছু বলতে সাহস পান না।

ভদ্রলোক অনেকক্ষণ চুপচাপ থেকে বললেন—মেয়েটিকে আর একবার ডাকুন।

পুন্নি আবার আসে। তার চোখে-মুখে একটা ভয়ার্ত ভাব। বহু টাকায় ছোটমামা তার জন্য ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট কিনছে, এ কথা ভিতরবাড়িতে ছড়িয়ে গেছে ইতিমধ্যে। সে এতটা কল্পনাও করে নি। তাই তার মুখে ভয়, লজ্জা, সংকোচ।

ভদ্রলোক পুন্নির দিকে চেয়ে বলেন—মা, এই বুড়ো ছেলেটার বায়না-টায়না একটু রাখতে পারবে তো? আমার বড় বৌমা হবে

তুমি, তা রান্না-টান্না কি বুড়োর একটু সেবা-টেবা—এসব পারবে তো?

পুন্নি মৃদু হেসে মাথা নত করে নিয়ম মাফিক। স্নেহভরে চেয়ে থাকেন দিগিন। এর আগে তিনবার পুন্নিকে নাকচ করে গেছে তিনটি ছেলেপক্ষ। তাই ও আর পাত্রপক্ষের সামনে বেরোতে চায় না, সে ব্যাপারটা মিটিয়ে দিলেন দিগিন। বিয়েটা যে হবে, বোঝাই যাচ্ছে।

ভদ্রলোক দিগিনের দিকে চেয়ে একটু হেসে বলেন—মেয়ে তো অপছন্দের নয়। আমার পছন্দই হয়েছে।

—কথা দিচ্ছেন তাহলে?

ভদ্রলোক একরকম হাঁফধরা হাসি হেসে বললেন—ঐ দেওয়াই হল।

—আমরা খুব বেশী দেরি করতে পারব না।

—দেরি করে আমাদেরই বা লাভ কী?

—তাহলে অগ্রহায়ণে দিন ঠিক করি?

—করুন। আমি এ সপ্তাহেই আবার আসব। আমার স্ত্রীকে একটু খবর দেওয়া নিতান্ত দরকার। আমার একার কথায় কিছু হবে না।

—স্ত্রীকে সব টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন জানিয়ে দিন। ছেলেরও মত নিন। কিন্তু সেগুলো সেকেন্ডারী ব্যাপার। আপনার মত থাকলে কেউই আপত্তি করবে না।

মানি-সেন্ট্রিক লোকটি মাথা নাড়েন। সম্বন্ধটা হাতছাড়া যে তিনি নিজের স্বার্থেই করবেন না তা বোঝাই যাচ্ছিল। বললেন—তাহলে কথাটা ফাইনাল বলেই ধরে নিন।

দিগিন মাথা নেড়ে বললেন—ধরে নিচ্ছি। আমরা আর সেই এঞ্জিনীয়ার ছেলেটির গার্জিয়ানদের সঙ্গে কথা বলব না।

ভদ্রলোক হাঁফ ছাড়লেন।

মনে মনে হাঁফ ছাড়লেন দিগিনও। পুন্নির একসময়ে বোধহয় ধারণা ছিল যে, যেহেতু তারা মামাবাড়িতে আশ্রিত সেইজন্যই তার ভাল বিয়ে হওয়ার সম্ভাবনা নেই। দেখতেও সে তেমন কিছু নয়, মামারাও খরচ করবেন না। হয়তো আদপে বিয়েই হবে না তার।

সেই কারণেই বোধহয় পুন্নি শান্ত এবং ভাল মেয়ে হয়েও একদা একটি ছেলের প্রেমে পড়ে গিয়েছিল। ছেলেটা পাড়ার বখাটেদের একজন। লেখাপড়া করে নি, জাতে নিচু, গুণের মধ্যে ভাল গোলকীপার ছিল। কবে কখন প্রেম হয়েছিল কে জানে। কিন্তু বাড়িতে কথাটা জানাজানি যখন হয় তখন ব্যাপারটা অনেকদূর গড়িয়ে গেছে। সারারাত্রি ধরে একটা ফাংশন হয়েছিল তিলক ময়দানে, সেখানে যাওয়ার নাম করে একবার গিয়েছিল পুন্নি। সকালে ফিরেও এল। কিন্তু ওর বন্ধুদের মধ্যে কে যেন বাড়িতে বলে দিয়েছিল যে পুন্নি ফাংশানে একটুক্ষণ থেকেই শান্তনুর সঙ্গে কেটে পড়েছিল। শিলিগুড়ি কলকাতার মতো বড় জায়গা নয়, এখানে সবাই সকলের খোঁজখবর রাখে। পুন্নির ব্যাপারটাও অনেকেই জেনে গেল। কিন্তু পুন্নির মা-বাবা মেয়েকে শাসন করেন নি। বড়দার কানে যেতেই উনি মত দিলেন—ওসব জাত-ফাত, শিক্ষা-দীক্ষা দিয়ে কী হবে। বিয়ে দিয়ে দাও। মেজদারও তাই মত ছিল। এবং বিয়ের প্রস্তাব পাঠানোর উদ্যোগও চলছিল। ব্যাপারটা দিগিন জানতে পারেন সবার শেষে।

দিগিন জাত-টাত বড় একটা মানতেন না, তাঁর নিজের শিক্ষাও বেশীদূর নয়! বিয়েটাতে মতও তিনি হয়তো দিতেন। কিন্তু তাঁর মনে হয়েছিল, পুন্নির ভালবাসাটা খাঁটি নয় এবং বাড়ির লোক বোঝা নামাতে চাইছে। প্রচণ্ড অর্থনৈতিক চাপে সংসারটার নৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে গেছে। পুন্নিকে ডেকে নিভৃতে প্রশ্ন করতেই সে কেঁদে ফেলল। প্রথমে বলল যে সে সত্যিই ছেলেটাকে ভালবাসে। ওকে ছাড়া কাউকে বিয়ে করবে না। তারপর দিগিন তার কাছ থেকে আস্তে আস্তে সব খবরই বের করে নেন। পুন্নি ছেলেটার সঙ্গে রাত কাটিয়েছে, পিকনিকে গেছে, চিঠি লিখেছে পরস্পরকে। পুন্নি যে ফাঁদে পড়ে গেছে সেটা বুঝতে কষ্ট হয় না। রাত কাটানোর ব্যাপারটা ছেলেটাই রটায়। এবং এমনই তার সাহস যে পুন্নির লেখা কিছু চিঠি সে এসে বড়দা আর পুন্নির বাবাকে দেখিয়েও যায়। ওসব দেখে ভয় পেয়ে সবাই বিয়ের উদ্যোগ করে।

দিগিন বুঝতে পারেন, ছেলেটাকে ভয় দেখিয়ে বা পুন্নিকে চোখ

রাঙিয়ে কোনো লাভ নেই। কিন্তু অত সহজে তিনি বাড়ির লোকের মতে মত দিতে পারলেন না। ছেলেটার দুঃসাহস এবং দুষ্টুবুদ্ধি তাঁর ভিতরটাকে শক্ত করে তুলল। কিন্তু মুখে তিনি কিছু বললেন না, মতামত দিলেন না। শুধু একদিন অমলকে ডেকে গোপনে বললেন—আমার ভাগ্নীর সঙ্গে তোমার ভাব শুনছি, ঠিক নাকি?

ছেলেটা মাথা নিচু করে বলে—আজ্ঞা হ্যাঁ।

—বিয়ে তো করবে, কিন্তু কাজ-টাজ কিছু করছ?

—চেষ্টা করছি।

—চেষ্টায় কী হবে? ধরা-করার কেউ আছে?

—না।

—ঠিক আছে, সে ভার আমি নিচ্ছি। তবে একটা কথা, চাকরি পাকা হওয়ার আগে বিয়ে-টিয়ে হবে না কিন্তু।

ছেলেটা চাকরির কথায় যথেষ্ট শ্রদ্ধান্বিত হয়ে উঠেছিল দিগিনের প্রতি। বলল—আজ্ঞে না।

এম-ই-এস-এর প্রায় সব হর্তা-কর্তাকেই চেনেন দিগিন। তাঁদের কাছে নিয়ে গেলেন। ক্লাস ফোর স্টাফ হিসেবে তার চাকরি হয় এবং চাকরি হওয়ার কয়েক মাসের মধ্যেই আসামের নেফায় তাকে বদলী করা হয়। সমস্ত ব্যাপারটাই দিগিন খুব নিপুণভাবে করেছিলেন। কেউ কিছু টের পায় নি। সবাই জেনেছিল হবু জামাইকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যই দিগিনের এই চেষ্টা। পুন্নিও বোধহয় খুশী হয়েছিল। অমল নেফায় যাওয়ার আগেই একদিন পুন্নিকে ডেকে দিগিন বললেন—ওর কাছ থেকে তোর চিঠিগুলি চেয়ে নিবি।

—কেন ছোটমামা?

—মিলিটারীর সঙ্গে থাকবে, আজ এ জায়গায়, কাল সে জায়গায়, ওগুলো হারিয়ে যদি ফেলে, আর অন্য কারো হাতে যদি পড়ে তো লজ্জার ব্যাপার।

পুন্নি লজ্জা পেয়ে বলে—আচ্ছা।

—সব ক'টা চেয়ে নিবি, নইলে কিন্তু ছাড়বি না।

—যদি দিতে না চায়?

—দেবে, বলিস না দিলে ছোটমামা রাগ করবে। চিঠিপত্র ছোটমামা পছন্দ করে না। কে কোথায় দেখে ফেলবে।

চিঠি ফেরত দিয়েছিল অমল। নেফা থেকে কয়েকখানা চিঠি লিখে থাকবে। বছরে এক আধবার আসে, দেখাসাক্ষাৎও বোধহয় করে পন্নির সঙ্গে। কিন্তু পন্নির প্রেমের দুধ কেটে ছানা হয়ে গেছে, এ সত্য পন্নির মুখ দেখলেই আজকাল বোঝা যায়। সঙ্গ বন্ধ করে দিলে যে কত ফল্‌স প্রেম নাকচ হয়ে যায়।

অমল ক'দিন আগেই এসে ঘুরে গেছে। শিগগীর আর আসবে না। এই ফাঁকে পন্নিকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের ঘরে পাচার করতে পারলে ভয়ের কিছু থাকবে না। প্রেমের তেজটাও কমজোরী হয়ে এসেছে। বাড়ির লোকও ব্যাপারটা ভুলে গেছে। কেবল দিগিন ভোলে নি। দুটো গিনিপিগের ওপর তার প্রেম-বিষয়ক পরীক্ষাটা তিনি চালিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত তার ফলাফলটা দেখবেন বলেই ভোলেন নি।

কয়েকদিন পরে এসে পাটিপত্র করে যাবেন বলে কথা দিয়ে ভদ্রলোক উঠলেন।

এর আগে পন্নির দুটো সম্বন্ধ ভেঙে গিয়েছিল উড়ো চিঠির জন্য। কে বা কারা উড়ো চিঠি দিয়েছিল কে জানে।

তবে দিগিনের পরিবারের শত্রু কেউ কেউ থাকাই সম্ভব। পাড়া-প্রতিবেশীদের মধ্যেও কি নেই মাৎসর্যে আক্রান্ত লোক! এবার নিশ্চিতভাবে পাত্রটিকে কিনে নিলেন দিগিন, উড়োচিঠিতে বোধহয় আর কাজ হবে না।

ভদ্রলোক চলে যেতে দিগিন নিজের টংগী ঘরখানায় এসে বসেন। মনটা ভাল নেই। উত্তরে মেঘপুঞ্জ জমে উঠছে। বেলা পড়ে এল। একটু শীত বাতাস বয় আজকাল, দিগিন ইজিচেয়ারে বসে টুলের ওপর পা তুলে দেন। পন্নির বিয়ে হয়ে গেলে তাঁর একটু একা লাগবে। পন্নিটা খুব সেবা করত।

পন্নির কথা ভাবতে ভাবতেই পন্নি উঠে এল নিচে থেকে।

—ছোটমামা।

—হুঁ।

—তুমি কী কাণ্ডটা করলে শুনি।

—কী ?

—অত টাকা খরচ করে বিয়ে দেবে ?

—না হয় দিলাম।

—ছি ছি, লোকে কী বলবে ?

—কী বলবে ?

—ভাল বলবে না। আমারও বিশ্রী লাগিবে। বড়মামা, মেজ মামা, মেসোমশাই কেউ খুশী হয় নি।

—কেন, কেউ কিছু বলেছে নাকি ?

—বলেছে।

—কী ?

—কী আবার। পাত্র আন্দাজে দেওয়া-থোওয়া বড্ড বেশী হয়ে গেছে।

—সে আমি বুঝব। তোর পাকামীর দরকার কী ? যা চা করে আন।

পুন্নি রাগ করে বলে—আমি এ বিয়ে করব না।

—না করিস না করবি। আমি ঠিক দকুলীর সঙ্গে সম্বন্ধ করে দেবো।

—তুমি অত টাকা খরচ করবে কেন ? ওতে আমার সম্মান থাকে না।

—সে আমি বুঝব। সম্মান নিয়ে তোকে মাথা ঘামাতে হবে না।

পুন্নি চা করতে যায়।

বড়বৌদি এসে ডাকেন—দিগিন ভাই।

—হুঁ।

—তাজ্জব। পুন্নির কি টাকার সঙ্গে সম্বন্ধ করলে ?

—করলাম।

—এত কিছুতে রাজী হলে কেন ? কী এমন পাত্র ?

—পাত্র খারাপ না।

—তা হলেই বা। নগদ দশ হাজার, স্কুটার, ফ্রিজ, সোনা—তুমি কী ভেবেছ বল দেখি। ওরা তো অত পাওনার কথা স্বপ্নেও ভাবে নি। তুমি আগ বাড়িয়ে বললে কেন ?

—মুখ বন্ধ করে দিলাম। আর টুঁ শব্দও করতে পারবে না।

—কেন? আরো অনেক কমেই তো হত। দশ হাজার নগদ শুনেই তো কাৎ হয়ে পড়েছিল।

দিগিন হাসেন। তিনি আসলে একটি সুন্দর বৃদ্ধের আকৃতির গিনিপিগকেই লক্ষ্য করেছিলেন সারাক্ষণ। যখন বুঝলেন ভদ্রলোকের টাকা-কেন্দ্রিক মন, তখন তিনি তাকে লোভানীর পর লোভানীতে উস্কে তুলেছিলেন। লোকটার নির্বিকার ব্যক্তিত্ব, ঠান্ডা মেজাজ ঝরে গেল, কর্তৃত্বের ভাবটা পড়ল খসে। মানুষ-গিনিপিগের বেশী কিছু নয়।

বৌদির দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন—ঠাকরোন, আজ ভাল করে শুঁটকী মাছ রাঁধো তো।

—কেন, কেউ খাবে নাকি?

—হুঁ।

—কে?

—ভটচায, আমার ব্যাঙ্কের এজেন্ট।

—মাইফেল বসবে, না?

দিগিন হেসে বলেন—ঠাকরোন, তুমি মাইফেলের মানেই জানো না।

—বয়স হল, এখন ওসব ছাড়ো না।

—ছেড়ে ধরবটা কী?

—সবই তোমার অদ্ভুত। শুধু শুঁটকী হলেই হবে নাকি?

—না। ঐ সঙ্গে একটু ফ্রায়েড রাইস মাংস আর মাছও কোরো। চাটের জন্য আলুর বড়া কোরো। মেটে চচ্চড়ি তো আছেই। ভটচায মদ-টদ খায় না, একটু চাখবে মাত্র। তাই খাবারটা দিয়ে পুষিয়ে দেওয়া যাবে।

বৌদি চলে যাওয়ার আগে বলেন—টাকাটা কিন্তু একদম ভস্মে ঘী ঢালা হল। পারলে পার্টিপত্রের দিন একটু কাটছাঁট কোরো।

—তাই কখনো হয়! কথা হচ্ছে কথা। কিছু কাটছাঁট হবে না।

—তোমার দাদা বলছিলেন এত টাকা বেরিয়ে গেল, শানুটাও লস্ দিচ্ছে, ব্যবসাপত্রের না ক্ষতি হয়।

দিগিন একটা হাসি লুকোলেন, বললেন—ক্ষতি হবে তো বটেই। সোপস্টোনটা ডোবাবে, তবে ঠিকেদারী তো আছেই। চিন্তা কী?

বৌদি একটু দাঁড়িয়ে থাকেন।

দিগিন বলেন—পুন্নির বিয়ে দেওয়ার পর আমি গরিব হয়ে যাবো না ঠাকরোন, ভয় নেই।

বৌদি শ্বাস ফেলে বলেন—তোমরাই বোঝো। আমি মেয়ে-মানুষ আমার এসব কথায় থাকার কী?

—মেয়েমানুষই তো কথায় থাকে। নইলে সংসারটা বাক্যহারা হয়ে যেত।

বৌদি বলেন—তবু তো মেয়েমানুষের পদতল ছাড়া গতি নেই।

বৌদি চলে যান। পুন্নি চা নিয়ে আসে। সন্ধ্যে হয়। হিমালয় ঢেকে যায়। তিনধারিয়ার আলোর মালা জেগে ওঠে। ডাউহিলের ডগায় বিন্দু বিন্দু আলো জ্বলে। দার্জিলিঙের রাস্তায় ক্রমান্বয়ে মোড় নিয়ে যে সব গাড়ি উঠছে বা নামছে তাদের হেডলাইট মাঝে মাঝে ঝলসে উঠছে।

সন্ধ্যের মুখে দিগিন পোশাক পরে মোটরসাইকেলটা নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। বাড়িতে বলে যান, ভটচায এলে যেন বসানো হয়।

এই শরৎকালে শিলিগুড়ির মতো এমন সুন্দর জায়গা আর হয় না। আবহাওয়াটি বড় মনোরম। ঘাসে গাছপালার একটা ভেজা গন্ধ ওঠে। শিশির পড়ে, চারধারে একটা নিঃশব্দ উৎসব লেগে যায়।

নিউমার্কেটে আলো ঝলসানো দোকানপাট। হিলকার্ট রোড এখন কলকাতাকে টেক্কা দেয় আলোর বাহারে। চারধারে আলোয় আলোময়।

দিগিন বাইকটা আস্তে চালিয়ে সেবক রোডের মোড় পেরিয়ে মহানন্দার পুলের কাছে এসে ট্যাঙ্কে পেট্রোল ভরে নেন। পাম্পের ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলেন। তারপর বর্ধমান রোড ধরেন। ফাঁকা রাস্তা, ঝড়ের বেগে চলে আসেন ময়নার বাড়ির কাছে।

উঁচু রাস্তা থেকে একটা শুঁড়িপথ নেমে গেছে। বড় রাস্তায়

বাইকটা দাঁড় করিয়ে অন্ধকার রাস্তাটা ধরে নেমে যান। ড্রেনের ওপর কংক্রীটের স্ল্যাব পাতা, তারপর, ঝুমকোলতার চালচিত্রওলা লোহার গেট। একটু ছোট বাগান। শিউলির গন্ধে ম ম করছে। কাঁচা মাটির গন্ধ পান। সেইসঙ্গে ধূপকাঠির একটা মিষ্টি গন্ধ।

ছোট হলেও বাড়িটা খারাপ না। দুখানা ঘর, বাগান, কুয়ো, সবই আছে। বাছাই ভাল কাঠের দরজা-জানালা, বারান্দায় গ্রীল। একটা রাগী ভুটিয়া কুকুর আছে পাহারাদার। আর আছে একজন নেপালী ঝি। ময়না কিছু কষ্টে নেই। দিগিন মাঝে মাঝে রাতে থেকেও যান। প্রায়দিনই দেখা করতে আসেন, যথেষ্ট টাকাপয়সা দেন। ময়নার খারাপ থাকার কথা নয়। গত বাইশ-তেইশ বছর তো এভাবেই কেটেছে।

ধূপকাঠির গন্ধটা উন্মুখ হয়ে শুঁকতে শুঁকতে বারান্দায় উঠে আসতেই একটা অস্ফুট আহ্লাদের আওয়াজ করে কুকুরটা এসে লুটিয়ে পড়ে। বারংবার লাফ দিয়ে গায়ে ওঠে, প্রবল আবেগে পায়ে মুখ ঘষে। দিগিন তার মাথায় চাপড় মেরে আদর করেন। ঘরে টিউবলাইট জ্বলছে, নীল পর্দা ফেলা। পুরুষকণ্ঠে ভিতর থেকে প্রশ্ন আসে—কে?

দিগিন উত্তর দেন না। কণ্ঠস্বরটা তিনি চেনেন। কাটিহারের ফকির সাহেব। মাঝে মধ্যে এদিকে আসেন।

বাইরের ঘরে একটা চৌকী আছে, গোটা দুই বেতের চেয়ার। চৌকীতে ফকির সাহেব বসে। লম্বা চুল, পরনে আলখাল্লা, চোখে সুর্মা মুখে পান। দাড়িটা ট্রিম করে কামানো। চোখের দৃষ্টিতে একটা জ্বলজ্বলে তীব্রতা আছে। লোকে বলে ফকির সাহেবের বয়স একশো। সেটা বোধহয় বাড়িয়ে বলা। দেখে পঞ্চাশের বেশী মনে হয় না।

দিগিন পা ছুঁয়ে প্রণাম করেন।

ফকির সাহেব মৃদু হেসে বলেন—আও বেটা।

—কখন এসেছেন?

—বিকালে। রাতের গাড়িতে ফিরে যাচ্ছি, তো ভাবলাম ময়না বিটির সঙ্গে দেখা করে যাই।

—আমাদের ওখানে গেলেন না তো ?

—যাবো। ফি হপ্তা তো আসছিই।

ধূপকাঠির সুন্দর সুবাস আবার বুক ভরে টানেন দিগিন।

ময়নার ঝি উঁকি দিয়ে দেখে যায়। একটু পরেই ময়না আসে। পরনে একটা চওড়া লালপাড়ের সাদা খোলের শাড়ি। বিয়াল্লিশ বছরের কিছু মেদ ও মেচেতা শরীর আর মুখকে শ্রীহীন করেছে বটে, কিন্তু এখনো দীর্ঘ শরীরে যথেষ্ট যৌবন রয়ে গেছে। মাথায় এলো-খোঁপা, কপালে চন্দনের টিপ। নাকটা একটু ছোটো হলেও ময়নার চোখ ছোট নয়। বেশ বড়বড় দুটি চোখ। মুখে কিছু ক্লান্তি, কিছু গাম্ভীর্য। ময়না আজকাল নেপালী ভাষায় কখনো কথা বলে না। এমন কি সে তার ঝিয়ের সঙ্গে পর্যন্ত বিশুদ্ধ বাংলায় কথা বলে।

দিগিনকে দেখেই মুখটা অন্য ধারে ফিরিয়ে নিয়ে বলল—ফকির সাহেবের জন্য রান্না করছি, তুমিও খেয়ে যেও।

দিগিন মাথা নাড়েন। বলেন—বাসায় আজ এক বন্ধু খাবে।

—ও। ময়না বলে।

দিগিন বেতের চেয়ারে বসেন। একটা চুরুট ধরান। বিশ্বের এমন কোন মানুষ নেই যার সামনে দিগিন চুরুট না খান।

ফকির সাহেব তাঁর পোঁটলা থেকে একটা কৌটো বের করে পান খেলেন, একগাদা দোক্তা মুখে দিয়ে ঝিম হয়ে বসে রইলেন একটু। পিক-টিক ফেলেন না। বার দুই তিন হেঁচকী তুলে দোক্তার ধাক্কা সামলে নিয়ে বললেন—কি খবর-টবর ?

—ভালই।

—বহোৎ আচ্ছা। [uncertain]

—আমার হাতটা একটু দেখবেন ফকির সাহেব ?

—দিনের বেলা।

—আগেও তো দেখেছেন।

—জরুর।

—আমার মরণ কবে ?

ফকির সাহেব মজবুত দাঁত দেখিয়ে হাসলেন, বললেন—ওই সব জেনে কি হয় রে বেটা ?

ময়না দাঁতে ঠোঁট কামড়ে একটু অসহায়ভাবে চেয়ে থাকে দিগিনের দিকে। কথা বলে না।

দিগিন নীরবে চুরুট খেয়ে গেলেন কিছুক্ষণ। অন্যমনস্ক। একটা শ্বাস ফেলে বললেন—মানুষ জন্মায় কেন ফকির সাহেব?

—খোদায় মালুম। ফকির সাহেব উদাস উত্তর দেন। পানটা মজে এসেছে। নিমীলিত চোখে সেই স্বাদটা উপভোগ করতে করতে আস্তে করে বলেন—কৌন জানে। পয়দা বেফয়দা। তব ভি কুছ হ্যায় জরুর।

দিগিন হাসলেন। ফকির সাহেব তাত্ত্বিক নন, দার্শনিক কথা-বার্তা আসে না, এমন অনেক কথা বলে ফেলেন যা ধর্মবিরুদ্ধ।

ষোল বছরের সেই কিশোরীটি কত বড় হয়ে বুড়ো হতে চল্ল। কিন্তু কেন? আটান্ন বছর বয়সে এসব প্রশ্ন নিতান্ত জরুরী বলে মনে হয়।

ফকির সাহেব একটা মস্ত বোতল পোঁটলা থেকে বের করে ময়নার হাতে দিলেন। বললেন—রাখ্। এক মাহিনা আওর খেয়ে দেখ।

ওষুধটা বাচ্চা হওয়ার জন্য খায় ময়না। দিগিন জানেন। গত তিন চার মাস ধরে খাচ্ছে।

ময়না বোতলটা নিয়ে একবার দিগিনের দিকে তাকায়। চোখে একটা শূন্যভাব। বহুবছর ধরেই কি ময়না তার শূন্যচোখে চেয়ে আছে দিগিনের দিকে? দিগিন ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারেন না। একটা বাচ্চা ময়নাকে তিনি দিতে ব্যর্থ হয়েছেন। সেটা হয়তো ময়নারই দোষ। কারণ, ময়না তো একা দিগিনের সঙ্গ করে নি। কাজেই দিগিন নিজেকে দায়ী করতে পারেন না। ময়নাও বাচ্চার জন্য তেমন ভিখিরিপনা করে নি কখনো। আজকাল কান্নাকাটি করে। দিগিন বিরক্ত হন। ময়না আজকাল কেবল একরকম ভাষাহীন চোখে চাইতে শিখেছে। দিগিন সেটা সহ্য করতে পারেন না। ময়নাকে তিনি যতদূর সম্ভব সুখে রেখেছেন, কখনো বিশ্বাসের ভঙ্গ হয় নি। বৌয়ের চেয়ে কিছু কম তো নয়ই, বরং বেশী সুখেই আছে ময়না। মর্যাদা হয়তো নেই। কিন্তু মর্যাদা না পেলেই বা ঘুমের তরকারীর দোকানের সেই অশিক্ষিত

মেয়েটির কী যায় আসে। বরং উল্টোদিক থেকে দেখলে ময়নাই দিগিনের প্রতি বিশ্বস্ত থাকে নি। অবাধে মেলামেশা করেছে ছোকরাদের সঙ্গে। পয়সা রোজগারের জন্য নয়, কিংবা কেবল যৌন-কাতরতার জন্যও নয়। সে বোধহয় দিগিন নামের একটা পাথর ভাঙতে পারে নি বলেই পুরুষের বুক চিরে চিরে একটা নিরন্তর প্রবহমান ফল্গুধারাকে খুঁজেছে। পায়নি। দিগিনের কাছ থেকে চলে যেতে চেয়েও যেতে পারে নি ময়না। দাঁড়ের পোষা ময়না, যেতে পারে না। দিগিন ওর দিকে চেয়ে এক গিনি-পিককেই দেখতে পান। ময়নাকে তেমন শাসন কখনো করেন নি দিগিন, কর্তৃত্ব নয়, দাবি-দাওয়াও নয়। হাওয়া-বাতাসের মতো সম্পর্ক বজায় রেখেছেন। কেউ কারো বাঁধা নয়। তবু কেন বাঁধা আছে ময়না তা ভাবেন দিগিন, অনেক চুরুট পুড়ে যায়, তবু সমাধান খুঁজে পান নি পঁচিশ বছর ধরে।

ময়না ভিতর-বাড়িতে চোখের ইশারায় ডাকে। দিগিন উঠে যান। ধূপকাঠির গন্ধ ছাপিয়ে উঠেছে মাংস রান্নার গন্ধ। প্রেশার কুকারের তীব্র হুইশল্ বেজে উঠল।

ভিতরের ঘরে ময়না শোয়। একটা খাট পাতা, একটা ড্রেসিং টেবিল, কাঠের কাঁচ-বসানো আলমারি আলনা। দিগিন বিছানায় পা তুলে বসেন, ময়না মোড়া টেনে মুখোমুখি বসে।

—ফকির সাহেবের ওষুধের টাকাটা দিয়ে দিতে হবে। ময়না বলে।

—কত?

—বিয়াল্লিশ টাকা। আমি দিয়ে দিচ্ছি আজ!

—আমার কাছে আছে, দিয়ে দেব'খন যাওয়ার সময়।

ময়না চুপ করে থাকে একটুক্ষণ। হঠাৎ মুখ তুলে বলে—মরার কথা জিজ্ঞেস করছিলে কেন?

—এমনিই।

—আমি জিজ্ঞেস করেছি।

—কী?

—বলেছি, বাঁচতে ইচ্ছে করে না।

—ও।

—ফকির সাহেব বললেন যে বাচ্চা হলে বাঁচতে ইচ্ছা করবে।

—তাই নাকি।

ময়না দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে—একা বেঁচে থাকা কত কষ্টের।

—কষ্ট কী? দুনিয়ায় সবাই একা।

ময়না এসব কথা ভাল বোঝে না। কিন্তু শুনলেই আজকাল ওর চোখ ভরে জল আসে। এখনো এল। চোখ মুছল নীরবে।

ময়না বলল—আমি কোথাও ঠিক চলে যাবো।

দিগিন চুপ করে রইলেন।

ময়না বলে—শুনেছ?

—শুনেছি।

—আমি কোথাও চলে যাবো।

—যেও, আমি তো কখনো বারন করি নি।

একটু তীব্রস্বরে ময়না বলে—কেন বারন করো নি?

—কেন করব?

ময়না কথা খুঁজে পায় না। আসলে সে বাঙালী মেয়েদের মতো কথার ওস্তাদ নয়। তার ওপর সে নানারকম পাপ-বোধে ভোগে। সে জানে, দিগিনের প্রতি সে তেমন বিশ্বস্ততার পরিচয় দেয় নি।

প্রেশার কুকারের আর একটা হুইশল্ বেজে ওঠে। শিউলির গন্ধের সঙ্গে মাংসের গন্ধ মিশে যায়। ময়নার ঝি কফি নিয়ে আসে।

দিগিন উঠে বসেন। বাঁ হাতের পাঁচ আঙুলের ওপর কাপসুদ্ধ প্লেটটা ধরে রেখে তিনি নিচে বসা ময়নার দিকে তাকান। দাঁড়ের ময়না। গিনিপিগ। বলেন—আজ সকালে শালুগাড়ার সিদ্ধাইয়ের কাছে গিয়েছিলাম।

ময়না চেয়ে থাকে।

দিগিন কফিতে চুমুক দিয়ে বলেন—সিদ্ধাই বলল, একজন ফর্সা আর লম্বা মেয়েছেলে আমার খুব ক্ষতি করবে।

—মেয়েছেলেটা কে?

—তা বলে নি।

—ফর্সা আর লম্বা?

—হ্যাঁ।

ময়না দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে—সে কি আমি?

—কী করে বলি?

—কীরকম ক্ষতি?

—তাও স্পষ্ট করে বলে নি।

ময়না চেয়ে থাকে। হঠাৎ মাথাটা নোয়ায়।

দিগিন হেসে বলেন—বোগাস। আসলে সবাই তোমাকে চেনে। আমাদের সম্পর্ক জানে, তাই ওসব বলে।

—তুমি তো বিশ্বাস করো।

—না, করি না।

—তবে গিয়েছিলে কেন?

—গিনিপিগ দেখতে।

গিনিপিগের ব্যাপারটা ময়না জানে। তাই বুঝল।

—আমি তোমার আর কী ক্ষতি করতে পারি? যদি ক্ষতি করি তো আমারই ক্ষতি। তুমি ভাল না থাকলে আমার ভাত-কাপড় জুটবে কী করে?

—সেই জন্যই তো বলছি সব বোগাস।

ময়না হঠাৎ মুখখানা তুলে বলল—ক'দিন আগে একদিন সকালে শানু এসেছিল।

—শানু? চমকে ওঠেন দিগিন, কেন?

—তেমন কোনো কারণ তো বলে নি। একটা স্কুটার হাঁকিয়ে এল।

—কী বলল?

—বলল, কাকীমা কিছু টাকা দাও, খুব লস যাচ্ছে।

দিগিন অবাক হন, বলেন—কাকীমা বলে ডাকল?

ময়নার চোখে আবার জল। কথা ফুটল না, মাথা নাড়ল কেবল।

—টাকা দিলে?

—দিই নি। বললাম, দেবো।

—কত?

—খুব বেশী নয়। দু'হাজার, তোমাকে বলতে বারণ করেছিল।

—কেন ?

—ও একটা হিসেব মেলাতে পারছে না। তোমাকে ভয় পাচ্ছে। বলল, কাকাকে ফাঁকি দেওয়ার উপায় নেই। টাকাটা ক্যাশে দেখাতে হবে।

দিগিন আগুন গরম কফি শেষ করেন। চুরুট ধরিয়ে নেন। ছড়ানো ঠ্যাং দুটো নাড়তে নাড়তে বলেন—ডোবাবে।

—কী ?

—ঐ ছেলেটাই ডোবাবে। বংশের কুড়াল।

—এমন সুন্দর করে ডাকল। তোমাদের বাড়ির কেউ তো আমাকে ওরকম করে ডাকেনি কখনো। আমার কথা মুখেই আনে না কেউ। কখনো আনতে হলে নাম ধরে ময়না বলে। ছোট বড় সবাই।

দিগিন উঠতে উঠতে বলেন—টাকাটা ওকে দিও না।

—কথা দিলাম যে !

দিগিন নিশ্বাস ফেলে বলেন—তাতে ওর ক্ষতি হবে। যতদূর জানি ও জুয়া-টুয়া খেলছে, ফাটকায় টাকা ঢালছে। রাতারাতি বড়লোক হতে চায়।

—চা'ক। ছেলেমানুষ।

দিগিন অবাক হয়ে ময়নার দিকে চেয়ে থাকেন একটু। মা হতে না পারা ময়না ভিখারিনীর মতো চেয়ে আছে। দিগিন শ্বাস ফেলে বলেন—ইচ্ছে হলে দিও। কিন্তু ও টাকাটা বাজে ব্যাপারে নষ্ট করছে। তাছাড়া তোমার কাছে টাকা চাইবে কেন ? ওর লজ্জা থাকা উচিত।

ময়না তার বড় দুখানা চোখ পরিপূর্ণ মেলে দেয় দিগিনের মুখের ওপর। বলে—আপন মনে করে চেয়েছে। ওকে বোকো না। আমার ছেলে থাকলে সে যদি টাকা নষ্ট করত তাহলে কী করতে ?

—শাসন করতাম।

—বেশী জোর করলে শাসন করা যায়। ও তো মোটে একবার চেয়েছে। টাকাটা কিন্তু আমি দেবো। তুমি কিছু বলো না।

দিগিন অন্যমনস্কভাবে বলেন—সোপস্টোনের পিছনে বহু

টাকা নষ্ট করেছে। কিছু বলি নি। কিন্তু এ সবের একটা শেষ থাকা উচিত।

—তুমিও তো টাকা কম নষ্ট করো না।

—সে করি রোজগার করে। ওর তো এসব রোজগারের টাকা নয়। ব্যবসাতে আমি ওকে নিয়েছি বিশ্বাস করে, বিশ্বাস রাখতে না পারলে ছাড়িয়ে দেবো।

—সবাইকে তো ছাড়িয়ে দিয়েছো, কাকে নিয়ে থাকবে?

—আমার কাউকে দরকার হয় না।

ময়না সে সত্যটা জানে! তাই চুপ করে থাকে। অনেকক্ষণ বাদে হঠাৎ বলে—শানু বিয়ে করবে।

দিগিন চমকে ওঠেন—কী বললে?

—শানু বিয়ে করবে।

—কাকে?

—পছন্দ করা মেয়েকে।

—তোমাকে কে বলল?

—শানু নিজেই বলে গেছে। কালিম্পঙের মেয়ে। বিয়ে করে আমার কাছে এনে তুলবে বলেছে।

দিগিন চেয়ে থাকেন। ঠিক বুঝতে পারেন না!

ময়না নিজেই বলে—মেয়েটা বিধবা, তোমরা নাকি ঘরে নেবে না, তাই আমার কাছে রাখবে।

দিগিন একটা হাই চাপলেন! বললেন—ও।

—আমি কী করব?

—শানুকে বলে দিও যে এ বাড়িটাও আমার, আর যে ঠিকাদারী ব্যবসার জোরে বাজারে ও নিজে চালু আছে সেটাও আমার। কাছেই ইচ্ছে করলেই ও যা খুশী করতে পারবে না।

ময়না হঠাৎ আস্তে করে বলে—আমি কি তোমার বৌ?

দিগিন ভ্রূ কুঁচকে চেয়ে বলেন—এসব কথা তো অনেক হয়েছে, আবার কেন?

—ধরো যদি শানুও তোমার মতোই কাজ করে তবে দোষের কী! আমার মতো কাউকে বৌ করে এনে যদি বাঁধা মেয়েমানুষের মতো রেখে দেয় তো তুমি কি তাকে শাসন করতে পারো?

—পারি। দিগিন শান্ত গলায় বলেন।

—কেন পারো ?

—কারণ আমি টাকা রোজগার করে নিজের পয়সায় সব করেছি। ওর মাজায় সে জোর নেই। ওর আছে বারফাট্টাই। ফকির সাহেব একা বসে আছেন, তুমি তার কাছে যাও। শানুর চিন্তা আমি করব।

ময়না শ্বাস ফেলে উঠে যায়। এ পাথর সে ভাঙতে পারবে না।

ভটচায আয়োজন দেখে খুব খুশী। পেটের রোগ আর প্রেশারের জন্য বাড়িতে খাওয়ার বড় ধরা-করা। কিন্তু লোকটা খাইয়ে মানুষ।

মদের গেলাসটা সরিয়ে রেখে মেটুলীর চাটটা টেনে নিয়ে বললেন —বড় খাওয়ার আগে আবার এই ছোটো খাওয়ার ব্যাপারটা কেন মশাই ?

দিগিন হেসে বললেন—এ ছোটো খাওয়া নয়, এ হল চাট, মদের মুখে একটু একটু খেতে হয়। নুন আর ঝাল স্বাদে তেষ্টা বাড়ে, তাতে মদটা খেয়ে আরাম।

কিন্তু ভটচায মদের মোটে স্বাদ পান না। দু-এক চুমুক কষ্টে খেয়ে বলেন—এ মশাই চলবে না! বড্ড লাউড জিনিস।

—তাহলে চাটটাও খাবেন না। খামোখা ক্ষিদে নষ্ট হবে। বলে দিগিন জলপান করার মতো দিশী মদ গলায় ঢালেন।

—শুঁটকী মাছ আমি বড় ভালবাসি।

—একটু মাল টেনে নিন, আরো ভাল লাগবে।

ভটচায কষ্টেসৃষ্টে আরো দু-এক চুমুক খান। বলেন—মাথা ঝিমঝিম্ করছে।

—তাহলে আর একটু চালান। ঝিমুনীটা কেটে ফুর্তি লাগবে।

ভটচায খেতে চেষ্টা করেন।

দিগিন উঠে গিয়ে পোর্টের একটা বোতল আনেন আলমারি থেকে। আলাদা গেলাসে ঢেলে দিয়ে বলেন—এটা খান। এটার স্বাদ ভাল।

পোর্ট ভটচাযের ভালই লাগে। অনেকখানি খেয়ে নেন একেবারে। বলেন, হ্যাঁ, এটা বেশ।

—আর একটু দিই ?

—দিন।

দিগিন মৃদু হেসে বলেন—খুব দামী জিনিস। এই বোতলটা একশো টাকা।

—বলেন কী! থাক থাক আর দেবেন না।

—খান না মশাই, দামকে ভয় কী ?

—দামের জন্য নয়, নেশা হয়ে যাবে।

বোতলটা ভটচাযের হাতের নাগালে রেখে দিলেন, বুঝতে পারেন 'দামী জিনিস' কথাটাই ভটচাযকে কাত করবে।

করলও। ভটচায গেলাস শেষ করে বোতলটা হাত বাড়িয়ে নিলেন, বললেন—দিগিনবাবু, এর জোরেই না এখনো ফিট আছেন। নইলে এখানকার জলহাওয়া সহ্য করেন কী করে ?

—একজ্যাক্টলি।

ভটচায কথা বলতে থাকেন। প্রথমে চাকরির কথা। তারপর ঘর-সংসারের কথা। কী একটু দুঃখের কথা বলে দু' ফোঁটা চোখের জল ফেলেন। দিগিন চোখ ছোটো করে চেয়ে গিনিপিগ দেখতে থাকেন। আজকাল তার বড় একটা নেশা হতে চায় না। কাল রাতে যেমন ঘুমের বড়ি খেয়েছিলেন তেমনি আজও একবার খাবেন নাকি!

ভটচায হেঁচকি তুলে বলেন—শুঁটকী মাছ!

—আসছে।

—খুব ভাল জিনিস।

—খুব।

—বহুকাল খাইনি, আমার বাসায় ওর পাট নেই। ছেলেবেলায় খুব খেয়েছি। আপনার বাসায় রেগুলার হয় ?

—হয়।

—সবাই খায় ?

—না। আমি খাই আর বড়বৌদি। আর কেউ না।

—বৌ থাকলে সে যদি না খেত তবে আপনারও খাওয়া হত না।

দিগিন হাসেন।

ভটচায হঠাৎ সংবিৎ পেয়ে বলেন—কিন্তু লোকে বলে আপনার কে একজন আছে।

দিগিন গম্ভীর পেয়ে বলেন—কে থাকবে?

—একজন মেয়েছেলে!

দিগিন হেসে বলেন—সে তো সবার থাকে।

—সবার থাকে? ভটচায হেঁচকী তোলেন।

—বিয়ে করলেই থাকে।

– না না, বিয়ে করা বৌয়ের কথা নয়।

—তবু কথা একই, বিয়ে করা বা না করা সবই এক কথা।

ভটচায অনেক ভেবে-চিন্তে মাথা নেড়ে বলেন—তা বটে। তাহলে আপনার একজন আছে?

-- একজন না, কয়েকজন।

—কয়েকজন? ভটচায চোখ বড় করে তাকাল।

—লোকে বলে না সে কথা? .

—না তো! একজনের কথাই শুনেছি।

—লোকে কমিয়ে বলেছে!

—রাখেন কী করে? একজনেরই যা খরচ।

—রোজগার করি। রাখি!

—বেশ খরচা পড়ে, না?

—তা পড়ে, ফুর্তিটাও তো কম নয়। মেয়েছেলে, কিন্তু বৌ নয়, এর মধ্যে কি কম ফুর্তি নাকি।

ভটচায মাত্রাহীন টানতে থাকেন পোর্ট। বলেন—বাড়িতে বসে এসব খান, কেউ কিছু বলে না?

—কী বলবে?

—আপত্তি করে না?

—বাড়িটা তো আমার।

—তবু ফ্যামিলিতে কি এসব চলে?

দিগিন দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন—অত ভাবতে গেলে ফুর্তিই তো ফিকে হয়ে যায়।

—তা বটে।

—ভাববেন না। কেউ কিছু বলে তো বলুক। আপনার কাজ আপনি করে যাবেন।

—কী করব ?

—ফুর্তি।

—এই বুড়ো বয়সে ?

—ফুর্তির আবার বয়স কী ? তাছাড়া সারাজীবন যদি ফুর্তি না করে থাকেন তো এই শেষ বয়সেই তা পুষিয়ে নেওয়া উচিত। আর তো বেশী সময় নেই। আপনি কিন্তু একটু বেশী খাচ্ছেন।

—না, আর খাবো না।

—খান। ক্ষতি নেই। তবে আর বেশী টানলে খাবার খেতে পারবেন না।

—দাঁড়ান। আর দুই চুমুক। আবার অনেকটা খেয়ে ভটচায একটা প্রকাণ্ড ঢেকুর তুলে বললেন—ঐ! গ্যাসটা বেরিয়ে গেল! পেটটা হাল্কা লাগছে।

—লাগবেই তো। দেশীটা খেলে আরো বেরিয়ে যেত।

—হ্যাঁ, ফুর্তির কথা কী যেন বলছিলেন ?

—এইটাই ফুর্তির বয়স। মরার পর ওপারে গেলে স্বয়ং যম যখন সওয়াল করবে—বাপু, পৃথিবীর কী কী অভিজ্ঞতা হয়েছে তোমার, কী কী ভোগ করে এলে—তখন কী বলবেন ? বলার কিছু আছে ? ঘ্যান্ ঘ্যান্ প্যান্-প্যান্ করে নাকি সুরে তখন পেটের রোগ, বৌয়ের মেজাজ, প্রোমোশনের দেরি, ডেবিট, ক্রেডিট—এসবই বলতে হবে। যম তখন ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেবে, বলবে—যাও, দুনিয়াটা আবার দেখে এসো, কিছুই দেখ নি।

ভটচাযের চোখ দুখানা রক্তাভ। সেই চোখে দিগিনের দিকে চেয়ে বলেন—শুঁটকী মাছ ?

—হবে। আর একটু খিদেটা চাগিয়ে নিন।

ভটচায মদে সম্পূর্ণ ভেসে যাওয়ার আগে আবেগ-স্খলিত কণ্ঠে বলেন—বাড়িতে বড় ধরাকাটা! কিছু খেতে-টেতে দেয় না মনের মতো। বহুকাল ধরে ডিপ্রেসনে আছি। যদি পেটটা ঠিক থাকত, যদি প্রেশারটা উৎপাত না করত।

খাবার দিয়ে গেল চাকর। ভটচায দু চামচ ফ্রাইড রাইস

খেলেন, একটুকরো মাংস, শুঁটকী মাছের চচ্চাড়িটা মুখে তুললেন মাত্র, খেতে পারলেন না। তারপরেই গেলাস রেখে চেয়ারে এলিয়ে বসে চোখ বুজলেন। আস্তে করে বললেন—বৌ বাচ্চা সব পাঠিয়ে দিয়েছি কোন্নগর। সেখানে আমার বাড়ি হচ্ছে। যে কদিন আছি রোজ আসব, বুঝলেন?

—নিশ্চয়ই। দিগিন বলেন।

একটা রিকশা ডেকে ভটচাযকে তুলে দিতে রাত হয়ে গেল।

ভিতর-বাড়িতে ফিরে আসবার সময়ে দেখলেন, শানুর ঘরে আলো জ্বলছে। বন্ধ দরজার সামনে একটু দাঁড়ালেন। ঘরটা নিঃশব্দ। আস্তে টোকা দিলেন দরজায়।

—কে?

—আমি।

—ছোটকাকা।

—হ্যাঁ।

শানু উঠে এসে দরজা খোলে। এ সময়টা দিগিনকে সবাই সমঝে চলে। কারণ প্রায়দিনই সন্ধ্যের পর দিগিন নেশা করেন।

কিন্তু আজ তাঁর নেশা হয় নি। যথেষ্ট পরিষ্কার আছে মাথা। চিন্তাশক্তি চমৎকার কাজ করছে।

শানু সপ্রশ্ন চোখে চেয়ে বলে—কিছু বলবে?

—হুঁ, বলে দিগিন শানুর ঘরে ঢোকেন।

ঘরটা ভাল। বারো বাই বারো মাপের ঘর। ফোম রবারের গদি পাতা খাট, সেক্রেটারিয়েট টেবিল, গদি আঁটা চেয়ার, টেবিল ল্যাম্প জ্বলছে। শানু একটু শৌখিন মানুষ। অন্তত দশ জোড়া জুতো র‍্যাকে সাজানো। ওয়ার্ডরোবটা বেশ বড়সড়। তাতে প্রয়োজনের অনেক বেশী জামাকাপড় ঠাসা আছে।

সেক্রেটারিয়েটের সামনের চেয়ারটায় বসেন দিগিন। কথা বলেন না।

শানু বিছানায় বসে। চেয়ে থাকে।

—শানু।

—বলো।

—ময়নার কাছে কেন গিয়েছিলি?

শানু স্মার্ট ছেলে। ঘাবড়াল না, একটু হাসল। বলল—তুমি চিরটা কাল কাকীমাকে বড় হেলাফেলা করেছ।

—কাকীমা!

—নয়?

দিগিন শ্বাস ফেললেন।

শানু বলে—মানুষ যাই বলে বলুক, আমি জানি কাকীমা বলেই।

একটু কর্কশ স্বরে দিগিন বলেন—বুঝলাম, কিন্তু গিয়েছিলি কেন?

—সম্পর্কটা সহজ করতে।

—সেটা নিয়ে তোর মাথাব্যথা কেন?

শানু গম্ভীর হয়ে বলে—ছোটকাকা, একটা মানুষের প্রতি সারাটা জীবন কেন অন্যায় করে যাচ্ছ?

—অন্যায়?

—অন্যায় ছাড়া কী? ভাত-কাপড়ের চেয়ে দামী জিনিস হচ্ছে মর্যাদা—

—থাক। টাকা চেয়েছিলি কেন?

—চেয়েছি ধার হিসেবে।

—কেন?

—সব টাকা লিকুইডেটেড হয়ে গেছে।

—সেটা আমাকে বলিস নি কেন?

—বললে তো বকতে।

—এখন কি বকব না?

শানু শ্বাস ফেলে বলল—সোপস্টোনের লস্‌টা হিসেব করছিলাম। তোমাকে যা বলেছি তার চেয়ে বেশী লস্‌ হবে। বাজারে ধারকর্জ একটু বেশী হয়েছে। জলঢাকায় যে ইরেকশনের কাজটা অর্ধেক বন্ধ রাখতে হয়েছে সেটার বিল আটকে দিয়েছে, লেবাররা ক্ষেপে আছে, যাওয়া যাচ্ছে না।

নিজের দুখানা হাতের দিকে অন্যমনে একটু চেয়ে থাকেন দিগিন, শানুর কোনো কথাই তাঁকে স্পর্শ করে না। জলঢাকা এম-ই-এস, সোপস্টোন, টাকা, বিল, এসব কথা একটা জীবনে

তিনি অনেক ভেবেছেন। এখন আর ভাবতে ভাল লাগে না। জীবনে সব কিছুরই একটা কোটা থাকে। তাঁর কোটা ফুরিয়েছে। আর কিছু করার নেই বোধহয়।

দিগিন তাঁর চিন্তান্বিত মুখখানা তুলে বলেন—আমার অনেক দোষ ছিল। ছিল কেন বলি, এখনো আছে। লোকে বলে, আমার ন্যায় বলে বস্তু নেই। কিন্তু আমার সদ্‌গুণেরও কিছু অভাব ছিল না। আমি সেই জোরেই দুহাতে টাকা রোজগার করেছি। রাতারাতি বড়লোক হওয়ার কোন শর্টকাট রাস্তা আমার জানা নেই। বাজে ফাটকায় বা অনিশ্চিত ব্যাপারে আমিও কিছু ক্ষতি স্বীকার করেছি, কিন্তু কোনো ব্যাপারেই আমার ফাঁকির ফিকির ছিল না। তাই আজও আমি টাকার ওপরে বসে আছি। তোমাদের আমলে তোমরা এই টাকার পাহাড় ধসিয়ে দেবে।

শানু মাথা নিচু করে থাকে। তারপর আস্তে করে বলে—চেষ্টা তো আমিও কিছু কম করি না।

—কালিম্পঙে তোমার এখন কী কাজ হচ্ছে?

—একটা ব্রীজ কনস্ট্রাকশন, তুমি তো জানোই।

—জানি। কিন্তু সে বাবদে তোমার সেখানে গিয়ে পড়ে থাকার মানে হয় না। কাল আমি নিজে সেখানে যাবো। তুমি জলঢাকায় যাবে। ইরেকশনের কাজটা শেষ করতেই হবে, মনে রেখো।

—লেবাররা ছেড়ে দেবে না! ওদের অনেক টাকা বাকী পড়ে গেছে।

—সেজন্য কে দায়ী?

—আমরা নই। ইরেকশনের ভুলটা ডিটেকটেড হয়েছে অনেক পরে। এখন নতুন করে করতে গেলে খরচ দ্বিগুণ হত। তাই আমরা ছেড়ে এসেছি।

—খরচের ভয় পেলে চলবে কেন? আমার নাম কোম্পানির সঙ্গে জড়িয়ে আছে, তার গুডউইল নষ্ট করার তুমি কে? কাল তুমি জলঢাকা যাবে।

শানু চুপ করে থাকে।

দিগিন বলেন—বুঝেছ ?

শানু মাথা নাড়ল।

—কালিম্পঙে তোমাকে আর যেতে হবে না।

শানু মাথা তুলে বলে—জলঢাকায় কাজটা আবার হাতে নিলে আমরা সর্বস্বান্ত হয়ে যাবো।

—হলে হবো। তোমাকে ভাবতে হবে না।

—ছোটকাকা।

—বলো।

—আর একটু ভেবে দেখো।

—ভাববার কিছু নেই। কাজটা করতে হবে।

—একটা পয়সাও আসবে না, ঘরের টাকা চলে যাবে।

—জানি। আমি বোকা নই।

—তবু যেতে বলছ ?

দিগিন রাগের গলায় বলেন—শুনতেই তো পাচ্ছ।

—ঠিক আছে।

—যদি লেবাররা গোলমাল করতে চায় তাহলে কী করবে ?

—কিছু ঠিক করতে পারছি না।

—ব্যাঙ্ক আওয়ার্সের পরে রওনা হয়ো। টাকা নিয়ে গিয়ে প্রথম লেবার পেমেণ্ট করবে। আমাদের ওয়ার্ক অর্ডার এখনো ক্যানসেল করে নি, সুতরাং বাকীটা করতে ঝামেলা হবে না। আমি চেক লিখে রাখছি।

শানু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলে—আচ্ছা।

—মনে রেখো লেবার পেমেণ্ট সবার আগে।

—আচ্ছা।

—আর সোপস্টোনের ব্যাপারটা তোমাকে ছেড়ে দিতে বলেছি। তুমি কিছু ভেবেছ ?

—অনেক টাকা ইনভেস্ট করেছি।

—তবু ছেড়ে দাও।

—এটাতে তোমার টাকা ছাড়াও পার্টনারদের টাকা আছে। তারা কী বলবে ?

—কী বলবে ? যদি সন্দেহ করে তবে পার্টনাররা ইনিশিয়েটিভ

নিক। তুমি ওটাতে আর টাকা ঢেলো না। ভুটান গভর্নমেন্ট দর কমাবে না।

—ভেবে দেখি।

—দেখ! আর শোনো, যদি ময়নাকে তোমার কাকীমা বলে ডাকতে ইচ্ছে হয় তো ডেকো। কিন্তু ওকে তোমার স্বার্থে জড়িও না।

শানু মুখটা তুলেই নামিয়ে নেয়।

দিগিন বলেন—বুঝেছ?

শানু মাথা নাড়ল। বুঝেছে।

—ময়না আমাকে সবই বলেছে। কিছু গোপন করে নি।

দিগিন উঠে দরজার দিকে যেতে যেতে একবার থমকে দাঁড়ালেন। শানুর দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন—কিছু বলার আছে?

শানু তার ছোটকাকাকে চেনে। ভালমানুষ, স্নেহশীল, কিন্তু তবু ছোটকাকা যা চায় সংসারে তাই শেষ পর্যন্ত হয়। কখনো ঈশ্বর, কখনো শয়তান এই মানুষটাকে শানু খুব ভাল করে চেনে, আবার আদৌ চেনেও না। শানু তাই স্থাণুবৎ দাঁড়িয়ে থাকে, তারপর হঠাৎ বলে—তুমি যা চাও তাই তো হয় ছোটকাকা।

—তাই হবে।

শানু শ্বাস ফেলে বলে—আমি প্রতিবাদ করছি না।

—আমিও অবিহিত কিছু করছি না।

—কালিম্পঙে আমার যাওয়াটা তুমি বন্ধ করতে চাও কেন?

দিগিন ভ্রূ কুঁচকে তাকালেন। বললেন—বুঝে দেখ।

—আমি খারাপ কিছু করছি না।

—তবে ময়নার আশ্রয় চেয়েছ কেন? সেখানে আমি তো যাই। আমার চোখ এড়াবে কী করে?

শানু চুপ করে থাকে।

দিগিন শান্ত গলায় বলেন—তুমি ভেবেছিলে তোমার ছোটকাকা যখন ময়নার সঙ্গে একটা অবৈধ সম্পর্ক রেখেছে তখন নিজের দুর্বলতাবশতঃ তোমার যে কোনো ভাগিয়ে আনা মেয়েকেও সহ্য করবে?

শানু চুপ।

—বলো, তাই ভেবেছিলে ?

—না।

—তবে ময়নার কাছে তাকে রাখতে চেয়েছিলে কোন্ সাহসে ?

—আমি তোমাকে যথাসময়ে বলতাম।

—না বললেও আমি জেনেছি। বলে রাখছি, তা হবে না।

—ঠিক আছে। বলে শানু মুখ ফিরিয়ে নেয়।

দিগিন বলেন—কী ঠিক আছে? স্পষ্ট করে বলো।

—আমি কাকীমার কাছে ওকে রাখবো না।

- তাহলে কোথায় রাখবে ?

অন্য কোথাও।

—রাখবেই ?

শানু চুপ করে থাকে।

দিগিন আস্তে করে বলেন—না।

শানু তাকায়, বলে—উপায় নেই ছোটকাকা।

দিগিন উত্তেজনাটা রাশ টেনে ধরেন। বলেন—তুমি কাল যাচ্ছ কিনা ?

—যাচ্ছি তো বললাম।

দিগিন মাথা নাড়েন। বলেন—কালিম্পঙ আর এম-ই-এস-এর কাজ আমি দেখব। ঠিক আছে ?

শানু মৃদুস্বরে বলে—কিন্তু কালিম্পঙে তুমি যে জন্যে যাচ্ছ তা হবে না।

—কী জন্যে যাচ্ছি তা বুঝলে কী করে ?

—বুঝেছি। তুমি গোলমাল কোরো না। লাভ হবে না।

দিগিন হাসেন, বলেন—শানু, দিগিন চ্যাটার্জি এখনো বহুকাল বাঁচবে।

শানু উত্তর দিল না।

দিগিন ধীরে ধীরে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে তাঁর ঘরে চলে আসেন। একটু ঠান্ডা পড়েছে আজ। একটা চাদর নিয়ে বিছানায় যাওয়ার আগে বীয়ার দিয়ে দুটো ঘুমের বড়ি খেলেন। বাতি নিভিয়ে কাচের শার্শি দিয়ে চেয়ে রইলেন উত্তরদিকে। পাহাড় মুছে গেছে। একটা অদ্ভুত জ্যোৎস্না উঠেছে। কুয়াশার আবছায় ডুবে আছে

শহর। নেশাটা আজ ধরছে না তেমন। তবু হাই উঠছে। ঘুম পাচ্ছে। তবু ঘুমোতে ইচ্ছে করে না। সংসারে কিছুই তাঁর নয়। তবু সবই তাঁকে কেন যে ভাবতে হয়।

ঘুম চোখেই দুটো চেক লিখলেন দিগিন। একটা পুন্নির বাবার নামে। অন্যটা চ্যাটার্জি কন্‌স্ট্রাকশনের শান্তি চ্যাটার্জির নামে। চেক দুটো সই করে রেখে দিলেন টেবিলে।

শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন।

ভোরবেলা একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলেন তিনি। সেবকের করোনেশন ব্রীজের ওপর দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। পায়ের নিচে, বহু নিচে তিস্তা। তিস্তার দুধারে খাড়া পাহাড় দুটোকে আঁকড়ে ধরে ঝুলছে বিখ্যাত করোনেশন ব্রীজ। হঠাৎ দেখেন একটু দূরে দুই পাহাড় থেকে কে যেন একটা দোলনা দুলিয়েছে। সেই দোলনায় ঝুল খাচ্ছে একটা লোক। লোকটা চেনা। বহুকাল আগে শিলিগুড়িতে যখন প্রথম এসেছিলেন তখনকার চেনা। ফটিক লাহিড়ি। লাহিড়ি দোল খাচ্ছে, আর ভয়ে চীৎকার করছে। দিগিন হাতের রাইফেল তুলে লাহিড়িকে একবার নিশানা করে গুলি করলেন। ফসকাল, দিগিন আবার নিশানা স্থির করেন···পর পর কয়েকটা গুলি করেন দিগিন। লাগল না, কিন্তু লাহিড়ি চীৎকার করতে লাগল।

ঘুম ভেঙে যায় অস্বস্তির সঙ্গে। শুনতে পান দকলীর মা চেঁচিয়ে সুর করে গাইছে, ও স্বামী তুই মর, ও স্বামী তুই মর। বোধহয় মাথাটা আবার গরম হয়েছে। সারাদিনই হাসে, কাঁদে, গায়। দকলীর বাপ চীৎকার করে ধমকাল। অশান্তি। সংসার জিনিসটার রহস্য কখনো বোঝেন নি দিগিন। ঘুমভাঙা চোখে তিনি একটু অবাক হয়ে হঠাৎ ফটিক লাহিড়ির কথা ভাবলেন। লাহিড়িকে স্বপ্ন দেখার কোনো মানেই হয় না। বহুকাল আগে লাহিড়ি মারা গেছে, গুলি খেয়ে নয়, সাধারণ কতগুলো রোগে ভুগে। তাকে এতকাল পরে স্বপ্নে দেখার মানে কী?

রাতে ভাল ঘুম হয় নি। সেই যে লাহিড়িকে স্বপ্নে দেখে ঘুম ভাঙল তারপর থেকে দিগিন জেগেই ছিলেন।

সকালে পুন্নি যখন চা করতে এল তখন দিগিন উত্তরমুখো ইজিচেয়ারে বসে নিজের পায়ের পাতার ফাঁক দিয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখছেন। চোখে কটকট করে আলো লাগছে।

পায়ের পাতায় কাঞ্চনজঙ্ঘা ঢেকে দিগিন বলেন—আমার চায়ে দুধ-চিনি দিস না।

—কেন?

—লিকার খাবো।

পুন্নি তাই এনে দেয়।

দিগিন চায়ের লিকারে খানিকটা হুইস্কি মিশিয়ে খেলেন। চুরুট ধরিয়ে নিলেন। শরীরটা ভাল নেই। কালিম্পঙ যেতে তাঁর মোটেই ইচ্ছে করছে না। কোথাও যেতে ইচ্ছে করছে না।

কুণ্ঠিত পায়ে শানু এল। পরনে বাইরে যাওয়ার পোশাক। মুখটা একটু শুকনো।

—ছোটকাকা।

—উঁ।

—ঘুমোচ্ছ?

—না।

—আমি জলঢাকা যাচ্ছি।

—কেন?

—তুমি বললে যে।

—ও।

—যাচ্ছি।

—যাবে? যাও।

—চেকটা লিখে রেখেছ?

—হ্যাঁ। টেবিলের ওপর আছে। নিয়ে যাও।

শানু টেবিলের কাছে যায়। চেকটা নেয়। দিগিন ক্লান্তভাবে কাঞ্চনজঙ্ঘার দিকে চেয়ে থাকেন। চেকটা আজ ক্যাশ হয়ে যাবে, তারপর যা থাকবে তা ক্যাশ করে নেবে পুন্নির বাবা। তারপরও কিছু থাকবে। কিন্তু সে খুব বেশী কিছু নয়।

—সেভিংস অ্যাকাউণ্টের চেক! এত টাকার চেক কি বিনা নোটিসে ক্যাশ করবে? শানু জিজ্ঞেস করে।

দিগিন বুঝতে পারেন ভুল করে সেভিংসের চেক সই করেছেন কাল, আজকাল বড় ভুলভাল হচ্ছে।

ভ্রূ কুঁচকে বললেন—করবে। ভটচাযকে একটা পার্সোনাল চিঠি লিখে দিচ্ছি। প্যাডটা দে আর কলমটা।

শানু প্যাড এনে দেয়। দিগিন খস্‌খস্‌ করে দু'লাইন লিখে দেন। শানু চলে যেতেই আবার ক্লান্তভাবে বসে থাকেন। সামনে আজ স্পষ্ট ও পরিষ্কার কাঞ্চনজঙ্ঘা। বরফাচ্ছন্ন, নিঃশব্দ, ভয়াল, ভয়ঙ্কর। দিগিন চেয়েই থাকেন। কত বছর ধরে তিনি হিমালয়কে দেখেছেন আর দেখেছেন। ঐ নিস্তব্ধতা কতবার তাঁকে কাছে টেনেছে। আজ যেন হিমালয় ছেড়ে তাঁর কাছেই চলে আসছে তুষারশুভ্র নিস্তব্ধতা। তিনি অপলক চেয়ে থাকেন পাহাড়ের দিকে।

কাল রাতে কেন ফটিক লাহিড়িকে স্বপ্ন দেখলেন তিনি? কোনো মাথামুণ্ডু নেই। তাঁর জীবনের সঙ্গে ফটিক লাহিড়ির কোনো যোগাযোগ নেই।

পুন্নির বাপকে ডেকে পাঠালেন।

পুন্নির বাবা এসে দাঁড়াতে তেমনি ভটচাযকে দু'লাইনের চিঠি সমেত চেকটা দিয়ে বললেন—এটা আজই ক্যাশ করবেন।

চেকটা দেখে পুন্নির বাবা অবাক হয়ে বলেন—এখনই কেন?

—আমি কালিম্পঙ যাচ্ছি আজই। বেশ কিছুদিন থাকব না। যদি ছেলের বাবা আসে তবে টাকাটা যে কোনো অজুহাতে শো করবেন।

পুন্নির বাবা মাথা চুলকোন। অনিচ্ছুকভাবে বলেন—আচ্ছা।

দিগিন আর কোনো দিকে মনোযোগ দেন না। বেশ কিছুদিন থাকব না—এ কথাটা তিনি কেন বললেন? কালিম্পঙে তাঁর তো থাকার কথা নয়! পুন্নির বাবা চলে যান। দিগিন সবিস্ময়ে আবার কাঞ্চনজঙ্ঘার নিস্তব্ধতার দিকে চেয়ে থাকেন। কালিম্পঙে যদি যেতে হয় তবে এক্ষুণি তোড়জোড় করা দরকার। জিনিসপত্র গোছাতে হবে, জীপটা রেডি রাখতে হবে, দু'চার জায়গায় দেখা করেও যেতে হবে। কিন্তু সেসব জরুরী কাজ পড়ে থাকে। দিগিন পুন্নিকে ডেকে এক কাপ চা করতে বলে বসে থাকেন চুপচাপ।

ফটিক লাহিড়ির কথা অকারণে কেন যে মনে হচ্ছে। সরু মাদ্রাজী চুরুটের ধোঁয়ার গন্ধের মধ্যে বসে থাকেন দিগিন। সামনে সোনালী সাদা কাঞ্চনজঙ্ঘার ওপর নীল আকাশ।

টাকা—এই শব্দটাই অদ্ভুত। মানুষের ভিতরে ঐ শব্দটা ঢুকে গেলেই টরেটক্কা বেজে উঠতে থাকে, মানুষ আর মানুষ থাকে না।

মোটরসাইকেলটার একটা পিন ভেঙেছে। পাঁচ দশ টাকার মামলা। অমর সিংয়ের গ্যারেজে সারাতে দিয়ে দিগিন রাস্তায় পায়চারি করেন। মিস্ত্রীটা উঠে এসে বলল—একটু সময় লাগবে। আপনি চলে যান না, সারিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

দিগিন লোক চেনেন। চোখের আড়াল হলেই ওদের জো। তখন পিন-এর সঙ্গে এটা ভেঙেছে, ওটা পুরোনো হয়েছে, সেটা পাল্টানো দরকার বলে নানারকম সারাইয়ের ফিরিস্তি দিয়ে বিল পাঠাবে বাড়িতে।

দিগিন মাথা নেড়ে বললেন—না রে, জেলখানায় ঢালাইয়ের কাজ হবে, এক্ষুণি যাওয়া দরকার।

উত্তর দিকে চেয়ে একটু দাঁড়িয়ে থাকেন দিগিন, শরতের মেঘ কাটা আকাশ। বর্ষার জলে বাতাসের ধুলোকণা ধুয়ে গেছে। পরিষ্কার আকাশ দেখা যায়, আর ঝকঝকে পাহাড়। সামনের পাহাড়ের রঙ মোষের গায়ের মতো ভূষকো, তার পিছনে রুপোর কাঞ্চনজঙ্ঘা। ডানদিকে আরো কয়েকটা রুপোলী চূড়া, কত বছর ধরে দেখছেন, তবু পুরোনো হয় না।

উত্তর বাংলার কিছুই পুরোনো হয় না। তবু কিছু কিছু হারিয়ে গেছে, মানুষের অবিমৃষ্যকারিতায়, ন্যারোগেজের একটা লাইন ছিল কালিম্পঙের দিকে, নদীর ধার দিয়ে, পাহাড়ের কোলে কোলে যেত ছোট্ট রেলগাড়ি গেইলখোলা পর্যন্ত। দার্জিলিঙের মতো অতো চড়াই-উৎরাই ছিল না, ছিল না অত রিভার্স আর লুপ। মায়াবী মাঠ প্রান্তর, ছোটো ছোটো কুয়াশায় ঢাকা পাহাড়, নদীর খাত বেয়ে সেই ছোটো ট্রেন বয়ে আনত সিকিমের কমলালেবু, কাঠ, আপেল। সেই লাইন নাকি তেমন লাভজনক হচ্ছিল না,

তাই রেলকোম্পানী লাইন তুলে দিল। ঐ স্বপ্নের রেলগাড়ি উঠে যাওয়ার পর বহুকাল দিগিনের মন খারাপ ছিল। মংপু বা কালিম্পঙে যেতে হলে বরাবর ঐ ট্রেনে চেপে যেতেন দিগিন। রিয়াত স্টেশন থেকে একটা রোপওয়ে ছিল। সেই রোপওয়ে দিয়ে মাল এবং মানুষ দুইই যেত। দিগিনও গেছেন। আর যাওয়া যেত খচ্চরের পিঠে। তখনো কালিম্পঙে মোটরগাড়ির রাস্তা হয় নি। কিছুক্ষণ যেন রূপকথার রাজ্যে থেকে আসতেন। মাঝপথে একটা স্টেশন ছিল—নামটা মনে পড়ছে না–বহুকাল হয় উঠে গেছে। এক দুপুরে গাড়িটা দাঁড়িয়ে দম নিচ্ছে, দিগিন চা খেতে নামলেন। তখন যৌবন বয়স। প্ল্যাটফরমের গায়ে প্রচণ্ড কৃষ্ণচূড়া ফুটেছে। ছোট্ট কাঠের স্টেশন ঘর, চারদিকে খেলনা-খেলনা ভাব, ছোটো লাইন, ছোটা সিগন্যাল, ছোটো নিচু প্ল্যাটফর্ম। তার চারদিকে সেই খেলাঘরের স্টেশন, ডানদিকে নদীর খাত, দুধারে পাহাড়ের বিশাল ঢাল। দিগিন চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছিলেন, দেখলেন কৃষ্ণচূড়া গাছটার নিচে একটা বাচ্চা ছেলে দাঁড়িয়ে। আড়াই কি তিন বছর বয়স, গোলগাল চেহারা, শীতের চিমটিতে গালদুটো লাল, ফাটা গা। শীতের সোয়েটার গায়ে, পরনে প্যান্ট। কিন্তু দুষ্টু ছেলে সোয়েটার টেনে তুলে ফেলেছে বুকের ওপর, পেটটা উদোম। দু মুঠিতে কিছু কাঁকর আর ধুলো কুড়িয়ে নিয়েছিল। তারপর হঠাৎ খেলা ভুলে চেয়ে আছে দূরের দিকে। দুই পাহাড়ের মাঝখানের খাত বেয়ে গর্জে চলেছে দুরন্ত ফেনিল তিস্তা, তার দুরন্ত শব্দ গমগম করে প্রতিধ্বনি হয়ে আসছে। কাজলপরা দুই চোখে শিশু হাঁ করে দেখছে, কতকাল আগেকার সেই দৃশ্য, আজও ভোলেন নি দিগিন। বড় মায়া ঘনিয়ে উঠেছিল বুকে। সেই শিশুটির ধারে কাছে কেউ ছিল না। একা। খেলতে খেলতে খেলা ভুলে একা মুগ্ধ-বিস্মিত চোখে দেখছে। দিগিন হাতের কাপে চুমুক দিতে ভুলে গেলেন, গাড়ির হুইশল যতক্ষণ না বাজল ততক্ষণ ভিখিরির মতো, কাঙালচোখে চেয়ে রইলেন তার দিকে। কোলে নেন নি, আদর করেন নি। কিন্তু আজও এত বছর পরেও প্রায়ই যখন মনে পড়ে, তখন'কত আদর যে করেন। সে কতো বড় হয়েছে এখন, সংসারীও হয় নি কি। কিন্তু সেসব মনে হয় না।

কেবল দিগিনের মনের মধ্যে শিশুটি আজও অবিকল ঐ কয়েক মুহূর্তের ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে, দুহাতে দুমুঠো ধুলো, আদুড় পেট, চোখ লেপটানো কাজল, আর তার চারধারে বিশাল পাহাড়, গতিময় প্রচণ্ড নদী, তার শব্দ, একা সে দাঁড়িয়ে।

চোখে কেন জল আসে! দৃশ্যটা ভাবলেই আসে, অথচ করুণ দৃশ্য তো নয়! তবে বুঝি সৌন্দর্য জিনিসটাই ওরকম, বুক ব্যথিয়ে তোলে! নাকি, শিশুটি নাড়া দেয় অক্ষম পিতৃত্বকে? কী হয়, কে জানে! একটা কিছু হয়। নিজের সঙ্গে মিল খুঁজে পান নাকি। পৃথিবীর অঢেল সম্পদ নিজের জন্যে খেলার ছলে আহরণ করতে করতে তিনি নিজেও কি মাঝে মাঝে খেলা ভুলে চেয়ে থাকেন না কাঞ্চনজঙ্ঘার দিকে!

সেই লাইন নেই, গাড়ি চলে না, স্টেশন কবে উঠে গেছে। তবু রয়ে গেছে একটি বীজ! কবে যেন অতীতের বাতাসে খসে পড়েছিল দিগিনের হৃদয়ে। আজ বয়সের বর্ষা পেয়ে ডালপালা ছড়িয়েছে, দৃশ্যটা ভোলেন নি দিগিন।

দিগিনের পাশ দিয়ে একটা জীপগাড়ি চলে যেতে যেতে থামল। দিগিন মুখ তুলে দেখলেন, তাঁরই জীপ, শানুই এখন এটা ব্যবহার করে। ড্রাইভার রমণীমোহন গাড়িটা সাইড করিয়ে রাখল। জীপের পিছন থেকে কপিল নেমে এল।

কালো বেঁটে এবং মজবুত চেহারা কপিলেব, চোখে ধূর্তামী, মুখে একটু নির্বিকার শয়তানী ভাব, বহুকাল কপিল দিগিনের কারবারে আছে।

কপিল দিগিনকে জানে। দিগিনও কপিলকে জানেন। এই জানাজানির ব্যাপারটা বহুকাল ধরে হয়ে আসছে। আজও শেষ হয় নি।

শিলিগুড়ির তল্লাটে কপিলের নাম কীর্তনিয়া বলে। ভালই গায়। বিভোরতা আছে, ভক্তিভাব আছে। অবরে সবরে গাঁ গঞ্জ থানা থেকে তার ডাক আসে। ছোটো মাপে সেও নামজাদা লোক। নিজের সেই মর্যাদা সম্পর্কে সে সচেতনও! মুখখানা সবসময়েই গম্ভীর হাসিহীন। কথা-টথা কমই বলে। একমাত্র দিগিন ছাড়া সে আর কারও বড় বাধ্য নয়। শানু ওকে

সামলাতে পারে না, প্রায়ই দিগিনকে এসে বলে—তোমার কপিলকে নিয়ে আর পারা যায় না, ওকে তাড়াও।

দিগিন তাড়ান না।

সে আজকের কথা তো নয়। তখন সাহেবদের আমল। শিলিগুড়ি টাউন স্টেশনে পুরোনো আমলের ব্রডগেজের দার্জিলিং মেল এসে থামত সকালবেলায়। সাহেবদের বড় প্রিয় ছিল দার্জিলিং। ফার্স্ট ক্লাস বোঝাই লাল রাঙা সাহেবরা নামত কুকুর, মেমসাহেব আর নধর বাচ্চাদের নিয়ে। সরাবজীর জাল-ঢাকা চমৎকার রেস্টুরেন্টে বসে ব্রেকফাস্ট খেত। তারপর দার্জিলিঙের ছোটো গাড়িতে উঠত। টাউন স্টেশন তখন ঝকঝক করত। এখনকার মতো পাঁজরা সার হায়-হতভাগা চেহারা ছিল না। কপিল ছিল সেই সময়কার টি-আই সাহেবের সেলুন বেয়ারা। অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান টি-আই সাহেব লোক খারাপ ছিল না, কিন্তু কপিলটা ছিল হাড় হারামজাদা। সরাবজী থেকে সাহেবের নাম করে দু-বোতল বিলিতি হুইস্কি হাতিয়েছিল, তাই চাকরি যায়। চাকরি যাওয়ার পর কিছুকাল বড় কষ্টে গেছে। সেই কষ্টের দিনে একটামাত্র মেয়ে মল্লিকাকে রেখে কপিলের বৌ মরল। মল্লিকা তখন দু আড়াই বছরের, মা মরা, একলা। কপিল সেই মেয়ে রেখে কোথাও যেতে পারত না। পায়খানা পেচ্ছাপের সময়েও মেয়েকে কোলে নিয়ে গিয়ে বসত। আবার বিয়ে করবে তেমন মুরোদ নেই, নিজেরই তখন প্রায় ভিক্ষে-সিক্ষে করে চলছে।

তখন দিগিনের বাড়ি আসত। ঘরদোর সাফ-সুতরো করত, পয়সাকড়ি হাতাত, ফাঁক পেলে চুরি করে দিগিনের বোতল ফাঁক করত। এখন দিগিনের বাড়িতে যেখানে বড়দাদা পাকা বাড়ি তুলেছে সেখানে কপিল একদা চমৎকার একটা বাগান করেছিল, মল্লিকাফুল যে আসলে বেলফুল তা কপিলই শিখিয়েছিল দিগিনকে। কপিলের জন্য দিগিনের মায়াদয়া তেমন ছিল না, ছিল ঐ মেয়েটার জন্য। ট্যাপাটোপা দেখতে ছিল মেয়েটা, বাপ দিগিনের বাগান করত, মেয়েটা বাপের কোপানো জমির মাটির ঢেলা ছোটো দুই হাতে চৌরস করত দিনভর রোদে বসে। বাপ ঘর ঝাঁট দিচ্ছে তো সেও একটা ন্যাতা বুলিয়ে কাঠের মেঝে মুছতে লাগত নিজের মতো

করে। বদলে বাপ-বেটিতে পেটভরে ভাত খেত দুপুরে, রাতের ভাত গামছায় বেঁধে নিয়ে যেত। তখন মাঝে মাঝে রাঁধতও কপিল. মুরগীর ঝোল, ডিমের ডালনা, খিচুড়ি।

মেয়েটাই ছিল কপিলের জীবনসর্বস্ব। মেয়ে কাঁধে সর্বত্র চলে যেত সে। কাছ ছাড়া করত না। গ্রামে গঞ্জে মেয়ে সঙ্গে করেই কীর্তন করে বেড়াত। বাপের গায়ের গন্ধে, শরীরের ছায়ায় মেয়েটা পাঁচ বছর পর্যন্ত বেড়ে উঠল। তারপর ধরল ম্যালেরিয়ায়। ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়ার এক ধাক্কায় নিভে গেল মেয়েটা। মেয়েহারা বাপ সক্কালবেলায় কারো কাছে না গিয়ে খবরটা দিতে এল দিগিনকে। ডাকে নি, শব্দ করে নি। দিগিন তখনো ওঠেন নি ঘুম থেকে, শেষরাতে এসে ঠায় দাঁড়িয়েছিল টংগী ঘরের বারান্দায়। শিলিগুড়ির সেই দুর্দান্ত শীতে গায়ে গেঞ্জীর ওপর কেবলমাত্র চ্যাটার্জি সাহেবের বুড়ি পিসি কীর্তন শুনে মরার আগে যে নামাবলীটা দান করে গিয়েছিলেন কপিলকে, সেইটে জড়ানো। দাঁড়িয়ে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে আছে। বাক্যহারা, বোধবুদ্ধি নেই, কেবল ঢোঁক গিলছে আর থুথু ফেলছে। পাড়াপ্রতিবেশীরা আর কীর্তনের দলের বন্ধুরা মেয়েটাকে নিয়ে গেছে শ্মশানে। এই সময়টায় সারা দুনিয়ার মধ্যে কপিল কেবল দিগিনকে মনে রেখে তারই কাছে চলে এসেছিল।

আজও কপিলের দিকে তাকালে সেই কপিলকে দেখতে পান দিগিন। শানু তাড়াতে বলে। তাড়ানো কি সোজা? সেই মেয়েহারা বাপটিকে আজও দিগিন মনের কপাট খুললেই দেখতে পান যে।

দিগিন জানেন, কপিল লোক ভাল নয়। চুরি-চামারি তো আছেই, চরিত্রের অন্য দোষও আছে। মেয়ে মরার পর কপিলকে নিজের কারবারে রাখলেন দিগিন। নানারকম কনস্ট্রাকশনের কাজে বহু হাজার টাকার মালপত্র এখানে সেখানে পড়ে থাকে। সেসব পাহারা দেওয়ার জন্য চৌকিদার রাখতে হয়। সে আমলে নেপালীরাই এই কাজ করে বেড়াত। দিগিনেরও কয়েকজন নেপালী চৌকিদার ছিল। তাদের দলে কপিলকে ভিড়িয়ে নিলেন, কাঙালকে শাকের ক্ষেত দেখিয়ে দেওয়া হল। কৃতজ্ঞতাবোধ কিছু

কমই ছিল কপিলের। রড, সিমেন্ট, কাঠ, রং, সে কিছু কম চুরি করে নি। তবু দিগিনের প্রতি তার একরকম আনুগত্য আর ভালবাসা আছে। জিনিস না বেচলে তার চলত না। ধরলে টপ করে স্বীকার করত।

নেপালী আর ভুটিয়ার মিশ্রণে দো-আঁশলা একটা লোক একবার একটা চায়ের দোকান করেছিল মহানন্দা ব্রীজের উত্তরে। খুবই রহস্যময় দোকান। লোকটার এক ছুকরি বউ ছিল, নাম ছিপ্‌কি। দু গালে অজস্র ব্রণ, রোগাটে চেহারা। অনাহার এবং অর্ধাহারের গভীর চিহ্ন ছিল চোখের কোলে, গালে। রহস্যময় সেই দোকানের সামনের দিকে সেই দো-আঁশলা লোকটা রুটি, চা, বিস্কুট এবং ডিম বেচত। আর পিছনের খুপরিতে বিক্রি হত ছিপ্‌কি, আর চোলাই। সঙ্গে মেটে চচ্চড়ি কি তেলেভাজা। একটু নীচু শ্রেণীর মানুষেরাই ছিল সেই দোকানের খদ্দের। সন্ধ্যেবেলা বেশ ভিড় হত। ছিপ্‌কি তার স্বামীর সঙ্গে সামনের দোকান সামলাত, চোখে কাজল, চুল খোঁপা করে বাঁধা, হাতে কাঁচের চুড়ি, রঙীন সস্তা শাড়ি পরনে, খুব হাসত আর চোখ হানত। ভিতরের ঘর থেকে মাতালদের স্খলিত গলার নানান শব্দ আসত। ছিপ্‌কির স্বামী মাঝে মাঝে উঠে গিয়ে নোংরা পর্দার আড়ালে চোলাইয়ের খদ্দেরদের পরিচর্যা করে আসত। লোকটা ছিল আধবুড়ো, খুব গম্ভীর, দার্শনিকের মতো মস্ত কপাল ছিল তার। এক সময়ে মিলিটারির ল্যান্স নায়ক ছিল বলে শোনা যায়। মিলিটারির মতোই আবেগহীন স্বভাব ছিল তার। পরনে চাপা পাজামা, গায়ে কোমরের বহু ভাঁজের কাপড়ের বন্ধনীতে গোঁজা থাকত কুক্‌রি। নেপালীরা কোমরে যে চওড়া করে কাপড়ের বন্ধনী বাঁধে তার একটা কারণ পেটটাকে গরম রাখা। পাহাড়ী অঞ্চলে পেটে ঠাণ্ডা লেগে এক রকমের হিল-ডয়েরিয়া হয়, সহজে সারে না। দিগিনও পাহাড়ে গেলে কোমরে পেট ঢাকা কাপড় বাঁধতেন নেপালীদের দেখাদেখি।

মাতাল আর চা-পিপাসুদের সকলেই ছিপ্‌কিকে চাইত। কিন্তু সকলের পকেটে তো পয়সা নেই। যাদের আছে তারা একটু বেশী রাতের দিকে ছিপ্‌কির স্বামীর সঙ্গে দরদস্তুর ঠিক করে নিত। পিছনের খুপরিতে চলে যেত ছিপ্‌কিকে নিয়ে। সামনের

দোকানটায় লোকটা নির্বিকার বসে থাকত, তার সামনে উনুনে চায়ের জল ফুটছে, একটা ঘেয়ো কুকুর বসে আছে দোরগোড়ায়। সামনে অন্ধকার, নদীর জল ছুঁয়ে ঠাণ্ডা বাতাস বয়ে যাচ্ছে। এই রকমই ছিল লোকটা।

কপিল সেখান থেকে গরমী রোগ নিয়ে আসে। দিগিন তাকে দুবার চিকিৎসা করে ভাল করলেন। অবশ্য চিকিৎসার খুব সুবিধে হয়ে গেছে আজকাল। সিফিলিসের অমোঘ ওষুধ পেনিসিলিনে বাজার ছাওয়া। কিন্তু দিগিন সেটুকু করে ক্ষান্ত হন নি। মহানন্দা পুলের কাছে ঐ দোকানটা যেতে আসতে চোখে পড়ত, ভিড় দেখতেন, ছিপ্‌কিকেও দুচারবার লক্ষ্য করেছেন, কপিলকে সেখানে প্রায়ই দেখা যেত।

একদিন শীতকালে শালবাড়ি থেকে ফেরার পথে জীপ থামালেন। হাড় ভেঙে যাচ্ছে উত্তুরে বাতাসে! অন্তত চার পাঁচ পেগ নীট হুইস্কি ছিল পেটে! মেজাজটা দুরন্ত ছিল। সোজা দোকানে ঢুকে জিজ্ঞেস করলেন···কী পাওয়া যায়?

সে রাতে ছিপ্‌কির বোধহয় খদ্দের জোটে নি। সাজগোজ করে একটা ভুটিয়া ফুলহাতা মেয়েলী সোয়েটার পরে ঘোমটায় কান মুখ ঢেকে আগুন পোহাচ্ছিল। লোকটা একটা ছুরি দিয়ে পেঁয়াজ কুঁচিয়ে রাখছে। দুচার জন চায়ের খদ্দের বসে হাঁ করে ছিপ্‌কিকে দেখছিল, বিনা পয়সায় বিনা বাধায় যতটা দেখা যায়। ইয়ার্কি-টিয়ার্কিও বোধহয় করছিল, কারণ দিগিন যখন ঢোকেন তখন ছিপ্‌কি একজনের দিকে চেয়ে হাসছিল। দিগিন দেখলেন মেয়েটির হাসি বড় চমৎকার। মুখটা পাল্টে যায়। কিশোরীর মতো সরলহৃদয়া হয়ে ওঠে। দিগিনকে অনেকে চেনে, দোকানে ঢোকা মাত্র খদ্দেরদের কয়েকজন পয়সা দিয়ে পালিয়ে গেল। এক আধজন যারা বসে ছিল তারাও গরম চা হুস্ হাস করে মেরে দিয়ে উঠে গেলে ছিপ্‌কির চোখে একটু বিস্ময় ফুটে উঠেছিল, সামনে জীপ্ দাঁড়িয়ে, দিগিনের মতো সুপুরুষ চেহারার মানুষ, লোকটার চারদিকে যেন টাকা আলো দিচ্ছে, এ মানুষ এখানে কেন?

ছিপ্‌কির স্বামীর সেসব নেই। দিগিন জিজ্ঞেস করলেন দ্বিতীয়বার—কী পাওয়া যায় এখানে?

লোকটা উনুন থেকে একটা সিগারেট ধরিয়ে নির্বিকার গলায় বলে—চা, রুটি, ডিম।

—আর কিছু না?

লোকটা দিগিনের দিকে তাকাল না। মাথা নাড়ল। না।

দিগেনের পেটে হুইস্কিটা তখন কাজ করছে, হাতের দস্তানা দুটো খুলে রেখে বেঞ্চে বসে বললেন—মাংস পাওয়া যায় না? মেয়েমানুষের মাংস?

লোকটা ভয় খেয়েছিল ঠিকই। জীপটা দাঁড়িয়ে, দিগিনের চেহারাটাও তার ভাল ঠেকছিল না। তবু বিনয়হীন গলায় বলে—ওসব এখানে হয় না।

দিগিন ছিপ্‌কির দিকে তাকিয়ে পরিষ্কার জিজ্ঞেস করলেন—দর কত?

ছিপ্‌কি একটু দিশাহারা হয়ে গেল। তার জীবনে এত বড় খদ্দের সে কখনো পায় নি। তাই স্বামীর দিকে চেয়ে নেপালীতে বলল—লোকটা কী বলছে শুনছো?

দিগিন দস্তানাটা টেবিলের ওপর ফটাস করে একবার আছড়ে বললেন—কুড়ি টাকা?

তখন টাকার দাম যথেষ্ট। অত টাকা কেউ দেয় না ছিপ্‌কিকে। মেয়েটা দিগিনের দিকে একবার চেয়ে স্বামীর কাছে গিয়ে নীচু স্বরে কী বলল।

দিগিন গরম খেয়ে বললেন—পঞ্চাশ টাকা!

বলেই কোটের ভিতর পকেট থেকে অন্তত সাত আটশো টাকার একটা গোছা বের করে প্রকাশ্যে পাঁচখানা দশটাকার নোট গুণে বের করে নিলেন। লোকটা আড়চোখে দেখল, ছিপ্‌কি তার কাঁধ খামচে ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে অস্ফুট গলায় কী যেন বলে। এত টাকা দেখে সে পাগল হয়ে গেছে। ছোটলোক, দুর্গন্ধযুক্ত, মাতাল এবং নীচ স্বভাবের লোকদের সঙ্গ করে সে ক্লান্ত। সেই মুহূর্তেই সে যেন সেই ক্লান্তিটা টের পেল। নতুন লোকটা তার কাছে শীতরাতে যেন স্বর্গ থেকে খসে-পড়া দেবদূত।

লোকটা উঠে গিয়ে ভিতরের ঘরের নোংরা পর্দাটা কেবল তুলে বোবা হয়ে রইল। এক হাতে পর্দা ধরা, অন্য হাতটা বাড়ানো।

সেই বাড়ানো হাতে দিগিন টাকার নোটগুলো গুঁজে দিলেন।

ভিতরের খুপরিতে লণ্ঠন জ্বালা আলোয় ছিপকির দিকে তাকিয়ে তার প্রথম যে কথাটা মনে হল, এ হচ্ছে কপিলের মেয়েছেলে। চোর, হাভাতে ছোটলোক কপিল।

দিগিন বিছানায় বসে ছিলেন, গা ঘেঁষে ছিপকি, কাঁধে হাত। মুখে অদ্ভুত উত্তেজিত হাসি! সে জানে তার বাজার ভাল। কিন্তু এতটা ভাল তা সে কল্পনা করে নি। সে মুগ্ধ চোখে চেয়ে দিগিনের মুখের ওপরেই শ্বাস ফেলল। নিজের গালে আঙুল বুলিয়ে বলল—এসব কিন্তু গরমী নয়। ব্রণ। আমি খারাপ লোকের সঙ্গে দোস্তি করি না।

দিগিন ঠ্যাং ছড়িয়ে বসে চুরুট টানছিলেন। মেয়েটা ঘাড়ের ওপর হামলে পড়ে আছে। পঞ্চাশ টাকায় কেনা মেয়েছেলে, যা খুশী করতে পারেন। তবু এই মেয়েটা কপিলের এঁটো, কিংবা কপিলই এই মেয়েটার উচ্ছিষ্ট?

মেয়েটাকে এক ঝটকায় টেনে সামনে দাঁড় করালেন দিগিন। লণ্ঠনের আলোয় চেয়ে রইলেন ওর দিকে। শরীরে সীমাবদ্ধ মেয়েমানুষ। নদীর মতো, সবাই স্নান করে যায়। গহীন চুলের মস্ত খোঁপা, রোগা চেহারা, সর্বশরীরে চামড়ার ওপর খসখসে ভাব। গলার চামড়ার ভাঁজে ময়লা বা পাউডার জমে আছে।

নেপালীতে বললেন—ও লোকটা তোর কে হয়?

মেয়েটা লাজুক হেসে বলল—সঙ্গে থাকে।

—স্বামী?

ছিপকি মুখ ভ্যাঙাল।

—দেখি তোর হাত! বলে দিগিন ওর হাত টেনে নিবিষ্টমনে ওর হস্তরেখা দেখলেন। ভ্রূ কুঁচকে, কপালে ভাঁজ ফেলে অনেকক্ষণ ধরে দেখে-টেখে বললেন—দূর! তুই এখানে পড়ে আছিস কেন? তোর ভাগ্য তো খুব ভাল। এখন বয়স কত?

মেয়েটা হিসেব জানে না। অবাক হয়ে বলল—কত জানি না!

দিগিন বললেন—বাইশ তেইশ হবে। আর এক বছরের মধ্যে তোর ভাগ্য ফিরে যাবে।

সকলেরই এই দুর্বলতা থাকে, ভাগ্য বিষয়ক। মেয়েটা মাতাল দিগিনকে সঠিক বিশ্বাস করতে পারছে না, মাতালরা কত কাণ্ড করে। তবু হাতটা চেপে ধরে বলল—কী হবে ?

—তোর বাড়ি হবে, গাড়ি হবে, সব লেখা আছে। এ লোক-টার সঙ্গে পড়ে আছিস কেন ? পালা।

এই বলে দিগিন উঠে পড়লেন। দাঁড়িয়ে উঠে বললেন—তোর সঙ্গে সময় কাটাতে এসেছিলাম, কিন্তু ভয় পেয়ে গেলাম রে। তুই একদিন খুব বড় হবি তো, তাই ভয় লাগল।

দিগিন বিদায় নেওয়ার আগে আরো পঞ্চাশটা টাকা ছিপ্‌কির হাতে গোপনে দিয়ে বললেন—তোর স্বামী তোর কষ্টের টাকা সব মেরে দেয় জানি। এটা রাখ। জানি তুই যখন বড় হবি তখন এসব দশবিশ পঞ্চাশ টাকা ভিখিরিকে দিয়ে দিবি। ভাল চাস তো কালই পালিয়ে যা।

—কোথায় যাবো ?

—কোথায় যাবি !

দিগিন একটু ভাববার ভান করেন। শেষে আবার দশটা টাকা বের করে ওর হাতে দিয়ে বলেন—শালবাড়িতে চ্যাটার্জির কাঠ-গোলায় চলে যাস। শনিবার মঙ্গলবার থাকি। কলকাতায় পাঠিয়ে দেবো। ফিল্মে নামবি ? আমার দোস্ত আছে।

ছিপ্‌কির চোখমুখ কী রকম যে উজ্জ্বল হয়েছিল ফিল্মের নামে ! অনেকখানি ঘাড় হেলাল, আর ছুটে এসে বুকে পড়ে একটু আদর করেছিল দিগিনকে।

মেয়েটা বোধহয় পালিয়ে যাওয়ারই চেষ্টা করেছিল। কয়েকদিন পর তার শরীরটা এক সকালে পাওয়া গেল মহানন্দার বিশুষ্ক নদীর খাতে। একটু একটু জল চুঁইয়ে বয়ে যাচ্ছে নালার মতো শীতের পাহাড়ে নদী। তারই জল ছুঁয়ে একবুক রক্ত ঢেলেছে ছিপ্‌কি। কুক্‌রিতে পেটটা হাঁ হয়ে আছে।

লোকটা একমাস পরে ধরা পড়ল মাদারিহাটে। দোকানটা তার আগেই উঠে গেছে।

তখন এরকম মহানন্দার পাড়ে হামেশা লাশ পাওয়া যেত।

চাটাইয়ে বেঁধে ধাঙড়রা নিয়ে আসত হাসপাতাল মর্গে। দু'চার ঘা ছুরি চালিয়ে ডাক্তাররা রিপোর্ট দিত। ধাঙড়রা ফের চাটাই বাঁধা মড়া নিয়ে হয় পোড়াত, নয়তো পুঁততো। ছিপ্কির জন্য এখনো একটা কষ্ট হয় দিগিনের। পালাতে গেলেই যে খুন হবে, সেটা ভেবে দেখেন নি দিগিন। চালের ভুল। তা হোক, তবু দোকানটা ওঠানো গেছে। কপিল কিছুদিন মনমরা হয়ে ছিল।

এখন কপিলকে দেখে একটু ভ্রু কোঁচকালেন দিগিন! রূঢ় মুখভাব করে একটু চেয়ে রইলেন। কর্মচারীদের সঙ্গে তার ব্যবহার একটু কর্কশ। মুখভাবে তিনি কাউকেই প্রশ্রয় দেন না।

কপিল কখনো দিগিনের চোখে তাকায় না। নানা পাপ জমে আছে ভিতরে। তাকাতে পারে না। একবার মুখের দিকে চেয়ে চোখ সরিয়ে নিয়ে বলল—আপনার কাছেই যাচ্ছিলাম। কাল রাতে শাটারিংয়ের কাঠ কারা খুলে নিয়ে গেছে। আজ ঢালাই হওয়ার কথা।

দিগিন অবাক হন। বলেন—জেলখানার ঢালাইয়ের?

কপিল মাথা নাড়ল—কয়েকটা শালখুঁটিও উপড়ে নিয়েছে। লোহার রডও।

দিগিন একটা বিরক্তিকর শব্দ করে বললেন—চৌকিদার কে ছিল?

—কেউ ছিল না। শানুবাবু তিন দিন আগে আমাকে জেল-খানার ক্যাম্প থেকে সরিয়ে চালসার রোড কনস্ট্রাকশনের কাছে পাঠিয়ে দেন। বলেছিলেন, জেলখানার কাজ, মালপত্র পুলিশেরাই দেখতে পারবে। তবে দাজুকে শানুবাবু দেখতে বলেছিল, সে কাল থেকে মাল খেয়ে কোথায় পড়ে আছে।

দিগিন শানুর বুদ্ধি দেখে অবাক হন। চৌকিদার হিসেবে কপিল ভাল নয় ঠিকই, মাল কিছু সরাবেই। কিন্তু কপিল কখনো কাজ নষ্ট করবে না। তাকে সরিয়ে দাজুর ভরসায় এত মালপত্র ফেলে রাখতে কে ওকে বলেছিল? দাজু কোনোকালে সন্ধ্যের পর স্বাভাবিক থাকে না।

দিগিন বললেন—চালসায় তোর কী কাজ ছিল?

—কিছু না। একটা কালভার্ট হয়েছিল, সেটা ভেঙে পড়েছে প্রথম লরীটা পাস করতেই। ইঞ্জিনিয়ার সাহেব ডেকে শানুবাবুকে গরম খেয়েছেন। সেইটে ফের করে দিতে হচ্ছে, নইলে কেস করবে গভর্নমেণ্ট। সেই কাজ সত্যেনবাবু দেখছেন, আমি গিয়ে ভেরেণ্ডা ভেজে এলাম।

ভিতরে ভিতরে আগুন হয়ে যায় দিগিন। সোপস্টোন মায়া মৃগের মতো মিলিয়ে গেছে, ঠিকাদারীও যাবে। চ্যাটার্জী কনস্ট্রাকশনের যে সুনাম আছে তা উড়িয়ে পুড়িয়ে দিয়ে যাবে শানু। একটা কালভার্ট করতে গিয়েও বেশি লাভ খাবে, প্রথম লরীটাও নিরাপদে পেরোতে পারবে না! আবার তৈরি করতে ডবল গচ্চা যাচ্ছে। শানু আজকাল কিছু খুলে বলে না। কিন্তু ভিতরে ভিতরে ব্যবসাটার মধ্যে উইয়ের মতো গর্ত খুঁড়ে ঝুরঝুর করে দিচ্ছে।

দিগিন মিস্তিরিকে ডেকে বললেন—কতক্ষণ লাগাবি?

—আপনি কাজ থাকলে চলে যান না। পিন আনতে লোক পাঠিয়েছি, ঠিকঠাক করে পাঠিয়ে দেবোখ'ন।

দিগিন চিন্তিতভাবে জীপে উঠলেন, রমণীমোহন গাড়ি ছাড়ল, মুখটা ঘুরিয়ে নিল জেলখানার দিকে। পিছনের সীটে বসা কপিল একটু কেশে বলল—ঢালাইয়ের দিন মিস্তিরিদের ভরপেট মিষ্টি খাওয়ানোর নিয়ম, তা সেটা শানুবাবু তুলে দিয়েছেন। বললে বলেন—রোজ ঢালাইয়ের কাজ হবে আর রোজ মিষ্টি খাওয়াতে হবে এ নিয়ম চলবে না।

দিগিন গম্ভীর গলায় বললেন—হুঁ।

চুপ করে রইলেন। শানুর ওপর কেউ খুশী নয়। সবাই যেন পাকেপ্রকারে, নানা আকারে ইঙ্গিতে বলতে চাইছে, শানুকে সরিয়ে দিয়ে এবার দিগিন হাল ধরুন। দিগিনের আজকাল আর ইচ্ছে করে না।

নতুন জেলখানা পুরোনো বাজার ছাড়িয়ে, জলপাইগুড়ির বাস যেখানে দাঁড়ায় তারও খানিকটা পশ্চিমে। গাড়িটা জেলখানায় ঢুকতেই দূর থেকে দেখেন, শানু কালো চশমা চোখে দাঁড়িয়ে আছে। পরনে নেপাল থেকে চোরাপথে আনানো বিদেশী স্ট্রেচ

প্যান্ট, গায়ে একটা মার্কিন ব্যানলনের গেঞ্জী। নীল প্যান্ট, আর হাল্কা হলুদ গেঞ্জীতে ভাল দেখাচ্ছে। বেশ লম্বাটে, সাহেবী ধরনের চেহারা। কলকাতায় লেখাপড়া শিখতে গিয়েছিল, তখন একবার সিনেমাতেও নেমেছিল। সেই থেকে শিলিগুড়িতে ওকে সবাই গুরু বলে ডাকে।

জীপ থামতেই শানু দৌড়ে এল।

—কাকা, জলঢাকা যাওয়া হয় নি। ঝামেলা পাকিয়ে গেল।

দিগিন তাকালেন। বললেন—কত টাকার মাল গেছে?

—তিন চার হাজার টাকার তো বটেই। ছোটো কাজ ছিল, বেশী মার্জিন থাকত না।

দিগিন মাথা নেড়ে বললেন—শাটারিংয়ের কাঠ আনতে লোক পাঠিয়েছো?

শানু একটু যেন অবাক হয়ে বলে—না, এখনি আবার শাটারিংয়ের কাঠ কিনব কেন? যতদূর মনে হচ্ছে পুলিশের লোকই সরিয়েছে। কিছু সি-আর-পি আছে, বড্ড পাজি। দেখি যদি বের করতে পারি।

দিগিন বিরক্ত হয়ে বলেন—সে তুমি দেখগে। তা বলে ঢালাইয়ের কাজ তো বন্ধ রাখা যাবে না। কাঠ কিনতে লোক পাঠাও, আর গোডাউনে কিছু রড আছে, আনিয়ে নাও।

শানু তেমনি বিস্ময়ের সঙ্গে বলল—সময় তো আছে, এত তাড়ার কিছু নেই। আর সাতদিন দেরি করলেও কিছু হবে না। তাছাড়া মিস্তিরিরা আজই শাটারিং করে ঢালাই করতে কি পারবে?

দিগিন গম্ভীর হয়ে বললেন—পারতেই হবে। মিস্তিরিদের ডাকো। আমি কথা বলে যাবো, তুমি একটা জীপ ভাড়া করে জলঢাকা চলে যাও আজই।

হেডমিস্ত্রি দিগিনের হাতের লোক। সে এসে দিগিন কিছু বলার আগেই বলল—আজই ঢালাই করে দেবো। আপনি যান।

জীপ থেকে দিগিন আর নামলেন না, জীপ ছাড়তে ইঙ্গিত করলেন রমণীমোহনকে। একবার চেয়ে দেখলেন, শানুর মুখ খুব গম্ভীর, প্রেস্টিজে লেগেছে বোধহয়। কর্মচারীদের সামনে দিগিন ওকে পাত্তা দিলেন না তেমন। তার ওপর জলঢাকা যেতে হচ্ছে।

রমণীমোহন জীপ ছাড়ল। কপিল দৌড়ে এল জীপের সঙ্গে, কী যেন বলবার জন্যে মুখটা উন্মুখ, দিগিন চোখের ইশারা করলেন, কপিল জীপের পিছনে উঠে পড়ল।

বাসার দিকেই মুখ ঘোরালো জীপ। দিগিন চুপ করে বসেছিলেন। হঠাৎ বললেন—কপিল।

—আজ্ঞে।

—শালখুঁটিগুলো কাকে বেচেছিস ?

একটু চুপ করে থেকে কপিল বলল—অনাদিবাবুর গোলায়।

—কখন ?

—ভোর রাতে। একটা সাপ্লাইয়ের লরি এসেছিল, তাদের ভজিয়ে মাল তুলে দিয়েছি।

— কততে বেচলি ?

বিনা দ্বিধায় এবং সম্পূর্ণ অকপটে কপিল বলল—শানুবাবুর কথা ধরবেন না। তিনচার হাজার টাকার মাল ছিল না। মেরে কেটে হাজার খানেকের মতো হবে। আমি তিনশো পেয়েছি।

দিগিন একটু হাসলেন। কপিলকে তিনি চেনেন, এমন প্রতিশোধস্পৃহা খুব কম লোকেরই থাকে, প্রতিশোধ নেয়ও খুব কূটকৌশলে।

পিছন থেকে কপিলের হাতটা এগিয়ে এল। তাতে একশ টাকার তিনটে নোট, ভাঁজকরা, দিগিন নিয়ে বুক পকেটে রাখলেন। রমণীমোহনকে বললেন—সেবক রোড ধরে চল।

বিনা উত্তরে নিউমার্কেটের রাস্তা ধরে সেবক রোডে গাড়ি উঠিয়ে আনল রমণীমোহন, পিছনে কপিল চুপ করে বসে আছে। সে লজ্জিতও নয়, দুঃখিতও নয়, নির্বিকার। মল্লিকা মরে যাবার পর থেকেই ওরকম। ওর ভালবাসার, স্নেহের কোনো কেন্দ্রবিন্দু নেই। এখনো অবসর সময়ে কীর্তন করে। কীর্তন করতে করতে যদি কৃষ্ণভক্তি আসে কখনো, তো ভাল, না এলে একদিন বুড়ো হয়ে এমনিই মরে যাবে। কেউ কাঁদার নেই।

টাকা—এই কথাটা আবার মনে পড়ল। টাকা।

টাউন স্টেশনের স্টেশনমাস্টার ছিলেন মদন চৌধুরী। তেল

চুকচুকে শরীরখানি। মুখভাবে আহ্লাদে ভরা, পান খেতেন, বিলোতেন। স্টেশনমাস্টার হিসেবে খারাপ ছিলেন না, মানুষটাও ভাল। তার দুই মেয়ে ছিল, নমিতা আর প্রণতি। প্রণতি ছোটো, দীঘল কালো চেহারা। কিন্তু কালো রঙে অমন রূপবতী সে আমলে দেখেন নি দিগিন। ভারী লোভ হত। দিগিনের বয়স তখন কিছু না। ওদের বাড়িতে যেতেন টেতেন। প্রণতি অবশ্য খুব একটা সামনে আসত না। তবু পাশের ঘরে তার পায়ের শব্দ, গলার আওয়াজ শুনতেন। পর্দার ফাঁক ফোঁকর দিয়ে দেখা যেত। মদন চৌধুরীরা বারেন্দ্রশ্রেণী, আর সে সম্পর্কে খুব সচেতন ছিলেন। প্রায়ই বলতেন—ভাল দুটো বারেন্দ্রশ্রেণীর পাত্র খুঁজবেন তো চাটুজ্জে। এসব পঁয়তাল্লিশ ছেচল্লিশ সালের কথা। তখনো ময়নাকে আনেন নি দিগিন।

একবার কলকাতা যাবেন। চৌধুরী এসে বললেন—আমার বাড়ি ওরাও যাবে। আমি বলি কি আপনার সঙ্গে চলে যাক।

কে কে যাবে তা জিজ্ঞেস করলেন না দিগিন। কিন্তু উচাটন হয়ে রইলেন। প্রণতি যাবে!

যাওয়ার দিন স্টেশনে গিয়ে দেখেন প্লেস করা গাড়ির একটা ইণ্টার ক্লাস কামরায় চৌধুরীর দুই মেয়ে, বৌ, আর ছেলে বসে আছে। বুকখানা নড়ে উঠল দিগিনের। ভিড়ের গাড়ি নয়, তখন অফ সিজিন চলছে। ফাঁকা কামরাটায় তারা মাত্র ক'জন। সে যে বয়ঃসন্ধির আশা-নিরাশার কী গভীর উদ্বেগের দিন গেছে সব! নিজেকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পুরুষ বলে মনে হয়, কখনো মনে হয় সবচেয়ে আহাম্মক বোকা। তখন গেরস্ত ঘরের মেয়েরা সহজলভ্য ছিল না। তাদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করতে বুকের পাটা লাগত।

প্রণতি গাড়ির জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বসে রইল তো রইলই। চৌধুরীর বৌ আর ছেলে দিগিনকে খুব খাতির করতে থাকে। চৌধুরী গিন্নী টিফিন ক্যারিয়ার খুলে অনেক খাবার খাওয়াল, পান খাওয়াল। বাড়ি ঘরের খোঁজখবর নিল। দিগিন আড়চোখে প্রণতিকে দেখে নিয়ে কিছু বাড়িয়েই বললেন। বয়সের মেয়ের সামনে দুচারটে গুলচাল না ঝাড়ে কে!

রাতের গাড়ি। ছাড়তে না ছাড়তেই ঢুলুনী পেয়ে গেল সবার। খাওয়ার পর একে একে সবাই শুয়ে পড়ছে। দিগিন বাঙ্কে শুয়ে একটা বাসী প্রবাসী খুলে পড়বার চেষ্টা করছেন। আসলে সেটা ভান। প্রথমত দিগিন বই-টই পড়তে ভালবাসেন না। দ্বিতীয়ত গাড়ির ঝাঁকুনিতে পড়া যাচ্ছিলও না।

চৌধুরীগিন্নী আর ছেলে একটা সীটে দুধারে মাথা রেখে শুলেন। অন্যটায় নমিতা আর প্রণতি। নমিতা শুল, কিন্তু প্রণতি ঠায় বসে রইল।

তার মা ডাকে—ও প্রণতি শুবি না।

সে মাথা নাড়ে। শোবে না।

—কেন?

—ঘুম আসছে না। বিরক্ত হয়ে প্রণতি বলে।

জামদানী শাড়িপরা নিশ্চল মূর্তি বসেই রইল। একবারও মুখ ফেরাল না ভিতরবাগে। সবাই যখন খাচ্ছিল তখনো ঐ ভাবে ছিল। খায় নি। তার নাকি খিদে নেই। দিগিন বুঝতে পারছিলেন, তিনি কামরায় আছেন বলেই মেয়েটার ঐ কাঠ-কাঠ ভাব। তবে কি মেয়েটা তাকে অপছন্দ করছে? দিগিন কি বিশ্রী দেখতে? মেয়েটা কি রোগা মানুষ পছন্দ করে? নাকি, দিগিনের গুলচালগুলো সব ধরে ফেলেছে মেয়েটা। বরাবরই কি দিগিনের প্রতি ঘৃণা পুষে এসেছে মনে মনে?

খুবই তুচ্ছ কিন্তু জরুরী প্রশ্ন সব।

অন্য বাঙ্কে শেষ সময়ে এক বুড়ো পশ্চিমা উঠে শুয়েই ঘুমিয়ে পড়েছে। তার নাকের ডাক শোনা যাচ্ছিল। ক্রমে সকলেই গভীর বা হাল্কা ঘুমে ঢলে পড়ছিল, চৌধুরী গিন্নী ঘুমগলায় একবার বললেন—জানালাটা বন্ধ করে বোস, ঠাণ্ডা লাগবে।

—না। আমার মাথা ধরেছে।

গলার হার-টার যদি কেউ টেনে নেয়। দেখিস।

—উঃ, তুমি ঘুমোও না।

—কিছু তো খেলি না। বলে চৌধুরীগিন্নী পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়লেন।

দিগিনের মাথা তখন আগুন। ঐ রোগা একরত্তি মেয়েটার

অত দেমাক কিসের ? না হয় দিগিন তেমন লেখাপড়া জানেন না, না হয় একটু জংলা চেহারা, তাই কি ? পুরুষ, আস্ত একটা জলজ্যান্ত পুরুষ কাছে থাকলে একবার ফিরে তাকাতে নেই ?

ধৈর্য ধরে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলেন দিগিন। না। অবস্থার কোনো পরিবর্তন নাই। শুধুমাত্র শরতের ঠাণ্ডা থেকে গলা বাঁচানোর জন্য আঁচলটা জড়িয়ে নিয়েছে গলায়। আর, বোধহয় একটু হেলে বসেছে জানালার কাঠে ভর দিয়ে।

উপেক্ষা কোনদিনই সহ্য করতে পারেন না দিগিন। অনেক ভেবেচিন্তে একটা উপায় বের করলেন। কামরার আলোগুলি ধুধু করে জ্বলছিল। দিগিন হঠাৎ ঝুঁকে বললেন—আলোগুলো কি নিভিয়ে দেবো ? সবাই ঘুমোচ্ছে তো, আলো থাকলে অসুবিধে।

মেয়েটা শুনল কি না বোঝা গেল না। বসেই রইল।

—শুনছেন ! দিগিন ডাকেন।

মেয়েটা একটু নড়ল, বা কাঁপল।

ক্ষীণ গলায় উত্তর এল—দিন।

আপনার অসুবিধে হবে না তো ?

মেয়েটা ফেরানো মাথাটাই নাড়ল একটু। ঘাড় ফেরাল না।

দিগিন শব্দসাড়া করে বাথরুম সেরে এসে বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়লেন।

কী অদ্ভুত দৃশ্য তখন ? সেদিন পূর্ণিমা ছিল বোধহয়। কী জ্যোৎস্নার আলো এসে ভরে দিল কামরা। আর সেই জ্যোৎস্নায় মাখা কালো পরীর মতো, রূপসী জীনের মতো জানালায় বসে আছে প্রণতি।

ঘুম কি হয় দিগিনের। কামস্পৃহা নয়। নারীপ্রেমও নয়, সে এক অলৌকিকের অনুভূতি। জীবনের সব চাওয়া যেন ঐ মূর্তিটায় গিয়ে জমাট বেঁধেছে। কী জ্যোৎস্না। আর কী প্রস্তরীভূত সেই দেহখানি।

সজাগ দিগিন আর চোখ ফেরাতে পারেন না। পাশ ফিরে চেয়ে রইলেন।

অনেক অনেকক্ষণ বাদে মেয়েটার বুঝি মনে হল যে এবার সবাই

ঘুমিয়েছে! চকিতে একবার চাইল ভিতরের দিকে। সবার আগে তাকাল দিগিনের দিকে। সে দিগিনের মুখ দেখতে পাবে না জেনেও দিগিন চোখ বুজে নিথর হয়ে ঘুমের ভান করলেন।

মেয়েটা উঠল। বাথরুমের দিকে গেল পথ হাতড়ে।

খুটখাট একটু শব্দ হল বুঝি। বাথরুমের দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

কী সতর্ক মায়েদের মন। ঐ যে একটু খুটখাট শব্দ হল তাইতেই চৌধুরীগিন্নী উঠে বসলেন। প্রণতির শূন্য আসন দেখলেন। বাথরুমের দরজার ঘষা কাচে আলো দেখলেন। সন্দেহ হল। চকিতে একবার মুখ উঁচু করে দেখে নিলেন, দিগিন তার জায়গায় আছেন কিনা।

দিগিন মনে মনে হাসেন আজও। কত কূট হয় মানুষের মন! কত সন্দেহ আসে!

বাথরুম থেকে এসে আর কাট হয়ে থাকল না প্রণতি। সহজ হয়ে বসল। চুলটা ঠিক করল খানিক, বেণীর শেষ মাথায় রিবনের ফাঁস খুলে গিয়েছিল, সেটা বাঁধল। জলের বোতল থেকে জল খেল। এবং বারংবার তাকাল দিগিনের অন্ধকার বাঙ্কের দিকে। দিগিন মনে মনে হাসলেন।

খুব মাঝরাত তখন। প্রণতি অবশেষে শুয়েছে। দিগিনের ঘুম এল না। একবারে প্রথম রাতে না ঘুমোলে তাঁর ঘুম কেটে যায়। শুয়ে থেকে কাঁহাতক আর সময় কাটাবেন। সে আমলের ক্যাভেণ্ডার সিগারেট একটা বের ধরে ধরিয়ে শুয়ে শুয়ে টানছেন। সব জানালা বন্ধ। ঘুটঘুট করছে অন্ধকার। কেবল দরজায় কাচ ফেলা বলে একটু ঘষা আলো দেখা যাচ্ছে! চাঁদের মুখে মেঘ জমেছে নিশ্চয়। ট্রেনটা থেমে আছে কোথাও সিগন্যাল না পেয়ে। বাইরে জলা-জমি থেকে ব্যাঙের ডাক আসছে। তখন পৃথিবীতে মানুষ কম ছিল, নির্জনতা ছিল। ট্রেন যেত বিজনের ভিতর দিয়ে। অনেকদূর পর্যন্ত লোকবসতি ছিল না উত্তরবাংলায়। ভূতুড়ে মাঠে ঘাটে অলৌকিক জ্যোৎস্না খেলা করত। জীন ছিল, পরী ছিল।

সেই খুব আবছা অন্ধকার থেকে একটা অশরীরী স্বর এল—ক'টা বাজে?

দিগিন প্রথমটায় চমকে উঠলেন। এত ক্ষীণ স্বর যে প্রথমটায় বুঝতে পারলেন না ভুল শুনেছেন কিনা। তারপর বুঝলেন প্রণতি।

খুব সন্তর্পণে সিগারেটের আলোয় ঘড়ি দেখে বললেন—একটা।

তারপর সব চুপ।

খুব সাহস করে দিগিন আস্তে বাতাসে কথা ক'টা ছাড়লেন—তুমি ঘুমোও নি।

—না। ঘুম আসছে না। যেন কথা নয়, বাতাসের শব্দ—এত ক্ষীণ আর নরম গলা।

—আমিও না। দিগিন ঝুঁকে বললেন। তারপর আবার একটু চুপ করে থেকে বুকের কাঁপুনীটা সামলালেন। বললেন—তুমি কিছু খেলে না।

—আমার খিদে পায় না।

—কেন?

—এমনিই।

এত আস্তে কথা হচ্ছিল যে পরস্পরও শোনবার কথা নয়। সে যেন দূর থেকে কানে-কোন বলা। তবু কি আশ্চর্য তাঁরা শুনতে পাচ্ছিলেন। ভালবাসা বুঝি এমনিই। ইন্দ্রিয়ের শক্তি বাড়িয়ে দেয়।

—কলকাতায় ক'দিন থাকবে?

—বেশীদিন না।

—বেড়াতে যাচ্ছো?

—হুঁ। মামার বাড়ি।

—আমি সাতদিন পরে ফিরব। তোমরা?

—একমাস।

আর কি তেমন কোনো কথা হয়েছিল? ঠিকঠাক আজ আর মনে পড়ে না। তবে হলেও এর চেয়ে বেশী ঘনিষ্ঠ কিছু নয়।

সকালে দিগিন ঘুমহীন রাত শেষে উঠলেন। আবার জানালার দিকে মুখ করে বসে আছে প্রণতি। ফিরে তাকায় না।

বড্ড জ্বালিয়েছিল সেবার মেয়েটা। বুকে এমন একটা ঢেউ তুলে দিয়েছিল। দিগিনকে প্রায় গহীন সমুদ্রে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল সেই ঢেউ। তখনো প্রণতি কিশোরী মাত্র।

তখন প্রেম এটুকুই মাত্র ছিল। তবুও এটুকুও কম নয়।

কপাল। সেবার কলকাতা গিয়ে একমাসের নাম করে বহুকাল থেকে গেল প্রণতিরা। শিলিগুড়িতে ভাল ইস্কুল ছিল না, কলেজ তখনো হয় নি। মামারা বড়লোক। তারা ভাগ্নে-ভাগ্নীদের সেখানেই রেখে দিল। বহুকাল ওরা আর আসে নি। চৌধুরীগিন্নী অবশ্য এসে থাকতেন প্রায়ই।

প্রেমটা কেটে যাচ্ছিল কি! কে জানে। ঘটনাটা কেন আজও অত হুবহু মনে আছে?

কয়েক বছর বাদে ভারত সরকার আর পূর্বপাকিস্তান সরকারের মধ্যে একটা চুক্তি হয়। সেই তিপান্ন চুয়ান্ন সালের কথা, চুক্তি হল ভারতের মালপত্র নিয়ে ব্রডগেজের গাড়ি পূর্বপাকিস্তানের ভিতর দিয়ে আসবে, তাতে দূরত্ব করবে, সময় বাঁচবে। তখন এ অঞ্চলে ব্রডগেজ লাইন উঠে গিয়ে মিটার গেজ হয়ে গেছে। তাই ঠিক হল পাকিস্তানের ভিতর দিয়ে ব্রডগেজের গাড়ি হলদিবাড়ি পর্যন্ত আসবে। সেখানে ট্র্যানশিপমেণ্ট হয়ে মিটারগেজে উঠে চালান হবে উত্তরবাংলায় আর আসামে। এই চুক্তি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হলদিবাড়ি স্টেশনের দাম বেড়ে গেল রাতারাতি, সবাই হলদিবাড়িতে পোস্টিং চায়। ট্র্যানশিপমেণ্ট মানেই টাকা, আর হলদিবাড়িতে যে বিপুল মাল এ গাড়ি থেকে ও গাড়িতে উঠবে তাতে বছরে লক্ষ লক্ষ টাকা খেলা করবে। স্টেশন-মাস্টাররা ট্র্যানশিপমেণ্টের জন্য রেলওয়ের কাছ থেকে চুক্তিমতো টাকা পায়, আর কুলির সর্দারদের সঙ্গে তারা আর একরকম চুক্তি করে নেয়। এই দুই চুক্তির মধ্যে ফারাক থাকে অনেক। ফলে ভাল স্টেশনের মাস্টারদের ঘরে লক্ষ্মী ঝাঁপি উপুড় করে দেন।

হলদিবাড়ির খবর হতেই চারদিকে স্টেশনমাস্টাররা আনচান করে উঠলেন। দৌড়োদৌড়ি শুরু হল, অফিসারদের বাংলোয় ভেটের ছড়াছড়ি হতে লাগল। শিলিগুড়ির এ-টি-এস সাহেব তখন বাঙালী, সজ্জন লোক, ঘুষটুষ খেতেন না। মদন চৌধুরী তাঁর মাকে মা ডেকে, সপরিবারে নেমন্তন্ন খাইয়ে এমন আত্মীয়তা গড়ে তোলেন যে সাহেব মদন চৌধুরীকে পোস্টিং দিয়ে দিলেন।

একমাসে মদন চৌধুরীর চেহারা এবং স্বভাব পাল্টে গেল,

একটা ওপেন ডেলিভারী নিতে হলদিবাড়ি গিয়েছিলেন দিগিন। দেখেন চৌধুরীর মুখে চোখে একটা উদভ্রান্ত ভাব, চেহারার সেই স্নিগ্ধতা নেই, দিনরাত স্টেশনে পড়ে থাকেন। চোখদুটো চকচকে, সবসময়ে চতুর্দিকে ঘুরছে। দিগিনকে দেখে বললেন—চাটুজ্জে, আপনার তো অনেক জানা-শুনো, জলপাইগুড়ির কমিশনার সাহেবকে বলে আমাকে একটা রিভলবারের লাইসেন্স বের করে দিন।

দিগিন অবাক হয়ে বলেন—রিভলভার দিয়ে কী হবে?

চৌধুরী তেমনি উদভ্রান্তভাবে অসংলগ্ন কথা বলেন—এত টাকা? কখন কি হয়!

চৌধুরীর বাড়ির চেহারাও, পাল্টেছে, বড় ছেলে বাদে আর ছেলেমেয়েরা স্থায়ীভাবে কলকাতায় থাকে। বেশীরভাগ জিনিস-পত্রও কলকাতায় পাঠিয়ে দিয়েছেন চৌধুরী, স্ত্রীও গেছেন। সেখানে চৌধুরীর বাড়ি হচ্ছে, দুটো বাড়ি একটা বৌয়ের নামে, অন্যটা বিধবা বোনের নামে। রেলের কোয়ার্টারে দুটো ঘর। ভিতরের ঘরটায় সবসময়ে তালাবন্ধ, বাইরের ঘরটায় দুটো ক্যাম্প খাটে বাপ ব্যাটা শোয়। ঝি চাকর কাউকে রাখে নি। ছেলেই রান্না করে।

দিগিন বুঝলেন কাঁচা টাকার স্রোতে চৌধুরী ডুবছেন।

দিগিন অবশ্য চৌধুরীকে রিভলবারের লাইসেন্স বের করে দিয়েছিলেন। সেই রিভলভার শিয়রে নিয়ে শুতেন আর দুঃস্বপ্ন দেখতেন চৌধুরী। মানুষটার জন্য তখন কষ্ট হত। হাভাতের হঠাৎ বিপুল টাকা হলে তার বড় একটা সুখ হয় না, অসুখ উপস্থিত হয়।

চৌধুরীরও হল, পোস্টিং পাওয়ার বছরখানেকের মধ্যে প্রথম স্ট্রোক। কিন্তু চৌধুরী সিক-লীভ নেবেন না, ঐ অবস্থাতেই কাজ করার জন্য ব্যস্ত। বহু বলে কয়ে তাকে হাসপাতালে দেওয়া হল। কলকাতা থেকে কেউ এল না, এলে নাকি বাড়ির কাজে ব্যাঘাত হবে।

সে যাত্রা বেঁচে গেলেন চৌধুরী। রাশি রাশি টাকা কলকাতায় পাঠান, বড় ছেলে আনাগোনা করে, স্টেশনের অন্যান্য স্টাফ খুব

অসন্তুষ্ট, তারা নাকি ভাগ পায় না। চৌধুরী এখন টাকা চিনেছেন, টাকা ছাড়া মুখে কথা নেই, কিন্তু চেহারাটায় একটা রুগ্ন খড়ি ওঠা ভাব, চোখে ক্ষয়রোগীর চোখের মতো অসুস্থ উজ্জ্বলতা।

এ সময়ে খবর এল, বোনের ছেলেরা বাড়ি দখল করেছে, তারা ভাড়াটে বসাতে দেবে না। বলছে—আমাদের মায়ের নামে বাড়ি, আমাদের ইচ্ছেমতো হবে।

চৌধুরী ছুটে গেলেন কলকাতায়, ভাগ্নেদের হাতে পায়ে ধরলেন। বোন বললেন—দাদা, আমি কী করব! ছেলেরা আমার কথা শোনে না।

ভগ্নমনোরথ চৌধুরী ফিরে এলেন একা। মাথায় টাক পড়ে গেছে, কাঁদনে চোখের কোলে কালি, অসুস্থ-অস্বাভাবিক চেহারা।

রিভলভারটা সেইসময়েই প্রথম কাজে লাগল। রিটায়ারমেন্টের সময় হয়ে এসেছিল, মোটে আর মাসখানেক আছে। তারপরই পোঁটলা পুঁটলি বেঁধে গিয়ে কলকাতায় হাজির হবেন, সেখানে বাড়িঘর, ছেলে মেয়ে বৌ, সংসার। একটা মাস কাটিয়ে যেতে পারলেই হত! কিন্তু ঐ বাড়ির শোকটাই সামলাতে পারলেন না। রিভলভারটা কপালে ঠেকিয়ে ঘোড়া টেনে দিলেন এক নিশুতরাতে।

দিগিন হঠাৎ হো-হো করে হেসে উঠলেন আপনমনে। ঘটনাটা মনে পড়লেই দুঃখের বদলে তার প্রবল হাসি পায়। চৌধুরী বেশ ছিল শিলিগুড়ির মাস্টার হয়ে। কিছু অভাব ছিল না, তারপর হলদিবাড়ি গিয়ে খুব বড়লোক হল, সেও ভালই, কিন্তু সেই বড়-লোকীর একটু লোকসান, বিধবা বোনের নামের একটা বাড়ি হাত ছাড়া হয়ে গেল, সেটুকু সহ্য করতে পারল না। বাড়িটা গেছে তো যাক না, তবু তো তোমার অনেক থাকছে। তুমি তো শিলিগুড়ির মাস্টার থাকা অবস্থায় ফিরে যাচ্ছ না। তবু মানুষের ওইরকম হয়। গরীব থেকে বড়লোক হলে ফের একটু গরীব হওয়া তার সহ্য হয় না।

জুয়াড়ি নির্মল গাঙ্গুলি তিনতাস খেলেই বড়লোক হয়েছিল। তার একটা পেটেণ্ট কথা ছিল—এমনি লস্ সহ্য হয় ভাই। কিন্তু লভ্যাংশের লস্ সহ্য হয় না। গাঙ্গুলি যেদিন হারত সেদিন স্পোর্টসম্যানের মতো হারত। কিন্তু যেদিন প্রথমে জিতে পরে

হারত সেদিন বড় মনমরা থাকত। বলত—ঈশ্বর আমাদের সহ্যশক্তি বড় কম দিয়েছেন। ক্ষতি সহ্য হয়, কিন্তু লাভের ক্ষতি সহ্য হয় না। ছেলেবেলায় একটা হাবা ছেলেকে সবাই ক্ষেপাতাম। সে বড় পয়সা ভালবাসত। সবাই তাকে বলত পয়সা নিবি? অমনি সে হাত পাতে। আমি বলতাম। সে হাত পাতত। পয়সা দিয়ে ফের নিয়ে নিতাম, আবার দিতাম, ফের নিয়ে নিতাম। শেষবারটা মজা করার জন্য পয়সাটা নিয়ে নিতাম, দিতাম না। সে ক্ষেপে গিয়ে বলে বেড়াত— নেম্মলটা খচচড়। দে'লে নে'লে, দে'লে নে'লে, ফের দে'লে, ফের নে'লে। নে'লে তো নে'লে, আর দে'লে না।

জীবনটা ঐরকম। মাঝে মাঝে সব নিয়ে নেয়। আর কিছু দেয় না।

সেবক স্টেশনের কাছে লেভেল ক্রসিং পার হয়ে জীপ উঠে এল কালিম্পঙের পাহাড়ী রাস্তায়। দূরে দুই পাহাড়ের কোলে করোনেশন ব্রীজের আর্চ দেখা যাচ্ছে। নিচে তিস্তা। শরতের নদীটা এখনো বর্ষার ঢল নিয়ে নেমে যাচ্ছে। সাদা, সফেন জল, সেই জলের প্রবল শব্দ। তিস্তার দুধারে বালির বিছানা। বাঁ পাশের তীর ধরে ছিল রেললাইন। ছোট্ট ছোট্ট সব স্টেশন। নিরিবিলি, নিঃঝুম। এখন আর কিছু নেই। স্টেশনের ঘরগুলো পর্যন্ত না। দিগিন ঝুঁকে দেখতে লাগলেন।

বে-খেয়ালে গরমজামা আনেন নি। হঠাৎ চলে এসেছেন খেয়াল খুশীমতো। রমণীমোহন আর কপিলেরও গরম জামা নেই। শরৎকাল। পাহাড়ে এ সময়ে শীত পড়ে যায়। কিন্তু রমণীমোহন বা কপিল তার জন্য দিগিনকে কিছু বলবে না। দিগিনকে তারা জানে। কখনো তাঁর কোনো কাজে তারা নিজেদের সিদ্ধান্ত ঢোকায় নি।

এখন আর কিছু করার নেই। দিগিন তবু বললেন—কপিল, গরমজামা আনার কথা খেয়াল হয় নি রে। তোদের কষ্ট হবে।

রমণীমোহন স্থির চোখে চেয়ে গাড়ি চালাতে চালাতে বলল—কালিম্পঙ যাবেন তো?

—তাই তো যাচ্ছি।

—দুপুর দুপুর কাজ সারতে পারলে ফিরে আসতে কষ্ট হবে না। রোদ থাকবে ততক্ষণ। বেলা পড়ে গেলে ঠাণ্ডা লাগবে।

কাজ! কাজের কথা খেয়াল ছিল না। মনেও পড়ল না। চারধারে চেনা পাহাড়, বনস্থলী, নদী, কত পুরনো স্মৃতির ভূত ঘুরে বেড়াচ্ছে চারধারে। সম্মোহিত দিগিন জানেন, এই হল কাজ। সেই পুরোনো রেললাইন খুঁজতে খুঁজতে, সেই পুরোনো স্টেশনের চিহ্ন ধরে ধরে আবার অতীতে ফিরে যাওয়া, যেখানে আজও এক অলীক স্টেশনে দুমুঠো ধুলো হাতে করে মুগ্ধ এক শিশু দাঁড়িয়ে আছে। আর কিছু কাজ নেই।

—ডাকলেন—কপিল।

—আজ্ঞে।

—ঠিকাদারের চৌকিদারী তোর কাজ নয়। তোর আসল কাজ কি কপিল?

কপিল চুপ করে থাকে।

দিগিন বললেন—তোকে একটা বাগান বানাতে দেবো। শাল-বাড়িতে জমিটা পড়ে আছে, গেছিস তো!

কপিল হুঁ দিল।

—ওখানে একটা বাগান বানাবি, পলাশ লাগাবি, শিউলি, বেলফুল···

—মল্লিকা। কপিল বাধা দিয়ে বলল—দিগিন ভুলে গিয়ে ছিলেন, বেলফুলই মল্লিকাফুল।

দিগিন একবার ফিরে দেখলেন, কপিলের চোখদুটো চকচক করছে। মুখখানা লোভাতুর। বাগান! বাগান! এ পৃথিবীতে একমনে একখানা বাগান বানানোর মতো গভীর কাজ আর কি আছে? সে আর কিছু চায় না। একখানা বাগানমাত্র।

দিগিন অনেকক্ষণ কপিলের মুখের দিকে পিছু ফিরে চেয়ে দেখেন। কপিলের মুখটা পাল্টে যাচ্ছে। চতুর, ধূর্ত মুখখানা কতগুলো লাবণ্যের রেখায় ডুবে গেল। খুব তৃপ্তি পেলেন দিগিন। গাঢ়স্বরে বললেন—পারবি না?

—খুব।

—কাল চলে যাস শালবাড়িতে। কাল থেকেই লেগে যা।

আবেগে কপিল বুঝি কথা বলতে পারল না। চোখটা মুছল। মল্লিকা! মেয়েটা। জীপগাড়ি না হলে এখন সে দিগিনের পায়ে

মুখ ঘষত। পলাশ লাগাবে, শিউলি লাগাবে, আর সেইসঙ্গে গ্রীষ্মের মল্লিকাফুল, সাদা ঘ্রাণে ভরা। মেয়েটার কথা মনে পড়বে। এই মাটিতেই তো মিশে আছে মেয়েটা।

গাড়ি চড়াই ভাঙছে। পাহাড়ী গোরুর একটা পাল রাস্তা পার হয়ে নেমে যাচ্ছে বনভূমিতে। তাদের গলার ঘণ্টার শব্দ। রোদ লেগে বনভূমি মথিত হয়, গভীর উদ্ভিদজগতের নেশারু গন্ধ আসে। এক পাহাড়ের ঢালের ছায়ায় গভীর শীতল রাস্তা। ওপরে আকাশ আর তিস্তার ওপারে রোদ ঝলসাচ্ছে। টিপ টিপ করে চুঁইয়ে নামছে একটা জলধারা, পাহাড়ের গা বেয়ে, তার ওপর একটুখানি কালভার্ট, জীপটা গুমগুম শব্দ করে কালভার্ট পার হয়ে গেল। শীত বাড়ছে, শার্টের বোতামটা এঁটে নিলেন, বুকে হাত জড়ো করে বসলেন দিগিন।

কালিম্পঙের দিকে বাঁক নিচ্ছে গাড়ি। বেশী দেরি নেই, জাগ্রত চোখে চেয়ে আছেন দিগিন। বহুকাল আসেন না। যা দেখছেন তাই যেন ভিতরটাকে নেড়ে দিচ্ছে। ঘুলিয়ে উঠছে সব। স্মৃতি আর বর্তমান হয়ে যাচ্ছে একাকার।

নড়ে বসলেন দিগিন। হাই উঠছে। ঐ দেখা যাচ্ছে কালিম্পঙের ঢাল। ধানক্ষেত। ধান চাষ বা আবাদ পাহাড়ী জায়গায় বড় একটা দেখা যায় না। কালিম্পঙ ব্যতিক্রম। এইজন্যই দিগিনের কালিম্পঙের প্রতি কিছু পক্ষপাত আছে।

রবীন্দ্রনাথের বাড়ি চিত্রভানুর সামনে গাড়িটা দাঁড় করিয়ে নামলেন। বাগানে সেই শ্বেতপাথরের কেদারা। আর একটা শ্বেতপাথরের ট্যাবলেটে কালিম্পঙ নিয়ে লেখা রবীন্দ্রনাথের কবিতাটার ওপর দুপুরের রোদ পড়েছে। সেই যখন রবিবাবু আসতেন তখন এসে তাঁকে এইখানে দেখে গেছেন দিগিন। ঐ শ্বেতপাথরের কেদারায় গদী পেতে বসতেন। অদিগন্ত প্রকৃতির বিস্তার থাকত সামনে। প্রতিমা দেবীকে দেখেছেন। ঐ কেদারার পিছনে এসে দাঁড়িয়ে থাকতেন কখনো। কী সুন্দর, আর করুণ মুখশ্রী?

সেই রবীন্দ্রনাথের সেণ্টেনারী হয়ে গেল। সময় কত তাড়াতাড়ি যায়। বাগানে কেউ নেই। চমৎকার বাড়িটায় একটু বয়সের দাগ

পড়েছে। মনে হচ্ছে, এক্ষুনি লম্বা দাড়িওলা জোব্বা পরা মূর্তি ধীর গম্ভীর রাজার মতো বেরিয়ে আসবেন।

দিগিন জীপে উঠলেন এসে। ডাকলেন—রমণী।

—আজ্ঞে।

—শানু এখানে কোথায় আসে রে?

রমণীমোহন চুপ করে থাকে।

—সেখানে চল। বলে দিগিন হেলান দিয়ে বসে চোখ বোজেন। রমণীমোহন স্টার্টারে চাপ দেয়। গাড়ি কেঁপে ওঠে।

হঠাৎ দিগিনের খেয়াল হয়, বলেন—তোরা কিছু খাস নি?

রমণী মাথা চুলকে বলে—আপনারও হয় নি।

দিগিন হাসলেন। বললেন—বুড়ো হয়ে যাচ্ছি নাকি রে? খাওয়ার কথা মনে থাকে না! চল।

ভাল হোটেলে তিনজন বয়স্যের মতো সমান সমানে বসে খেলেন। দিগিন সামান্যই খান। কিন্তু রমণী আর কপিল দু পাশে পাহাড় পর্বত গিলে ফেলতে লাগল। এই খিদেটা চেপে ছিল ওরা এতক্ষণ। বেলা একটা বাজতে চলল। ওরা কিছু বলতে জানে না। চিরকালই ওদের ঐরকম সব সম্পর্ক দিগিনের সঙ্গে। কর্মচারী, তবু কিছু বেশী। চাকর, তবু যেন অন্যরকম। শেষ পর্যন্ত সম্পর্কটা তালিয়ে দেখেন নি দিগিন। গোলমেলে! একটা জিনিস জানেন ওরা তাকে অন্ধের মতো বিশ্বাস করে।

ফের জীপে উঠে রমণীমোহন দিগিনের দিকে তাকিয়ে বলে—সেইখানে তো?

কোথায় যাওয়ার কথা তা খেয়াল ছিল না দিগিনের। বড় রাস্তার ধারেই একটা নানারী। খুব বড় বড় পাইন আর দেবদারু গাছের ছায়ায় টালির চালওলা বাড়ি। বহুকাল আগে এক ফরাসী বুড়ি নানের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন তখনকার এ-টি-এস সাহেব পেরেরা। বুড়ির কিছু মাল চুরি গিয়েছিল কলকাতা থেকে আসবার সময়ে ট্রেনে। বুড়ি রিপোর্ট করে। সাধারণত ট্রেন থেকে যাত্রীদের মাল চুরি গেলে রেল ক্ষতিপূরণ দেয় না। কিন্তু বুড়ি বিদেশী বলে, আর নান বলেই বোধহয় দিয়েছিল। পেরেরা সাহেবের দেহরক্ষী হয়ে রাইফেল হাতে দিগিন এসেছিলেন। সেই

ফরাসী সন্ন্যাসিনীর অনাবিল হাসি আজও বুকে লেগে আছে, ত্রিশ বছর পরেও। ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়ে নিজের হাতে করা কেক আর কফি খাইয়েছিল বুড়ি। অনেক আশীর্বাদ করেছিল।

অন্যমনস্কতা থেকে দিগিন ফিরে এসে বলেন—কোথায়?

—সেই মিসট্রেসের বাড়ি! রমণী বলে।

—কোন্ মিসট্রেস?

—যেখানে শানুবাবু আসেন!

—ওঃ। দিগিন বুঝতে পেরে বলেন—মেয়েটা মিসট্রেস্ বুঝি?

—না। মেয়েটা মিসট্রেসের মেয়ে। বিধবা।

দিগিন বিস্বাদ মুখে বলেন—শানু প্রায়ই আসে।

—সপ্তাহে দু তিনবার।

—বিধবা। তাহলে বয়স কত? বেশী?

—না। কম।

—বাচ্চা-কাচ্চা নেই?

—না। বালবিধবা।

—এ যুগে বালবিধবা হয় নাকি?

—এ হয়েছে। নিখিল ব্যানার্জির মেয়ে।

—নিখিল ব্যানার্জি! সে কে?

—আপনার চেনা ছিল। মনীষা দিদিমণির বর। দিদিমণিকে ছেড়ে পালিয়ে গেছে যে।

দিগিনের মনে পড়ল। উত্তরবাংলার প্রায় সব মানুষকেই চেনেন দিগিন। নিখিলকেও চিনলেন। খুব সুপুরুষ, খুব শিক্ষিত মানুষটা। কিন্তু চাকরি হয় জোটে নি, নয় তো করত না। মনীষা নামে মেয়েটি তার প্রেমে পড়েছিল। কলকাতা থেকে দুজন পালিয়ে আসে এই জঙ্গুলে দেশে। শিলিগুড়ি স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে নেমে দুজন হাবাগোবা হয়ে বসে আছে, জায়গা অচেনা, প্রেম পাংচার হয়ে বাতাস বেরিয়ে যাচ্ছে, দায়দায়িত্বের চাপে চাকা বসে যাচ্ছে মাটিতে। নির্মল গাঙ্গুলি তার বাড়িতে নিয়ে তুলল সে অবস্থায়। পরের বাড়িতে নবদম্পতির প্রথম ফুলশয্যা হল। সেইখানে থাকতে থাকতেই দুজনের রোজ খিটিমিটি বাঁধত। গাঙ্গুলি অতিষ্ঠ হয়ে এসে বলত—মাইরি, কাদের জোটালুম।

প্রেম করে পালানো সে যুগে বিরল ঘটনা ছিল। গাঙ্গুলি এ ব্যাপারটার প্রতি আকৃষ্ট হয়েই ওদের আশ্রয় দেয়। কিন্তু ওদের বনিবনার অভাব দেখে বিগড়ে যায়। মনীষা নাকি খুব বড়লোকের মেয়ে, আর নিখিল বেকার, মধ্যবিত্ত। সে-সময়ে সেই দুঃসাহসী আর দুঃসাহসিনীকে দেখার জন্য প্রায়ই দিগিন গেছেন ও বাড়ি। খুব স্মার্ট দম্পতি। দিব্যি কথাটথা বলত, কলকাত্তাই গুলচালও দিত। মাস দুই পর মনীষা চাকরি পেয়ে গেল কালিম্পঙে। বেকার স্বামীকে ঘাড়ে করে চলে গেল।

সুন্দর চেহারা ছাড়া, আর একটা ইস্‌লামিক হিস্ট্রির এম-এ ডিগ্রি ছাড়া নিখিলের আর কিছু ছিল না। চাকরির উৎসাহ ছিল খুবই কম। বসে খেত। বৌ চাকরি করত। বছর সাতেক ধরে ওদের দুজনের ঝগড়া হল। প্রেম কতদূর হয়েছিল কে জানে? তবে কালিম্পঙ থেকে যারা আসত তাদের কাছে মনীষা আর নিখিলের ঝগড়ার খবরই শোনা যেত। তারপর নিখিল এক আসামী মেয়ের সঙ্গে গৌহাটি পালিয়ে গেল। সেখানে নাকি সুখেই আছে তারা। নতুন শ্বশুরের সম্পত্তি পেয়েছে। নিখিলের মেয়ের খবর অবশ্য রাখতেন না দিগিন।

—শানু এখানে জুটল কি করে?

রমণীমোহন একটা ঢেঁকুর তুলে বলল—সাইটের কাছেই বাড়ি। ও বাড়িতে জলটল খেতে যেতেন। তারপরই চেনা জানা।

—কে কাকে ভজাল জানিস ?

রমণীমোহন একবার আড়চোখে দিগিনের দিকে চেয়ে বলে—শানুবাবুর দোষ নেই। মেয়েটা দেখতে ভাল। নিখিল ব্যানার্জির মতো।

গাড়িটাকে একটা পাক খাইয়ে টিলার মাঝ বরাবর তুলে দাঁড় করাল রমণী। বাড়িটা দেখিয়ে দিয়ে বলল—এই বাড়ি।

দিগিন দ্বিধাগ্রস্ত পায়ে নামলেন।

জীপ-এর শব্দ শুনে কেউ উঁকি দিয়েছিল বোধহয় জানালা দিয়ে। দিগিন মাথা নীচু করে ঢালু পথটা বেয়ে উঠছেন। এখনো লম্বাটে,

টান চেহারা, দূর থেকে দেখলে শানু বলেও ভুল হতে পারে। মাথায় একটা টুপি ছিল, চোখে কালো চশমা।

বাড়ির কাছে যেতে না যেতেই দরজা খুলে চমৎকার একখানা মুখ উঁকি দিল। মুখে একটু হাসি একখানা আয়ুহীন প্রজাপতির " থিরথির করে কাঁপছে।

দিগিন মুখ তুলতেই সেই প্রজাপতিটা মরে গেল ঝুপ্ করে। মেয়েটা মুখ নামিয়ে সরে দাঁড়াল একটু।

দিগিন বললেন—মনীষা আছে?

মেয়েটা মাথা নাড়ল—নেই। এ সময়ে স্কুলে থাকে।

—আমি শান্তি চ্যাটার্জির কাকা।

মেয়েটার মুখে এক অসম্ভব আতঙ্কের ছায়া খেলা করে গেল। এমনভাবে তাকাল যেন দিগিন যমপুরী থেকে পরোয়ানা নিয়ে এসেছেন। ব্যাধভীতা হরিণীর মতো পলকে সরে গেল ভিতরে।

দিগিন ক্লান্ত বোধ করলেন। বহুদিনকার পুরোনো বকেয়া ক্লান্তির বোঝা। শ্লথ পায়ে দরজার চৌকাঠে উঠে দাঁড়ালেন।

ভিতর থেকে ক্ষীণ কণ্ঠে মেয়েটি বলল—আপনি বসুন। মা এখুনি আসবেন।

দিগিন পদা সরিয়ে ভিতরে ঢুকলেন। ছোট্ট বসার ঘর, কাঠের মেঝে, কাঠের দেওয়াল, ওপরে টিন, বসবার ঘরে ছোট্ট ছোট্ট সোফাসেট, বইয়ের র‍্যাক, মেঝেয় সিকিমের কার্পেট পাতা। ফুলদানীতে ফুল। কেউ নেই।

দিগিন বসলেন, হাই তুললেন, কী করবেন তা এখনো ভাল করে জানেন না। একটা চুরুট ধরিয়ে ঠ্যাং-দুটো ছড়িয়ে দিলেন সামনে। মাথা হেলিয়ে চোখ বুজে রইলেন খানিক। চোখ বুজেই টের পেলেন, তাকে কেউ দেখছে। অত্যন্ত মনোযোগে, অতি সাবধানে দেখছে।

চোখ না খুলেই বললেন—এসো মা, তোমার সঙ্গেই দুটো কথা বলি।

পর্দার আড়ালে ভিতরের ঘর থেকে একটা অস্ফুট ভয়ার্ত শব্দ হল। তারপর খানিকক্ষণ চুপচাপ। তারপর আস্তে একখানা সুন্দর ফর্সা হাত পর্দাটা সরাল। রঙীন ছাপা শাড়ি-পরা, ভীত-সন্ত্রস্ত মেয়েটি ঘরের মধ্যে পা দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

দিগিন চুরুটের ঘন ধোঁয়া ছাড়লেন। অল্প একটু কাশি এল। সামলে নিয়ে বললেন—নামটি কি ?

—অধরা ব্যানার্জি।

দিগিন ভ্রূ কোঁচকালেন। চুরুটের দিকে চেয়ে বললেন—তোমার কি স্বগোত্রে বিয়ে হয়েছিল ?

আবার একটা অস্ফুট কাতর শব্দ, ভয়ের। ধরা পড়ার। মেয়েটি তার সুন্দর মুখটি নত করে দুধারে দুবার ফেরাল। অর্থাৎ না।

—তোমার স্বামীর পদবী কী ছিল ? দিগিন জিজ্ঞেস করলেন।

—ভট্টাচার্য। ক্ষীণ কণ্ঠের উত্তর এল।

—তাহলে ব্যানার্জি বললে কেন ? ইচ্ছে করলেই কি পদবী বদলানো যায় ?

বলে চেয়ে রইলেন দিগিন। বয়স কম। বোধহয় বাইশের বেশী কিছুতেই নয়। সাদা ধপধপে সিঁথি। কুমারীর মতো।

—কত বয়সে বিয়ে হয়েছিল ?

—ষোলো। তেমনি ক্ষীণ উত্তর।

—এখন কত বয়স ?

—একুশ।

—বিয়ের কদিন পর স্বামী মারা যায় ?

কাঠ-কাঠ প্রশ্ন, পুরুষ গলায়। মেয়েটা একবার করুণাভিক্ষু চোখ দুটো তুলে তাকাল। পরমুহূর্তে চোখ নামিয়ে নিয়ে বলল —ছ' মাস।

—কী হয়েছিল ?

মেয়েটি বাঁ হাতটি তুলে চোখ মুছল। মুখটা ফিরিয়ে নিয়ে বলল—আসাম অ্যাট্রোসাইটিসের সময়ে খুন হয়, তেজপুরে।

—ও! বলে দিগিন চুপ করে রইলেন। তারপর মুখ তুলে বললেন—তার কথা তোমার মনে পড়ে ?

মেয়েটা উত্তর দিল না। চুপ করে নতমুখী হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, দরজার একটা কাঠে ঠেস দিয়ে, যেন কোর্টে দাঁড়িয়ে জেরার উত্তর দিচ্ছে।

—মনে পড়ে না ? দিগিন প্রায় ধমকালেন।

মেয়েটি তার সজল চোখ দুখানা তুলে তাকাল। কী মায়া

থাকে চোখে। কী বিপুল ফাঁদ। দীগিনের বরফ গলতে শুরু করে।

মেয়েটি মাথা নেড়ে বলে—না।

—এত অল্পবয়সে তোমার বিয়ে দিল কে? কেনই বা!

—আমার দাদামশাই। আমার বাবা চলে যাওয়ার পর···বলে মেয়েটি দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে থামল। পারিবারিক ব্যাপার এ লোকটাকে বলা ঠিক হবে কি-না তা বুঝতে পারছিল না বোধহয়।

দিগিন বললেন—আমি তোমার মা বাবার সব ঘটনা জানি। বলো।

—বাবা চলে যাওয়ার পর দাদামশাই আমাদের ভার নেন। অবশ্য আমরা তাঁর বাড়িতে যাই নি। কিন্তু তাঁর কথামতো আমরা চলতাম। তিনি আমার বিয়ে দিয়েছিলেন। গৌরীদান করারই ইচ্ছে ছিল, কিন্তু মা দেন নি। তবু অল্প বয়সে বিয়ে হয়েছিল।

দিগিন একটা শ্বাস ফেলে বললেন—যাও, কফি করে আনো।

মেয়েটা চলে গেল। পরিপূর্ণ গৃহকর্তার মতো বসে রইলেন দিগিন। শীতটা বাড়ছে। ফেরার সময় একটু মাল টেনে নেবেন। এসব রাতে আজকাল খুব জ্যোৎস্না ফুটছে। বহুকাল জঙ্গলে পাহাড়ে জ্যোৎস্না দেখেন নি।

মেয়েটি কফি নিয়ে এল। দিগিন কাপটা হাতে নিয়ে তাপ দেখলেন, আগুন-গরম। খুব গরম ছাড়া খেতে পারেন না। খুশী হলেন।

নিঃশব্দে কফিটা খেয়ে উঠলেন। সকালে রাজমিস্ত্রির সঙ্গে যেভাবে কাজের কথা বলেছেন অবিকল সেই স্বরে বললেন—কোথাও পালিয়ে-টালিয়ে যেও না, ওতে লাভ হয় না। আমার বাসাতেই তোমার জায়গা হবে। শানু এলে বলো।

একটু চুপ করে থেকে বললেন—বিয়ের আগে শানুর সঙ্গে বেশী মিশো না, বুঝলে?

মেয়েটি লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে যাচ্ছিল। কিন্তু সেই অপরূপ লজ্জার দৃশ্যটি দাঁড়িয়ে দেখলেন না দিগিন। কে যেন তাকে জ্যোৎস্নায় ডাকছে। জঙ্গলে, পাহাড়ে, নিশুত রাতে।

বাইরে অবশ্য এখনো শেষ দুপুরের রক্তাভ রোদ।

জীপে উঠে দিগিন আর একটা চুরুট ধরালেন। বললেন—চালা। মেহের সিংয়ের দোকানে একটু থামাস।

কালিম্পঙের কনস্ট্রাকশনের কাজটা দেখার কথা তার মনে পড়ল না। সিংয়ের দোকান থেকে একটা বড় পাঁইট কিনলেন দিগিন, আর দুটো ছোটো। তারপর ফেরার পথে মাঝরাস্তায় জীপ দাঁড়-করিয়ে ভ্রূ কুঁচকে একটু কপিল আর রমণীর দিকে তাকালেন। তারা ইঙ্গিত বুঝল। বড্ড শীত পড়েছে। ছোটো পাঁইট দুটো তুলে নিয়ে দুজনে জীপের পিছন দিকে চলে গেল। মালিকের সামনে খায় না।

কয়েকদিন পর। শালবাড়িতে আজ খুব জ্যোৎস্না ফুটেছে। প্রচণ্ড জ্যোৎস্না।

মোটর সাইকেলটা খামারবাড়ির সামনে থামালেন দিগিন। পিছনের সীট থেকে ময়না নামল। তার গায়ে শাল, মুখ ঘোমটায় ঢাকা।

এখানেও প্ল্যাংকিং করা পুরানো ঘর একটা। কেউ থাকত না। এখন কপিল থাকে। খামারবাড়ির চারধারে জমি সদ্য কোপানো। কয়েকদিনে দু'বিঘেটাক জমি কুপিয়ে ফেলেছে কপিল। আরো দু'বিঘে কোপাবে। জমিটা ছাড়া হয়ে পড়ে ছিল।

নিস্তব্ধ খামারবাড়ির গভীর থেকে একটা খঞ্জনীর শব্দ আসছে। মৃদু কান্নার সুরে কপিল 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে…' গাইছে। একদম একা। পরিপূর্ণ সুখী।

ময়না ঘোমটা ফেলে দিয়ে পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নার প্লাবনে স্নান করে বলল—এখানে আনলে যে!

দিগিন ভ্রূকুটি করলেন, বললেন—কেন, খারাপ লাগছে?

ময়না মাথা নাড়ল, বলল—ভাবছি, আমার এত ভাগ্য!

দিগিন এ কথায় সাড়া দিলেন না।

পিছনে গভীর শালবন। বর্ষা পেয়ে আগাছা জন্মেছে খুব। সেদিকে চেয়ে বললেন—যাবে ওখানে?

ময়না বলল—তুমি গেলে যাবো না কেন?

—এসো।

বলে দিগিন হাঁটতে লাগলেন। শালবন খুবই গভীর। জ্যোৎস্না পেঁছায় নি ভিতরে। স্বপ্নময় অন্ধকার। জোনাকি জ্বলছে, ঝিঁঝি ডাকছে। পেঁচার শব্দ আসছে। পাখির ডানার শব্দ।

দিগিন জঙ্গলের মধ্যে ঢুকতে লাগলেন। পিছনে ময়না। ময়না পিছন থেকে দিগিনের একটা হাত ধরে বলল—আর যেও না।

—কেন?

—সাপখোপ আছে।

দিগিন হাত ছাড়িয়ে নিলেন। বললেন—তুমি কপিলকে ডাকো, দরজা খুলে দেবে। ঘরে বসে থাকো গিয়ে। আমি আসছি।

ময়না অসহায়ের মতো বলল—যদি না আসো?

দিগিন ভ্রূ তুলে বললেন—আসব না কেন?

ময়না লজ্জা পেয়ে বলে—তুমি তো অদ্ভুত। তোমার সম্বন্ধে কোনো কথাই নিশ্চয় করে বলা যায় না।

—ও। বলে দিগিন ভাবলেন, বললেন—যদি না আসি তবে কপিল তোমাকে পেঁছে দেবে।

ময়না দ্বিধাগ্রস্তের মতো শালবনের প্রান্তে দাঁড়িয়ে রইল। ফিরে গেল না। এলও না সঙ্গে।

মানুষ ঐরকম। অনেকদূর পর্যন্ত সঙ্গে আসে, কিন্তু সবটা পথ আসে না। জীবন থেকে তাই মানুষ খসতে থাকে, একটা বয়সের পর। দিগিন কোমর সমান আগাছা ভেদ করে এগোতে লাগলেন।

সংসারের কিছুই তাঁকে টানছে না। কেবল যেন এক মহা পর্বত, মহা আকাশ, মহা বৃক্ষ তাকে টানে।

হেমন্তের হিমে পাতা খসছে। কী সুন্দর এই পাতা খসে পড়ার শব্দ। ঘুড়ির মতো মস্ত শালপাতা খসে পড়ছে। কুয়াশা-মাখা অন্ধকার-আক্রান্ত জ্যোৎস্নায় চারদিকে ভূতুড়ে ছায়া। শীত। একটা গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে বসে রইলেন দিগিন। চুরুট ধরালেন। সাপখোপের কথা তার মনেও আসে না। কেবল মনে হয় সব কাজ সারা হয়েছে। অনেকদিন ঘুমোন নি, বিশ্রাম নেন নি। অনেকদিন যেন আবার কোনো শক্ত কাজও করেন নি।

হঠাৎ চমকে উঠলেন। একটা স্পর্শ পেলেন কাঁধে। প্রথমটায় ভয় হল, সাপ? ভূত? শত্রু?

মুখ তুলে দেখলেন, ময়না। ঘোমটা খসিয়ে ফেলা মুখ খুব আবছা দেখা যাচ্ছে। চোখ দুটো মস্ত বড় করে চেয়ে আছে।

—তোমার পায়ের শব্দ পাই নি তো! বললেন দিগিন।

—তুমি কি সজ্ঞানে ছিলে?

ময়না পাশে বসল। ওমর খৈয়ামের রুবাইয়াতের একটা বাংলা সংস্করণ ছিল বাড়িতে। তাতে ঠিক এই ভঙ্গীতে সাকীর একটা ছবি ছিল। ওমরের হাঁটুতে হাত রেখে উন্মুখ হয়ে বসে আছে।

দিগিন ময়নাকে টেনে নিলেন বুকের কাছে। অনেক বয়স হয়ে গেছে। তবু দুরন্ত ঠোঁটে দীর্ঘস্থায়ী একটা চুম্বন করলেন। কোনো কামবোধ নেই। কেবলই একটি গভীর ভালবাসা থেকে উৎসারিত চুম্বন যেন। ময়নাও বোধহয় তা বুঝল। বলল—এমন সুন্দর আদর হয় না। এসো, আমিও তোমাকে একটা চুমু দিই।

ঠোঁট বাড়িয়ে দিলেন দিগিন। অনেকক্ষণ ধরে আকুল চুমু দিল ময়না। চারদিকে ঘুড়ির মতো বড় বড় পাতা খসে পড়ছে তো পড়ছেই। শীত। কুয়াশা। জ্যোৎস্না। কয়েকদিন পর। সকালবেলায় ঘরে ইজিচেয়ারে বসে আছেন দিগিন। উত্তরের দিকে চোখ। তেমনি পা দুখানা সামনে তোলা। কাঞ্চনজঙ্ঘার শিরা-উপশিরা এবং ক্ষতচিহ্ন সবই আজ সকালের রোদে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। বিশাল একটা ঢালের ছায়া পড়েছে বুকে। পাহাড়টা যত সুন্দর ততই কুৎসিত। সাদা হাহাকারে ভরা একাকীত্ব। ওখানে তুষার ঝরছে, বয়ে যাচ্ছে মৃত্যুহিম বাতাস, একটিও গাছ নেই, পতঙ্গ নেই, প্রাণ নেই। ওরই পায়ের কাছে কোন দুর্জ্ঞেয় দুর্গম নির্জনতায় সৃষ্টি হচ্ছে তুষার নদী, পৃথিবীর প্রাণস্পন্দনের বীজকে অংকুরিত করবে বলে সৃষ্টি হচ্ছে হ্রদ—নদীর উৎস। ওকে ঘিরে আছে নিস্তব্ধতা, কেবলই নিস্তব্ধতা।

কেউ ডাকে নি, তবু দিগিন ঠিকই শুনতে পেলেন ডাক। বহুকাল আগে ফটিক লাহিড়ি একটা সবুজ রঙের পুরনো হারকিউলিস সাইকেল চালাত। ফুলপ্যান্টে ক্লীপ আঁটা, মাথায় হ্যাট, সাইকেল করে শিলিগুড়ির রাস্তা তৈরীর কাজ দেখে বেড়াত। সেই সাইকেলটা কোথায় হারিয়ে গিয়েছিল। আজ আবার তার ঘণ্টি

বাজল হঠাৎ। দিগিন ঠিকই শুনতে পেলেন। চমকালেন না। যেন ঘণ্টি বাজার কথাই ছিল।

বারান্দা দিয়ে ঝুঁকে তিনি দেখলেন, ফটিক লাহিড়ি বিশ বছর আগেকার সেই চেহারায় দাঁড়িয়ে। ফুলপ্যাণ্টে ক্লীপ আঁটা, মাথায় হ্যাট।

—আসছি। বললেন দিগিন, তারপর কাউকে কিছু না বলে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেলেন।

সাইকেলের ক্যারিয়ারে বসে বললেন—টানতে পারবে তো লাহিড়ি ?

—পারবো।

দিগিন একটা শ্বাস ফেলেন।

লাহিড়ি সাইকেলটা চালাতে থাকে উত্তরের দিকে। রাস্তা ক্রমে চড়াইয়ে ওঠে। ছোট ছোট পাহাড় ডিঙিয়ে যায়। ক্রমে চারধারে সাদা তুষার জেগে ওঠে। কেবল তার মধ্যে সাইকেলের চেন ঘোরাবার একটা মিহি শব্দ হয়। কাঞ্চনজঙ্ঘার গা বেয়ে ক্রমশ ওপরে উঠতে থাকে লাহিড়ির সাইকেল।

—পারবে তো লাহিড়ি ? দিগিন জিজ্ঞেস করেন।

লাহিড়ি হাঁফ-ধরা গলায় বলে—পারবো, পারতেই হবে।

—বরং তুমি ক্যারিয়ারে বোসো, আমি চালাই।

—না হে, তোমাকেও তো এরকম ট্রিপ মারতেই হবে। প্রথম দিনটা আমিই তোমাকে নিয়ে যাবো।

—আচ্ছা।

দিগিন আর কথা বলেন না। লাহিড়িও না। চারিদিকে কেবল এক সাদা, শীতল অন্ধকার জমে। আর কিছুই দেখা যায় না। না পাহাড়, না আকাশ, না পথ। সাইকেলের শব্দটাও শেষ হয়। দিগিন হাতটা বাড়ান। বিড়বিড় করে ডাকেন – লাহিড়ি।

কেউ উত্তর দেয় না।

দিগিন জানতেন এরকমই হবে। বিড়বিড় করে বলেন—সাদা অন্ধকার। অদ্ভুত সাদা এক অন্ধকার।

পুন্নি চা নিয়ে এল।

কিন্তু দিগিন তা হাত বাড়িয়ে কোনোদিনই আর নিলেন না।